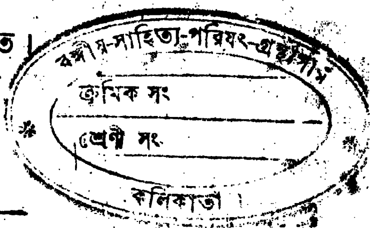
৪র্থ ভাগ। ১ম সংখ্যা।



অলৌকিক রহস্য

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

সম্পাদিত।



প্রকাশক,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী,

৫৬।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রাবণ, ১৩১৯-২০

বার্ষিক মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা।

PRINTED BY S. C. PAL, AT THE FINE ART PRINTING SYNDICATE
147, Baranashi Ghose Street, Calcutta.

অলৌকিক রহস্য।

১ম সংখ্যা] চতুর্থ বর্ষ। [শ্রাবণ, ১৩১৯।

রহস্যের অনুসন্ধান।

জগন্মঙ্গলময়ীর কৃপায় "অলৌকিক রহস্য" চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই ধারাবর্ষী শ্রাবণে করুণারূপিনী জননীর করুণাধারার আবাহনে আসুন, আমরা সকলে যুক্তকরে বলি :—

মঙ্গলং দিশতু নো বিনায়কো
মঙ্গলং দিশতু নঃ সরস্বতী
মঙ্গলং দিশতু নঃ সমুদ্রজা
মঙ্গলং দিশতু নো মহেশ্বরী ॥

গণপতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ; সরস্বতী আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ; লক্ষ্মী আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ; মহেশ্বরী আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

এই তিন বৎসর আমরা অনেক অলৌকিক ঘটনার সমাচার আপনাদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়াছি। এই সমস্ত ঘটনা নানাস্থানে নানাবিধ অবস্থায় সংঘটিত হইয়া পরলোকবাসীদিগের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। মৃত্যুপ্রাচীর-পারে অপর জগতের প্রান্তরে, অনেক বিপন্ন

পথিকের কাতর রোদন ও বিপন্মুক্ত হইবার ব্যাকুল আহ্বান আমাদের এ জাগ্রৎ জগতের তটভূমিতে আঘাত করিয়াছে।

এ আঘাত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই জীব 'ভূর্ভুবস্বঃ এই তিন লোকের পথে গতায়াত করিতেছে এই তিন লোকের পথে চলিতে চলিতে অনেক জীব কর্ম্মদোষে পথ হারাইয়া স্বরচিত বিভীষিকাময় অবস্থায় আপনাদিগকে পাতিত করে। সেই অবস্থায় পড়িয়া তাহারা মুক্তির আশায় সূক্ষ্ম সমীরণের সাহায্যে আমাদেরই কাছে তাহাদের কাতর আবেদন পাঠাইয়া দেয়। জীবের ভাগ্যবশে কোন কোন আবেদন আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু অধিকাংশই সংসারের কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া অশ্রুত রহিয়া যায়।

চিরাত্মস্থ ঋষিগণ এই সকল আবেদন শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদের অব্যাহত দৃষ্টি জাগতিক মায়ার সর্ব্বাবরণ ভেদ করিয়া এই সকল জীবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিল। এইজন্য তাঁহারা এই সকল জীবের উদ্ধারার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই উপায় অবলম্বনের জন্য জগৎবাসীকে তাঁহারা ব্যাকুলভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, স্থূলদেহীর যন্ত্রণা এই সকল সূক্ষ্মশরীরীর যন্ত্রণার সহস্রাংশের ও একাংশ নয়। আমাদের স্থূল দেহের উপরে প্রকৃতি যতই তীব্রবেগে আঘাত করুক না কেন, এই প্রেতলোকবাসিগণের আঘাতের তুলনায় তাহা কুসুমের কোমল স্পর্শ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা বুঝিয়া ঋষিগণ পুত্রাদি পরমাত্মীয়ের উপরেই মৃতের যন্ত্রণামুক্তির ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। দেশভেদে বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে পরলোকগতের মুক্তি সাধিত হইয়া থাকে। ইহাকেই সাধারণতঃ আমরা শ্রাদ্ধক্রিয়া কহিয়া থাকি। আমাদের দেশের শাস্ত্রকার এই ক্রিয়া এতই প্রয়োজনীয় বুঝিয়াছিলেন যে, মৃতের পরিত্যক্ত ধনাদিতে অধিকার এই শ্রাদ্ধক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত করিয়া

ছিলেন। শাস্ত্রাদেশ "পিণ্ডং দত্বা ধনং হরেৎ।" যে পুত্র, অথবা যে আত্মীয় মৃতের শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন না করিয়া তাহার ধন গ্রহণ করে, সে দায়ভাগী না হইয়া দায়াপহারী হয়।

যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা এই সকল শাস্ত্র বাক্যে আস্থাবান ছিলাম। আমাদের দেশের অতি নরাধমও এই শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত না। জীবের স্থূল দেহাবসানেও যে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে, স্থূলদেহীর ন্যায় অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে তাহারা যে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ চক্ষে না দেখিলেও তাহা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, তথাকথিত জ্ঞানের প্রখরতায় আমরা অল্পদিনের মধ্যেই সে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলাম। তাহার ফলে জড়জগতেই আমাদের অস্তিত্ব নিঃশেষে ঢালিয়া আমরা অধ্যাত্মজগতে আমাদিগকে নিঃস্ব করিয়াছি। পিতৃপুরুষবর্গকে আমাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিয়া, আমরা নিজেরাও বৈতরণী-পারের কড়ি তার অনলজলে নিক্ষেপ করিয়াছি!

কালের কুটীলা গতি, আমরা যাহাদিগকে গুরুস্থানীয় করিয়া আমাদের শাস্ত্রের আদেশ অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়াছিলাম, পিতৃপুরুষগণকে কতকগুলা কি জানি কি দুরভিসন্ধিধারী, কি দুর্ব্বোধ্য স্বার্থান্বেষী মনে করিয়া সেই সকল ফলমূলাশী বনচারী 'বর্ব্বরের' প্রলাপ কথায় কর্ণে অঙ্গুলি দিয়াছিলাম, এখন আবার সেই সকল পাশ্চাত্য গুরুপ্রদত্ত কড়ি লইয়াই আমরা নিজেদের পারের ব্যবস্থা করিতেছি। হউন জড়বাদী, যদি এই সকল পাশ্চাত্য মনীষী সত্যানুসন্ধী না হইতেন, আর এই অনুসন্ধানের ফলে যদি তাঁহারা সত্যের আভাষ না পাইতেন, জড়ের অন্তরাল হইতে চৈতন্যময়ীর অপাঙ্গের ইঙ্গিত লক্ষ্য না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা কে বলিতে পারে।

আর্য্যঋষির যুগযুগান্ত-সঞ্চিত তপস্যার প্রভাবে ভারতের মৃত্তিকার কণায় কণায় অমৃতরস-নিঃসন্দিনী শক্তি আছে। "মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্ত সিন্ধবঃ।" এই মন্ত্র তাঁহারা নিরর্থক উচ্চারণ করেন নাই। তাঁহাদিগের মধুময় আবাহনগানে ওষধিসকল মধু অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল; পার্থিব রজ মধুমিশ্রিত হইয়াছিল। সেই প্রাণপূর্ণ দেশে জন্মিয়াছি বলিয়াই, আমরা চৈতন্য হারাইয়াও মরি নাই। আমরা নিজে আপনাদের বাঁচাইবার চেষ্টা না করিলেও বাহিরের লোকের সত্যানুসন্ধানের ফলে আমাদের প্রাণ ফিরিয়া আসিয়াছে।

পাশ্চাত্য জড়বাদী মনীষিগণ জীবদেহের স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ছিলেন যে, জীবের দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়া যায়। মরণের পর তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সুখদুঃখাদির অনুভূতি দৈহিক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, চিন্তাদি মানসিক ব্যাপার মস্তিষ্কের বিন্দু সকলের স্পন্দনমাত্র। স্পন্দনেই তাহাদের উদ্ভব, স্পন্দনের নিবৃত্তিতেই তাহাদের নিবৃত্তি। আত্মা পরলোকাদির কথা কেবল মাত্র কবি-কল্পনা। মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণের ভিতরে যে জ্ঞানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই, তাহা কেবল ইন্দ্রিয়-জনিত এবং সে জ্ঞান তাহাদের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়শক্তির অনুরূপ সীমাবদ্ধ। এই বোধশক্তির বিকাশ মস্তিষ্কের গঠনের উপর নির্ভর করে। তাঁহাদের মতে মানুষ আর কিছুই নহে, চিন্তাশক্তিসমন্বিত জন্তু মাত্র।

পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাদিগের জিজ্ঞাসিত অনেক প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই। ছয়সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্টির আরম্ভ ও আদি মানবের জন্ম কথা তাঁহাদের সমীক্ষার কাছে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ভূগর্ভ ও গিরিগাত্র হইতে প্রস্তররূপে পরিণত জীবকঙ্কালের আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান

করিলেন! সৌদামিনীকে বশে আনিয়া ও দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহারা আপনাদিগকে বাইবেলের ঈশ্বরের সমকক্ষবোধে গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিলেন। পাশ্চাত্য দেশ নিরীশ্বরবাদীতে ভরিয়া গেল।

যাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা অল্পসাহসী, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বাইবেল-কথিত অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের ব্যবস্থাটা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইল। কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দীপূর্ব্বে ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজ, এইরূপ স্বাধীনচিন্তাশীল মনীষিগণের প্রভাবে টলমল করিতে লাগিল।

কেহ বাইবেলের বাক্যে একেবারেই অনাস্থা প্রকাশ করিলেন, কেহ একেবারে অবিশ্বাস্য অংশ প্রক্ষিপ্তবোধে বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ লইয়া কোনও মতে ধর্ম্মকে ধরিয়া রহিলেন। ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মপুস্তকের যুগানুযায়ী টীকা করিতে প্রস্তুত হইলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আপনার বহিরাবরণ লইয়া কেবল অনন্ত নরক-ভীত অপেক্ষাকৃত অল্পমেধাবী ও অল্পশিক্ষিত জনগণকে আশ্রয় করিয়া রহিল।

কিন্তু জড়বাদী হইলেও, ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলেও এইসকল মনীষিগণ জিজ্ঞাসু। তাৎকালিক মিসনরীদের ব্যাখ্যায় প্রীত না হইয়া তাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধানে জড়া প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসু ঈশ্বরের কৃপাপাত্র। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন:—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ॥

জ্ঞানীর ন্যায় জিজ্ঞাসুও ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। ভগবান এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিগণকেই উদার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। "উদারাঃ সর্ব্বএবৈতে।" সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকুক অথবা নাই থাকুক

সত্যের অনুসন্ধানে জড়া প্রকৃতির সেবা করিতে যাইয়া তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ভগবানের অর্চ্চনায় নিযুক্ত ছিলেন।

ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া আকাঙ্ক্ষিত সদ্বস্তুর লোভে কেহ যদি ভ্রমের পথে চলিয়া যায়, ভগবান তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া তাহাকে সুপথে ফিরাইয়া আনেন। হিন্দুর চক্ষে জগতে ভগবৎসত্তাবিহীন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। সর্ব্বভূতে ভগবান আছেন বলিয়াই হিন্দু স্থূলতম প্রস্তর হইতে সূক্ষ্মতম অব্যক্ত অচিন্ত্যের পূজা অনাদিকাল হইতে করিয়া আসিতেছে। "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" সাধকগণ স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে এই মহাবাক্যের অর্থ করিয়া আত্মতৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং হিন্দুর চক্ষে পাশ্চাত্য মনীষী এতকাল জড়ের সাধনা করিতে গিয়া প্রকৃত পক্ষে প্রাণময়ী প্রকৃতিরই উপাসনা করিতেছিলেন।

ভগবদনুস্যূতা প্রকৃতি—জগজ্জননী মহামায়া আর অধিক দিন তাঁহাদের কাছে আত্মগোপন করিতে পারিলেন না। পরীক্ষা সমীক্ষাদির নামে নব প্রণালীর অবলম্বনে জড়ের উপাসনা করিতে করিতে প্রতীচ্য বিজ্ঞানবিৎ চৈতন্যের আভাসপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মায়া ও সংস্কারবশে জড়ের প্রীতি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে না পারিলেও চৈতন্যের সত্তা স্বীকার করিতে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের আর অধিক বিলম্ব নাই। প্রতীচ্য বিজ্ঞান উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া এমন স্থানে উপস্থিত হইয়াছে যে, আর এক পদ অগ্রসর হইলেই ভূর্লোক অতিক্রম করিয়া তাহা ভুবর্লোকের সীমায় উপস্থিত হয়।

সার উইলিয়ম ক্রুক, সার অলিভার লজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ আগে হইতেই পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। অনেক পরলোক-প্রবাসীর ছায়াচিত্র তাঁহাদের সমীক্ষার ফলে লোকচক্ষুর গোচর

হইয়াছে। ডাক্তার কিলনার সম্প্রতি অভিনব চশমার আবিষ্কার করিয়া মানবের সূক্ষ্মশরীর সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। গতবর্ষের 'অলৌকিক রহস্যের' দ্বিতীয় সংখ্যার "সূক্ষ্মশরীরের প্রমাণ" নামক প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ হীরেন্দ্রবাবু তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। সুতরাং এ স্থলে তাহা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ বহু পরীক্ষা ও সমীক্ষার ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন, বহুযুগ পূর্ব্ব হইতেই প্রজ্ঞানময় ঋষি তাহা জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। সে ঘোষণা-বাক্য উপেক্ষা করিয়া চিরান্ধকারে নিমজ্জিত হইবার জন্য আমরা প্রতীচ্য গুরুর সহযাত্রী হইয়া কালস্রোতে ভাসিয়া চলিতেছিলাম। প্রতীচ্য গুরু আলোকের ক্ষীণ আভাস পাইয়াই স্বস্থানে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন। এখন কর্ম্ম-হীনতায় যদি আমরা তাহাদের পুনরাবর্ত্তন উপেক্ষা করিয়া পুরুষকারের সামান্য মাত্রও নিদর্শন দেখাইতেও অপারগ হই, তাহা হইলে আমাদের স্বদেশে ফিরা অসম্ভব হইবে। আমরা ডুবিব মরিব। ভগবানের শ্রীচরণরজঃপূত কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবের ইহা হইতে দুর্ভাগ্য আর নাই। অধিকাংশ মানব স্বল্পবুদ্ধি। অসাধারণ প্রতিভা লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, ইতর সাধারণ ব্যক্তিগণ, নিজেদের বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়া, সেইরূপই আচরণ করিয়া থাকে। ইহাই সমাজের প্রকৃতি-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। সুতরাং বুঝিতে পারি না বলিয়া, শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস সর্ব্বথা সমীচীন নহে।

আমি আমার ন্যায় স্বল্পবুদ্ধি সাধারণ জীবকে আহ্বান করিতেছি। নির্গুণ ব্রহ্ম সকল জীবের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হইলেও সাধারণ জীব বাসনার দাস। বাসনার লেশমাত্র থাকিলেও জীবের ঈশ্বর স্বরূপ বোধের সম্ভাবনা নাই।

যতদিন মানব এই বাসনা ত্যাগ না করিতে পারিবে, ততদিন তাহাকে ভুর্লোক ভুবর্লোক এবং স্বর্লোক এই তিন দেশের পথেই যাতায়াত করিতে হইবে। ততদিন জন্মের পর জন্ম—এইরূপ কত জন্ম হইবে তাহার সংখ্যা নাই। যিনি এই জন্মমরণভয়ে ভীত হইয়া বিবেক-বৈরাগ্য আশ্রয় করতঃ সাধনার পথে অগ্রসর হন, তিনি ধন্য। আমরা তাঁহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি। কিন্তু সকলেই সেরূপ নহে।

"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎযততিসিদ্ধয়ে।"

আমরা সেই সহস্রের মধ্যে নয় শত নিরেনব্বুইয়ের ভিতরে পড়িয়াছি। আমরা সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত যত্নবান সেই ভাগ্যবান "কশ্চিৎ" নহি। পুত্রকন্যাদির মোহ ত্যাগ করিতে অশক্ত হইয়া নিরন্তর আমরা আমাদিগকে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করিতেছি। অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের এই বন্ধন-জনিত গতাগতি। এ গতাগতি যতদিন থাকিবে, ততদিন আমরা রূপের হাত এড়াইতে পারিব না। ঈশ্বরবোধে স্থূল হইতে স্থূলতম প্রস্তর-রচিত প্রতিমারই অর্চ্চনা করি, অথবা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক বলিয়া আপনাকে লোকসমক্ষে প্রচারিত করি, যতদিন আমাদিগকে পৃথিবী হইতে স্বর্গ ও স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরাফিরি করিতে হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা যমের অধিকারাধীন। যমের রাজ্যে পিশাচ হইতে আরম্ভ করিয়া দেবতা পর্য্যন্ত অনেক অধিবাসী আছে। [illegible]ংকর্ম্মে এই পিশাচের সহবাসে নরকযন্ত্রণা, সৎকর্ম্মে দেবতার সহবাসে স্বর্গসুখভোগ। সদসৎ কর্ম্মের ফলে স্বর্গ নরক অবশ্যম্ভাবী. ইহা বুঝিয়া ইহজগতেই আমাদিগকে চরিত্র গঠন করিতে হইবে। জীবে জীবে প্রীতি সংস্থাপিত করিতে হইবে। জীবের দুঃখ নিজের দুঃখ মনে করিয়া তাহার প্রতীকারে যত্নবান হইতে হইবে। আর বুঝিতে হইবে যে, জীব শুধু দৃশ্যজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে না। অদৃশ্য জগৎও সুখী এবং অসুখী এই উভয় অবস্থাপন্ন অসংখ্য জীবে পূর্ণ। দুঃখী

প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের পুণ্যকর্ম্মের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, স্বুখী আমাদিগকে কর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগের অবস্থা পাইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেছেন আর আমাদিগকে মোহনিদ্রা হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তেই সাধুর শ্রবণীয় সুস্নস্বরে জগজ্জননী ও জগৎপিতার নাম লইয়া বলিতেছেন—

মাতাচ পার্ব্বতী দেবী, পিতা দেব মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিব ভক্তাশ্চ স্বদেশভুবনত্রয়ং॥

এস ভাই, আমরাও শিবপার্ব্বতীর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া সমস্বরে বলি, "মঙ্গলময় আমাদিগের পিতা, মঙ্গলময়ী আমাদের মাতা, এই ত্রিজগতের কল্যাণকল্পে যাঁহারা মঙ্গলময়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেই সকল ভক্ত আমাদিগের ভাই, এবং ত্রিভুবন আমাদের স্বদেশ। আর এ নূতন কথা, এ মধুর কথা, এ উদারবাণী যে মহাপুরুষের মুখ হইতে প্রথম বাহির হইয়াছে, সেই আর্য্যঋষিকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তাঁহার জয়ঘোষণা করি।

পুনরাগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৪৪)

পরবর্ত্তী মাস অগ্রহায়ণের শেষে আমার বিবাহ হইল। আমার অমতে ও অজ্ঞাতসারে পিতা যে সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও, মাতার কথা শুনিয়া পিতার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যই করিলাম।

আমার শ্বশুর জমীদার, তাহার উপর কৃতবিদ্য. সে সময়ের জুনিয়র সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সুতরাং পাশ্চাত্য জ্ঞানলোক তাঁহারও মধ্যে যথেষ্ট প্রবেশ করিয়াছিল। তিনিও তৎকালীন অন্যান্য কৃতবিদ্যের মত হিন্দুর কুসংস্কারগুলার মূলোচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু সমাজটা একেবারে পরিত্যাগ করিতে তাঁহার সাহস ছিল না। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার পিতা পূর্ব্ব হইতেই পুত্রের মনোভাব বুঝিয়া, এবং তাঁহার সঙ্গীদিগের অনেককে প্রকাশ্যে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিয়া, বিষয়ের উত্তরাধিকার-সম্বন্ধে কিছু কড়াকড়ি করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার মনে ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি প্রকাশ্যে সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। যাহা কিছু করিতে হইত তাহা গোপনে। বিশেষতঃ তাঁহার মাতাঠাকুরাণী জীবিত ছিলেন। তিনি সেই সেকালের স্ত্রীলোক, পরম নিষ্ঠাবতী রমণী। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে অনার্য্যাচার প্রবেশ করিতে দেন নাই।

শ্বশুর মহাশয়ের গৃহধর্ম্মের দুইটা দিক ছিল। একদিক তাঁহার পিতৃপিতামহকৃত, অপর দিক তাঁহার নিজকৃত। বাড়ীতে দেবসেবা ছিল;

এবং সেই সঙ্গে অতিথিসৎকারের ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থা তাঁহার পিতৃপুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল। বাটী হইতে কিছু দূরে গঙ্গাতীরে তাঁহাদের এক উদ্যান। সেই উদ্যানমধ্যে এক সুনির্ম্মিত ও ইংরাজীধরণে সুসজ্জিত বাটী। সে বাটীর মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মের অপর দিক, অর্থাৎ ভোজনসেবা চলিত। ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভে সমাজবিপ্লবের প্রথম অবস্থায় শিক্ষিতগণের ভিতর প্রথম প্রথম এই ভোজন ধর্ম্মটাই প্রচলিত হইয়াছিল। আহার-বিহারে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিতা করিয়া অনেকেই কুসংস্কারের গণ্ডীটাই প্রথম অতিক্রম করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। মিসনরীগণের চেষ্টায় অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, শিক্ষিতগণের অধিকাংশই সে ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা সে সময় সংখ্যায় মুষ্টিমেয় ছিলেন। তারপর মহাত্মা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। এ সমস্তই ইতিহাসের কথা, সুতরাং এস্থলে তাহার অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

আমার শ্বশুর মধ্যাহ্নে গৃহে আহার করিতেন; রাত্রির আহারাদি ব্যাপার বাগানেই সম্পাদিত হইত। বাড়ীতে সেই প্রাচীনকালের আত্মীয়া "ব্রাহ্মণী" চিরপ্রথানুযায়ী কতকগুলা "বৈষ্ণবাটী" অর্থাৎ শাকসব্জী এবং আলুকুমড়ার তরকারী লইয়া নিত্য তাঁহার যে রুচির শ্রাদ্ধ করিত, সন্ধ্যার পর বাগানে বন্ধুবান্ধবের সহিত ইচ্ছামত মাংসাদি ভোজনে তিনি সেই রুচির আবার প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সব সুভোজ্য আহার যে ব্যক্তি প্রস্তুত করিত, তাহাকে সকলে আদর করিয়া "তারকেশ্বরের বামুন" বলিত।

বাড়ীতে আহার-সম্বন্ধে বিধিপ্রবর্ত্তনের ইচ্ছা থাকিলেও মায়ের ভয়ে তিনি কিছুই করিতে পারিতেন না। তিনি জননীকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। জননীও তাঁহার তেজস্বিনী ছিলেন। সুতরাং

অন্তরে হিঁদুয়ানীর উপর শ্রদ্ধাহীন হইলেও মায়ের ভয়ে বাহ্যতঃ হিন্দুর আচারব্যবহারগুলার কতক কতক তাঁহাকে বজায় রাখিতে হইয়াছিল।

এই কারণেই ইচ্ছা না থাকিলেও আমার স্ত্রীর বিবাহে তিনি কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইতে দেন নাই। বিবাহের সময় আমার স্ত্রীর বয়স সবে মাত্র দশ বৎসর হইয়াছিল।

আমাদের ঘরে বিবাহ দিবার তাঁহার একটী কারণ ছিল। তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র। প্রথমেই তাঁহার কন্যা হইয়াছিল। তাহার পর দুই তিনটী সন্তান হইয়া মরিয়া যায়। তাহার পর এক পুত্র, সর্ব্বশেষে আমার স্ত্রী। আমার স্ত্রী ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহার মাতৃবিয়োগ হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমার শ্বশুরের ধর্ম্মসম্বন্ধে মত যাহাই হউক না কেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার সদ্‌গুণ তিনি যথেষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন চরিত্রবান পুরুষ ছিলেন। স্ত্রীবিয়োগের পর আর তিনি দার-পরিগ্রহ করেন নাই। অবশ্য মাতা তাঁহাকে পুনর্ব্বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন, এমন কি দুই একবার অনুরোধও করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বশুর মাতার এ অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর দিবস হইতে অধিকাংশ সময় তিনি বহির্ব্বাটীতেই অবস্থান করিতেন। বহির্ব্বাটিতে তাঁহার একটী প্রকাণ্ড পাঠাগার ছিল। সেখানে সেক্‌সপিয়র, মিল্‌টন, বেকন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ইংরাজী কবি ও দার্শনিকগণের গ্রন্থগুলি তাঁহার নির্জ্জন সঙ্গীর কার্য্য করিত।

এই সকল কারণে অগত্যা আমার দিদি শ্বাশুড়ী অতি শৈশব হইতেই আমার স্ত্রীর পালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী হিন্দু বিধবার সহবাসে, ও ত্যাগের জীবন্ত আদর্শের সম্মুখে অবস্থান করিয়া, কুমারী অবস্থা হইতেই তাহার কতকটা ব্রহ্মচারিণীর মত স্বভাব হইয়াছিল। সে পিতামহীর সঙ্গে নিরামিষ আহার করিত।

নিরামিষ আহারে বালিকা এতই অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, শেষে মাছ মাংসের গন্ধ পর্য্যন্ত সহিতে পারিত না।

আমার শ্বশুর প্রথম প্রথম তাহার প্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখেন নাই। স্ত্রীবিয়োগেরপর হইতেই তাঁহার কতকটা উদাসীনের ভাব আসিয়াছিল। আমার শ্বাশুড়ীর মৃত্যুকালীন আমার শ্যালকের বয়স হইয়াছিল চার বৎসর। শ্বশুর তাহারই রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। যখন কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহাকে নিজের কাছে আনিলেন, তখন দেখিলেন, বালিকা তাঁহার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। সে তাহার ঠাকুরমার মত মাটীর শিব গড়িয়া পূজা করে, গৃহদেবতা লক্ষ্মী-নারায়ণের আরতির সময় তাঁহার গায়ে চামর ঢুলায়, পূজার সময় ধূপ ধুনা জ্বালে ও পুরোহিতের পূজার নানাপ্রকারে সাহায্য করে। পড়িতে বলিলে, ‘ক’ দেখিয়াই প্রহ্লাদের মত কাঁদে। দুই চারিদিন বালিকাকে বশে আনিবার চেষ্টা হইল, চেষ্টার ফলে সে প্রবল জ্বরে পড়িল। অগত্যা আমার শ্বশুর তাহার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া মায়ের কাছেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন।

শ্বশুর মহাশয় জ্যেষ্ঠা কন্যাকে পণ্ডিত রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং একজন ইংরাজীতে সুশিক্ষিত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমার শ্যালীপতি ভাই সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন। ওকালতীতে তাহার বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছিল। শুনিয়াছি তিনি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। শুধু নিজের প্রতিভাবলে সমাজে গৌরবলাভ করিয়াছিলেন! তবে চালটা তাঁহার পূরা সাহেবী ধরণেরই হইয়াছিল। স্ত্রীকেও তিনি তদনুযায়ী শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়াছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত এক মেম তাহাকে ইংরাজী পড়াইয়াছিল। তাহার সংসর্গে থাকিয়া আমার শ্যালিকারও আচারব্যবহার অনেকটা ইংরেজী ধরণের হইয়াছিল।

পিতামহীর কাছে অনেকটা সংযতভাবে আসিলেও, তাহার আচরণ পিতামহীর বড় মনোমত হইত না। এইজন্য কনিষ্ঠা নাতিনীকে কোন আচারী হিন্দুর ঘরে দিবার জন্য তিনি আমার শ্বশুরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

মায়েরও অনুরোধটা রক্ষা হয়, অথচ কন্যা একেবারে কুসংস্কারাপন্ন নিরেট হিন্দু পরিবারের মধ্যে পড়িয়া কতকগুলা মাটীর ডেলায় মনুষ্যত্বটা অঞ্জলি না দেয়, এই ভাবিয়া, দুই কূলই বজায় থাকে, এমনি একটী পরিবারের মধ্যে তিনি পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন।

এই সময়ে ঘটনাক্রমে পিতার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। পূর্ব্ব হইতেই দেশমধ্যে পিতার নামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সুতরাং আগে হইতেই তাঁহার নাম শ্বশুরের জানা ছিল। এখন পিতার শারীরিক অসুস্থতার জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তন-উপলক্ষে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার আলাপ হইল। সেই আলাপেই আমার শ্বশুর বুঝিয়াছিলেন, এই সুসভ্য অধ্যাপকের গৃহে তাঁহার কন্যা পড়িলেই তাঁহার দুইকুল রক্ষা হইবে অর্থাৎ পিতাকে অধ্যাপকত্ব বজায় রাখিতে হইলে তাঁহাকে টিকি রাখিতেই হইবে, আর পুত্রকে ইন্‌জিনিয়ারের কাজ করিতে হইলে, মাথায় টুপী পরিতেই হইবে। সুতরাং আজকাল তাঁহার মায়ের হাতে পড়িয়া অশিক্ষিতা হইলেও কালে কন্যা যে সভ্যতার আলোকে সাঁতার কাটিবে, তাহাতে তাঁহার আর সন্দেহই রহিল না।

পিতাও পূর্ব্বে দরিদ্র ছিলেন। এইজন্য একটা বনিয়াদী ঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতা তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি, আমি তাহার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এক জমীদারের জামাতা হইলাম।

দুর্গার সৌন্দর্য্য হইতে বিভিন্নভাবে বিকশিত হইলেও প্রথম শুভদর্শনেই

আমার স্ত্রীর রূপ আমার মনোজ্ঞ হইয়াছিল। বিশেষ আনন্দের কথা আমার মাতা তাহাকে দেখিবামাত্র প্রীতা হইয়াছিলেন; এবং সযত্নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আসল কথা, আমার সংসারের প্রতিষ্ঠার আরম্ভ অশুভ হয় নাই।

এ অবান্তর কথা তোমাদের শুনাইবার প্রয়োজন নাই জানি; এবং শ্বশুরগৃহে নবাগতা রোরুদ্যমানা বালিকার প্রেমকাহিনী শুনিবার জন্য তোমরাও উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া নাই, ইহাও জানি। অনেক বিচিত্র উপন্যাসের ষোড়শী নায়িকার চিরমধুময় বিশ্রম্ভালাপে তোমরা তৃপ্ত হইয়াছ, অনেক নিবিড় নিশীথিনীর রসপ্রস্রবণী তমিস্রায় তোমরা স্নাত হইয়াছ, অনেক কোকিল-কূজিত কুঞ্জের অন্তরালে নীলচেলাঞ্চলের আকুল সমীর-প্রীতি তোমরা নিরীক্ষণ করিয়াছ। তোমাদের কাছে এক দশম-বর্ষীয়া বালিকার কথা উত্থাপন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। তথাপি উত্থাপন করিলাম।

এখন আমি বৃদ্ধ। আমার অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে প্রিয়তমার যৌবনের সেই ব্যাকুল-বিলসিত রূপতরঙ্গ গাঢ়তমসোত্থিত চপল তড়িদ্বিকাশের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য জাগিয়া আবার ঘনান্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। জীবনের এই সীমান্ত হইতে আমি আমার স্ত্রীর সেই দশমবর্ষের সৌন্দর্য্যই মধুর দেখিতেছি। কেন দেখিতেছি তাহাই তোমাদের বলিব।

তৎপূর্ব্বে কার্ত্তিকমাসের শেষ কয়টা দিনের ইতিহাস আপনাদিগকে শুনাইবার প্রয়োজন হইবে বুঝিয়া অগ্রে তাহারই অবতরণা করিতেছি। মাতার চরণে শরণ লইবার পর হইতেই আমার হৃদয়ের ভার অর্দ্ধেকের উপর লাঘব হইয়া গেল। আমি সর্ব্বপ্রথম জীবনে এক অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন নিশা-রাক্ষসীর আকর্ষণে স্বপ্নসঞ্চরণে কোন দুর দেশস্থ প্রান্তরের অভিমুখে

চলিয়াছিলাম। কিন্তু চলিবার সময় কতকগুলি সাধুর দৃষ্টি আমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। তাহারই আকর্ষণের বিরুদ্ধে চলিতে চলিতে আমারি ধীরে ধীরে সংজ্ঞা ফিরিয়াছে। আমি আবার গৃহমুখে ফিরিতেছি।

উষার জ্যোতি এখনও পূর্ব্বদিগঙ্গনার স্নেহালিঙ্গন পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সেইজন্য স্বগৃহের চূড়া এখনও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না। তবে মনে হইতেছে আমি যেন তাহা দেখিতে পাইতেছি। অস্পষ্ট উষায় আঁধার ও আলোকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঘরের মূর্ত্তিটী যেন আকাশ-বাসিনী ক্ষুদ্র তারার ন্যায় কাঁপিতেছে।

প্রত্যাবর্ত্তনমুখে এক একবার নিশা-রাক্ষসীর মোহকর স্পর্শ অনুভব করিতেছি। তবু বিশ্বাস, আমি স্বগৃহে প্রবেশ করিতে পারিব। ঘুমন্ত ডাক্তারবাবুর আশার কথা থাকিয়া থাকিয়া আমার কর্ণরন্ধ্রের ভিতর দিয়া এক একবার আমার মর্ম্মতন্ত্রীতে আঘাত করিতেছে,—"তুই একবার ফিরিবার ইচ্ছা কর্ তাহাহইলেই দেখিতে পাইবি, সময় তোর সহায় হইয়াছে। সেই তোকে তোর নিজের ঘরে ফিরাইয়া দিবে।

আমি এখন সময়ে অসময়ে মায়ের কাছে উপস্থিত হই, সময়ে অসময়ে কর্ত্তব্যসম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করি। তাহারই আদেশানুসারে আমাকে বিবাহ করিতে হইল। নতুবা তাঁহার আসন্নমৃত্যু স্মরণ করিয়া বিবাহ করিতে আমার আর ইচ্ছা ছিল না। নরাধম ত বটিই, তবে এরূপ পাপ স্বার্থচিন্তা আমি মনে স্থান দিতে পারি নাই।

তবে আমার ফিরিবার ইচ্ছা আমি মায়ের কাছে প্রকাশ করি নাই। কি জানি যদি মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া যায়। এখন পর্য্যন্ত এমন কিছু কাজ করিতে পারি নাই, যাহাতে পুরুষত্বের উপর ভর দিবার সাহস করি। গোপালকে দুই দুইবার আনিতে গেলাম, দুই দুইবারই বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া আসিয়াছি। মনে মনে স্থির করিয়াছি, এবার

যদি গোপালের সন্ধানে আমাকে ঘর ছাড়িতে হয়, তাহা হইলে গোপালকে না লইয়া আর ঘরে ফিরিব না। এখনও নিজের উপর সাহস নাই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারিলাম না, মনের ইচ্ছা মনেই রাখিলাম, মায়ের কাছেও প্রকাশ করিলাম না।

মায়ের সঙ্গে দুইদিন কথা কহিয়াই বুঝিলাম, পিতার প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ। আমার কাছে তাঁহার কথা তুলিতে না তুলিতে মায়ের চক্ষে জল আসে। কহিতে কহিতে বারংবার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া যায়। কখন কখন অশ্রুধারা গণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলে।

পিতার প্রতি এই অগাধ স্নেহ পশ্চাতে রাখিয়া মা চলিয়া যাইতেছেন। বড়ই আঘাত! পাণ্ডিত্যের অভিমান লইয়া মূর্খ পিতা সতীর মর্য্যাদার উপর বড়ই আঘাত করিয়াছিলেন! এ আঘাত মা সহ্য করিতে পারিলেন না! ভগ্ন হৃদয়ে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে অশ্রুবিন্দু ধরণীপৃষ্ঠ অঙ্কিত করিতেছে। চলিতে চলিতে স্নেহের আবেগে মা সন্তানের কাছে হৃদয় কবাট মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমার পিতামহ এক দরিদ্রের কুটীর হইতে অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীরূপিণী জননীকে কুড়াইয়া গৃহে আনিয়াছিলেন। পিতার বয়স তখন সতেরো বৎসর। এক দরিদ্রা বিধবার একমাত্র কন্যা শ্বশুরগৃহে আসিবার অল্পদিন পরেই মাতৃহারা হইয়াছিল। শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী পিতা ও মাতার আদরে তাহাকে পালন করিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পদিন পর হইতে আজিও পর্য্যন্ত আর মাকে আমাদের গৃহত্যাগ করিতে হয় নাই। পিতার আবাল্য সহচরী তাঁহার দীনাবস্থার জীবনময়ী আনন্দময়ী সঙ্গিনী আজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে পড়িয়া দুঃখে জীবন ত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পিতার অবস্থা কি হইবে, কে তাহাকে যত্ন করিবে, এই সব চিন্তা তীর্থগামিনীরও পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমাগত দুই তিন দিন ধরিয়া মা আমাকে

তাঁহার জীবনের ইতিহাস বলিয়াছেন, আর কাঁদিয়াছেন। তবে এত দুঃখে ও তিনি একসুখে সুখী। তিনি পিতার ও আমার বালাই লইয়া মরিতেছেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছেন তিনি না মরিলে আর এ গৃহে শান্তি ফিরিয়া আসিবে না।

মায়ের এই মর্ম্মকাহিনী দুইদিন ধরিয়া নীরবে শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে এক একবার মনে হইয়াছিল, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমিও জীবন বিসর্জ্জন দিব। এক সময়ে মনের আবেগে মাকে সেই কথাই বলিলাম। বলিলাম "মা! এক একবার মনে হয়, আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছি। অনুমতি কর, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

মা বলিলেন—"তুমি ত কিছুই কর নাই। তুমি ত আমার অভক্ত সন্তান নও। যদি আর কোন রমণী তোমার মত পুত্র পায়, তাহা হইলে, তাহার পুত্রভাগ্যের সীমা নাই। গোপালের উপর ঈর্ষার কথা মনে করিতেছ? পিঠাপিঠি দুই ভাই হইলে ঐরূপ ঈর্ষা করিয়া থাকে। আমি কি গোপালকে ছাড়িতাম, আর আমি না ছাড়িলে তাহাকে কেহ কি লইয়া যাইতে পারিত? তুমি সেজন্য কিছুই মনে করিও না। আমার গুরু যদি দামোদরের দোহাই না দিতেন, তাহা হইলে গোপালকে কখনই কাছছাড়া করিতাম না। দামোদর আমার মমতার বন্ধন ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছেন। তুমি গোপাল-সম্বন্ধে কিছু মনে করিও না। তবে গোপালের সঙ্গে আর দেখা হইল না, সে গোপালেরও ভাগ্য, আর আমারও ভাগ্য। দেখা বুঝি দামোদরের আর ইচ্ছা নয়! তবে তোমাদের—"

বলিতে বলিতে মাতা নীরব হইলেন। আমি তাঁহাকে কথা শেষ করিতে অনুরোধ করিলাম—"বল মা, বল। আমাদের মনুষ্যত্বহীনতার

কথা তোমার মুখ হইতে বাহির হউক। আমাদের মহাপাপ খণ্ডিত হইয়া যাক্।

কিন্তু মা আর বলিলেন না। কেবল বলিলেন,—"কিছু মনে করিও না। গোপালের কথা স্মরণে আসিলেই আমি কিছু আত্মহারা হই, কোথা হইতে মোহ আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলে। তোমরা কেহ কিছু কর নাই গোপীনাথ! মানুষে কেহ কিছু করিতে পারে না। সমস্তই দামোদরের হাত। তবে অধিকাংশ মানুষই মনে করে বটে আমি করিতেছি। একথা যে না বুঝে তাহাকে বুঝান দুর্ঘট; যিনি বুঝেন, তিনি কখন কখন কোন ভাগ্যবানকে বুঝাইয়া দেন। আমি স্ত্রীলোক, তাহার উপর বুদ্ধিহীন—মাঝে মাঝে গুরুর এই সার বাক্যটা ভুলিয়া যাই। তাই কখন কখন তোমাদের উপর অভিমান করি!"

আমি বলিলাম—"দামোদরের উপর অভিমান করি, এমন অবস্থা আসিল কৈ! পাপী বুঝিয়া তিনি সাত বৎসর আমাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। তোমরা এ অট্টালিকায় বাস করিয়া সুখী হইয়াছ; কিন্তু আমি যে দিন হইতে শ্বশুরের পর্ণকুটীর ছাড়িয়া আসিয়াছি, সেইদিন হইতেই জানি, আমি বনবাসে আসিয়াছি। মরণকালেও যে ইষ্টদেবতাকে দেখিতে পাইব, সে আশাও নাই।"

সাত বৎসর মা হৃদয়ে এই সমস্ত যন্ত্রণা নিরুদ্ধ রাখিয়া নীরবে হাসিমুখে সংসার করিয়াছেন! মায়ের সেই ধৈর্য্য স্মরণ করিয়া তাঁহাকে মনে মনে সহস্রবার প্রণাম করিলাম। আর তাঁহাকে বলিবার বা বুঝাইবার কিছুই রহিল না। কেবল একটা কথা তাঁহার কাছে জানিবার রহিল, সেইটা পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি বলিলাম—"মা শেষ কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব।"

মাতা। কি জিজ্ঞাসা করিবে কর।

আমি এই সাত বৎসরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার কতক শুনিয়াছি, কতক দেখিয়াছি, নিজেও ভুগিয়া কতক কতক অনুভব করিয়াছি। সে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা, আমি বোধ হয় কোনও কালে স্মৃতি হইতে মুছিতে পারিব না। তথাপি আমার সন্দেহ—বিষম সন্দেহ—আমি কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না, তোমরা একটা নুড়ার জন্য এত ব্যাকুল কেন?

মাতা। আমি লেখাপড়া জানিনা—শাস্ত্রের মর্ম্ম কি তাও বুঝি না। আমি তোমাকে ইহার উত্তর কেমন করিয়া দিব! আমার শ্বশুরকে ঐ শিলার সম্মুখে গড়াগড়ি খাইতে দেখিয়াছি। পূজার সময় তাঁহার চক্ষু হইতে জল ঝরিতে দেখিয়াছি, তাঁহার স্তব পাঠ শুনিতে শুনিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইত। তখন একবার ঠাকুরের দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হইত, তাহার অঙ্গ হইতে রূপ যেন ঝরিতেছে। আমার খুড় শ্বশুরই যেন ভাল লেখাপড়া শিখেন নাই, কিন্তু শ্বশুর ত মূর্খ ছিলেন না। তারপর শুনিয়াছি, ঠাকুর আমাদের বংশের অনেকের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন।

আমি। তুমি কখন কিছু দেখিয়াছ?

মাতা। এইত বলিলাম।

আমি। ও তোমার দৃষ্টিভ্রম। আমি তার চেয়েও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয়, সে সমস্ত স্বাভাবিক ঘটনার আশ্চর্য্য সমাবেশ। এই বলিয়া আমার সম্বন্ধে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই গুলি সব একে একে মায়ের কাছে বর্ণনা করিলাম।

ইহা শুনিয়া মা বলিলেন—"এত দেখিয়াও তোমার বিশ্বাস হইল না!"

আমি বলিলাম—"ভাবিতে ভাবিতে যখন মাথা গুলাইয়া যায়, তখন বিশ্বাস হয়। আবার মাথাটা ঠিক হইলে মনে হয়, এ সমস্ত কিছুই নয়।

সেগুলা যেন কেমন ঘটনা-স্রোতে হঠাৎ মিলিয়া গিয়াছে। বিশ্বাস হয়, এমন কখন কি কিছু দেখিয়াছ ?”

আমার যদি সেই ভাগ্যই হইত, তাহা হইলে এমন পুণ্যের সংসারে আসিয়াও এত দুঃখ পাইতেছি কেন ?

মা আমার সাধ্বী তিনি ত আর সন্তানকে প্রতারিত করিতে পারেন না ! মায়ের কথায় আমার অনেকটা আহ্লাদ হইল। আহ্লাদের কারণ, আমি দামোদরের খর্পরে পড়িয়া অনেকটা বুদ্ধিহারা হইয়াছিলাম। আমি সেই নবমীনিশার ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। বিশ্বাস করিয়াছিলাম, মা আমার যথার্থই নিজের প্রাণের পরিবর্ত্তে পিতার প্রাণ যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, মা পিতার জ্ঞান ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেহত্যাগ করিবে। তাহা না করাতে আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। সুখী হইয়াছিলাম—তথাপি তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ যায় নাই। আজ আশা হইল, আশার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ হইল ; কিন্তু সে আনন্দের ভাব প্রথমেই আমি মায়ের কাছে প্রকাশ করিলাম না। সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইবার জন্য মায়ের অসুখের সময়ে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা তাঁহাকে আদ্যোপান্ত শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“এ স্বপ্নের কথা তুমি কিছু জান কি ?”

মা বলিলেন—“কৈ না—কিছুই জানি না।”

তখন বুঝিলাম, সে বিরাট স্বপ্ন আমার মস্তিষ্কের বিকার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ঘুমন্ত ডাক্তার বাবুর মুখ হইতে যে কথা বাহির হইয়াছিল, সে কথা তিনিও স্মরণে আনিতে পারেন নাই। এই সমস্ত ভাবিয়া, স্বপ্নটা একান্ত অলীক চিন্তা বলিয়া স্থির করিলাম।

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া আমি মাকে বলিলাম—“মা অনুমতি কর, আমি যাইয়া চিকিৎসক আনিয়া তোমাকে দেখাই।”

"তুমি কি মনে করিয়াছ, আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব ?"

"নিশ্চয়ই পাইবে। কতকগুলা ঐন্দ্রজালিক তোমাকে সরলপ্রকৃতি জানিয়া প্রতারিত করিয়াছে। তুমি ভাবিয়া ভাবিয়া রুগ্ন হইয়াছ।

আমার কথা শুনিয়া মা একটু হাসিলেন মাত্র—কিয়ৎক্ষণ কোনও উত্তর করিলেন না।

আমি কিন্তু মায়ের হাসি দেখিয়া নিরস্ত হইলাম না। ডাক্তার আনিব বলিয়া জেদ ধরিলাম এবং সেই সঙ্গে মনে মনে খুল্ল পিতামহ, বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী ও তাহাদের আশ্রয়রূপী দামোদর—সকলকেই এক সঙ্গে কবরস্থ করিলাম। এখন হাসি পায়, গরীব দামোদর কত বার আমার হাতে মরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, একেবারে তাহাকে কিছুতেই মারিতে পারিলাম না। একটু সামান্য মাত্র উপলক্ষ করিয়া আবার দামোদর বাঁচিয়া উঠে।

আমি বলিলাম—"মা বল, আমি ডাক্তার আনি। সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলেই তুমি দুই দিনেই আরোগ্য লাভ করিবে।"

মা বলিলেন—"ডাক্তার বাবুর ফিরিয়া আসার অপেক্ষা কর।"

আমি ঈষৎ রোষ ও ক্ষোভের সহিত কহিলাম—"তোমার ডাক্তার বাবু কবে আসিবে তার ঠিক কি? সেই নুড়ীটা হাঁ করিয়া তাহারও মাথাটা গ্রাস করিয়াছে।"

মা বলিলেন—"ছি বাপ্‌ ঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধার কথা কহিতে নাই। তিনি আমাদের গৃহদেবতা, আমাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।"

কথা শুনিয়া যেমন আমি দামোদরের কন্থায় অগ্নিসংযোগ করিতে যাইতেছি, অমনি কি জানি কেমন করিয়া আমার চোয়াল ধরিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, কে যেন বাহির হইতে আমার গলাটা টিপিয়া

ধরিয়াছে। মা আমার দুরবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন—"বেশ ত দামোদরের উপর তোর যদি একান্তই অবিশ্বাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে একদিন এক মনে তাঁহাকে জানাস্ না কেন! বলিস, 'ঠাকুর, আমি অজ্ঞান, আমি তোমাকে বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাতে তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস হয়, এমন একটা উপায় করিয়া দাও।' তোদের প্রতি তাঁর অপার করুণা। একদিন একমনে বলিলে তিনি ঠিক বিশ্বাস করিবার উপায় করিয়া দিবেন।

আমি এতক্ষণ চোয়াল লইয়া যুদ্ধ করিতেছি—প্রাণপণে চোয়াল খুলিবার চেষ্টা করিতেছি। যখন দেখি, কিছুতেই খুলে না, তখন অনন্যোপায় হইয়া মনে মনে দামোদরকে প্রণাম করিলাম—"দোহাই বাবা, অপরাধ হইয়াছে, চোয়ালটা খুলিয়া দাও।" বলিবামাত্র আমার মুখ খুলিয়া গেল। আমি তখন মাকে বলিলাম—ইতিমধ্যে আমার কি ঘটিয়াছিল, বুঝিতে পারিয়াছ কি?

মাতা। কি ঘটিয়াছিল?

আমি। চোয়াল চাপিয়া দাঁতে দাঁতে আটকাইয়াছিল। আমি তোমার দামোদরের কাঁথায় আগুন দিতে গিয়াছিলাম। সে কথা যেই মুখে উচ্চারণ করিতে যাইতেছি, অমনি আমার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। মনে মনে দামোদরের পায়ে পড়িলাম, তবে চোয়াল ছাড়িল।

আমার কথা শুনিবামাত্র আনন্দে মায়ের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, "তোরা তাঁকে যা মনে কর্ না কেন, তিনি যা তা তিনিই আছেন। তবে এ একটু ছোট ব্যাপার লইয়া তুই বিশ্বাস করিবি কেন? গালে খিল হয়ত আপনা আপনি ধরিয়াছে, আপনা আপনি ছাড়িয়াছে। এ রকম উপায়ে ঠাকুরের উপর ভক্তি আনিতে গেলে তাহা ত চিরস্থায়ী হইবে না!

"তবে তোমাকে একটা কথা বলি। সে আজ বহুদিনের কথা। তখন আমার শ্বশুর শাশুড়ী জীবিত। আমি সবে মাত্র তোমাদের ঘরে আসিয়াছি। শ্বশুর কোন দূরদেশে শ্রাদ্ধের বিদায় আনিতে যাইবেন। বাড়ী ফিরিতে দুই চারি দিন দেরী হইবে বুঝিয়া, তিনি তোমার পিতার উপর দামোদরের পূজার ভার দিয়াছিলেন। পৌষ মাসের দুরন্ত শীত—বিদেশে কষ্ট হইতে পারে বলিয়া যজমানদের দেওয়া একটী মোটা বনাত তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। ঘরে ফিরিতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগিয়াছিল। আমার বেশ মনে আছে, শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া, প্রথমেই তোমার পিতাকে ডাকাইলেন। তোমার পিতা নিকটে আসিবামাত্র, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ঠাকুরের রীতিমত সেবা করিয়াছ?" স্বামী বলিলেন—"করিয়াছি।" তখন বুঝিতে পারি নাই, কি জানি কেন, স্বামীর কথায় শ্বশুরের বিশ্বাস হইল না। তিনি বলিলেন—"আমি দেখিব।" এই বলিয়া তিনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ও মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমার শাশুড়ী ও অন্যান্য দুই একজন গুরুজন ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে গেলেন। বাড়ীতে আসিয়া বিশ্রাম নাই, অন্য কোনও কথা নাই, একেবারেই তাঁহাকে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বাটীর সকলেই বিস্মিত হইলেন। আমিও আমার খুড় শাশুড়ী কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিলাম।

শ্বশুর ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়াই বাহিরে আসিলেন, এবং তোমার পিতাকে তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—'মিথ্যাবাদী, আর কখন আমার ঠাকুরের গায়ে তুমি হাত দিও না। তোমাকে যে শিক্ষা দিয়াছি, তাহা কেবল ভস্মে ঘি ঢালিয়াছি। এই দারুণ শীতে তুমি আদুড় গায়ে রাখিয়া তাঁকে কষ্ট দিয়াছ! এই বলিয়া খুড়শ্বশুরকে ডাকিয়া

তিনি তাহার উপর পূজার ভার দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—আর তোমার পড়া শুনা করিবার প্রয়োজন নাই। দামোদর যে তোমাকে পড়াশুনার বুদ্ধি দেন নাই, সে ভালই করিয়াছেন। তুমি দামোদরের সেবা লইয়া থাক'।"

আমি। এরূপ করিবার কারণ জানিয়াছিলে কি?

মাতা। বহুকাল পরে শুনিয়াছিলাম। শ্বশুরকে নাকি ঠাকুর স্বপ্ন দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"তুইত এখানে বেশ সুখে আছিস্। ভাল আহার করিতেছিস্, ভাল বনাত গায়ে দিয়াছিস। আমাকে কিন্তু এমন নিষ্ঠুরের হাতে দিয়াছিস্ যে, আমি না খাইয়া মরিতেছি, আর শীতে হি হি করিতেছি।

আমি। এ কথা বুঝি ছোট ঠাকুরদাদার কাছে শুনিয়াছ?

মাতা। মূর্খ! কথায় কথায় ছোট ঠাকুরদাদার উপর দ্বেষ কর কেন? তিনি শুধু, যখন তোমাদের মঙ্গলচিন্তার প্রয়োজন হয়, তখনই তোমাদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলেন। নহিলে তিনি নীরব। শুন, আমি মরিতে চলিয়াছি, যদি যথার্থই নিজের মঙ্গল চাও, তা'হলে আমার অন্তিম কথা শুনিয়া রাখ, যদি তাঁহাকে ভক্তি করিতে না পার, কদাচ তাঁহার প্রতি অথবা আমার গোপালের প্রতি দ্বেষ করিও না।

কথা কহিতে কহিতে মায়ের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মায়ের সে অবস্থা দেখিবামাত্র আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কথা কহিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার চেষ্টা করিলাম, কথা মুখ হইতে বাহির হইল না। মা বলিতে লাগিলেন—"আমি এতদিন কোন্ কালে মরিতাম, আমার গুরুর আদেশে বুঝি মৃত্যু কিছু কালের জন্য সরিয়া গিয়াছে। তোমাদের উপর স্নেহে আমি তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য বড়ই ব্যাকুল ছিলাম। ব্যাকুল ছিলাম,—দেখিবার জন্য এ অধার্ম্মিকের সংসারে ধর্ম্মের ফিরিয়া

আসিবার উপায় আছে কি না। আমার গোপাল দিন কিনিয়া লইয়াছে। তোমরা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তার ভালই করিয়াছ। এখানে থাকিলে অসৎসংসর্গে তাহারও মগজ বিগড়াইয়া যাইত। আমি জানি এখন সে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইয়াছে। দুঃখী তুমি আর তোমার পিতা। আমার শ্বশুরের কুলটা অপবিত্র রহিয়া যাইবে, এ আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমাদের দুর্দ্দশা আমার দেখা অসহ্য হইয়াছে। তাই গোপীনাথ, আমি তোমার বধূর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। যদি দেখি সে সৎকুলের কন্যা, তাহা হইলে আমি তার হাতে ধর্ম্ম ফিরাইবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব।"

আমার চিত্তের এই বিক্ষেপ-চিত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। শুধু আত্মগোপনে অভিলাষ নাই বলিয়া কহিলাম। আমি, নিজেকে আধুনিক সংশয়াত্মা বঙ্গীয় যুবকগণের প্রতিনিধি মনে করিয়া, আত্মপ্রকাশ করিতেছি।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিদ্রাবস্থায়।

নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম-দেহের সংক্রমণ।

মানুষ যখন প্রগাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হয়, তখন তাহার সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার সন্নিকটে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। আমরা যাহাকে নিদ্রা বলি, তাহা সূক্ষ্মদেহের এই সংক্রমণ মাত্র। যাঁহারই সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে, তিনিই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে

পারেন। যোগ শাস্ত্র ৩,৫০,০০০ নাড়ীর কথা উল্লেখ করেন। এই সমস্ত নাড়ী দেহ-তত্ত্ববিদের স্নায়ুমণ্ডলী (Nerves) হইতে স্বতন্ত্র। জাগ্রৎ অবস্থায় এই সমস্ত নাড়ী দিয়াই বাহ্য জগতের অনুভব হয়।° আমাদিগের স্নায়ুমণ্ডলী বাহ্যদৃষ্টিতে সমস্ত অনুভূতির প্রণালী বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নাড়ীগুলিই সকল অনুভূতির নিমিত্ত-কারণ। স্বপ্না-বস্থায় অন্তঃকরণ সূত্রদ্বারা এই সমস্ত নাড়ী দেহ হইতে প্রত্যাহৃত হয় এবং জাগ্রদবস্থায় মানসে যে সমস্ত চিত্রের অঙ্কন হয়, যে সমস্ত ছায়া পাত হয়, দেহী সেই সমস্ত চিত্র দর্শন করেন। সুষুপ্তির অবস্থায় বা গাঢ় নিদ্রার সময় সেই মন উৎক্রান্ত হইয়া কারণ শরীরে আহৃত বা নিহৃত হয়। যোগের ভাষায় এই তত্ত্ব আর এক ভাবে উক্ত হয়। চিত্ত জাগ্রৎ কালে ত্বগিন্দ্রিয়ে, স্বপ্নকালে মেধ্যা নাড়ীতে এবং সুষুপ্তিকালে পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থিত থাকে।

মানবের তিন প্রকার চৈতন্য এবং শরীর।

এই ত হইল দেহ বা শরীর-সম্বন্ধীয় কথা; এখন শরীরী বা দেহীর বা চৈতন্যের এই তিন বিভিন্ন অবস্থায়,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় বা এই তিন অবস্থায় চৈতন্যের যে তিনটি ভাব হয়, তাহার স্বল্প আলোচনা করা যাক্। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছেন; তবে তাহা বিরাট চৈতন্যের কথা। কিন্তু যাহা সমষ্টিভাবে সত্য, তাহা বিশিষ্ট জীবের বিষয়ও বলা যাইতে পারে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে যে, আত্মা চতুষ্পাৎ,—বৈশ্বানর, তৈজস্, প্রাজ্ঞ ও ব্রহ্মভাব। তাহা কিরূপ? উপনিষদ বলিতেছেন,—"জাগ্রৎ অবস্থায় আত্মা স্থূল উপাধির যোগে স্থূল জগৎ ভোগ করেন, তখন তাহার নাম হয় বৈশ্বানর।* স্বপ্নাবস্থায়

---

* বৈশ্বানর—বিশ্ (জাত হওয়া)+ব=বিশ্ব,—যাহা সকলের দ্বারা জাত হওয়া যায়—স্থূল জগৎ। এই বিশ্বকে যিনি ভোগ করেন, তাঁহার নাম বৈশ্ব। নর-

আত্মা সূক্ষ্ম উপাধির যোগে সূক্ষ্ম জগৎ ভোগ করেন, তখন তাঁহার নাম হয় তৈজস (astral)। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা কারণ উপাধি-যোগে আনন্দ ভোগ করেন, তখন তাহার নাম হয় প্রাজ্ঞ। তুরীয় অবস্থায় আত্মার পক্ষে জগৎ প্রপঞ্চের উপশম হয়। তখন তিনি শান্ত, শিব, অদ্বৈত। * আমাদিগের চতুর্থপাদ্ বা তুরীয় অবস্থার বিষয় আলোচনার প্রয়োজন নাই। স্বপ্ন-চৈতন্যের মূল শ্লোকে যে "প্রবিবিক্তভুক" কথাটী আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝা উচিত। প্র, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে (জাগ্রৎ চৈতন্যের বিষয়ীভূত বস্তু হইতে) বিবিক্ত (বিশেষীকৃত—Differentiated) হইয়াছে যাহা—অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যে সমস্ত বস্তু আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয়, তাহারা একপ্রকার বাহ্যতঃ "সৎ" পদার্থ, কারণ যে কেহ ঐ অবস্থায় থাকে, সে সেই বস্তু অনুভব করিতে পারে ; কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় যাহা অনুভূত হয়, তাহা স্বপ্নদ্রষ্টার মানসে অস্থিত জাগ্রৎ অবস্থায় বিষয়ীভূত পদার্থের পুনরাবির্ভাব মাত্র এবং তাহা কেবল স্বপ্নকালে স্বপ্নদ্রষ্টারই সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। মনোরূপী অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা তাহার জ্ঞান হয় বলিয়া অন্তঃপ্রাজ্ঞ বলা হইয়াছে।

একই আত্মা এই তিন অবস্থায়,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে কার্য্য করেন,—"এক একাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু।" † আমরা

ন (না) + র (ক্ষয়প্রাপ্ত) - রীঙ্ (ক্ষরে) + ড। অতএব বৈশ্বানর অর্থে, স্থূল জগতের যিনি অক্ষর ভোক্তা।"

* জাগরিত স্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ...স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ। ৩

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ ......প্রবিবিক্ত ভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

......সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতমুখঃ প্রাজ্ঞ তৃতীয়ঃ পাদঃ।৫

......প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

† ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্—৩—১।

মানবের দেহতত্ত্ব আলোচনায় সময়, তাহার বিচার করিয়া আসিয়াছি। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও ইহা ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ফ্রেডারিক মায়ার্স সাহেব বলেন—"মানব তিন অবস্থার মধ্যে কার্য্য করে, সাধারণতঃ আমরা যাহাকে পৃথিবী বলি, সেই পৃথিবীতে, ইথরীয় লোকে ও তাহা হইতে আরও সূক্ষ্মতর লোকে। শেষোক্ত এই লোকের আর একটি নাম স্বর্গ। * এই তিন লোকই আমাদিগের পূর্ব্বালোচিত ভূঃ, ভূবঃ এবং স্বঃ।

নিদ্রা ও মৃত্যুর পার্থক্য।

সূক্ষ্মদর্শী আরও দেখিতে পান যে, নিদ্রার সময় সূক্ষ্মদেহ স্থূলোপাধি হইতে নিষ্ক্রামিত হইলেও তাহা স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয় না, একটা অতি সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সূত্রের দ্বারা তাহা স্থূলদেহের সহিত সংযুক্ত থাকে। মৃত্যু ও নিদ্রার ইহাই পার্থক্য। মৃত্যুও নিদ্রা, তবে তাহাতে এই যোজক সূত্র থাকে না,—স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। এইখানে পাঠকদিগকে আর একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিই। আমরা যাহাকে পিণ্ড-দেহ বলিয়া আসিয়াছি, সেই ইথারীয় দেহ নিদ্রাকালে প্রায়শঃ স্থূল দেহ হইতে উদ্‌গত হয় না, তাহা স্থূলদেহের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে।

আমরা দেখিলাম যে, নিদ্রাকালে সূক্ষ্মদেহ কিরূপে স্থূল হইতে উদ্‌গত হইয়া অবস্থান করে। এখন দেখিব, এইরূপ হইলে জীবাত্মার অবস্থা কি হয়? তাহার বিবিধ শরীরেরই বা কিরূপ কার্য্যকলাপ হইতে থাকে! মনে করুন একজন গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। ভাণ্ড ও পিণ্ড-দেহ-

---

* Man lives in three environments.—the physical the ethereal and the metethereal, that which is called the heaven world.—Myer's Human Personality.

সমন্বিত তাহার স্থূল শরীর স্থিরভাবে শয্যায় শয়িত আছে; তাহার সূক্ষ্ম দেহ তদ্রূপ স্থিরভাবে তাহার স্থূল-দেহের ঠিক উর্দ্ধে ভাসমান হইয়া অবস্থিত আছে। এই সময়ে তাহার অতি-স্থূল বা ভাণ্ডদেহস্থ মস্তিষ্কে, তাহার সূক্ষ্মদেহে চৈতন্যের ক্রিয়া কিরূপ হইতে থাকে; তাহা পর্য্যায়ক্রমে দেখা যা'ক।

১। ভাণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী।

নিদ্রাকালে জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহসাহায্যে স্থূলদেহ হইতে বহির্গত হইলে, স্থূল-দেহের যে, পূর্ণভাবে সংজ্ঞালোপ হয় তাহা নয়। তাহাতে অতি ক্ষীণভাবে চেতনা থাকে।

স্থূল দেহের চৈতন্য।

তাহা কিন্তু চৈতন্যের আধার জীবের চেতনা নহে। কারণ, জাগ্রৎ কালে যেরূপ সংজ্ঞা থাকে, এই সংজ্ঞা তাহা হইতে বিভিন্ন। যে সমস্ত কোষাণু দিয়া তাহার স্থূলতম শরীরটি গঠিত তাহাদিগের বিশিষ্ট চেতনার সমবায়-যোগে যে এই অদ্ভুত চৈতন্যের উৎপত্তি, তাহাও বলা যায় না তাহা এই উভয় হইতে স্বতন্ত্র এক বিশেষ চৈতন্য। আমরা তাহাকে স্থূল দৈহিক চেতনা বলিব। এই যে অভিনব চৈতন্যের কথা বলিলাম, তাহা যে কিরূপ আমরা একটি উদাহরণ দ্বারা বলিতে চেষ্টা করিব।

বাষ্পসাহায্যে সংজ্ঞা লোপ করিয়া কখন কখন দন্ত উৎপাটিত করা হয়। যিনিই এই দৃশ্য দেখিয়াছেন, তিনিই পূর্ব্ব কথিত চৈতন্যের কথিত ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন থাকিলেও দন্ত উৎপাটনের সময় আহত (?) ব্যক্তি অস্ফুট চীৎকার করে, হস্ত মুখ-গহ্বরাভিমুখে লইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্রিয়ার অর্থ কি? এই সমস্ত হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সে বেদনার যন্ত্রণা অন্তরে অন্তরে কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতেছে। কিন্তু তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে, যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, দন্তোৎপাটনের সময় সে কিছু কি

অনুভব করিতে পারিয়াছিল? সে উত্তর করে, "না আমি কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই।" ইহাতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্থূল দেহেরও এক প্রকার চৈতন্য থাকে। প্রকৃত মানবের যদ্যপি এ চৈতন্য হইত তাহা হইলে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে তাহার স্মৃতিতে সংজ্ঞাহীন অবস্থার ক্রিয়াকলাপ সমস্তই থাকিয়া যাইত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এই ক্রিয়া স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া-জনিত (Reflex action)। এই উত্তরে সাধারণের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থতা লাভ করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানবিদের এই উত্তরের কোনও মূল্য নাই; কারণ এই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে, "স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া তাহার কারণ নয়, তাহারই নামান্তর মাত্র। চালভাজা কি ইহার উত্তরে ভাজা চাল বলিলে, যেমন বুঝান হইল, বৈজ্ঞানিকের এই উত্তরও অনেকটা তদ্রূপ।

আমরা দেখিলাম যে, চৈতন্যের আধার মানব জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহের সহিত স্থূলদেহ হইতে উদ্গত হইলেও স্থূলদেহে একরূপ চৈতন্য থাকে। কিন্তু এই চৈতন্য অতিক্ষীণ, অতিম্লান। অতএব জাগ্রৎ অবস্থায় তাহা মানবদেহকে যেরূপ আয়ত্তে রাখিতে পারে, নিদ্রার সময় তদ্রূপ পারে না। আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি* কিরূপে শরীরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত আমাদিগের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্য্যের বিকার হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় মানবের চৈতন্যের পূর্ণ আয়ত্তকালে যদ্যপি মস্তিষ্কের ও স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া অস্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করে, নিদ্রাকালীন যখন মস্তিষ্ক ক্ষীণ চৈতন্যের অল্প আয়ত্তে থাকে, তখন যে সে অধিকতর অস্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে? তাই খাদ্যসামগ্রী সম্যক্ পরিপাক না হইলে আমরা নানারূপ অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখিতে থাকি।

---

* অলৌকিক রহস্য ২য় ভাগ, পৃঃ ৩২৬, ৩২৭।

নিদ্রাকালীন এই স্থূল দৈহিক চৈতন্যের অনেক বিশেষত্ব আছে; আমরা তাহা এইবার সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ইহা ঠিক প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে; নির্ব্বাচন বা বিচার করিবার শক্তি ইহার থাকে না। তাই ইহার কার্য্যে একটা অসংলগ্নতা, একটা বিপর্য্যয়, অনেকটা অস্বাভাবিকতা দৃষ্ট হয়।

এই চৈতন্যের বিশেষত্ব কি?

ইহার দ্বিতীয় বিশেষত্ব, ইহা কোনও ভাব ভাবরূপে ধারণা করিতে পারে না। কোনও ভাব আসিলে ইহা ভাবরূপে গ্রহণ না করিয়া দৃশ্য রূপে গ্রহণ করে এবং সেই দৃশ্যের নায়ক হয় সে নিজেই। নিরালম্ব বা নির্ব্বিশেষ চিন্তা (abstract thought) বা স্মৃতি আসিলেই তাহা প্রত্যক্ষ গোচরোপযোগী একটা কাল্পনিক দৃশ্য বা চিত্ররূপে প্রতিভাত হয়। মনে করুন কোনও রূপে নিদ্রিতের পার্থিব মস্তিষ্কে কোনও মহত্ত্বের ভাব আসিয়া প্রতিঘাত করিল, অমনি সে স্বপ্নে দেখিবে যে সেই মহত্ত্ব-ভূষিত একজন মহাপুরুষ আসিয়া তাহার নিকট তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় দিতেছে! সেইরূপ ঘৃণার চিন্তা আসিলে সে স্বপ্ন দেখিবে যে, একজন লোক আসিয়া নিদ্রিতের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে।

আবার কোনও দেশ বা স্থানের কথা স্মরণে আসিলে, নিদ্রিত ব্যক্তি কল্পনা করে যে, সে সেই দেশে বা স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যখন জাগ্রৎ অবস্থায় কলিকাতায় বসিয়া দিল্লী বা আগ্রার বিষয় চিন্তা করি, তখন কল্পনা আমাদিগকে তত্তৎ স্থানে লইয়া যায়, এবং আমরা তত্রত্য সৌন্দর্য্য কল্পনা-সাহায্যে দেখিতে থাকি; কিন্তু সেই সময়ে আমাদিগের কি মনে হয় যে, আমাদিগের স্থূলদেহ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সেই সেই স্থানে বিচরণ করিতেছে? তাহা হয় না। আমরা বিচারশক্তি দ্বারা অতি সহজেই বুঝিতে পারি যে, আমরা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অপর কোথাও যাই নাই। স্বপ্নাবস্থায় কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে, আমরা

প্রকৃতই সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। যাহার সাহায্যে আমরা বিচার করিতে পারি, সেই মনোময় কোষ সূক্ষ্মদেহের সহিত আমাদিগের স্থূলদেহ ত্যাগ করায়, আমাদিগের অলীক কল্পনাকে সংযত করিবার আর কিছুই থাকে না। তাই আমাদিগের মনে হয় ত আমরা যথার্থই সেই সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়াছি।

এইরূপ স্বপ্নে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বিচরণের কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। ইহার বিশেষত্ব এইটুকু স্বপ্ন-দ্রষ্টা সহসা যে একস্থান হইতে অপর স্থানে উপস্থিত হয়, তাহাতে সে আদৌ বিস্মিত হয় না। এইরূপ যে কেন হয়, তাহা হয়ত আমার বলিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা হইতে বিস্ময় উৎপাদিত হইতে পারে, স্থূল মস্তিষ্কে এমন কিছুই নাই। স্থূল মস্তিষ্ক সাহায্যে কেবল একখানি চিত্র উৎপাদিত হয়, এবং তাহাই তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। কোন বিষয় বা দ্রব্যের অনুক্রম বা পারম্পর্য্য স্বাধীনভাবে বিচার করা মনের ক্রিয়া,—তাহা স্থূল মস্তিষ্কের নহে।

একথা সকলেই জানেন যে, অনেক সময়ে প্রিয়তমের একখানি অতি পুরাতন ছিন্ন পত্র, একটি ক্ষুদ্র শব্দ বা কথা, গানের একটি কলি, একটি সুর, বা সামান্য একটি পুষ্প, আমাদিগের বিস্মৃত জীবনের অনেক হারাণ কথা মনে জাগাইয়া দেয়। আবার অতীত ঘটনা, পূর্ব্বের বিস্মৃত কাহিনী অভিনব বেশে মানসে জাগিয়া উঠে। হর্ষে দুঃখে, লোভে উৎসাহে, ক্রোধে ও প্রেমে আমরা যুগপৎ বিভোর হই। এই ত হইল জাগ্রৎ অবস্থার কথা। স্বপ্নাবস্থায়ও এইরূপ একটি স্মারক বা নিদর্শন তৎসম্বন্ধীয় অতীতকালের কতকগুলি চিত্র জাগাইয়া দেয়। কিন্তু সেই চিত্রগুলি প্রায় অসংবদ্ধ বা অসংলগ্ন। অতএব তাহাদিগের ব্যঞ্জনায় বা সংহতিতে জীবনের সেই অতীত আখ্যায়িকাটি অঙ্কন করিতে পারে না। বায়স্কোপের (Bioscope) চিত্রগুলি পরস্পর সংলগ্ন বলিয়া এবং তাহারা নেত্রপটে যুগপৎ

জায়মান হয় বলিয়া আমরা সেই চিত্রগুলির সংহতিতে একটা দৃশ্য দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা সেইরূপ না হইয়া যদ্যপি সেই চিত্রসমষ্টির মধ্য হইতে কতকগুলি অপসৃত করা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের যোজনায় কোনও নির্দ্দিষ্ট দৃশ্য না দেখাইয়া কতকগুলি অসংলগ্ন সম্বন্ধহীন কেবল চিত্রই দেখা যায়। স্বপ্নাবস্থায় ঠিক তাহাই হয়। স্বপ্নে সংলগ্ন চিত্রগুলি ঠিক পর পর মনে আসে না, অতএব এইরূপ হয়। আর স্মরণেই বা আসিবে কি করিয়া? একজনকে যদ্যপি কোনও সময়ে কতকগুলি অর্থহীন, সম্বন্ধহীন কথা বলিয়া, পরে তাহাকে সেইগুলি আবৃত্তি করিতে বলা হয়, সে যেমন তাহা পারে না, স্বপ্নকালেও ঠিক সেইরূপ সমস্ত চিত্রগুলিকে আমাদিগের স্থূলদেহের মস্তিষ্ক ধারণা করিতে পারে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে জাগ্রৎ অবস্থায় স্মৃতি আসে কেন? জাগ্রৎ অবস্থায় স্মারক ভাবোদ্দীপক, অতএব যেমন অর্থ-যুক্ত বাক্য অতি সহজেই স্মৃতিতে আসে; ভাবটি মনে আসিলে তাহাই সমকাল-সম্ভূত চিত্রগুলি গঠন করিয়া দেয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

প্রেততত্ত্ব।

আমাদের গ্রামবাসী কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের পুত্রবধূ কিছুকাল যাবৎ হিষ্টিরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। অনেক চিকিৎসা করিয়াও কোনও ফল দর্শিল না; তাই আমাদের ঔষধ ব্যবহার করাই স্থির করিলেন।

রোগিনীর হিষ্টিরিক ফিটের সঙ্গে শ্বেতপ্রদরও ছিল। কিন্তু তাহা এত ভয়াবহ যে, অনেক প্রাচীন চিকিৎসকও তাহার স্রাব দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। স্রাব প্রায় সমস্ত দিন ব্যাপিয়াই হইত, কিন্তু তাহাতে তাহার শরীরের বৈলক্ষণ্য বা রুগ্নতার কোনও বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। রোগিনীর জ্যেষ্ঠতাত পূর্ব্ববঙ্গের কোনও সহরে একজন প্রসিদ্ধ এলো-প্যাথিক চিকিৎসক। তিনি সাধ্যমত ইহার জন্য চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল দর্শে নাই।

গত ১৩১৫ সনের ২৫শে আশ্বিন বৈকালে উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত প্রতিবেশীর বাড়ীতে যাই এবং নানা কথার মধ্যে তাহাদেরই একজন উক্ত রোগীর সম্বন্ধে আমাকে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমরা অনেক দিন পূর্ব্বেই উক্ত রোগিনীর খবর লইয়াছিলাম এবং একটু আত্মীয়তা থাকার দরুণ আমার অগ্রজ ইহাকে চিকিৎসা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মীয়তা নিবন্ধন এবং বয়সের অল্পতা হেতু অনেকেই আমাদিগকে বিশ্বাসে আনিতে সাহস করিলে না। যাহা হউক সর্ব্বশেষ অনন্যোপায় হইয়া আমাদের দ্বারাই চিকিৎসা করান স্থির হইল।

'অলৌকিক রহস্যে'র পাঠকবর্গ সকলেই জানেন যে, কি উপায়ে আমরা আত্মাকে আহ্বান করতঃ ক্রমে কুণ্ডলী-বদ্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ করি। এ স্থানেও তাহাই করা হইল। একটী বালকের দ্বারা ফুল পাঠাইয়া দিয়া রোগিনীর হস্তে তাহা দিতে বলিলাম। বিধাতার ইচ্ছায় ফুল দর্শন করিবামাত্র রোগিনী সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া পড়িলেন এবং সংবাদ পাওয়া মাত্র ১০।১২ জন সঙ্গী সহ রোগিনীর কাছে গেলাম। বলা বাহুল্য যে, ফুল পাঠাইবার সময়ে আমরা বহির্বাটীতে ছিলাম।

রোগিনীর নিকটে যাইয়াই উহাকে কুণ্ডলীবদ্ধ করিয়া যথাবিহিত প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুকাল পর্য্যন্ত অর্থশূন্য চীৎকার ব্যতীত অন্য কোনও জবাব পাইলাম না। কিয়ৎকাল পরে রোগিনী মা মাঁ করিয়া উচ্চ চীৎকার করায় আমি আবার প্রশ্ন করিলাম।—

প্রঃ। কে তুমি?

আবিষ্টা কোনও উত্তর না দিয়া নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন,—"আর উপায় নাই, আর থাকা সহজ নহে! এ লোক সহজ লোক নহে।" আমি আবার প্রশ্ন করিলাম।

প্রঃ। কে তুমি?

উঃ। আমি, আমি।

প্রঃ। তোমার নাম কি?

উঃ। আমার নাম! বাপ রে বাপ, তা কি বলা যায়?

সামান্য কয়েক মিনিট ক্রন্দন করিয়া, পরে বলিতে লাগিলেন—"আচ্ছা আমি যাব, আর আমাকে কষ্ট দিও না? এই আমি যাই।" আবার আমি প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।

প্রঃ। আস্‌বে না ত?

উঃ। বাবা, আবার!

প্রঃ। তবে তুমি যাও?

উঃ। আমায় ছেড়ে দেও।

ইহার পরেই কুণ্ডলী কাটিয়া দিয়া আবিষ্টার চৈতন্য সঞ্চার করিলাম এবং তৎপর দিবস যথাবিহিত কবচ ধারণ করাইলাম। উক্ত কবচ ধারণ অবধি হিষ্টিরিক ফিট এবং প্রদর উভয়ই নিরাময় হইল।

প্রায় দশ মাসকাল রোগমুক্ত অবস্থায় রহিয়া, ১৩১৬ সনের শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে হঠাৎ একদিন রোগিনীর হাতের কবচ হারাইয়া যায়।

ইহার প্রায় ১৫।২০ দিবস পরে আবার হিষ্টিরিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়াবহ প্রদরও আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু এবারকার প্রদর ততোধিক ভয়াবহ এবং আশ্চর্য্যজনক। পূর্ব্বে যে স্রাব হইত, তাহাতে রোগিনীর পরিধেয় বসন মাত্র ভিজিয়া যাইত, কিন্তু এবার তাহা নহে। এবার স্রাব হইবার পূর্ব্বে কেমন একটু বেগ জন্মিত এবং এককালীন পাঁচসের হইতে আট সের পর্য্যন্ত স্রাব হইতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতেও রোগিনীর শরীরের কোনও বিশেষ বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইল না।

ক্রমে গ্রাম্য চিকিৎসকগণ আসিয়া দেখা দিলেন এবং সকলেই ইহাকে বায়ু ও প্রদররোগ অনুমান করিয়াই যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় কোনই ফল দর্শিল না। অনন্তর সকলেই রোগিনীকে ঢাকা লইয়া যাইতে উপদেশ করিলেন। যাহা হউক অগত্যা তাহাই স্থির হইল।

ইতিমধ্যে রোগিনীর অভিভাবক অনন্যোপায় হইয়া আমার নামে চাঁদপুরে পত্র লিখিলেন। কিন্তু কোনও কার্য্যোপলক্ষে সেই সময়ে আমি ঢাকায় ছিলাম, তাই আমার অগ্রজ শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় উক্ত রোগিনীর জন্য কবচ পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যদিও আমরা একসঙ্গেই প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকি এবং উক্ত বিষয়ে একই গুরুর শিষ্য, তথাপিও ইতিপূর্ব্বে আমার দ্বারা চিকিৎসিত হওয়ায় রোগিনীর অভিভাবকগণ উক্ত কবচ ব্যবহার করিলেন না এবং রোগিনীকে ঐ অবস্থায়ই ঢাকা লইয়া গেলেন।

ঢাকা যাইয়াই প্রথমে বড় বড় চিকিৎসক ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। (বলা বাহুল্য যে তাহার মধ্যে স্ত্রী চিকিৎসকই অধিক ছিল)। রোগিনীকে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন সত্য, কিন্তু সাধ্যমত ঔষধের ব্যবহার না

ভিজিটের জন্য হস্তপ্রসারণে কাহারও ভুল হইল না। সে যাহা হউক, উহার মধ্যে দু' একজন বলিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে যাঁহার দ্বারা এ রোগিনী আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাকে ডাকুন।

যে দিবস ডাক্তার আসিলেন সে দিবসই বৈকালে আমার জন্য লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত সে দিন আর তথায় যাওয়া হইল না। তৎপর দিবস প্রাতে রোগীকে দেখিতে গেলাম এবং পূর্ব্ব নিয়মানুসারে ফুলের সাহায্যে রোগিনীর চৈতন্য লোপ করিয়া আত্মা আহ্বান করিলাম ও কুণ্ডলীবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলাম।

প্রঃ। তুমি কে, আর এ রোগিনীকে কি ক'রে কোথায় ধরলে ?

এই সময়ে উত্তর দিতে অমত প্রকাশ করাতে একটু যাতনা দেওয়া হইল এবং যথারীতি উত্তর আরম্ভ করিল।

উঃ। আমি ইহাকে ১১ বৎসর বয়সের সময়ে প্রথম ধরি এবং সামান্য রকমে ইহার শরীরে প্রবেশ করি ; কিন্তু বিবাহ রাত্রিতেই বিশেষ ভাবে ইহার দেহ আশ্রয় করি।

প্রঃ। প্রথম ইহাকে কি ভাবে ধরলে ?

উঃ। তোমাদের বউ নোয়াখালীতে তাহার পিতার কাছে থাকৃত। ইহার মাঁ বাপ ইহাকে বড়ই আহ্লাদ করিত কিন্তু আমার চক্ষে ইহা সহ্য হইত না। এত আহ্লাদ কেন আমার সইবে! তাই সর্ব্বদাই আমি ইহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছুতেই ইহার দেহে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। হঠাৎ একদিন তোদের বউ তার ছোট ভগ্নীকে কোলে করিয়া তাদের দক্ষিণের বাসা হইতে আসিতে-ছিল, তখন সন্ধ্যা কেবল হয় হয়, সেই সময়ে ইহাকে ভয় দেখাইয়া অভিভূত করিয়া ইহার দেহে প্রবেশ করি। তোদের বউ (আমিষা) তখন চীৎকার করিয়া মায়ের কাছে আসে, আর মা ইহাকে কতই যত্নে

রাখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু আর যত্ন করিয়া কি হইবে? আমার কার্য্য আমি আগেই সেরে রেখেছি। আমি ইতিপূর্ব্বে ইহার অমুক ভগ্নীকে আশ্রয় করেছিলাম, তখন মামু (নোয়াখালীর একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির) এসে আমাকে ছাড়িয়ে দেয়। তার পর অনেক চেষ্টা করে তবে ইহাকে আশ্রয় করি।

প্রঃ। আচ্ছা, আমি একবার তাড়িয়ে দিলুম, আবার এলে কেন?

উঃ। কেন আসব না, কবচ হারিয়ে ফেলেছে। আসব না ত কি করব? আমি যে এখানে এলেই বাঁচি। এবার তোদের বউকে মেরে ফেলব।

প্রঃ। তোর সাধ্য নাই, যে ইহাকে মারবি।

উঃ। ইঃ সাধ্য নাই! সেই দিনই ইহাকে মেরে ফেলতুম। ছাদের উপরে ঘাড় মোচড়াইয়া মারবার যোগাড় করেছিলাম মাত্র। আমাকে দেখে ভয়ে স্বামীর কাছে দৌড়ে যায়। আর স্বামী বল্লে কি না কিছু না। দৌড় না দিলেই দেখতে পেত কেমন "কিছু না"।

প্রঃ। ইহার এ রোগের কারণ কি?

উঃ। আমিই ইহাকে রোগ দিয়াছি। আমি ছেড়ে গেলে আর ১০ বৎসরের মধ্যে ইহার কোন রোগই হবে না। বলা বাহুল্য যে এ রোগারোগ্যের পর অবধি আবিষ্টার আর কোনও অসুখ হয় নাই এবং একটী সন্তানও হইয়াছে।

প্রঃ। তুমি এখন যাও?

উঃ। না, যাব না।

প্রঃ। তোমাকে যেতেই হবে?

এই কথা বলিয়াই আমি আবিষ্টাকে একটু যাতনা দিবার চেষ্টা করিলাম।

উঃ। আমার একটা কথা আছে।

প্র। কি কথা ?

উঃ। আমি নিজের ইচ্ছায় এখানে আসি নাই। আমাকে একজন এখানে পাঠিয়েছে। তিনি বলেছেন, "যদি তুই যন্ত্রণা সইতে না পারিস্, তাহলে তুই ইহাকে ছেড়ে যেতে পার্‌বি। নচেৎ তোকে এখানেই থাক্‌তে হবে"। আচ্ছা আমি তাকে একটু জিজ্ঞাসা করে নেই।

তৎপরে আবিষ্টা যেন কাহার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

"আর আমাকে কতকাল কষ্ট দিবে ? আমি যে, আর সইতে পারি না। তুমি ত বল যতক্ষণ সইতে পারিবে ততক্ষণ থাক ; কিন্তু আমি যে আর সইতে পারি না, তা'ত তুমি বোঝ না। আমি আর এখানে থাকব না। আরও সহ্য করে থাক্‌ব ?"

প্রঃ। তবে এখন যাও ?

উঃ। আমাকে যে নিষেধ করে ?

প্রঃ। কে নিষেধ করে ?

উঃ। ঈশ্বর।

প্রঃ। আমরা ঈশ্বর বুঝি না। তোকে ছেড়ে যেতেই হবে। নচেৎ সাতদিন তোকে এখানে আবদ্ধ করে রাখব। শেষে বুঝতে পাবে কি মজা।

এই কথা বলিয়াই আমি বাইরে চলিয়া গেলাম এবং ২।১ মিনিট পরেই আবিষ্টা উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ওকে নিয়ে আয় আমায় ছেড়ে দিতে বল।" আমি রোগিনীর নিকট আসিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম।

প্রঃ। বল যাবি কি না, যদি না যাস্ তবে এই ভাবে ৭ দিন তোকে উপোস করিয়ে রাখব।

উঃ। আচ্ছা আমি যাই কিন্তু আর এক বউকে ধর্‌ব।

প্রঃ। তা কিছুতেই হবে না। তুই অমুক স্থানের কালীবাড়ীতে একটা গাছে যাইয়া আশ্রয় নিবি। আর কাহারও অনিষ্ট করিতে পারিবি না।

উঃ। আচ্ছা আমি প্রতিজ্ঞা করলুম, কাকেও ধরব না।

প্রঃ। এ বৌকে ত আর কখনো ধরবি না ?

উঃ। না।

তৎপরে আত্মাকে কুণ্ডলী কাটিয়া ছাড়িয়া দিলাম এবং আবিষ্টা সংজ্ঞা লাভ করিল। ইহার পরে আর কখনো তাহার ফিট হয় নাই বা প্রদরের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন যে, প্রেতাত্মাগণ ইচ্ছা করিলেই কত প্রকারে আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। আজকালকার অনেক চিকিৎসকই হিষ্টরিক ফিটকে একটা বায়ুরোগের সংজ্ঞা দিয়াই দূরে সরিয়া রহেন বা তাহাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের সীমায় দাঁড়াইয়াই জগতের অপ্রত্যক্ষ সত্যকে অনায়াসেই পদানত করিতে অগ্রসর হচ্ছেন।

আমাদের এই আত্মিক তত্ত্বের অনুশীলনের আরম্ভ অবধি অদ্য পর্য্যন্ত এইরূপ বহুবিধ রোগীই আমাদের হাতে পড়িয়াছে এবং বিধাতার কৃপায় প্রায় সকলগুলাই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে ২।৪টী ব্যতীত প্রকৃত শারীর রোগীর সংখ্যা খুব কমই দেখিতে পাইয়াছি। তবে প্রেতাত্মা কর্তৃক প্রেরিত বা সংক্রামিত রোগগুলা যে ডাক্তারী বা কবিরাজী চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় হইতে পারে না, এমন কথা আমরা বলিতে সাহসী নহি। কিন্তু আমাদের দেশীয় চিকিৎসকগণ সে পথ অবলম্বন করিতে তত রাজী নহেন।

আয়ুর্ব্বেদে ভৌতিক চিকিৎসার উল্লেখ আছে এবং তন্ত্রে ইহার ভূয়সী ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সমুদয় চিকিৎসাও আমাদের

দেশ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রের যে টুকু আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গীভূত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্যান্য অংশ সকল আমাদের শাস্ত্র ব্যবসায়ীদের দ্বারা সর্ব্বতোভাবেই উপেক্ষিত হইয়াছে।

আমাদের এই চিকিৎসা-প্রণালী ও আয়ুর্ব্বেদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের ক্ষুদ্র একটু অংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসকও আমাদের এই প্রণালীকে একটু অলৌকিকের চক্ষে দেখিতেছেন। যাহা হউক সময়ান্তরে এই বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

জাপানী ভূত

বা

সাকুরা-নিবাসী "মোনোরো"।

নিম্নে যে গল্পটী লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহা ভূতের গল্প হইলেও একটী প্রকৃত ঘটনা। "সোগুণ"দিগের প্রাধান্য সময়ে জাপ কৃষকগণের অবস্থা কিরূপ ছিল, এই বৃত্তান্তটী পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হইবে। যখন জাপানীরা আমাদের নিকট অসভ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তখনও তাঁহাদের মধ্যে স্বার্থত্যাগের যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। "পরার্থে সর্ব্বমুৎসৃজেৎ" এই মহা বাক্যটীর কর্ম্মক্ষেত্র জাপান আমাদের দেশের ন্যায়ই ছিল।

পূর্ব্বে ভূম্যধিকারিগণ কৃষকগণের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধেক গ্রহণ করিতেন এবং অনেক সময়ে ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অতিরিক্ত কর আদায় করিতেন। নিঃসহায় কৃষকগণের প্রতিকারের কোনও উপায় ছিল না। যদি কোন কৃষক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিত—তাহা হইলে কোনও ফল হইত না, বরং অধিকাংশ স্থলে তাহার জীবনসংশয় হইত।

শিমসার অন্তর্গত শকুরা দুর্গে "কৎসুকে নোমুকে মাশনবু" নামক জনৈক লর্ড বাস করিতেন। তিনি প্রজাবর্গের উপর নানাপ্রকার অন্যায় কর ধার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতেন। প্রজাবর্গ তাঁহার অন্যায় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া তাহাদের ১৩৬ জন প্রতিনিধি একত্র হইয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে একমত হইয়া বলিলেন, "এ বিষয়ে স্থানীয় শাসনকর্ত্তাগণকে বারংবার বলিয়া যখন কোনও ফল হইতেছে না, তখন আমরা সকলে "ইয়োদো" (Yedo) প্রাসাদে যাইয়া সোগুণের নিকট প্রতিকারের প্রার্থনা করিব।"

অনন্তর তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে "ইয়োদো" (Yedo) যাইয়া সোগুণের একজন পারিষদকে তাঁহাদের দরখাস্তখানি দেখাইলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কোনও উত্তর করিলেন না। অতঃপর তাঁহারা * সোগুণের হস্তে দরখাস্ত দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে "ইওয়াহামী"

* সোগুণগণের পারিষদবর্গের অনুমতি ব্যতীত তাঁহাদের নিকট কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না। যদি কেহ অজ্ঞানতাবশতঃ কিংবা তাহার দুঃখ জানাইবার জন্য সোগুণের নিকট যাইত, তাহা হইলে তাহাকে জীবনের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইত।

পল্লীর প্রতিনিধি "মোনোরো" মান বলিলেন :—"দরখাস্তখানি সোগুণের নিকট দেওয়া স্থির হইল বটে, কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করা সহজসাধ্য নহে। যাহা হউক, আপনারা কি উপায়ে এই কার্য্য সমাধা করিতে চাহেন?" উত্তরে অন্যান্য প্রতিনিধিগণ বলিলেন, "ইহার তো কোনই বিহিত উপায় দেখিতেছি না।"

তখন "মোনোরো" পুনরায় বলিলেন, "আমরা প্রতিকারের জন্য স্থানীয় শাসনকর্ত্তা এবং সোগুণের পারিষদের নিকট দরখাস্ত দিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা যখন উহা অবজ্ঞা করিলেন, তখন অগত্যা আমাদিগকে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সোগুণের নিকট দরখাস্ত দিতে হইবে। সোগুণ যখন প্রাসাদ হইতে বাহির হইবেন, তখন তাঁহার গাড়ীর মধ্যে দরখাস্তখানি নিক্ষেপ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না। যদি আপনারা সকলে উহাতে সম্মত হন, তাহা হইলে আপনাদের পরিবারবর্গের নিকট হইতে ইহজন্মের মত বিদায় লইয়া পুনরায় এখানে আসিতে প্রস্তুত হউন।" মোনোরোর প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন এবং ফুলাবেশী পল্লীতে পুনরায় একত্র হইব্যর দিন স্থির করিলেন।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলে ফুলাবেশীতে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু মোনোরো শারীরিক অসুস্থতাহেতু উপস্থিত হইতে পারিলেন না। ইহাতে অন্যান্য প্রতিনিধিগণ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া (Yedo) "ইয়েদো" অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবশেষে তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সোগুণের সমস্ত কর্ম্মচারীর নিকট দরখাস্ত দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদের ন্যায্য প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিলেন না। প্রতিদিন প্রত্যেক জায়গায় এইরূপ ভগ্নমনোরথ হওয়ায় তাঁহারা পুনরায় মোনোরোর নিকট পরামর্শের জন্য দুইজন লোক প্রেরণ করিলেন।

এদিকে মোনোরো তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদি এবং আত্মীয়স্বজনদিগকে একত্র করিয়া বলিলেন :—"আমি আজ ইয়োদোতে যাইব। সোগুণের হস্তে দরখাস্ত দিতে চেষ্টা করিব। এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হই বা না হই, আমার মৃত্যু নিশ্চয়ই। যদি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আমার অপর ভ্রাতাগণ দুর্ব্বহ করভার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন। এরূপ সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিবার অবসর পাইয়াছি বলিয়া আমি আজ ধন্য হইলাম। আমার মৃত্যুতে তোমরা শোকপ্রকাশ করিও না।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফুলাবেশীতে গেলেন এবং তথা হইতে উল্লিখিত দুইজন লোকের সহিত ইয়োদোতে উপনীত হইলেন। ইয়োদোতে উপস্থিত হইলে অন্যান্য প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন :— "এ যাবৎ আমাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়ায় আমরা সকলে হতবুদ্ধি হইয়া আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন?"

মোনোরো ধীরে এবং গম্ভীরস্বরে বলিলেন :—"আমরা এতদ্দিন পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হই নাই বলিয়া আক্ষেপ করিবার কোনও কারণ নাই। শুনিতেছি, দুই একদিনের মধ্যে সোগুণের পারিষদবর্গ (councillors) প্রাসাদে যাইবেন। আমরা কয়েকজন একখানি দরখাস্ত লইয়া প্রথমতঃ "ইয়ামোতো নো থামী"র নিকট দিব। ইনিই মন্ত্রীবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতেও যদি ফল না হয়, তাহা হইলে অবশেষে সোগুণের নিকট যাইব।"

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিনে "ইয়ামাতোনা থামী" যখন প্রাসাদে যাইতেছিলেন, তখন মোনোরো আর পাঁচজন প্রতিনিধির সাহায্যে তাঁহাদের লিখিত দরখাস্তখানি তাঁহার হস্তে দিয়া প্রজাবর্গের দুঃখকাহিনী সংক্ষেপে তাঁহাকে বলিলেন। দরখাস্তখানি গৃহীত হইল দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত

প্রচ্ছন্নচিত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সঙ্গীগণকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অন্যান্য প্রতিনিধিগণ সকলেই আশান্বিত হইয়া বারংবার মোনোরোকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মোনোরো বলিলেন, "যদিও আমাদের দরখাস্ত গৃহীত হইয়াছে, তথাপি আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হইবার আশা অতি কম। যাহা হউক, সাহায্যার্থ এগারজন লোক আমার নিকট রাখিয়া আপনারা সকলে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যান। দরখাস্তের ফল যাহা হয়, যথাসময়ে আপনাদিগকে জানাইব।"

মনোরোর প্রস্তাবমত এগার জন প্রতিনিধি তাঁহার সাহায্যার্থ তথায় রহিলেন এবং অন্যান্য সকলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ইহার কয়দিন পরেই "ইয়ামতো নো থামী"র নিকট স্বহস্তে দরখাস্ত দিবার অপরাধে মোনোরো প্রধান আদালতে অভিযুক্ত হইলেন। অনন্তর তিনি তথায় উপস্থিত হইলে "ইয়োতো নো থামী"র দুইজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কয়েকদিন পূর্ব্বে তুমি "ইয়ামোতো নো থামী"র হস্তে দরখাস্ত দিয়াছ, তজ্জন্য তোমার গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু প্রভু এবার তোমাকে ক্ষমা করিয়া তোমার প্রতি যৎপরোনাস্তি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তুমি যদি ভবিষ্যতে আর কখনও এরূপ অন্যায় কার্য্য কর, তাহা হইলে তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।" এই বলিয়া তাঁহারা দরখাস্তখানি মোনোরোর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। দরখাস্তখানি হাতে লইয়া, মোনোরো জানিতে লাগিলেন:—"আমি বাস্তবিকই অপরাধী। "ইয়ামতো নো থামী" আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যদি আমার লিখিত দরখাস্তখানি পাঠ করিয়া কৃষকবর্গের দুঃখমোচন করিতেন, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত বাধিত হইতাম। আপনারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার এই প্রার্থনাটী অবগত করেন, তাহা হইলে উহা মঞ্জুর হইলেও হইতে পারে।"

কর্ম্মচারিগণ এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না ; সুতরাং মোনোরো বিষন্ন মনে ফিরিয়া আসিলেন। অনন্তর তিনি অপর এগারজন প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সোগুণ যখন প্রাসাদ হইতে বাহিরে যাইবেন, তখন তাঁহারা দরখাস্তখানি তাহার গাড়ীর ভিতরে ফেলিয়া দিবেন। কয়েকদিন পরেই সোগুণ "ইয়েমিৎসু" তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের সমাধিস্থল "উয়েনোয়" যাইবেন বলিয়া প্রচার করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া মোনোরো তাঁহার সহচরগণকে বলিলেন, "আমি পথিমধ্যে সেতুর পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া সোগুণের গাড়ীর মধ্যে দরখাস্ত ফেলিয়া দিব। সোগুণের নিকট দরখাস্ত দিবার এই এক বিশেষ সুবিধা এবং সুযোগ দেখিতেছি। অবশ্য আমি সোগুণের অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক ধৃত হইব, এবং এই অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। সুতরাং আমি আশা করি, মৃত্যুর পর আমার আত্মার যাহাতে সদগতি হয়, তাহা আপনারা করিবেন।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সোগুণ যখন উয়েনোয় যাইতেছিলেন, তখন মোনোরো তাঁহার গাড়ীর ভিতর দরখাস্তখানি ফেলিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুচর-বর্গ কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ ধৃত হইলেন। সোগুণ এই দরখাস্তখানি পাঠ করিয়া উহা কৎমুকে নো মুকে মাশনবুর নিকট প্রেরণ করিলেন এবং মোনোরোকে বন্দী করিয়া কারাগারে পাঠাইতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর "মশনবু" দরখাস্তখানি পাঠ করিয়া তাঁহার পারিষদকে Councillor) বলিলেন, "আমার কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত মুখ্য, নচেৎ আজ আমাকে অপদস্থ হইতে হইত না। কৃষকগণ সকলে যখন অতিরিক্তকর জন্য আপত্তি করিয়াছিল, তখনই তাহার বিধান করা উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন হইতে অতিরিক্ত কর মাপ করা হইবে, কিন্তু সোগুনের নিকট স্বহস্তে দরখাস্ত দেওয়াতে মোনোরোর যে অপরাধ হইয়াছে তাহা কোনও

মতে মার্জনীয় নহে। এরূপ অপরাধে কিরূপ গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত, জনসাধারণকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য মোনোরো এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে। আর আর যাহারা এ কার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইবে।"

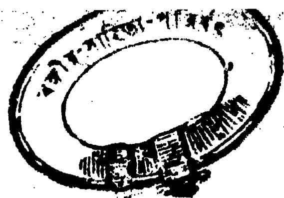
প্রভুর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পারিষদ বলিলেন :—মোনোরোর অপরাধ গুরুতর এবং তাঁহার প্রাণদণ্ড হওয়াও ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণ নির্দ্দোষী। তাহাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক মাপ করুন।

ইহার উত্তরে মাশানবু বলিলেন :—মোনোরো যে অপরাধ করিয়াছে, তাহাতে তাহার স্ত্রীপুত্রগণকে মাপ করা যাইতে পারে না।

অতপর মোনোরোকে লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া মাশানবুর মাকুরা দুর্গে পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন, এবং তথায় তাহার স্ত্রীপুত্রগণ ও পল্লীর অন্যান্য প্রতিনিধিগণ আহুত হইলেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া "মাশানবু" বলিলেন, তোমাদের উপর যে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহা অদ্য হইতে মাপ করিলাম, কিন্তু মোনোরো যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার জন্য উহার এবং উহার স্ত্রীপুত্রদিগের প্রাণদণ্ড করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম, সি, ই ; এম, আর, এ, এস্।



অলৌকিক রহস্য।

২য় সংখ্যা। চতুর্থ বর্ষ। [ভাদ্র, ১৩১৯।

প্রত্যভিঘাত। (Repercussion)

আমার কোন দূর আত্মীয়ের বাটীতে নিম্নবর্ণিত ঘটনা ঘটে, তবে আমরা নাম ও স্থান এস্থলে প্রকাশ করিলাম না। ব্যক্তিগতভাবে কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে আমরা পত্রদ্বারা তাহাকে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক নহি।

কৃষ্ণ বাবু একজন কণ্ট্রাক্টর। নিঃস্ব অবস্থা হইতে সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। সহরতলীতে অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। বাটীতে লোকজনের অভাব নাই। কুলি সরবরাহের কাজ, সর্দ্দার আদির নিকট হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রায়ই বাটীতে আসিতেছে। গৃহে ভোজ্য অপরিমিত, কাজেই দরিদ্র আত্মীয়বর্গের আশ্রয় লইবার একটি মনোমত স্থান কৃষ্ণবাবুর বাটী।

দরিদ্র অবস্থায় শ্বশুর মহাশয় কয়টি মূর্খ সন্তান লইয়া বড়ই বিপন্ন। একটি ছেলেকে তিনি কৃষ্ণবাবুর বাটীতে রাখিয়া দিলেন। ছেলেটি অতি শান্তপ্রকৃতি। সহোদরার বাটীতে আনন্দে থাকে। ক্রমে সে কৃষ্ণবাবুর কার্য্যের একজন সরকার হইল ও দুই পয়সা পাইতে লাগিল।

একদা ছেলেটি দুইদিনের জন্য আপন বাটীতে যাইল। দ্বিতীয় দিন রাত্রে কৃষ্ণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার মামাশ্বশুর

বলিতেছেন, "বৌমা! আমি তোমার নিকট আসিলাম। এ জন্মে বড়ই আহারের কষ্ট পাইয়াছি। তোমাদের সংসারে আহারের প্রাচুর্য্য দেখিয়া তোমার গর্ভে জন্মাইবার জন্য আমি আসিলাম।"

পরদিন স্বপ্নবৃত্তান্ত বাটীতে প্রচারিত হইবামাত্র, কৃষ্ণবাবুর পত্নীর অনুরোধে কৃষ্ণবাবুর শ্বশুর-বাটীতে লোক পাঠান হইল। লোক আসিয়া সংবাদ দিল, কৃষ্ণবাবুর সরকার শ্যালকটী স্বপ্ন-দর্শন-রাত্রিতে কলেরায় মরিয়াছে।

এদিকে কৃষ্ণবাবুর উক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ ঘাটে পথে নির্জ্জন থাকিলেই দেখেন, তাঁহার মৃত মামাশ্বশুর ছায়ামূর্ত্তিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। ইহাতে তিনি বড়ই ভীত হইয়া পড়িলেন; এবং ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে লাগিলেন, বাটীতে গৃহিণী মহলে এই ব্যাপারের প্রতিকার করা আবশ্যক বোধ হইল। ওঝা প্রভৃতির সন্ধান হইতে লাগিল, মিলিতেও বিলম্ব হইল না। ব্যবস্থা হইল, তিনি একমুষ্টি ছাই মন্ত্রপূত করিয়া দিবেন। তাহা কুলা করিয়া লইয়া, ঘাটে যাইবার পথে যখন ছায়া মূর্ত্তি দেখা দিবে, তখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছাই দিতে হইবে। এই মীমাংসার রাত্রে পুনরায় স্বপ্ন হইল। মামাশ্বশুর বলিতেছেন "বৌমা, তোমার কোন অনিষ্ট করিব না, তোমার গর্ভে জন্মাইব মাত্র, তুমি ছাই দিও না।"

যাহারা চিরতরে নির্ব্বাক হইয়াছে, তাহাদের কথা বা ইচ্ছা পালন করিতে কে আর ইচ্ছা করিয়া থাকে? তাহাকে ছাই দেওয়াই স্থির হইল। মন্ত্রপূত ভস্ম কুলায় করিয়া যথাবিহিতমতে দেওয়া হইল। ইহার পর বধূমাতা যখন সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন তখন আর তাহার সে মুখ নাই। মুখটি ছাই দ্বারা ঢাকা ও নিতান্ত মনোবেদনা-জ্ঞাপক। রাত্রে স্বপ্নবশে আবার তাহার সহিত দেখা হইল। বলিলেন "বৌমা আমি দরিদ্রের পুত্র। অন্নাভাব বরাবর সহ্য করিয়াছি। তোমাদের বাটীতে ভোজ্য

দ্রব্যের আধিক্য দেখিয়া, পরজন্মে দুইটি খাইতে পাইব বলিয়া তোমার নিকট আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। "তুমি আমাকে ছাই দিলে," বলিয়া মূর্ত্তি চিরতরে চলিয়া গেল, আর তাহার দর্শন কৃষ্ণবাবুর বধূর গোচর হয় নাই।

* স্থূল ভস্মরাশি সূক্ষ্মদেহী ব্যক্তির উদ্দেশে ছুঁড়িয়া দেওয়ায় তাহা সূক্ষ্মদেহে লাগিয়া রহিল, ইহা সচরাচর বিশ্বাসযোগ্য হয় না। কিন্তু ঘটনাটি যেরূপ হইয়াছে, তাহাই আমাদের লিখিতে হইল।

এই ধরণের আর একটি অতি প্রাচীন আখ্যায়িকাও এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

ঘটনাস্থল ইংলণ্ড ১৩১৮ খৃষ্টাব্দের কথা। সত্যাসত্য, ভগবানই জানেন। একটি নাইট্ তাঁহার সুন্দরী স্ত্রী লইয়া ঘর করেন। স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র ভাল নহে। সংশোধনের উপায় নাই দেখিয়া মনোদুঃখে নাইট তীর্থ যাত্রায় বাহির হইলেন। পোপের স্থান রোম নগরে যাইয়া পোপকে দর্শন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও অনুজ্ঞা লইয়া জেরুসালমে যাইতে তিনি অভিলাষ করিলেন। সেখানে ধর্ম্মযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করিবার বাসনায় পোপের দর্শন অপেক্ষা করিয়া তিনি রোমনগরে কয়েকদিবস অবস্থান করিলেন।

একদিন পথিমধ্যে একটি সন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, "বৎস! তোমার প্রাণসংশয় উপস্থিত। তোমার ভ্রষ্টা স্ত্রী তোমার মৃত্যুর জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়াছে। যদি তুমি আমার কথামত কাজ কর, তবে তোমার জীবন রক্ষা হইতে পারে। সন্ন্যাসীর কথা নাইটের বিশ্বাস হইল। তিনি সন্ন্যাসীসহ তাঁহার আশ্রমে যাইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, বৎস অবিলম্বে গলদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ঐ নদীতে অবস্থান কর, বিলম্ব করিও না। নাইট তাহাই করিলেন। সন্ন্যাসী নাইটের হস্তে একখানি দর্পণ দিলেন ও বলিলেন, "ইহার মধ্যে দেখ।" নাইট দেখিলেন, তাঁহার শয়ন

কক্ষের দেওয়ালে মোম দ্বারা তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি করা হইয়াছে ও ঘরের মধ্যে একটি পাড়ার কেরাণী ধনুর্ব্বাণ লইয়া মূর্ত্তির উদ্দেশে লক্ষ্য করিতেছে।

সন্ন্যাসী বলিলেন "ডুব দাও, বিলম্ব করিও না।" নাইট ডুবিলেন ও সন্ন্যাসীর আদেশে উঠিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "পুনরায় দর্পণ দেখ।" নাইট দেখিলেন, তীরটি সেই মোমের মূর্ত্তির গাত্রে লাগে নাই। কেরাণীটি একটু নিকটে আসিয়া পুনরায় ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেছে। সন্ন্যাসীর আদেশে তিনি পুনরায় ডুবিলেন উঠিয়া নাইট দেখিলেন, এবারেও তীর পার্শ্বে লাগিয়াছে। দর্পণ দেখিতে দেখিতে তিনি যেন শুনিতে পাইলেন, কেরাণীটি পার্শ্ববর্ত্তী নাইট-পত্নীকে বলিতেছে, এই শেষবার এবার "যদ্যপি বিফল হই, তবে আমার জীবনের আর আশা নাই।" এই বলিয়া সে দেওয়ালের মোমমূর্ত্তির অতি নিকটে আসিয়া, শেষবার ধনুর্ব্বাণ লইয়া লক্ষ্য করিতে যাইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস! খুব সাবধান, ক্ষণ বিলম্ব হইলেই তোমার প্রাণহানি হইবে। শীঘ্র ডুব দাও।" নাইট ডুবিলেন ও ক্ষণপরে উঠিয়া দর্পণের দিকে দৃষ্টি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাসিতেছ কেন?" নাইট উত্তর করিলেন, আমি দেখিতেছি এবারেও তীর আমার মূর্ত্তিকে বিদ্ধ করিতে পারে নাই। কিন্তু দেওয়ালে বিদ্ধ না রহিয়া তাহা ফিরিয়া গিয়া সেই কেরাণীকে বিদ্ধ করিয়াছে, কেরাণী বেচারা তীরের বিষে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। আরও দেখিতেছি, আমার শয্যার তলে আমার স্ত্রী গর্ত্ত করিতেছে, পরে তিনি দেখিলেন সেই গর্ত্ত মধ্যে তাহার স্ত্রী কেরাণীর মৃত দেহ পুঁতিয়া ফেলিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বৎস, আর ভয় নাই, তোমার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। তুমি জল হইতে উঠিয়া আইস। ঐ কেরাণীকে তোমার স্ত্রী ডাকিয়া আনিয়া উহার সহিত একত্র বাস করিতেছিল। একদা তোমার

স্ত্রী উহাকে বলিল, 'তুমি মন্ত্রবিদ্যা অনেক জান, কোন উপায়ে যদি বিদেশে অবস্থানকালে আমার স্বামীকে মারিয়া ফেলিতে পার, তবে আমি তোমার হইব ও আমার এই সকল সম্পত্তি তোমারই হইবে। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া সুখে থাকিব।' তদনুসারে তোমার মূর্ত্তি মোম-দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি দর্পণ মধ্যে দেখিয়াছ।'

এখন সেই মন্ত্রবিৎ কেরাণী মরিয়াছে। তুমি আপন দেশে ফিরিয়া যাও। তোমার স্ত্রীকে দূর করিয়া দাও, ও আপন অর্থাদি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া, স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মযুদ্ধে যাত্রা করিতে পার।"

তদনুসারে নাইট দেশে ফিরিলেন। তাঁহার ভ্রষ্টা স্ত্রী মৌখিক অতিশয় প্রীতি জানাইলেন; কিন্তু নাইট কোন কথা প্রকাশ না করিয়া তাঁহার শ্বশুর ও শ্যালকদের ডাকাইয়া সমুদয় ঘটনা আদ্যোপান্ত বলিয়া কেরাণীর মৃতদেহ শয্যাতল হইতে বাহির করিলেন। এক্ষণে আর স্ত্রীর বলিবার কিছু রহিল না। নাইট তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন ও সম্পত্তিসকল বিতরণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে (Crusade) প্যালেষ্টাইন অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় ঘটনাটিতে দেখা গেল যে, নাইটের অনুরূপ কল্পিত মোমের মূর্ত্তিতে তীর বিদ্ধ হইলে, বহুদূরস্থিত নাইটের স্থূল দেহে সে আঘাতের প্রতিঘাত হইয়া, নাইটকে বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হওয়ার ফলভোগ করাইত। সাধু সন্ন্যাসীর কৃপায় নাইট রক্ষা পাইলেন।

এবারে একটি দশ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা দেওয়া হইল। এটি সত্য ঘটনা, ইহার দ্রষ্টার বর্ণিত। যিনি বলিতেছেন, তিনি একজন পণ্ডিত। মন্ত্রবিদ্যা আলোচনার জন্য দক্ষিণ আমেরিকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইনি তাহার একজন অধ্যাপক। ইনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা অসত্য মনে করিতে পারি না। ঘটনা দক্ষিণ আমেরিকার

তিনি বলিতেছেন,—"আমি আরকেহাই নগরে গত আগষ্ট মাসে দিন-কতক ছিলাম। একদিন আমার বন্ধু ডাক্তার রণচোটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার বাটীতে যাই। ডাক্তার সে সময় প্রায়ই বাটীতে থাকেন। কিন্তু সেদিন কিছু পরে বাটীতে আসিয়া তাহার অনুপস্থিতি হেতু তিনি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সান্ধ্য ভোজনের পর তিনি বলিতে লাগিলেন, যে রোগিণীকে তিনি বাধ্য হইয়া অসময়ে দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহার হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি স্নায়ু বিকার নাই। তিনি গত রাত্রে শয্যায় শুইয়া জাগ্রত রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, জ্যানেট নামে একজন কাফরী দেওয়ালের মধ্য দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অসৎ প্রস্তাব করিতেছে। জ্যানেট অতি বদমায়েস লোক, পাড়াতেই থাকে, এবং ইতিপূর্ব্বে তাহাকে পথিমধ্যে দুই একবার অসৎ কথাও বলিয়াছিল। যাহা হউক, স্ত্রীলোকটি অতিশয় ভীত হইয়া নিকটস্থ একটি জলপাত্র ছুঁড়িয়া তাহাকে মারিল। জল পাত্রটি জ্যানেটের মূর্ত্তির মধ্য দিয়া গিয়া দেওয়ালে, ঠেকিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গেল। ইহার পর জ্যানেটের মূর্ত্তি দেওয়ালের মধ্যেই চলিয়া গেল। এই ভয়ে রোগিণী স্নায়ুর দৌর্ব্বল্যে অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন। এই ব্যাপারে আপনি কিরূপ বুঝেন বলুন।

"আমার বন্ধু ডাক্তার রণচোট যাহা বলিলেন, তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে এইরূপ বলা যায় যে, জ্যানেট নামক লোকটির ডাকিনী বিদ্যার অধিকার আছে। এই বিদ্যা বলে সে সূক্ষ্মদেহে যাতায়াত করিতে পারে। দুশ্চরিত্র বলিয়া সে এই বিদ্যার কুব্যবহার করিতেছে। যাহা হউক আমার বন্ধু রোগিণীর সম্বন্ধে যাহা তাহারাই মুখে শুনিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল।

"কিন্তু এ সন্দেহ পরদিনই দূর হইল। পরদিন প্রত্যূষে আমি পথ

মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময় সহরের অপর একটি ডাক্তার—তাঁহার নাম প্রষ্টার—আসিতেছেন দেখিতে পাইলাম। এত প্রত্যুষে কোথায় গিয়াছিলেন, একথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন পার্শ্ববর্ত্তী 'ভ্যালেন্স্ নগরে জ্যানেট নামক, একটি খোঁড়া লোককে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। লোকটির কুঁচকাদেশ গভীর ভাবে কাটিয়া গিয়াছে। সে বলে যে ভাঙ্গা কাচের উপর পড়িয়া গিয়া সে এরূপ আঘাত পাইয়াছে। ইহা হইতে আমার ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। স্ত্রীলোকটির কথা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইল।

এস্থলে আমরা দেখিলাম, জ্যানেটের সূক্ষ্মদেহের আঘাত স্থূলশরীরে প্রকাশ পাইল।

দক্ষিণ ভারতের একজাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে, কেহ আঘাত পাইয়া ক্ষত চিহ্ন সহ মৃত হইলে, পর জন্মে তাহার দেহে সেই ক্ষত চিহ্ন প্রকাশ পায়। অনেক শিশু কন্যাদের নাকে ও কানে নোলক ও মাকড়ি পরার বিবিধ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহিণীরা বলেন পূর্ব্বজন্মে সে স্ত্রীলোক ছিল,—নাক কান বিঁধাইবার দাগ এজন্মেও প্রকাশ পাইয়াছে।

সটকা ব্যথা হইলে ওঝাদের নিকট তাহার একপ্রকার মন্ত্র আছে। তাহারা মাটিতে একটি নরদেহ আঁকিয়া যেস্থানে রোগীর সট্‌কা ধরিয়াছে মূর্ত্তিটার সেই স্থলে মন্ত্র-পাঠান্তে, অস্ত্রাঘাত করে। ইহার রোগী ফলে সটকা ছাড়িয়া যায়।

এই সকল ও ইহার অনুরূপ ঘটনাকে রিপার্কাশন্ (Repercussion) কহে। ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ প্রতিঘাত বা প্রত্যভিঘাত বলা যাইতে পারে। কোন শূন্য গৃহে শব্দ করিলে যেমন প্রতিশব্দ বা প্রতিধ্বনি হয়, আঘাতপক্ষে রিপার্কাশন সেইরূপ

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাপানী ভূত

বা

"সাকুরা"-নিবাসী "মোনোরো"।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই বলিয়া নিম্নবর্ণিতরূপে তাঁহাদের প্রতি দণ্ড প্রচার করিলেন :— যেহেতু মোনোরো কৃষকগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে ; যেহেতু মোনোরো সোগুণের নিকট স্বহস্তে দরখাস্ত দিয়া আমার অবমাননা করিয়াছে, যেহেতু মোনোরো আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছে ; এই সমস্ত অপরাধে উহাকে এবং উহার স্ত্রীকে ক্রুশ (†) কাষ্ঠের সহিত হস্তপদ বদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইবে ; এবং উহাদের পুত্রদ্বয়ের শিরশ্ছেদন করা হইবে। নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি এইরূপ প্রাণদণ্ড আদেশ হইল।

মোনোরো—ইয়া হাসি. পল্লীর প্রতিনিধি, বয়স ৪৮ বৎসর

তাহার স্ত্রী—নাম "মান" বয়স ৩৮ বৎসর।

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—নাম "গেন্নো যুকে" বয়স ১৩ বৎসর।

তাহার মধ্যম পুত্র—নাম "সোহেই" বয়স ১০ বৎসর।

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র—নাম "কিহাটী" বয়স ৭ বৎসর।

ইহাদের দুইটী কন্যা ছিল, সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের বিবাহ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল; তাই তাঁহারা এই ভীষণ দণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেন।

মোনোরো অবিচলিতচিত্তে সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ এবং কৃষকগণের প্রতিনিধিবর্গ এই নিদারুণ দণ্ড শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; এবং যাহাতে মোনোরোর নিরপরাধ স্ত্রীপুত্রগণ রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় কোনও ফল হইল না। একবার যে দণ্ড প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আর রদ হইবার নহে,

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন মোনোরোর স্ত্রী এবং পুত্রগণের প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন মোনোরোর ভক্ত তিনজন প্রতিনিধি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। ইঁহারা মহাত্মা মোনোরোর এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণের আত্মার ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করিয়া সাম্রাজ্যের প্রত্যেক ধর্ম্মমন্দির পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর "ইয়ারা দাই" নামক স্থানে "মোনোরো"কে সপরিবারে হত্যা করা হইবে বলিয়া প্রচারিত হইলে রাজকর্ম্মচারিগণ যথাসময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে "তো কোজি" মন্দিরের কয়েকজন পুরোহিত আসিয়া কর্ম্মচারিগণের নিকট বিনীতভাবে জানাইলেন যে, তাঁহারা "মোনোরো" এবং তাহার স্ত্রী পুত্রগণের মৃতদেহ যথারীতি সমাধি দিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। তাঁহারা ইহাও জানাইলেন যে, যদি তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পরম প্রীতিলাভ করিবেন।

কর্ম্মচারিগণ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন :—"আপনাদের প্রার্থনা অনুযায়ী কার্য্য হইবে; কিন্তু মোনোরোর মৃতদেহ তিন দিন তিন রাত্র এইখানে ঝুলান রহিবে। তাঁহার ন্যায় অপরাধীর কিরূপ দণ্ডবিধান করা হয়, তাহা জনসাধারণকে দেখাইবার জন্য এরূপ করা হইবে। অতএব এই সময়ের পরে, ইচ্ছা করিলে আপনারা তাঁহার মৃতদেহ লইতে পারেন।"

বলা বাহুল্য, হত্যার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বালক বালিকা, যুবক যুবতী এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলে একত্র সমবেত হইয়া "মোনোরো" এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রগণের স্বর্গারোহণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে অপরাধিগণকে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া তথায় উপস্থিত করা হইল। একখানি পুরাতন ছেঁড়া মাদুর

তাঁহাদের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা তাহার উপর উপবেশন করিলেন। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া "মোনোরো" তাঁহার স্ত্রী এবং দর্শকবৃন্দ সকলে নয়ন মুদিয়া রহিলেন এবং সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিলেন, "উঃ! কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য!"

বেলা দুই প্রহরের সময় মোনোরো এবং তাঁহার স্ত্রীর হস্তপদ বন্ধন করিয়া ঠিক্ সোজা ভাবে ক্রশ কাষ্ঠের সহিত বদ্ধ করা হইল। অতঃপর তাঁহাদেরই সম্মুখে শিরশ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র "নেন্নেযুকে" তথায় আনীত হইল। এই সময়ে "মোনোরো" আর অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "উঃ! আর সহ্য হয় না, নিরপরাধ বালকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহাদের এই নিদারুণ দণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে। আমি দোষী, আমার প্রাণ দিতে আমি একটু মাত্রও দুঃখিত নহি।

দর্শকবৃন্দ সকলে চক্ষু মুদিয়া রহিলেন। এমন কি জল্লাদের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হওয়ায়, ক্ষণেকের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া সে বালকের পশ্চাৎ দিকে যাইয়া দণ্ডায়মান রহিল। এই সময়ে "নেন্নেযুকে" চক্ষু মুদিয়া বলিতে লাগিল—"হে মাতঃ! হে পিতঃ! আমি তোমাদের পূর্ব্বেই সর্ব্বশক্তিপূর্ণ স্বর্গধামে চলিলাম। আমি আমার ভ্রাতাগণের সহিত* সানজু নদীর তীরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিব এবং তোমাদিগকে ঐ নদী পার করাইয়া সকলে একত্রে গমন করিব। হে দর্শকবৃন্দ! তোমরা আমাকে বিদায় দাও।"

---

* সানজু নদী। বৌদ্ধধর্ম্মমতে মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বর্গারোহণের সময় এই নদী পার হইয়া যায়। এই নদী পার হইবার মাশুল স্বরূপ কিঞ্চিৎ মুদ্রা মৃত ব্যক্তির সমাধিতে দেওয়া হয়। হিন্দুদিগের বৈতরণী নদী এবং সানজু নদী একই নয় কি?

এই বলিয়া "নেন্নেযুকে" গ্রীবা প্রসারিত করিয়া জল্লাদকে শিরশ্ছেদন করিতে অনুরোধ করিল। জল্লাদ কর্ত্তব্যানুরোধে সজলনয়নে নিরপরাধ বালকের মস্তক মুহূর্ত্ত মধ্যে কাটিয়া ফেলিল। চতুর্দ্দিক হইতে শোকোচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল।

তৎপরে দ্বিতীয় পুত্র "সোহেই" তথায় আনীত হইল। সে জল্লাদকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়! আমার দক্ষিণস্কন্ধে ঘা, যাহাতে তথায় ব্যথা না লাগে এরূপ ভাবে আমার মস্তক কাটিয়া ফেলুন!" এই বলিয়া "সোহেই" বামস্কন্ধ প্রসারিত করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ইহারও ছিন্ন মস্তক ভূতলে লুণ্ঠিত হইল!

তৃতীয় পুত্র "কিহাটী" নিশ্চিন্তচিত্তে মিষ্টান্ন খাইতেছিল। এই মিষ্টান্নগুলি দর্শকবৃন্দ বালকদিগকে দিয়াছিলেন। কিহাটী তাহার ভ্রাতাদের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা কিছুই বুঝিল না। সে মিষ্টান্ন খাইতে খাইতে বালক-সুলভ সরলতার সহিত নিকটস্থ দর্শকবৃন্দের সহিত সহাস্য-বদনে আলাপ করিতেছিল। এমন সময়ে সহসা তাহার মস্তক ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বালকত্রয়ের শিরচ্ছেদ শেষ হইলে উল্লিখিত পুরোহিতগণ তাহাদের মৃতদেহ সমাধি দিবার জন্য লইয়া গেলেন।

তৎপরে জল্লাদ যখন মোনোরোর স্ত্রী মানের বক্ষে লৌহ বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি তারস্বরে বলিতে লাগিলেন;—"স্বামিন্! আপনি প্রথম হইতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন, আমরা আজ যে অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম, তাহাতে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি ব্যতীত কমিবে না। আমাদের এই কয়েকটী জীবন দান করিয়া যদি সহস্র সহস্র লোকের উপকার করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা প্রাণপাতের সুযোগ আর আছে কি? অতএব স্বামিন্! মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হউন। স্বর্গে যাইয়া আমরা পুণ্যাত্মাগণের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিব।"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া "মোনোরো" সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, "আমার অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছে, আমি এক্ষণে প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত। আমার যদি আরও ৫০০ শত প্রাণ থাকিত, তাহা হইলে ৫০০ শতবার এইরূপ সদনুষ্ঠানে অম্লানবদনে তাহা পাত করিতাম। কিন্তু আমার কৃত অপরাধের জন্য তোমার মতন স্ত্রী শাস্তি প্রাপ্ত হইল, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। উঃ! হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! হে ঈশ্বর! আমার সহায় হউন, আমি যেন এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারি। আমাদের প্রভু মাসানবু লৌহনির্ম্মিত সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিলেও আমার প্রেতাত্মার অত্যাচারে তাঁহাকে জর্জ্জরিত হইতে হইবে।" এই বলিতে বলিতে মোনোরো আরক্তলোচনে জল্লাদকে আহ্বান করিয়া বলিলেন:—"শীঘ্র আমার বুকে লৌহ বিদ্ধ কর।" "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে," এই বলিয়া জল্লাদ মোণোরের দক্ষিণ স্কন্ধে লৌহবিদ্ধ করিয়া বামস্কন্ধ দিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।

তৎপরে মোনোরোর স্ত্রীর বক্ষেও লৌহশলাকা বিদ্ধ করা হইলে, তিনি অতি ক্ষীণস্বরে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মোনোরোর বক্ষে শলাকা বিদ্ধ হইলেও তিনি নির্ভীকচিত্তে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিতে লাগিলেন:—"দর্শকবৃন্দ এবং রাজকর্ম্মচারিগণ আপনারা মনে রাখিবেন যে, মাসানবুকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে যদি আমার মুখ তাঁহার দুর্গাভিমুখে ফিরিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন যে, আমার বাক্য সত্য হইবে।

মোনোরোকে এইরূপভাবে কথা বলিতে শুনিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। জল্লাদ ১২।১৩ বার লৌহ বিদ্ধ

করিলে মোনোরো মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব কথিত মত মুখ দুর্গাভিমুখেই ফিরিয়া রহিল। কর্ম্মচারিগণ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং মোনোরোর মৃতদেহের নিকট জানু পাতিয়া বসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা একবাক্যে বলিতে লাগিলেন :—"আপনি কৃষক-বর্গের উপকারার্থ যেরূপ স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। আপনি মনুষ্যশরীরে দেবতা ছিলেন। আপনার অপরাধের জন্য নিরপরাধ স্ত্রীপুত্রগণকে আপনার সমক্ষে হত্যা করা অত্যন্ত বিগর্হিত হইয়াছে। যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণে আক্ষেপ করিয়া কোনও ফল নাই। আপনার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার জন্য আমাদের প্রভু "মাসানবু" তাঁহার অন্যান্য গৃহদেবতার ন্যায় আপনার পূজা করিবেন।

এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে কর্ম্মচারিগণ বারংবার মোনোরোর মৃতদেহকে অতি ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রভুর মঙ্গল কামনা করিয়া প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে সমস্ত বৃত্তান্ত "মাসানবু"কে জ্ঞাপন করা হইল। কিন্তু তিনি ইহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। সোগোরো যে সামান্য একজন কৃষক নহেন, তাহা তিনি বুঝিলেন না।

অনন্তর মোনোরোর মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট বাজে আপ্ত করিয়া লইল। কেবলমাত্র তাঁহার গৃহের আসবাব পত্রাদি মোনোরর কন্যাদ্বয়কে দেওয়া হইল।

এদিকে কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী মোনোরোর দরখাস্তানুযায়ী কাজ না করায় শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন। কয়েক জনকে চাকুরী হইতে অপসৃত

করা হইল; কেহ কেহ নির্ব্বাসিত হইলেন এবং দুই জন উচ্চ কর্ম্মচারিকে "হারাকিরি"* করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল।

ইহার কতিপয় মাস পরে "মাসানবু"র স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন। গর্ভের প্রথমাবস্থা হইতেই তিনি দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। মাসানবুর অনুচরবর্গ মন্দিরে যাইয়া নানা দেবতার পূজা দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই যন্ত্রণার উপশম হইল না। অতঃপর সপ্তম মাসের শেষ ভাগ হইতে প্রতি রাত্রিতে তাঁহার শয়নকক্ষে একটা অস্পষ্ট ছায়া পড়িতে লাগিল। এই ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও বিকট চীৎকারধ্বনি কখনও বা ভূত-প্রেতের অট্টহাসির রোল উঠিতে লাগিল। একে অসহনীয় যন্ত্রণা, তাহার উপর আবার এই উপদ্রব হওয়ায় মাসানবুর স্ত্রীর ব্যাধি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাত্রিতে তাঁহার আর নিদ্রা হইত না। একদা প্রভাতে তাঁহার বৃদ্ধা পরিচারিকাগণ মাসানবুর নিকট আসিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ইহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, সেদিন রাত্রিতে তিনি স্বয়ং তাঁহার স্ত্রীর কাছে নিষ্কাশিত অসিহস্তে জাগরিত থাকিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় এক বিকট শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সহসা দুইজন কাষ্ঠেবদ্ধ-হস্তপদ মোনোরো এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় মাসানবুর স্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল:—"আমরা তোমাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। এ যন্ত্রণা সে যন্ত্রণার নিকট কিছুই নহে।"

এই বাক্যশ্রবণমাত্র মাসানবু যেমন তাঁহার শাণিত তরবারি উত্তোলন করিলেন, অমনি এক বিকট হাসি হাসিয়া প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় কোথায় অন্তর্হিত হইল। মাসানবু ভীত হইয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে মন্দিরে

---

* উদরে অস্ত্র প্রবেশ করাইয়া আত্মহত্যা করার নাম হারাকিরি। এইরূপ আত্মবিধান জাপানবাসীরা গৌরবের কার্য্য বলিয়া বোধ করে।

যাইয়া প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন ; কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। প্রতি-রাত্রেই সমভাবে উপদ্রব চলিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে মোনোরো এবং তাঁহার স্ত্রী সশরীরে মাসানবুর স্ত্রীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। রোগিণী অচেতন হইয়া পড়িলে তাহারা অট্টহাসি হাসিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইত। দিবারাত্র এইরূপভাবে জ্বালাতন হইয়া অবশেষে মাসানবুর স্ত্রী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা মাসানবুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকেও অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহাদের আরক্ত লোচন দেখিলে অনুচরগণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, এবং কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিস্পন্দ হইয়া থাকিত। মাসানবু যদি তরবারি উত্তোলন করিতেন, তাহা হইলেই এক বিকট হাসির রোল উঠিত এবং দৃশ্য অধিকতর ভয়াবহ হইয়া উঠিত।

ক্রমশঃ এমন হইল যে, দিবাভাগে যখন মাসানবু সোগুণের প্রাসাদে থাকিতেন, তখন তাহারা ফটকে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিত মাসানবুর অনুপস্থিতির সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কক্ষে ইহারা প্রবেশ করিত এবং তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মাসানবুর আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবর্গ একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ব্যাপারটা দিন দিন যেরূপ গড়াইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে, ইহারা শীঘ্র ক্ষান্ত হইবে না। ইহাদের সম্মানার্থ একটা ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাদের মূর্ত্তি সেখানে স্থাপন করিয়া পূজা করা উচিত।" নতুবা সামান্য চেষ্টায় ইহাদের হাত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না।

এই পরামর্শ শুনিয়া মাসানবু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। "সোগো দাই মিয়ো" নামে মোনোরোকে অভিহিত

করিয়া এক মন্দিরে স্থাপিত করা হইল। তথায় মোনোরোর আত্মার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিলে পর দুর্গে আর ভূতের ভয় থাকিল না।

প্রায় এক বৎসর কাল বেশ শান্তিতে অতিবাহিত হইল। তৎপরে একদিন কোনও উৎসব উপলক্ষে সোগুণের প্রাসাদে সাম্রাজ্যের সকল দাইমিয়ো এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের নিমন্ত্রণ হইল। এই সময়ে মাৎসুমাতো দুর্গের "ইয়ামিনো থামির" সহিত মাসানবুর বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদের প্রকৃত কারণ কেহই বলিতে পারিলেন না। দ্বন্দ্বযুদ্ধে "ইয়ামিনো থামি" এরূপভাবে আহত হইলেন যে, তৎপর দিনই তিনি* পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে জাপানী আইনানুসারে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। "ইয়ামিনো থামি"র পরিবারবর্গের দুঃখের সীমা রহিল না। এদিকে পবিত্র স্থান প্রাসাদের মধ্যে রক্তপাত করার অপরাধে "মাসানবু" বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

মোনোরো এবং তাঁহার নিরপরাধ স্ত্রীপুত্রগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করায় তাঁহাকে এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইয়াছে, এই চিন্তা তাঁহার মনে মুহুর্মুহু উদিত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কারাগারে থাকিয়া দিবা-রাত্র মোনোরোর আত্মার নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, যদি তিনি এ যাত্রা রক্ষা পান তাহা হইলে মোনোরোর নাম যাহাতে লোকে পুরুষানুক্রমে সসম্মানে স্মরণ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সৌভাগ্যক্রমে কিছু দিনের মধ্যে সংবাদ আসিল যে, মাসানবুর দোষ সোগুণ ক্ষমা করিয়াছেন, এবং তাঁহার পদোন্নতির আদেশ দিয়াছেন।

---

* পুরাকালে কোন উচ্চ বংশীয় জাপানী নিজের দুর্গের বাহিরে হত হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত এবং তাঁহার পরিবারস্থ সকলে সাধারণ লোকের ন্যায় গণ্য হইতেন।

কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়াই মাসানবু প্রথমতঃ মোনোরোর মন্দির অতি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত করিলেন, এবং রাজধানী "কিয়োতো"য় যাইয়া তদানীন্তন* সম্রাটের নিকট মোনোরোর সম্মানবৃদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সেই অবধি মোনোরো দাইমিয়োকে সকলে দেবতা স্বরূপ পূজা করিতে আরম্ভ করিল। এখনও শত শত লোক সেই পবিত্র মন্দিরে গমন করিয়া চরিতার্থ হইয়া থাকেন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম, সি, ই, এম, আর, এ, এস্।

ভূতের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

প্রথম দিনের ঘটনার তারিখ—১৭ই শ্রাবণ, ১৩১৩ সাল।

স্থান—গ্রাম আমতলী, পোঃ কাগ্দি, জিলা ফরিদপুর।

শ্রীযুক্ত তারিণীদাস স্মৃতিরত্ন এই গ্রামের অধিবাসী। গ্রামের লোকে ইহাঁকে সাহসী, শান্ত, শিষ্ট ও পরোপকারী বলিয়া মান্য করে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত স্মৃতিভূষণ (ঠিকানা—গ্রাম তুলাবাড়, পোঃ পালং জিলা ফরিদপুর) মহাশয়ের নিকট তখন অধ্যয়ন করিতেন। অবকাশে তিনি বাড়ী আসিয়াছেন। বিদ্যার্থী ছাত্রেরা কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, এজন্য তিনি বাটীতে আসিয়াও চুপ করিয়া রহিলেন না। শশীভূষণ স্মৃতিতীর্থের নিকট তিনি পড়িতে যাইতে লাগিলেন।

---

* সম্রাট্ সূর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া জাপানীরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্মানসূচক উপাধির একমাত্র আধার। এমন কি দেবতাগণের উপাধি পর্য্যন্ত ইনিই দিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত তারিণীদাস স্মৃতিরত্ন মহাশয় এক গ্রামেই থাকেন। তবে দুই জনের আবাস মাত্র বার মিনিটের ব্যবধান। ঘটনার দিন রাত্রে স্মৃতিরত্ন মহাশয় স্মৃতিতীর্থের বাটীতে বসিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছিলেন। ক্রমেই রাত্রি বেশী হইতে লাগিল। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহারা এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, রাত্রি বেশী হওয়া সম্বন্ধে কিছুমাত্র তাঁহার বোধ ছিল না। যখন রাত্রি প্রায় দুইটা কিম্বা আড়াইটা, তখন তাঁহাদের আলোচনা শেষ হইল। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শয়ন করিতে গেলেন, আর স্মৃতিরত্ন মহাশয় গৃহাভিমুখে আগমন করিলেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের বাড়ীতে আসিতে হইলে প্রথমেই একটি পোড়ো বাড়ী পড়ে। এই বাড়ীতে প্রায় ৫০।৬০ খানি ঘর আছে। ইহা পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দ্বার পণ্ডিত * শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের।

কেহই আর দেশে থাকেন না। কাজে কাজেই উহা পোড়ো বাড়ীরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বাটী সংলগ্ন সুবৃহৎ উদ্যান। দুই পার্শ্বে দুই পুষ্করিণী। উহার মধ্যস্থল দিয়া সাধারণের যাতায়াতের পথ। উদ্যানভূমি হইতে পথ প্রায় তিন চারি হস্ত উচ্চ। পথের এক ধারে একটা সুবৃহৎ আম গাছ। উহা তিন চারি জনে বেড় পায় না। ঐ স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি একটা কাল বিড়ালকে মুথা গাছ খাইতে দেখিলেন। যখন তিনি প্রায় ঐ বিড়ালটার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, এই ত বিড়ালটাকে দেখিলাম, মুহূর্ত্তমধ্যে সে

---

* বর্ত্তমান দ্বারপণ্ডিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ তর্কতীর্থ—আমাদের সুপরিচিত। (অঃ সঃ)

কোথায় গেল? তৎপরে চতুষ্পার্শ্বে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি মনে করিলেন, হয় ত সে কোথাও পলাইয়া গিয়াছে।

এইস্থান হইতেই উদ্যানের আরম্ভ। উদ্যান অতিক্রম করিলেই বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়।

এস্থলে উদ্যানটীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। উদ্যানটী নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত ও বৃক্ষাকীর্ণ। এত বৃক্ষ যে মধ্যাহ্ন সময়েও তথায় অতি অল্প রৌদ্রই প্রবেশ করিতে পারে। রাত্রিতে সেই স্থানে দশ বারটী মশাল জ্বালিলেও অন্ধকার দূর হয় না। স্থানটী নিম্ন ভূমি হওয়ায় প্রায়ই স্যাঁতসেঁতে ও ভিজে থাকে। যেমন তিনি বাগানের মধ্য দিয়া গৃহাভিমুখে গমনের উদ্যোগ করিতেছেন, অমনি হঠাৎ তাঁহার বাম বাহুতে দৃঢ় চাপ অনুভূত হইল। তিনি বাম দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এক বিরাট ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার দক্ষিণ হস্তদ্বারা তাঁহার বাম হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া আছে। ছায়ামূর্ত্তিটীর অবয়বসমূহ সমস্তই প্রায় মনুষ্যের মত। কেবলমাত্র তাহার পায়ের পাতা দুইটী পশ্চাৎদিকে অবস্থিত। আর চক্ষু দুইটী নাসিকা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ চক্ষুদ্বয় হইতে সার্চ্চ-লাইটের ন্যায় উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি বহির্গত হইতেছিল। যে উদ্যানে রজনীতে দশ বারটী মশাল জ্বালিলেও অন্ধকার দূর হয় না, সেই উদ্যান এক্ষণে ঐ চক্ষু-বিনিঃসৃত রশ্মিদ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াও ভীত হইলেন না। তিনি স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার বাম হস্ত ধারণ করিলেন। তখন কিছুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের কুস্তী হইতে লাগিল। ভূতটী হঠাৎ তাঁহার পিছন দিক দিয়া জাপটাইয়া ধরিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই

ছাড়াইতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহাকে পুষ্করিণীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তখন তিনি উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার এক উপায় স্থির করিলেন। ভূতটী তাহাকে যে দিকে লইয়া যাইতেছিল, সেই দিকে অনেক সুপারী গাছ ছিল। তিনি মনে করিলেন যে, "যদি আমি কোন একটী গাছ প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয় সে ছাড়িয়া দিতে পারে।" তদনুসারে তিনি একটা সুপারী গাছকে জাপ্টাইয়া ধরিলেন, অমনি ভূতটা তাঁহাকে ধরিয়া একটু শূন্যে উত্থিত করিয়া ধরিল, আর গাছটীও সমূলে উত্থিত হইল। এইরূপে তিনি যতবার গাছ প্রাণপণে ধরেন, ততবার সে তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া ধরে, আর ততবারই তাহার হাতের সহিত গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া আইসে। এইরূপে তাঁহারা পুষ্করিণীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন ভূতটী তাঁহার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া পুষ্করিণীতে ডুবাইবার চেষ্টা করিল। তিনিও সেই সময়ে হঠাৎ ভূতের হাত হইতে পিছলাইয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া ডুবাইবার চেষ্টা করিলেন। তৎপরে তিনি ভূতকে লক্ষ্য করিয়া ঘুসি মারিলেন। তাঁহার বোধ হইল, তিনি যেন শূন্যে ঘুসি মারিতেছেন। তিনি যত ঘুসি মারিতে লাগিলেন, ততই যেন তাহার মনে হইতে লাগিল, তিনি কেবলই শূন্যে ঘুসি মারিতেছেন। তৎপরে তিনি ভূতকে ধরিলেন, এবং মাটীতে ফেলিলেন। ফেলিয়া তিনি ভূতের বুকের উপর বসিলেন। বসিয়াই তাহার বুকে সজোরে ঘুসি মারিতে লাগিলেন। পর মুহূর্ত্তে তিনি চাহিয়া দেখেন যে, মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়াছে। তিনি মাটীতে বসিয়া আছেন। সে জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার! স্মৃতিরত্ন উঠিলেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না—অবশেষে তিনি গৃহে গমন করিলেন।

এই ঘটনাটী শুনিয়া আপনারা হয় ত মনে করিতে পারেন যে, উহা স্মৃতিরত্ন মহাশয় স্বপ্নে দর্শন করিয়াছেন। তিনি যে স্বপ্ন দর্শন করেন নাই, তাহার প্রমাণ, বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, সকলে তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। মাতা, এত রাত্রি হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন "অদ্য ঐ বাগানের মধ্যে ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে। সে সব কথা আজ আর বলিব না। এক্ষণে আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, শীঘ্র ভাত দিন।" অন্নাহার করিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে তিনি শয়ন করিলেন। প্রাতে উঠিয়া বিষণ্ণভাবে তিনি বাহিরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গ্রামের শ্রীযুক্ত হরিচরণ ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে বিষণ্ণ দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্মৃতিরত্ন মহাশয় উত্তর করিলেন, "যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা যদি অপরের ঘটিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। এরূপ অবস্থায় আমি যদি তোমাকে ঘটনা বলি, তাহা হইলে তুমিও কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না, অধিকন্তু উপহাস করিবে। অতএব সে স্মৃতিরত্ন মহাশয় সকল কথা শুনিয়া তোমার কাজ নাই।" ব্যাকরণতীর্থের আগ্রহাতিশয্যে সমস্ত কথা বলিলেন। ব্যাকরণতীর্থ ঘটনাস্থল স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণমানসে স্মৃতিরত্নকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বাগানের প্রায় সমস্ত সুপারী গাছগুলিই সমূলে উৎপাটিত হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। আর যে যে স্থানে কুস্তী হইয়াছিল, যে স্থানে তিনি ভূতকে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের মাটীতে পদচিহ্ন, মুখচিহ্ন ইত্যাদি রহিয়াছে। আর উদ্যানের নিকটবর্ত্তী গৃহস্থেরা বলিল যে, গত রাত্রে দুইটা আড়াইটার সময় তাহারা ঐ বাগানে ভয়ানক শব্দ শুনিয়াছিল। তাহাদের বোধ হইতেছিল, যেন একটী প্রবল ঝড় গাছগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে।

দ্বিতীয় দিনের ঘটনার তারিখ, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩১৩।

স্থান—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গণ।

স্মৃতিরত্ন মহাশয় সেই দিনই তাঁহার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। স্মৃতিভূষণ মহাশয় ইতিপূর্ব্বেই ঘটনার বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি স্মৃতিরত্নকে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন—বলিলেন, "উহা মনের ভ্রম মাত্র। তুমি ও সমস্ত বিষয় ভুলিয়া যাও। বৃথা চিন্তা করিও না।" স্মৃতিরত্ন বলিলেন, "যাহা আমি নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, তাহা কিরূপে অবিশ্বাস করি?"

ক্রমে রাত্রি হইল। স্মৃতিভূষণ মহাশয় তাঁহার গৃহে শয়ন করিলেন। তাঁহার গৃহসংলগ্ন টোল-গৃহ। সেই ঘরে তারিণীদাস ও অন্যান্য ছাত্রগণ শয়ন করিল। তারিণীদাস গৃহের মধ্যস্থলে শয়ন করিল। রাত্রি যখন দুইটা আড়াইটা, তখন টোল গৃহের দ্বারে দুম্ দুম্ আঘাত হইতে লাগিল। আবার ক্ষণকালপরে গুম্ গুম্ ধপাস্ ধপাস্ শব্দ অনবরত চলিতে লাগিল। তখন তারিণীদাস শয্যা হইতে উঠিয়া দ্বার খুলিল। দেখিল, হরিচরণ ব্যাকরণতীর্থ ও নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য লণ্ঠন-হস্তে দণ্ডায়মান। তারিণীদাসকে দেখিয়াই তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, "তারিণী তোমার বাটীতে ভয়ানক বিপদ, আমরা তোমাকে লইতে আসিয়াছি। আমাদিগের সহিত শীঘ্র চল।" তারিণীদাস বলিল, "আমি যে যাইব, অন্ততঃ একবার অধ্যাপককে বলিয়া যাই। তাহা না হইলে তিনি কি মনে করিবেন।" হরিচরণ বাধা দিয়া বলিল, "না এখনই আমাদের সহিত যাইতে হইবে।" অগত্যা তারিণীদাস তাহাদের সহিত চলিল। বাটীর প্রাঙ্গণ পার হইয়াই পুষ্করিণী। সেই স্থানে যেই তিনি উপস্থিত হইয়াছেন, আর কোথায়

হরিচরণ, কোথায় নিশিকান্ত, আর কোথায় বা লণ্ঠন। পূর্ব্বদিনের সেই ভয়ানক মূর্ত্তি তারিণীদাসের শিখাগুচ্ছ (বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা তখন তাহার শিখা অত্যধিক মোটা ছিল) ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ধরিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। তখন তিনি প্রাণপণে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক মহাশয় এবং বাটীর সকলে অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কেহই তাহার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল না। তখন সেই ভীষণ মূর্ত্তিটী তাঁহাকে ধরিয়া কাদামাটীতে মুখ চাপিয়া ধরিল, কাদাতে নাসারন্ধ্র ও মুখ-গহ্বর বন্ধ হইয়া গেল। তবুও তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন। কণ্ঠনালী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্বর বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য উচ্চারণ অস্পষ্ট হইতেছিল। প্রতিবেশী একজন ঐরূপ গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে তারিণীদাসকে চিনিতে পারিল। তাঁহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য দ্বারের নিকট আসিলেন। বাটীর ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ থাকায় প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত ও স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নাম ধরিয়া ডাকা ডাকি করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল। স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। যখন বাহিরে ভয়ানক গণ্ডগোল আরম্ভ হইল, তখন ভূত স্মৃতিরত্নকে ছাড়িয়া দিল এবং বলিল, "দেখ গত কল্য রাত্রে আমি বাগানের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। তুমি আমার রাস্তায় পড়ায় আমি তোমাকে রাস্তা হইতে সরাইয়া দিবার জন্য তোমার হাত ধরিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তোমার বুদ্ধির দোষে আমার সহিত মারামারি করিলে। আমি ইচ্ছা করিলে তোমার অনেক উপকার করিতে পারিতাম। আমি তোমাকে মারিব না। আমি কে তাহাও তোমাকে বলিব না। তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল, তজ্জন্যই অদ্য তোমাকে কিছু শিক্ষা দিয়া গেলাম। আর কখনও তুমি এরূপ কার্য্য করিও না!" এই বলিয়াই

সে নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে আরোহণ করিল ও অদৃশ্য হইয়া গেল। স্মৃতিরত্ন মহাশয় তখন ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের দ্বারে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। স্মৃতিভূষণ মহাশয় দ্বারের নিকট পতনের শব্দ পাইয়া বাহির হইলেন। তারিণীদাসকে দেখিতে পাইলেন ও লোকজন ডাকিলেন। দেখিলেন,—তারিণীদাস নিস্পন্দ, নিষ্কম্প, শীতল। উত্তাপ-দ্বারা তাঁহারা জ্ঞান সঞ্চারিত হইল। তখন তিনি আমূল ঘটনা বলিলেন। সকলেই বিস্মিত হইল।

প্রথম দিনের ঘটনাস্থল বাগান ও তৎসংলগ্ন পোড়ো বাড়ীতে অনেকেই ভয় পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ও ঐ স্থানে ভয় পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনের ঘটনাস্থল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত স্মৃতিভূষণ মহাশয়ের বাটীসংলগ্ন পুষ্করিণী। পণ্ডিত শ্রীতারিণী-দাসের ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে একটী লোক মাছ ধরিতে গিয়াছিল। তৎপরে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তাহার পর দেখা যায় যে, তাহার মুণ্ডটী পুষ্করিণী তীরে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত আছে। একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। যখন ঐ ভূতটীর সহিত তারিণীদাসের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার শরীরে যেন এক অভূতপূর্ব্ব বলের উন্মেষ হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়, তাঁহার বলও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এই ঘটনাটী হরচন্দ্র তর্কপঞ্চানন মহাশয় একদিন গল্পচ্ছলে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট জ্ঞাপন করেন। মহারাজ তারিণীদাসকে ডাকাইয়া আনাইয়া সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং তিনি ঘটনাটী সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। শ্রীযুক্ত তারিণীদাস এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতেছেন।

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় দিনের ঘটনার তারিখে তারিণীদাসের বাটীতে কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই, এবং হরিচরণ ব্যাকরণতীর্থ ও নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের নিজ নিজ বাটীতেই শয়ন করিয়াছিলেন।*

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন কবিরাজ।
কুমারটুলি।

---

* আমরা গল্পটী যথাযথ প্রকাশিত করিলাম। নাম ধাম না দিলে, এরূপ অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহসী হইতাম না। তথাপি এই ঘটনা সম্বন্ধে এখনও আমাদিগের অনেক জ্ঞাতব্য রহিল। ঘটনার অলৌকিকত্বের উপর সন্দিহান না হইলেও এই ঘটনা-সংশ্লিষ্ট লোক-গুলির স্বাক্ষরের প্রয়োজন। আশা করি, প্রবন্ধ লেখক আমাদিগকে সত্বর তাহা পাঠাইয়া সুখী করিবেন। না দিলে, ইহা বিশ্বসনীয় নহে বলিয়া গৃহীত হইবে।

অং, সং।

শবদেহের আত্মসম্মান বোধ।

সম্পাদক মহাশয়, আপনি যে মহত্তর ব্রত ধারণ করিয়াছেন তাহা যথার্থই প্রসংশনীয় এবং অনুকরণীয়। ইহা অবিশ্বাস-প্লাবিত এই বঙ্গে নিশ্চয়ই যুগান্তর উপস্থিত করিবে সন্দেহ নাই। তথাপি দু'এক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। প্রার্থনা করি, আপনি এই মহাব্রত উদযাপনে অশ্রান্ত উদ্যমে যশস্তম্ভের উচ্চতর শিখরে আরোহণপূর্ব্বক বঙ্গবাসীর মুখ উজ্জ্বল করুন।

আজ আমি এক ক্ষুদ্র অথচ সত্য ভৌতিক গল্প লইয়া বিনীতভাবে উপস্থিত হইয়াছি। একান্ত বাসনা, আপনার বিখ্যাত "অলৌকিক রহস্যে"র একাংশে একটু স্থানদান করিয়া গল্পটিকে সাধারণের গোচরীভূত করুন।

সে আজ প্রায় ৫।৭ বৎসরের কথা। তখন আমি আমাদের পল্লীগ্রামের বাস-ভবনে থাকিতাম। সেই সময়ে এই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটে। যদিও আমি ইহা স্বচক্ষে দেখি নাই, তথাপি বিশ্বস্তসূত্রে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা যথার্থ সত্য, ইহাতে মিথ্যার লেশমাত্র নাই।

আমাদের বাটীতে একজন ঝি থাকিত, সে আমাদের গৃহস্থালীর কতক কতক কাজ করিয়া দিয়া চলিয়া যাইত। সর্ব্বদা তাহাকে আমাদের বাটীতে থাকিতে হইত না। একদিন মধ্যাহ্নকালে ঐ ঝি নিজ পরিবারের জন্য শাক তুলিতে তুলিতে, আমাদের গ্রামের প্রান্ত বিধৌত করিয়া যে একটি কলনাদিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে, তাহারই তীরে উপস্থিত হইল। তখন কোন্ কাল তাহা বেশ মনে নাই, কিন্তু গ্রামে কলেরা-দেবের ভীষণ আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহা বেশ মনে আছে। তাঁহারই কৃপায় কত লোকে যে সে বৎসর অকালে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ছোট লোকের ভাগই তন্মধ্যে বেশী ছিল। শবরাশিতে উক্ত ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পূর্ণপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল! ঝি শাক তুলিতে

তুলিতে অন্যমনস্ক ভাবে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সঙ্গে আরও দু'একজন গ্রাম্য কৃষক পত্নী ছিল। তাহারা কিন্তু অধিক দূর যায় নাই। শাক তোলা শেষ হইলে, যখন ঝি দেখিল যে, সহচরীবর্গের নিকট হইতে সে অনেক দূরে পড়িয়াছে, তখন স্থান ও কাল মনে করিয়া তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গিনীদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য সে ছুটিল। তাহার সঙ্গিনীরা ও শাক তোলায় অন্যমনস্ক ছিল, সুতরাং কেহ যে তাহাদের নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে; তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। যাহা হউক, সামান্য দূর যাইয়াই ঝি দেখিতে পাইল, একটা বিকটাকার শব নগ্নদেহে তাহার পার্শ্বে পতিত রহিয়াছে! রাত্রিকালে বোধ হয় শৃগাল কুক্কুরে তাহাকে তথায় জল হইতে তুলিয়া ফেলিয়াছিল। শবদেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দেখিয়াই ঝির শরীর শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভীত না হইয়া বেশ করিয়া শবটাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঝি মনে মনে বলিল, "আহা হারে দাদা আমার, মরণকালে তোমাকে দেখিতে পাই নাই। তা তোমাকে একটু কাপড় পরাইয়া ফেলিয়া দেয় নাই কেন? আমি থাকিলে"—সহসা ঝির শরীর কাঁপিতে লাগিল, এইবার তাহার ভয় হইল। সে দ্রুতপদে অদূরস্থিত বৃক্ষছায়ায় অবস্থিত সহচরী-বৃন্দের সহিত মিলিত হইবার জন্য চলিল। তাহার গা যেন সে সময়ে চলে না। যাহা হউক, যে মুহূর্ত্তে সে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইল, তন্মুহূর্ত্তেই একটা প্রবল ঘূর্ণী ঝঞ্ঝা সেই স্থানকে কম্পিত করিয়া তুলিল। ধূলিরাশিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। পত্রের মর্ম্মরশব্দে দিগন্তর মুখরিত হইয়া উঠিল। বৃক্ষশাখায় অবস্থিত বিহগকুল কল-কল শব্দ করিয়া সমবেতস্বরে ভীতির লক্ষণ প্রকাশিত করিতে লাগিল এবং সমস্ত প্রকৃতি যেন কি এক ভীষণ ভাব ধারণ করিল। যে যে দিকে পারিল পলাইয়া

গেল। ঝি কিন্তু সেই স্থানে বিগত-চেতনা হইয়া পড়িয়া গেল। সে সময়ে কে কাহার খোঁজ করে? সকলেই নিজ নিজ অবস্থায় কাতর! ঝি নিজমুখে আমাকে এই সব কথা বলিয়াছে, কিন্তু সে যে কতক্ষণ ঐরূপভাবে পড়িয়াছিল, তাহা সে বলিতে পারে নাই।

এদিকে তাহার সঙ্গিনীরা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু ঝি ফিরিল না দেখিয়া তাহার স্বামী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, একটা বিরাট ঘূর্ণী ঝঞ্ঝা তাহাদিগকে পরস্পরের নিকট হইতে পরস্পরকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহারা কেহ কাহারও সংবাদ বলিতে অক্ষম। তখন তাহার স্বামী পূর্ব্বকথিত বৃক্ষতলে যাইয়া দেখিল, সত্য সত্যই তাহার পত্নী অজ্ঞান অবস্থায় তথায় পতিত রহিয়াছে! যাহা হউক, যে কোন প্রকারে পত্নীকে বাটী লইয়া আসিল, তখনও তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় নাই। শীঘ্রই ওঝা আসিল এবং ভূত ছাড়াইবার জন্য গ্রাম্য ওঝা যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, তাহাই অবলম্বিত হইল। প্রথম প্রথম ঝি ওঝার সমস্ত প্রশ্নের সরলভাবে উত্তর দিয়াছিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে হীরার ভৌতিক দেহ তাহার শরীরে আবির্ভূত হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সে নষ্টামি আরম্ভ করিল। ওঝার প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। কিন্তু ওঝা যখন তাহাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল। তখন সে বলিল, "কেন 'এ' আজ আমার নিকট গিয়াছিল? আমি যে অমন উলঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার কি লজ্জা নাই? আমি ত ইহাকে ছাড়িব না।" ওঝা এই কথা শুনিয়া অধিকতর ভীষণবেগে তাহাকে পুনরায় প্রহার করিতে লাগিল, ইহাতে সে আবার বলিল, "আচ্ছা আমি যাইব, যদি আমাকে 'ও' কাপড় পরাইয়া দেওয়াইতে পারে!" ওঝা ইহাতে সম্মত হইল। তখন ঝি সংজ্ঞা লাভ করিয়া স্বীয় বদনমণ্ডল ঘোমটা দ্বারা আবৃত করিল। যে রমণী এ যাবৎকাল সাধারণের সম্মুখে কতরূপ হাসি তামাসা

করিতেছিল, তাহার এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে দর্শকবৃন্দ যুগপৎ স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইল।

এই স্থলে বলা উচিত যে হীরা আমাদের গ্রামের একজন ধাউরী বেহারা। সেই বৎসর কলেরায় তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পুত্রগণ তাহাকে উক্ত নদীতীরে ফেলিয়া দিয়া আসে। ভূত ঝাড়নের সময় হীরার এক পুত্র তথায় উপস্থিত ছিল সে পিতার নগ্নদেহ বস্ত্রাবৃত করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং দিয়াছিল।

অতঃপর ঝির প্রতি হীরার প্রেতাত্মা আর কখন কোন উপদ্রব করে নাই। এই ঘটনাটি আমার বড়ই আশ্চর্য্যময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। তবে শবদেহের আত্ম-সম্মান-বোধ আছে না কি? শবদেহও আমাদের ন্যায় সুখ দুঃখ অনুভব করে না কি? কে এই জটিল রহস্য আমায় বুঝাইয়া দিবে ?*

কে, এইচ্ রেজা।

২৯।২ নং পুলিশ হস্পিট্যাল রোড, কলিকাতা।

---

* যতদিন দেহাত্মজ্ঞান থাকে, দেহের উপর ও সংসারের উপর মমতা থাকে, ততদিন জীব স্থূলদেহ ত্যাগ করিলেও, সাধারণ জীবিত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। ইহাকেই মৃতের বদ্ধাবস্থা (earth-bound state) কহে। এইরূপ জীবকেই চলিত কথায় 'ভূত' বলিয়া থাকে। বাসনাগ্রস্ত জীবের মৃত্যুর পরে অধিকাংশেরই এই অবস্থা। এ অবস্থা অতি ভীষণ। স্থূলদেহী এ অবস্থা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। মানুষকে যাহাতে এই অবস্থায় না পড়িতে হয়, এইজন্য সকল দেশের সকল ধর্ম্মের আচার্য্যগণ মানুষকে মোক্ষের পথ দেখাইবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছেন। "অলৌকিক রহস্য" প্রচারের ইহাই একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা লেখকের সদিচ্ছার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অ, সং।

পুনরাগমন।

তৎপর দিন কোজাগরী পূর্ণিমা। বহুগৃহে ঐ দিবসে সমারোহের সহিত লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। আমরা যখন দেশে ছিলাম, তখন আমাদেরও গৃহে সাধ্যমত সমারোহের সহিত লক্ষ্মীপূজা হইত। লক্ষ্মীপূজায় আমিষের ব্যবহার নিষিদ্ধ। সুতরাং নিরামিষ ব্যঞ্জন ও পায়স-পিষ্টকাদি লক্ষ্মীদেবীকে নিবেদিত করা হইত। একে আমরা দরিদ্র, তাহার উপর পল্লীবাসী। তখনও পর্য্যন্ত গ্রামে আজিকালিকার মত আলু কপির প্রচলন হয় নাই। ধনাঢ্য ভিন্ন অন্যে সে সকল সামগ্রী চক্ষেও দেখিতে পাইত না; অথবা দেখিতে পাইলেও বহু হিন্দু তখনও পর্য্যন্ত এ সকল সামগ্রী বিলাতী মনে করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিত না। সুপ্রাপ্যের মধ্যে ছিল মৎস্য। সুতরাং মৎস্যই যখন ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হইত না, তখন, বুঝিতেই পারিতেছেন কিরূপ উপাদেয় খাদ্যে আমাদের ঘরে লক্ষ্মীদেবীকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দেবীর এই শাকান্ন প্রসাদ পাবার জন্য এত লোক উপযাচক হইয়া আমা-গৃহে পূজার রাত্রিতে অতিথি হইত যে, আমি বড় বড় সমারোহ-ব্যাপারেও আমাদিগের গ্রামে কাহারও গৃহে তত লোকসমাগম দেখি নাই। আমাদিগের আমাদিগের প্রতিবাসী ব্রাহ্মণদিগের গৃহের প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা মহিলাগণ অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে সমবেত হইতেন। সারাদিন সংযত ও উপবাসিনী থাকিয়া তাঁহারা দেবীর আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন। যিনি যে ব্যঞ্জন-রন্ধনে পারদর্শিনী ছিলেন, তিনি সেই সেই ব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন। আমার মাতা তখন অল্পবয়স্কা ছিলেন। তাঁহাকেও এক আধটা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার ভার দেওয়া

হইত। ভার দিবার সময়ে বৃদ্ধারা মাকে বলিতেন, খাঁটী ঘরের মেয়ে কি না এই ব্যঞ্জন রন্ধনেই বুঝা যাইবে।

দেবীর ভোগ হইয়া গেলে, যখন প্রায় মধ্যরাত্রিতে আগন্তুকেরা প্রসাদে পরিতৃপ্ত হইতেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিতেন, ব্যঞ্জন সকল অমৃত উদ্‌গীরণ করিতেছে। কোন কোন ব্যক্তি আহারকালীন কোন ব্যঞ্জন কাহার হস্তে প্রস্তুত, তাহা আস্বাদগ্রহণমাত্রেই বলিতে পারিতেন। মহিলারা নিজ নিজ সুখ্যাতি শুনিয়া লক্ষ্মীদেবীর করুণার দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। অভ্যাগতগণ আহারে পরিতৃপ্ত হইলে তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিত না; তখন তাঁহারা তাঁহাদের পরিশ্রম ও উপবাস সার্থকজ্ঞান করিতেন। একবার আমার মাতৃ কর্ত্তৃক প্রস্তুত ব্যঞ্জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি মহিলাগণ তাঁহাকে "সতীর বেটী সাবিত্রী" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

এখন সকল পূজাই একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় আসিবার পর দুই চারিদিন যা হ'ক দুই একটা ব্রতনিয়মাদিও ছিল, পাঁচ সাতবৎসর একেবারে যেন কিছুই নাই। অন্ততঃ আমি ত কিছুই দেখি নাই। তবে আমি ও পিতা উভয়েই প্রায় প্রতিদিনই দশটার সময় বাটী হইতে বাহির হইয়া বেলা চারিটার পর গৃহে ফিরিতাম। ইহার মধ্যে মা কখন কোনও পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি না জানি না; কিন্তু আমাদের পিতা-পুত্রের কল্যাণের জন্য সামান্য স্বস্ত্যয়ন শান্তি ছাড়া অন্য বড় একটা পূজার ব্যাপার কিছু দেখি নাই। সে স্বস্ত্যয়ন যে ব্রাহ্মণেরদ্বারা করান হইত তাহার 'ষত্ব ণত্ব' জ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না। আমরা কলিকাতায় আসিয়া যখন চোরবাগানে প্রথম অবস্থান করি, তখন এই গণ্ডমূর্খ ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া মায়ের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই অবধি কলিকাতাতে সে আমাদের পৌরহিত্য করিতেছে। এই সমস্ত পূজাদির ব্যাপারে পিতার কোনও বিশ্বাস ছিল না

বলিয়া তিনি উক্ত ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যে কোনও আপত্তি করেন নাই। মূর্খ হইলেও ব্রাহ্মণের প্রকৃতি বড় মধুর ছিল এবং সেইজন্য লোক-মনোরঞ্জনে তাহার একটী বিশেষ ক্ষমতা ছিল। পিতাও তাঁহার চরিত্র-গত মাধুর্য্যে তুষ্ট ছিলেন। সচরাচর বামুন পণ্ডিত হইলেই তাহার একটা উপাধি থাকে। এই ব্রাহ্মণের উপাধি ছিল চূড়ামণি। কিন্তু একদিন ন্যায়ালঙ্কার-উপাধিকারী কোনও পণ্ডিতকে সে ন্যায়লঙ্কার বলিয়াছিল। তদবধি ইহার চূড়ামণি উপাধি ন্যায়লঙ্কার উপাধিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আমরা যুবকবৃন্দ তাহাকে আবার ছোট করিয়া ন্যায়লঙ্কা করিয়াছিলাম। তাহাকে রহস্য করিতেছি বুঝিতে পারিলেও ব্রাহ্মণের মুখে আমরা কখন ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন দেখি নাই। আমাদের সঙ্গে দেখা হইলেই তাহার সদা প্রফুল্ল মুখ হইতে কেবল আশীর্ব্বচন নির্গত হইত।

আমাদের বাড়ীতে পূজার হাঙ্গামা বিশেষ কিছু না থাকিলেও আমাদের পৌরহিত্যে ব্রাহ্মণের যথেষ্ট লাভ ছিল। প্রতি পাল-পার্ব্বণেই ঝিয়ের মাথায় দিয়া মা নানাবিধ ভোজ্য উপচার তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। পিতাও মাসে মাসে ব্রাহ্মণকে কিছু কিছু অর্থদান করিতেন। কিন্তু সবার উপরি পাওনা ছিল, 'বিদায়'। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার পিতা কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্তের গৃহে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অধ্যক্ষতা করিতেন। সেইজন্য মূর্খ হইলেও পিতার সুপারিশে ব্রাহ্মণ অনেক স্থান হইতে 'বিদায়'-পত্র পাইতেন।

সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে মাও উঠিয়াছেন আমিও উঠিয়াছি। মা যেমন নিত্য প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করেন, সেইরূপ করিয়াছেন। আমি করিয়াছি, এক বিষম স্বপ্নের তাড়ায়। মায়ের সঙ্গে রাত্রিতে কথা বার্ত্তা কহিয়া শুইয়াছি, এমন সময় তন্দ্রামুখে এক স্বপ্ন দেখিলাম। ঘুমাইতে ঘুমাইতে বোধ হইল, যেন কে আমার মাথায় বসিয়া বলিতেছে, "ওঠ্

গোপীনাথ, আমার গায়ে একটু জল দে।" আমার বোধ হইল দামোদর যেন আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। চাহিয়া দেখি, গোপাল আমার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত রক্ষা করিয়া, আমার শয্যার উপরে বসিয়াছে। দেখিতেছি গোপাল, কিন্তু মনে হইতেছে সে দামোদর। মনে হইবামাত্র হৃদয়ের অস্থিরতায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল রাত্রি তখন তিনটা ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া চারিধারে চাহিলাম। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। তখন বাহির হইতে একবার ফিরিয়া, মুখে চোখে জল দিয়া আবার শয়ন করিলাম। তন্দ্রার মুখে আবার স্বপ্ন। "ও গোপীনাথ! ওঠ্ না। ওরে আমার গায়ে একটু শীতল জল দে। আমার গা জ্বলিতেছে। আমি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছি।" আবার জাগিলাম, শয্যার উপর বসিয়া চারিধারে চাহিলাম, কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না। স্বপ্নটাকে একবার স্মরণ করিলাম। দেখিলাম গোপাল কিন্তু মনে হইল দামোদর। মনে হইল, গোপালের মূর্ত্তি ধরিয়া দামোদর কথা কহিতেছে। তাইত! নুড়ীর আবার গাত্রদাহ কি? দূর তোর স্বপ্ন ঘুমাইবার জন্য আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আবার শয়ন করিলাম। এবারে স্বপ্নের শিলাময় কঠোর হস্তে আমার গা ঠেলিয়া দামোদর বলিল—"ওঠ গোপীনাথ, ওঠ্ ওঠ্ "আমি জ্বলিয়া মরি।" এবারে ঘুমের ঘোর পর্য্যন্ত দেশ ছাড়িয়া পলাইল। আমি এবারে ঠিক বুঝিলাম সে দামোদর। নুড়ীর হাত মুখ রসনা নাই বলিয়া সে গোপালের মূর্ত্তি ধরিয়াছে। পাথর কালো বলিয়া, গোপালকেও কালো দেখাইতেছে। সুন্দর গোপাল যেন অগ্নি দগ্ধ।

তথাপি স্বপ্ন—আমি তাহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না! বহুবার প্রতারিত হইয়াছি, আর হইব না; এ স্বপ্নকথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না। বুঝিলাম, আর নিদ্রা হইবে না। হৃদয়ের চাঞ্চল্য

আর যেন উপশমিত হইতে চাহিতেছে না। আমি শয্যাত্যাগ করিলাম, এবং মুখ-প্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

আমার সঙ্গে মায়ের দেখা হইবামাত্র তিনি আমাকে বলিলেন, "তোমাকে এখনি একবার পুরোহিত মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতে হইবে। তিনি বাটী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।"

আমি বলিলাম—"একটু পরে গেলে চলিবে না?

মাতা। চলিতে পারে। তবে তিনি যদি বাটীর বাহির হইয়া যান তা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ঘরে না, ফিরিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

আমি। পুরোহিত মহাশয়কে এত কি বিশেষ প্রয়োজন?

মাতা। বলিলে বিশ্বাস করিবি?

আমি। তুমি যা বলিবে আমি তাহা বেদবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। অবিশ্বাস্য হইলেও বিশ্বাস করিব।

মাতা। আজ বহুকাল পরে অভাগিনী কন্যাকে মা কমলার মনে পড়িয়াছে। মা আজ তোদের ঘরে শ্রীচরণ রাখিয়া তোদের পবিত্র করিতে আসিবেন।

আমি। তুমি কি মা লক্ষ্মীকে দেখিয়াছ?

মাতা। স্থূলচক্ষে দেখিব, এমন পুণ্য কি করিয়াছি। মা স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন।

ভাল জ্বালা! আবার স্বপ্ন! এ দুর্দ্দান্ত স্বপ্ন রাক্ষসী কত মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিবে! তবে যখন বিশ্বাস করিব বলিয়াছি, তখন মাকে আর অবিশ্বাসের কোনও ভাব না দেখাইয়া বলিলাম—"তবে পুরোহিত ঠাকুরকে আনিবার জন্য আমাকে আদেশ করিতেছ কেন?"

মাতা। মায়ের পূজার ব্যবস্থা করিতে হইবে ত ?

আমি। মা লক্ষ্মী যখন উপযাচক হইয়া তোমার ঘরে আসিতেছেন, তখন পূজার ব্যবস্থা তিনিই ঠিক করিয়া লইবেন।

মাতা। পাগলামী করিস্‌নি, শীঘ্র পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়া আন্।

আমি। ডাক্তার বাবু আসিলেন কিনা, আমি তাই জানিবার জন্ত তাঁহার বাটীতে যাইতেছিলাম।

মাতা। সে খবর আমি লইতেছি।

আমি আর মায়ের কথার প্রতিবাদ করিলাম না। 'যাইতেছি' বলিয়াই একখানা উত্তরীয় আনিতে নিজের ঘরের দিকে চলিলাম। এমন সময় পিতা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন,—"গোপীনাথ! তোমার ভাবী শ্বশুর আজ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন। সুতরাং আমাদিগকে, তিনি ও তৎসঙ্গে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদের আহারের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমি যে কয়দিন তাঁহার স্থানে ছিলাম, সে কয়দিন তাঁহার কাছে যেরূপ সেবা পাইয়াছি, তাহা মুখে আর তোমাকে কি বলিব। দেখিও আমাদের সেবার ক্রটীতে যেন লজ্জিত হইতে না হয়। আমি দুই চারিজন বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছি, ফিরিতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা।

আমি। কি রকম আয়োজন করিব আদেশ করুন।

পিতা। তুমি নিজে শীলের বাজারে গিয়া, উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া আন। যত প্রকারের ভাল মাছ পাও আনিবে। ইহা ছাড়া নিজে দেখিয়া উৎকৃষ্ট পাঁঠা কাটাইয়া আনিবে। ভাল ভেড়ার মাংস—ইংরাজীতে তাকে মাটন নাকি বলে—যত বেশী দামের হ'ক আনিবে। কেন না, দেখিয়াছি লোকটা বড় মাংস-প্রিয়। পাখী টাখী ত আর আমার ঘরে চলিবে না!

মা পিতার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"কেন, আনাও না। তাহাতে

আর দোষ কি ? ম্লেচ্ছখাদ্য সবই যখন আনান হইতেছে, তখন পাখীই বা আর বাকী থাকে কেন ?"

পিতা ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিলেন—"তুমি অতি নির্ব্বোধ, আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। আজিকালি যেরূপ কাল পড়িয়াছে, আমাকে সেই কালের অনুরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ত!

মাতা। তা ব'লে কি জীবহত্যা করিয়া এই শুভ কর্ম্মের আরম্ভ করিতে হইবে ?

পিতা। আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না।

মাতা। তা ব'লে আমি একমাত্র ছেলের বিবাহে আশীর্ব্বাদের দিনে জীবহত্যা করিতে দিব না।

পিতা। তবে তোমাদের যা অভিরুচি তাই কর। আসল কথা, যদি পরিচর্য্যায় আমার একটুও নিন্দা হয়, তা হইলে আমি আর এ বাড়ীতে থাকিব না।

মাতা। নিন্দা কিছুই হইবে না ; তুমি কোথায় যাইতেছ, যাও। শুধু তাহারা কখন আসিবে, আর ক'জন আসিবে বলিয়া যাও।

পিতা। লোক আসিবে প্রায় দশ জন। তাহারা সন্ধ্যার পরে আসিবে। এদিকে হইতেও দশ বারজন লোক হইবে। তোমরা সর্ব্ব-শুদ্ধ ত্রিশজনের মত আয়োজন করিবে। এই কথা বলিয়া, যাহাতে তাঁহাকে নিন্দাভাজন না হইতে হয়, মাতাকে ও আমাকে সেইরূপ উপদেশ দিয়া পিতা চলিয়া গেলেন।

আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখন কি কর্ত্তব্য ?—এই ত পিতার কথা শুনিলে ?"

মাতা বলিলেন,—"নিন্দাই হউক, আর যাই হউক, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ত সে কার্য্য করিতে দিব না।" এ আশীর্ব্বাদের দিনে শুধু মিষ্ট-

মুখ করাই রীতি। কাটা জিনিষ হবে বলিয়া লোকে ফলমূল দিতেই সঙ্কুচিত হয়, আর আমি সেই শুভ আশীর্ব্বাদের দিনে জীবহত্যা করাইব? বিশেষতঃ মা লক্ষ্মী যখন আমার ঘরে আসিতেছেন!

"তা হ'লে আমি বাজারে যাইব না?"

"না—সে যা করিবার আমি করিতেছি। তোমাকে যা করিতে বলিলাম, তুমি তাই কর—শীঘ্র পুরোহিত ঠাকুরকে সংবাদ দাও।" আর যাইবার সময়ে হরিয়াকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও।"

"ভাল মাংস না আনি, শীলের বাজার হইতে তরি-তরকারী ও ফল আনি না কেন?"

এখন যাহাকে মিউনিসিপ্যাল বাজার বলে, সে সময়ে তাহা শীলের বাজার ছিল। হগ সাহেবের আমলে মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ এই বাজার কিনিয়া নিজেদের করিয়া লইয়াছেন। সাহেববিবিদের খাদ্য অধিকাংশ সেই বাজারে বিক্রীত হইত। মাঝে মাঝে অরুচি নিবারণের জন্য, আমরা এই বাজারের খাদ্যৌষধ কিনিয়া আনিতাম, মাতা তাহা জানিতেন। শীলের বাজারের নাম শুনিয়াই তিনি বলিলেন—"সে ম্লেচ্ছবাজারের একটী জিনিষও আমি আজ ঘরে ঢুকিতে দিব না।"

"তবে তুমি যা জান তাই কর।" এই বলিয়া আমি পুরোহিতকে ডাকিতে চলিলাম। প্রথমেই হরিয়াকে ডাকাইয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিলাম।

ঘর হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমাদেরই বাড়ীতে আসিতেছিল। আমাকে দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল,—"কি ভাই, আমাকে ডাকিতে যাইতেছ?"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

পুরো। তুমি যাইতেছ কি না বল না ?

আমি। যাইতেছি।

পুরো। আমার মা জননী ত তোমাকে পাঠাইয়াছেন ?

আমি। হাঁ, মা জননীই পাঠাইয়াছেন। এখন শীঘ্র মা জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

পুরো। আবার কত শীঘ্র সাক্ষাৎ করিব! তুমি আমার বাড়ীতে পৌঁছিবার মন করিতে না করিতে আমি তোমাদের বাড়ীতে উপস্থিত। খবর পাইয়াই আমি ছুটিয়াছি। বিছানা থেকে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিতে যা বিলম্ব হইয়াছে। এর চেয়ে আবার কত শীঘ্র হইবে ?

এ ব্রাহ্মণ বলে কি! এর মধ্যে কে তাহাকে সংবাদ দিয়া আসিল! মার শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমিও শয্যা ত্যাগ করিয়াছি। পুরুত-ঠাকুরকে সংবাদ দিবার কথা, তিনি আমাকেই সর্ব্বপ্রথমে বলিয়াছেন। অন্য কাহাকেও বলিলে, আবার আমাকে তিনি আদেশ করিবেন কেন ?

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম। ব্রাহ্মণ বিশেষ বয়োবৃদ্ধ ছিল না। তাহার উপর মূর্খ বলিয়া, আমি তাহাকে বিশেষ সম্মানের ব্যবহার দেখাইতাম না। বরং তাহাকে পাইলে, আমি ও আমার সহচরবর্গ তাহার উপাধি লইয়া রহস্য করিতাম। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে তাহাকে ভালবাসিতাম। ইদানীং পড়াশুনার ব্যাপার লইয়া তাহার সঙ্গে বড় দেখা শুনা হইত না। কিন্তু চোরবাগানে যখন ছিলাম, তখন নিত্যই সে আমাদের বাটীতে আসিত। এখন তাহার সহিত ব্যবহার অনেকটা সংযত হইলেও, পুরোহিতের ন্যায্য প্রাপ্য শ্রদ্ধার

অতি অল্পাংশই তাহাকে দান করিতাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এরই মধ্যে তোমাকে কে খবর দিল ?"

ব্রাহ্মণ আমার মুখের পানে চাহিয়া সহাস্যে মাথা নাড়িয়া লম্বমান শিখাগুচ্ছকে ললাটে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আবার কে দিবে ? মূর্খ দেখিয়া বামুনের ছেলেকে কৃপায় যে আশ্রয় দিয়াছে, সেই।

"আমার মা ?"

"আবার কে ! এত করুণা পৃথিবীতে আর কার আছে ?"

"কি ঠাকুর, তুমি কি সকলকেই তোমার মতন মূর্খ ঠাওরাইয়াছ ?"

"একজনকেও ঠাওরাই না। আমি জানি দুনিয়ায় আমার চেয়ে বড় মূর্খ নাই। তাতে আমার অহঙ্কার কত ? পণ্ডিতের পণ্ডিত আছে, কিন্তু আমার বড় মূর্খ নাই।"

"আমি আগে সেটা জানিতাম না। আজ জানিলাম।"

আমার এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির শব্দে পথে দুই চারিজন লোক জুটিয়া গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিল—"ভাই গোপীনাথ, বেশ করিয়া জানিয়া রাখ, আমি অতিমূর্খ, হস্তি-মূর্খ। আর এটাও জানিয়া রাখ, বড় বড় অধ্যাপকগুলা যেমন অতি পণ্ডিত বলিয়া অহঙ্কার করে, আমিও তেমনি অতি মূর্খ বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি। গোপীনাথ ! ভাগ্যে মূর্খ হইয়াছিলাম, তাই মায়ের আশ্রয় পাইয়াছি।

"পাইয়াছ, ভালই হইয়াছে। এখন সত্য করিয়া বল দেখি, কে তোমাকে সংবাদ দিয়াছে।"

"মূর্খ বটে, কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী নই। মা জননীই আমাকে খবর দিয়াছেন ! তবে তুমি যা আশঙ্কা করিতেছ, তা নয়। তুমি মনে করিতেছ, তোমার মা নিজে আমার চোরবাগানের বাড়ীতে গিয়াছেন !"

"তোমার কথার ভাবে তাইত বোধ হইতেছে।"

ব্রাহ্মণ জিব কাটিয়া বলিল—"আরে বাপ্, তাও কি হয়! রাজরাণী—এত চাকর দাসী ঘরে—এ সব থাকিতে, তিনি নিজে একটা সামান্য খবর পাঠাইতে আমার ঘরে যাইবেন কেন! মা স্বপ্নে আমাকে খবর দিয়াছেন।"

"হয়েছে, বুঝিয়াছি। যাও, মায়ের সঙ্গে দেখা কর।"

"স্বপ্নে মা আমাকে দেখা দিয়া বলিলেন—"

"বলিলেন যে, আমার বাড়ীর চালকলাগুলা—সব ইন্দুরে শেষ করিতেছে—তুমি শীঘ্র আসিয়া সে গুলার গতি কর।"

"আরে না ভাই তামাসা রাখ। রাখিয়া, কি বলি তা শুন।"

"যাঁও যাও, তোমার পাগলামী কথা আর কি শুনিব!"

"শুনিবে বই কি, তোমাকে না শুনাইলে যে আমার সুখ হইতেছে না। এ কথা যাকে তাকে বলিবার নয়। বলিতে পারিতেছি না বলিয়া আমার পেট ফুলিতেছে।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আনুপূর্ব্বিক তাঁহার স্বপ্ন কথা আমাকে শুনাইল। শুনিয়া বুঝিলাম, ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে দেখা দিয়া মা তাহাকে আমাদের ঘরে লক্ষ্মী দেবীর আগমনের সংবাদ দিয়াছেন। আর অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে, যিনি আমার মা তিনিই লক্ষ্মী।

স্বপ্ন—স্বপ্ন! স্বপ্নের জ্বালায় আমি এতই অস্থির হইয়াছি যে, সে কথা যে ব্যক্তি বলে, ইচ্ছা হয়, তাহাকেও পর্য্যন্ত গোটাকতক রূঢ়বাক্য শুনাইয়া দিই। পুরোহিত ঠাকুরের উপরও পরুষ বাক্য প্রয়োগের ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাকে কোন কটুবাক্য বলিলে স্বপ্ন বেটাকে ত দেশ ছাড়া করিতে পারিব না! এই মনে করিয়া আমি তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, কেবলমাত্র বলিলাম—"মাকে বলিও, ডাক্তারবাবু আসিয়াছেন কিনা আমি জানিতে চলিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ বলিল,—"তোমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। আমি পথে আসিতে আসিতে দেখিলাম, ডাক্তারবাবু কোথা হইতে গাড়ী করিয়া আসিতেছেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী। আমি তোমাদের বাড়ী আসিতেছি বুঝিয়া, তিনি আমাকে বলিলেন 'গোপীনাথের সহিত দেখা করিয়া বলিও, সে যেন বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও না যায়। আমি একটু পরেই তাহার সহিত দেখা করিতেছি'।"

আমি। তবু আমি যাইব।

পুরো। তিনি যখন নিজে আসিতেছেন, তখন তুমি যাইবে কেন?

আমি। আমার খুসী।

পুরো। খুসী ত যাও।

এই কথার পর পুরোহিত আমাদের বাড়ীতে চলিয়া গেল; আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম। যে দুই চারিজন পথিক চূড়ামণির হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া, সেইখানে আসিয়াছিল, তাহারা তাহার ভাবভঙ্গীতে তাহাকে পাগল মনে করিয়া নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

পরিত্যক্ত মন্দির।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় আমি লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিতাম। আমাদের গ্রামখানি লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী হইলেও সহরের কোলাহল তাহার পবিত্রনিস্তব্ধতা ভঙ্গকরিতে সাহসী হয় নাই—সে গ্রামের মধুরতা ও শান্তি সন্দর্শনে, তাহা বাণিজ্য কোলাহলময়ী নগরী হইতে বহুদূরে স্থাপিত বলিয়া বোধ হইত। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামখানির ও বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—আমাদের সেই গ্রাম্য 'মেঠো' রাস্তার পরিবর্ত্তে সুবৃহৎ রাজপথ—তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাহার স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করিয়াছে, একটী নূতন রেলওয়ে ষ্টেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়া লণ্ডনের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এখন আর তাহার সেই প্রান্তস্থ বিপণি নাই—যথায় সন্ধ্যার পর গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া আপন আপন সুখ দুঃখের কথা কহিয়া নির্ম্মল আমোদ উপভোগ করিত। সেই প্রকাণ্ড "এল্‌ম"তল—যেখানে শান্তির প্রতিমূর্ত্তি বালক বালিকারা বৈকালিক ক্রীড়ার আত্মহারা হইত।—হায়! সেই মনোরম হৃদয়ানন্দদায়ক দৃশ্যের পরিবর্ত্তে সহরের এই তীব্রতা কি ভয়ানক! জানি না আমাদের গ্রামের পুরাতন অধিবাসীরা বর্ত্তমান সহরের কোলে কি সুখের ও সুস্থতার সহিত বাস করিতেছেন।

সেই গ্রামে অবস্থিতিকালে আমি আমাদের জেলার ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত পরিচিত হই এবং তাঁহাকে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি খুব আনন্দসহকারে আমার ইচ্ছার অনুমোদন করেন এবং আমাকে শিশুপ্রিয় দেখিয়া একজন শিক্ষকের পদ প্রদান করেন। কিছুদিন পরে তাহার Sunday Schoolএর তত্ত্বাবধায়ক

নিযুক্ত করিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করেন। যাহা হউক সুখের কি দুঃখের বিষয় বলিতে পারি না—শেষোক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া গ্রাম্য যুবকবৃন্দের সহিত বিশেষতঃ আমাদের গীর্জ্জার যুবক গায়কবৃন্দের সহিত আমার পরিচয়ের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে দুই সহোদর লিওনেল্ ও এড্গার আমার নিকট গীতবাদ্যাদি শিক্ষার ইচ্ছা করে। আমিও তাহাদিগের আগ্রহ দেখিয়া আমার বাটীতে যাইবার কথা বলি। আমার কথায় তাহারা সম্পূর্ণভাবে সম্মত হয় এবং এইরূপে আমাদের সম্বন্ধ অতীব দৃঢ়তর হইয়া উঠে।

আমার জীবনের এই সময়ে আমি অলৌকিক ঘটনারাজীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলাম। শীঘ্রই বুঝিতে পারি যে, এই দুই বালক মাধ্যমিক (Physical medium) হইবার বিশেষ উপযুক্ত। সুতরাং শীঘ্রই আমি তাহাদিগকে লইয়া, গীতবাদ্যাদি শিক্ষা দিবার পর দুই একটী অধিবেশন করি। এই সমস্ত অধিবেশনে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনাসমূহের বিকাশ পায়। অপ্রয়োজনীয়তা হেতু, এবং আমার বক্ষ্যমান্ ঘটনার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া সে সমস্ত এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। আমাদের অধিবেশনের পর আমি আমার ছাত্রদ্বয়কে তাহাদের বাটীতে রাখিয়া আসিতাম। তাহাদের বাটী আমাদের বাটী হইতে এক মাইল।

একদিন আমাদের অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে ; যুবকদ্বয়ও তাহাদের বাটী চলিয়া গিয়াছে। আমি আমার পাঠাগারে বসিয়া লিখিতেছি, এমন সময় একটী ঘটনাতে আমার মন আকৃষ্ট হইল। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি এই ঘরেই আমাদের অধিবেশন হইত। আমি প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনের পরই গৃহস্থিত আসবাব সমূহের সামান্য চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতাম। কিন্তু সে দিন একটু বিশেষত্ব লক্ষিত হইল—দেখিলাম আসবাবপত্রগুলি মৃদু মৃদু সঞ্চালিত হইতেছে। আমি এ সমস্ত লক্ষ্য করিয়াও সে বিষয়ে মনো-

যোগ দিলাম না। আমার লেখাতেই ব্যাপৃত রহিলাম। রাত্রি দুইটা, হঠাৎ আমার মনে এক অভিনব ইচ্ছার উদয় হইল—আমার শয়ন গৃহ নিকটেই ছিল, ইচ্ছা হইল একবার শয়নগৃহে যাইতে হইবে :—কেন যে ইচ্ছা হইল তাহা বলিতে পারি না—ইচ্ছার দমনের চেষ্টাও করিলাম না—চক্র-চালিতবৎ শয়নগৃহ অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। আমার বোধ হইল, যেন আমার অজ্ঞাতসারেই আমি লেখনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলাম।

শয়নকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। দেখিলাম কক্ষের দ্বার হঠাৎ উদ্ঘাটিত—শুভ্র আলোকে ঘরটী আলোকিত! আমার বেশ স্মরণ হইল, তাহার পূর্ব্বে সে গৃহে আলোক দেখি নাই। ত্বরিত পাদ-বিক্ষেপে সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। দ্বার ঠেলিয়া অর্থ পূর্ণদৃষ্টিতে কক্ষ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলাম।

কি দেখিলাম! সে দৃশ্যে আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল! আমি সংজ্ঞাহীন জড়ের মত একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঘরের ভিতর কোন আলোকাধার দেখিতে পাইলাম না, তবুও ঘরটী শুভ্র-আলোকে উজ্জ্বলিত, প্রত্যেক দ্রব্যই সুস্পষ্টরূপে নয়নগোচর হইতে লাগিল। আমার পরিচিত আসবাব পত্র যথাস্থানে রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আমার দৃষ্টি শয্যার উপর পতিত হইল। কি আশ্চর্য্য! যে লিওনেল্‌কে আমি পাঁচ ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মাতার গৃহে দিয়া আসিয়াছি, সেই আমার শয্যায় শয়ান! আমি আমার নয়নকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, কম্পিত হস্তে চক্ষু মুছিলাম—পুনরায় দেখিলাম লিওনেল্ নিস্পন্দভাবে আমার শয্যায় শায়িত। এখনও লিখিবার সময় তাহার সেই মূর্ত্তি আমার মানসপটে চিত্রিত।

বলিতে লজ্জা করে, এই দৃশ্য দেখিয়া প্রথমে ইচ্ছা হইল, সেই ঘর হইতে পলাইয়া আমার একমাত্র আশ্রয় স্থান লাইব্রেরী ঘরে আশ্রয় লই। কিন্তু রণে ভঙ্গ দিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না—নিজেই নিজেকে উৎসাহিত করিলাম এবং সাহসভরে খাটের নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু মূর্ত্তির কোনই পরিবর্ত্তন হইল না—বেশ চিনিতে পারিলাম আমার সম্মুখে লিওনেল্! তাহাতে আর আমার কোন সন্দেহ রহিল না। তাহার হাত দুইখানি বক্ষের উপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত—চক্ষুদ্বয় যথাসাক্ষাৎ বিস্ফারিত—আমার উপর সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত—চাহনীটি উদাস! আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাহার চক্ষু দুইটী সমাধিস্থের চক্ষুর ন্যায় লক্ষ্যহীন। সে যে ভাবে আবিষ্ট ছিল, প্রসিদ্ধ সম্মোহনকারগণও তাঁহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীনে মাধ্যমিক (Medium)কেও সেরূপে আবিষ্ট করিতে পারে না।

আমি বহুক্ষণ তাহার চক্ষুর প্রতি চাহিয়া রহিলাম—কিন্তু তাহাতে সামান্যও চাঞ্চল্য দেখিতে পাইলাম না। সে সেইরূপই—অচল—অটল—স্থির-লক্ষ্য! তাহার পরিধানে পুরোহিতদিগের পরিধানের ন্যায় সুবর্ণ-খচিত প্রান্তযুক্ত একরূপ পোষাক। এই সমস্ত লক্ষ্য করিয়া আমার মানসিক অবস্থা যে কিরূপ তাহার বর্ণনাতীত; কিন্তু সহজে অনুমেয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে, আমি নিদ্রিত। এই কথা স্মরণ হইবামাত্র উপন্যাস-বর্ণিত জাগরিত অবস্থার পরীক্ষার ন্যায় আমি নিদ্রিত কি না জানিবার জন্য হাতে 'চিম্‌টি' কাটিলাম। তারপর যাহা বুঝিলাম জাগরিত, তাহাতে আমি যে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ রহিল না। তখন সভয়ে খাটের পায়াটা আঁকাড়িয়া ধরিলাম, তারপর নিজেকে পুনরায় প্রোৎসাহিত করিয়া, আমার অনাহুত অতিথিকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু এ কি! যে মুহূর্ত্তে আমার মনে এই ইচ্ছা হইল—অমনি আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ

আবরণীর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল! আমার গৃহটী বৰ্দ্ধিতায়তন হইয়া ক্রমে ক্রমে আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল—আমি সেই অবস্থায় খাটিয়ার পায়া ধরিয়া দণ্ডায়মান!

তারপর দেখিলাম, আমরা এক নূতন স্থানে উপস্থিত হইয়াছি! আমরা এক প্রকাণ্ড পুরাতন মন্দিরের নাট-মন্দিরে সমুপস্থিত। মন্দিরটি প্রাচীন মিশর দেশীয় মন্দির বলিয়া অনুমিত হইল! চতুষ্পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম! ছাদটী এত উচ্চ যে—মন্দিরের দীপালোক সম্পূর্ণভাবে ছাদটীকে আলোকিত করিতে পারে নাই। আমি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলাম। প্রাচীর-গাত্রস্থ সুন্দর সুবৃহৎ কারুকার্য্য লক্ষিত হইল। তদুপরি খোদিত প্রতিমাগুলি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় উচ্চ! আমরা সেই মন্দিরের গৃহে সম্পূর্ণভাবে অসহায় অবস্থায় মনুষ্যসম্পর্কবর্জ্জিত! আমার দৃষ্টি আমার সম্মুখস্থ সঙ্গীর উপর ন্যস্ত!

তারপর যাহা ঘটিল—তাহার যথার্থ বর্ণনা আমার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও দুঃসাধ্য। আমার বেশ স্মরণ হয়, সে সময়ে আমার মনে পৃথিবীর দুই সুদূরবর্ত্তী স্থানের অসম্ভব সংযোগের চিন্তা উদিত হইয়াছিল। কিরূপে যে ইহা ঘটিতে পারে, সেই সন্দেহ-দোলায় আমি দোদুল্যমান। আমি মন্দিরাভ্যন্তরে নিওনেল্‌এর প্রতি দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া মনে মনে ঐ সকল কথারই আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলাম। শীঘ্রই সেই অবস্থায় থাকিয়াই আমি জানিতে পারিলাম, আমরা সেই মন্দিরেরই বহির্ভাগে অবস্থিত!! প্রকাণ্ড পশ্চিমমুখী তোরণ! মন্দিরের তুল্য বিস্তারে কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রায় পঞ্চাশ হাত সোপান অতিক্রম করিলে তবে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়। অস্তগমনোন্মুখ রক্তাক্ত রবিকরের প্রতিফলনে সেগুলি দীপ্তিমান্!

সে সব দৃশ্য হইতে নয়ন অপসারিত করিয়া আমার চতুর্দ্দিকে কোন বসতি বা আর কোন বস্তু আছে কিনা দেখিবার আশায় চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। যে আশায় চারিদিক অন্বেষণ করিলাম, তাহাতে আমাকে নিরাশ হইতে হইল। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর কেবল বালুকা-রাশি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল। আমার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আমরা এক অকল্পিতপূর্ব্ব বৃক্ষতলাদিশূন্য মরু-প্রান্তরে আগত। আমাদের নিকটেই তিনটি উচ্চ তালবৃক্ষ রহিয়াছে দেখিলাম। তাহা ব্যতীত আর কোন বৃক্ষাদি নয়নগোচর হইল না! আমরণ সেই অপার্থিব দৃশ্য আমার স্মৃতিপটে জাজ্জল্যমান্ থাকিবে—সেই অনন্ত-প্রসারিত বালুকাময় পীতবর্ণ মরু! সেই অজ্ঞাত প্রদেশস্থ তালবৃক্ষরাজী!! সেই রক্ততপন-কিরণ-স্নাত গগনস্পর্শী বিরাট গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিত্যক্ত মন্দির!

নিমিষের মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইল, পুনরায় আমরা মন্দিরাভ্যন্তরে!

প্রেতাত্মার আহার।

(সঙ্কলন)

চট্টগ্রামে হিন্দুদের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে, পরলোক গত ব্যক্তির আদ্যশ্রাদ্ধের দিন রাত্রে যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্যযোগে প্রেতের উদ্দেশে পুকুর পারে একটা ডালি দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, সেই এই ডালি দিয়া থাকে। শিকারপুর গ্রামে স্বর্গীয় অপর্ণাচরণ চৌধুরীর আদ্য শ্রাদ্ধের দিন তাঁহার শিশু পুত্র সারাদিনের ক্রিয়াকাণ্ডের পর ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যাকালেই ঘুমাইয়া পড়ে। তাঁহার এক জ্ঞাতি মৎস্য, মাংস পোলাউ, নানাবিধ তরকারী দধি, মিষ্টান্ন প্রভৃতির এক বিরাট ডালি যথা-সময়ে প্রেতের উদ্দেশে তাঁহাদের দীঘির পারে রাখিয়া আসেন। ঐরূপে

ডালি বাড়াইয়া মৃত ব্যক্তির নাম ধরিয়া ডাকিতে হয়। সাধারণতঃ ঐরূপে ডাকিয়া যাহারা ডালি দেয় তাহারা চলিয়া আসে, এবং পরদিন ডালির অন্নাদি সমস্তই কখনও বা অংশতঃ নিঃশেষ হইয়াছে দেখা যায়। ঐদিন অর্পণাচরণ চৌধুরীর প্রেতাত্মার উদ্দেশে যে ডালি দেওয়া হইয়াছিল পরদিন প্রাতে দেখা গেল তাহার একবিন্দুও নড়ে চড়ে নাই, অথচ ডালি বাড়াইবার পর রাত্রে প্রচুর বৃষ্টি হইয়াছিল। অর্পণাবাবুর শ্বাশুড়ী এ কথা শুনিয়া বলিলেন,—"জামাই আমার রাগ করিয়াছে, আমি বলি নাই তাই খায় নাই।" ছোট বেলা হইতে অর্পণাবাবু তাঁহার এই শ্বাশুড়ীকে (স্বর্গীয় অভয়াচরণ চৌধুরীর পত্নীকে) বড় শ্রদ্ধা করিতেন, ভয়ও করিতেন। তাঁহার কথা অর্পণাবাবু কখনো অগ্রাহ্য করিতেন না। তিনি ঐ দীঘির পাড়ে ডালির কাছে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা, সার জীবন কত কষ্ট করিয়া এত ধনসম্পদ্ রাখিয়া গেলে, কতদিন রাগ করিয়া আহার কর নাই, এখনও কি রাগের অন্ত হয় নাই? কাল আমি আসিয়া বলি নাই, তাই বুঝি তুমি কিছুই খাইলে না। তোমার শিশু পুত্র তোমাকে আহার না দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া কি রাগ করিয়াছ? বাবা এস, তোমার যা'ইচ্ছা কিছু খাইয়া যাও। তুমি যদি না খাও, তবে আমিও আজ না খাইয়া পড়িয়া থাকিব"—ইত্যাদি রূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে একটা কাল গরু সেখানে যে কয়জন দাঁড়াইয়া ছিলেন তাঁহাদের গা ঘেসিয়া ঐ ডালির কাছে গিয়া প্রথমে মাছের মুড়া, মাংস ও পোলাউ খাইতে আরম্ভ করে; দেখিতে দেখিতে কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাল, তরকারী, মিষ্টান্নাদি সমস্ত নিঃশেষ করিয়া ফেলে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্য-তীর্থ ও শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই প্রত্যক্ষ ঘটনার প্রমাণ।—"জ্যোতিঃ।"

অলৌকিক রহস্য।

৩য় সংখ্যা] চতুর্থ বর্ষ। [আশ্বিন, ১৩১৯।



স্বপ্ন-তত্ত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিদ্রাবস্থায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এই স্থূল মস্তিষ্ক চৈতন্যের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা অতি মৃদু স্পর্শ বা অতিক্ষীণ ধ্বনি বেশ অনুভব করিতে পারে। কেবল এই অনুভব করিয়াই ইহা নিশ্চিন্ত হয় না,—ইহা তিলকে তালে পরিণত করে। সেই সামান্য অনুভূতিকে বাড়াইতে বাড়াইতে, তাহাকে একটা মহা ব্যাপারে পরিণত করে। এই তত্ত্বটি বুঝিতে আমরা নিম্নে দুই একটি উদাহরণ দিতেছি।

উদাহরণ।

একজন স্বপ্ন দেখিল যেন তাহার ফাঁসি হইয়াছে। সে স্বপ্নে প্রকৃতই বন্ধনের যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিল। কেন যে এইরূপ ভীষণ স্বপ্ন দেখিল, এইটি নিরাকরণ করিতে যাইয়া দেখা গেল যে, তাহার পিরাণের কণ্ঠবেষ্টিকা তাহার গলদেশকে সজোরে চাপিয়া রহিয়াছে। নিদ্রিত আর এক ব্যক্তিকে একটি পিন্ (Pin) ফুটাইয়া দেওয়ায় সে স্বপ্ন দেখিল যে, দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে

আততায়ী তাহাকে ছুরিকা বিদ্ধ করিল। একজনকে সামান্য জোরে চিমটি কাটায় সে স্বপ্ন দেখিল যে, এক ভীষণ বন্য জন্তুর করাল কবলে সে পতিত হইয়াছে। ফরাশীস মরি সাহেব (Maury) সাহেব একটি সুন্দর স্বপ্নবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন,—

একদিন তিনি শয্যায় শায়িত ও নিদ্রিত আছেন। তাঁহার পালঙ্কের চতুর্দ্দিকে পিত্তলের বেষ্টনী। দৈবক্রমে তাঁহার শিরস্থ বেষ্টনীটি স্থানচ্যুত হইয়া তাঁহার গলদেশকে স্পর্শ করিল। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন সমস্ত ফরাসী দেশ ভীষণ বিপ্লব গ্রাস করিয়াছে। তিনি একজন তাহার অভিনেতা। শেষে বিপক্ষ পক্ষ গিলোটিনে (Guillotin) তাঁহার শিরশ্ছেদ করিল।

অপর একজন লিখিয়াছেন, "প্রতিদিন তিনি স্বপ্ন দেখিতেন যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিকট চীৎকার ও বজ্রের নির্ঘোষ হইতেছে। তিনি কিছুতেই প্রথম প্রথম ইহার কারণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই ; অবশেষে তিনি তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি প্রায় শয়নকালে তাঁহার কর্ণ পিধানের উপর সংন্যস্ত করিতেন। তিনি দেখিলেন তাহাতে একপ্রকার অস্ফুট মিশ্রিত (আবদ্ধ বায়ুর জন্য রুধিরের প্রবাহজনিত ইত্যাদি) শব্দ হইতেছে। তিনি স্থির করিলেন এই শব্দই স্বপ্নকালে ঐ মেঘগর্জ্জন-উৎপাদক। তিনি অন্যভাবে শয়ন করিয়া আর এইরূপ শব্দ অনুভব করিতেন না।"

বাহ্য উপায়ে স্বপ্ন দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার পরীক্ষা

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক সময় বাহ্য উপায়ে স্বপ্নাবস্থা আনিয়া স্বপ্ন-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রত্যেক বারেই যে এইরূপ স্বপ্নাবস্থা আনিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা নহে ; তবে তাঁহারা কখনও কখনও সমর্থও হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগের পরীক্ষার দুই একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একজন নিদ্রিত ব্যক্তির গলদেশে সহসা করাঘাত করিয়া তাহাকে জাগরিত করা হইল। সে জাগরিত হইবামাত্র তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, "তুমি কি কিছু স্বপ্ন দেখিতেছিলে?" জাগ্রৎ ব্যক্তি উত্তর করিল, হাঁ আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যেন আমি একব্যক্তিকে খুন করিয়াছি। তাহার পর আমি ধৃত হইয়া বিচারালয়ে আনীত হই। দেখিলাম সম্মুখে বিচারক, আমার বিচার হইতে লাগিল। সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। আমি অপরাধী প্রমাণিত হইলাম এবং বিচারক আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। আমি বধ্যভূমিতে নীত হইলাম। আমার গলদেশে গিলোটিনের ছুরিকা নামিল। ইহাতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

জারমাণী দেশীয় রিচার্স (Richers) সাহেব লিখিয়াছেন, একজন নিদ্রিত ব্যক্তিকে বন্দুকের শব্দে নিদ্রাভঙ্গ করাইয়া তাহার স্বপ্নের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। সে বলিল যে, সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যেন সে সৈনিকের কার্য্য করিত। অবশেষে কোনও কারণে সে স্বদেশত্যাগ করিয়া পলাতক হয় এবং নানারূপ কষ্ট সহ্য করে। পরে সে ধৃত হইল এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। দুর্গের সন্নিহিত ময়দানে সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া সে দণ্ডায়মান, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় একটি বন্দুক হইতে অগ্নিশিখা বাহির হইল, বন্দুকের শব্দ তাহার কানে প্রবেশ করিল। ইহাতেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।"

সাফেনস্ (Suffens) নামক একজন জারমান লেখক লিখিতেছেন, "বাল্যকালে, আমি এক শয্যায় ভ্রাতার সহিত নিদ্রিত আছি, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমি কোনও নির্জ্জন পথিমধ্যে বিচরণ করিতেছি। এমন সময়ে একটা বিকটাকার বন্যজন্তু আমাকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। আমি প্রাণপণে আত্মরক্ষার জন্য ছুটিতেছি, সেই পশুও আমার

পিছু পিছু ছুটিতেছে। অবশেষে আমি সম্মুখে সোপানরাজি দেখিতে পাইলাম এবং তাহার সাহায্যে উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু ভয়ে ও শ্রমে অভিভূত হইয়া আমি এক প্রকার চলচ্ছক্তিশূন্য হইয়া পড়িলাম। সেই ভীষণ জন্তু আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং আমার উরুদেশ আহত করিল। ইহাতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়; কিন্তু জাগরিত হইয়া দেখি যে, আমার ভ্রাতা আমার উরুদেশে চিম্‌টি কাটিয়াছে।

উপসংহার।

আমরা এইরূপে দেখিলাম যে, এক স্থূল দৈহিক মস্তিষ্ক স্বপ্ন চৈতন্যকে কিরূপ জটিল করে, আমরা দেখিলাম তাহা কিরূপ অতি সামান্য সাধারণ বিষয়কে অতিরঞ্জন করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে এক অভিনব উপন্যাস প্রস্তুত করে। এখনও আমাদিগের স্বপ্নোদ্ভাবক অন্যান্য কারণের কথা আলোচনা করা হয় নাই। আমাদিগের পিণ্ডদেহ কাম মন ইত্যাদির সহিত স্বপ্নচৈতন্যের কিরূপ সম্পর্ক এবং স্বপ্নবিষয়ক আরও অনেক কথা বলা হয় নাই। আমরা তাহা ধারাবাহিকক্রমে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

পিণ্ড দেহের মস্তিষ্ক।

আমরা পিণ্ড দেহের আলোচনা কালে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, স্থূল-দেহস্থিত (ভাণ্ড দেহস্থিত) মস্তিষ্ক অপেক্ষা ইহা কত অল্পতর কারণে বিকৃত হয়।* আমরা তথায় বলিয়া আসিয়াছি যে, জাগ্রৎ অবস্থায় চৈতন্যের যে বিকার দৃষ্ট হয় নিদ্রাকালীন বা স্বপ্নাবস্থায় তাহা অপেক্ষা অধিক বিকার হয়।† আমরা এইবার এই সত্যের অল্পাধিক বিশদভাবে আলোচনা করিব। নিদ্রাবস্থায় মানব চৈতন্য, সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করিয়া, স্থূলোপাধি হইতে নিষ্ক্রামিত হইলে, মানবের পিণ্ড দেহ তাহার ভাণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না; তাহা

* অলৌকিক রহস্য ৩য় বর্ষ ৯৪ পৃষ্ঠা।

† ঐ ৯৬ পৃষ্ঠা।

সাধারণতঃ ভাণ্ড দেহের সহিত জড়িত হইয়া থাকে। একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি।‡ জাগ্রৎ অবস্থায় মানব চৈতন্য যেইরূপ পিণ্ড দেহকে স্বায়ত্বে রাখে, নিদ্রাকালে তাহা উদ্‌গত হইলে, যে অতি ক্ষীণ চৈতন্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই দেহকে সেরূপ স্ববশে রাখিতে পারে না। অতএব নানা বাহ্য কারণে তাহা অভিপন্ন হয়।

অপরের চিন্তা স্রোত।

ইতি পূর্ব্বে কথিত § আমাদিগের নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে যদ্যপি একজন সূক্ষ্মদর্শী অবলোকন করেন, তাহা হইলে কি দেখিতে পান? অনন্ত চিন্তা স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে, নিদ্রিতের পিণ্ডদেহস্থিত মস্তিষ্ককে পর্য্যায়ক্রমে অধিকার করিতেছে, আবার সরিয়া যাইতেছে। প্রাবৃটের পূর্ণিমা রজনীতে গগনের যে সুন্দর দৃশ্য হয়, তাহার সহিত ইহার বেশ তুলনা হয়। গগনে বিক্ষিপ্ত অনন্ত জলদ-খণ্ড পবন-হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে পর্য্যায়ক্রমে আসে, ক্ষণিকের তরে অমৃত ধারা বর্ষী চন্দ্রমাকে আচ্ছন্ন করে, তাহার পর আবার অনন্ত গগনে ভাসিয়া যায়। নিদ্রিত ব্যক্তির ও ঠিক তাহাই হয়। সাধারণে মনে করিতে পারেন, এই যে নানাবিধ চিন্তা তরঙ্গাবলি, ইহারা সমস্তই নিদ্রিতের নিজের চিন্তা। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; কারণ যাহার সাহায্যে মানব চিন্তা করিতে সক্ষম হয় সেই মন, নিদ্রাকালে তাহার ভাণ্ড ও পিণ্ডদেহ সমন্বিত স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া উদ্‌গত হইয়া যায়। অতএব তখন আর স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার শক্তি পিণ্ডদেহস্থিত মস্তিষ্কে থাকে না। ইহারা তাহার নিজের চিন্তারাজি নহে। অপরের চিন্তাসমূহ যাহা সাধারণের অদৃশ্যভাবে মেঘ-খণ্ডের ন্যায় শূন্যে ভাসিয়া বেড়ায়, ইহারা তৎসমস্ত।

‡ ঐ ২য় বর্ষ ২৩৯ পৃষ্ঠা।
§ ঐ ৪র্থ বর্ষ ২৮ পৃষ্ঠা।

কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিতেছেন যে, ও আবার কি কথা? মানব চিন্তা কি কখনও ধূলি পটলের মত আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে? সত্য সত্যই চিন্তা গুলি বিশিষ্ট মূর্ত্তি-বিশেষ। তাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তবে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহারা গ্রাহ্য হয়, তাহা আমাদিগের এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কোনটিও নয়। ইহারা আমাদিগের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয় এবং সেই অনুভবকে দিব্যদর্শন বলে যাঁহারই দিব্য-দৃষ্টি বিকসিত হইয়াছে, তিনিই তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ-গোচর করিতে পারেন। পাইওনিয়র Pioneer পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব দক্ষ সম্পাদক স্বাধীনচেতা শ্রীযুক্ত এ, পি, সিনেট মহোদয়ের পূর্ব্ব-জীবনের সুকর্ম্মের ফলে তিনি এক মহর্ষির কৃপাপাত্র হইয়াছিলেন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ তাঁহাকে অনেক উপায়ে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন এবং কখন কখন পত্রিকাও লিখিতেন। সিনেট মহোদয় The occult world (আধ্যাত্মিক জগৎ) নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহাতে এইরূপ অনেক উপদেশ ও পত্রিকা সঙ্কলিত আছে। আমি পাঠকবৃন্দকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে শিক্ষাপ্রদ ও আশ্চর্য্যজনক অনেক কথা সন্নিবেশিত আছে। আমি সেই পুস্তক হইতে মহাপুরুষের একখানি পত্রের সার সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, মূল পত্রিকাখানিও পাদ-টিপ্পনিতে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। মহাপুরুষ লিখিতেছেন,—

চিন্তামূর্ত্তি বা কৃত্যা।

"মানবের মানসে উদিত ভাব, সূক্ষ্মলোকে প্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশক্তিশালী একটি প্রাণীরূপে পরিণত হয়। এই প্রাণীগণের জীবন-কাল তাহাদিগের স্রষ্টার চিন্তার একাগ্রতা ও তীব্রতার উপর নির্ভর করে। চিন্তা সৎ হইলে তচ্ছৃষ্ট মূর্ত্তি, সৎক্রিয়াশালী শক্তিমান বন্ধুরূপে এবং অসৎ চিন্তায় প্রসূত হইলে মানবের অনিষ্টকারী শত্রুরূপে বিচরণ করে। এই মহা-

শূন্যে আমরা অহরহঃ প্রতিমুহূর্ত্তে এইরূপ কতশত প্রাণী সৃষ্টি করিতেছি। আমাদিগের প্রত্যেক কামনা, প্রত্যেক আবেগ ও আসক্তি হইতে এক একটি চিন্তা মূর্ত্তি প্রসূত হইতে থাকে। মহাশূন্যে এইরূপ কি মহান্ প্রাণী স্রোত চলিতেছে; এবং তাহা কিরূপ চৈতন্য বিশিষ্ট স্নায়ুবান অপর প্রাণীর উপর প্রতিক্ষণে কার্য্য করিতেছে! ইহারা হিন্দুর কর্ম্ম ও বৌদ্ধের স্কন্দ। যোগী ইহাদিগকে সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় প্রসব করেন, অপর লোকে অজ্ঞাত ভাবে তাহা প্রসব করে।"*

ঋষি যাহা পত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যেন ভগবানের উক্তির প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। গীতায় আছে,—

"ভূত ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্ম সঙ্গিতঃ।"

---

*........."Because every thought of man upon being evolved, passes into the inner world, and becomes an active entity by associating itself, coalescing we might term it, with an elemental—that is, to any one of the semi-intelligent forces of the kingdom. It survives as an active intelligence—a creature the mind's begetting—for a longer or shorter period proportionate with the original intensity of the cerebral action, which generated it. Thus a good thought is *perpetuated* as an active, beneficient power, an evil one as a maleficient demon. And so man is eventually peopling his current in space with a world of his own, crowded with the offsprings of his fancies, desires, impulses and passions; a current which reacts upon any sensitive or nervous organisation which comes in contact with it in proportion to its dynamic intensity. The Buddhist calls this his *Scanda*; the Hindu gives it the name of *Karma*

The Occult world, page 30.

[ভূতদিগের ভাব (উৎপত্তি), উদ্ভব (বৃদ্ধি) কারক যে বিসর্গ, তাহাই কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বকথিত অসংখ্য জীবের উৎপত্তি হয় তাহাই কর্ম্ম। যেমন একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে অসংখ্য জীবভাবসম্পাদক সৃষ্টি-ব্যাপার তাহাই আদি-কর্ম্ম রূপে অভিহিত হয় বা তাঁহার সেই কল্পনা বা চিন্তা—"যথা পূর্ব্বং অকল্পয়ৎ"—যেমন আদি কর্ম্ম, সেইরূপ প্রত্যেক মানবের পূর্ব্বোক্ত জীবসৃষ্টি "কর্ম্ম" নামে অভিহিত হয়।]

শাস্ত্র পূর্ব্বকথিত মানব-চিন্তা-সৃষ্ট-মূর্ত্তিকে "কৃত্যা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কোথাও বা আবার তাহাদিগকে "যক্ষ দেবতা বিশেষ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত চিন্তা প্রসূত মূর্ত্তির এক একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণ ও আকার আছে। সূক্ষ্মদর্শী তাহাদিগকে দেখিতে পান। এইরূপে যাঁহারা এই সমস্ত সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারেন তাঁহারা কেহ কেহ তাহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, এবং অনেক স্থলে চিন্তামূর্ত্তির সুন্দর ও সুরঞ্জিত চিত্র সাধারণ সমীপে প্রচার করিয়াছেন। পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী এনি বেসেণ্ট মহোদয়া ও শ্রীযুক্ত লেড্ বিটার কৃত "Thought forms" (চিন্তামূর্ত্তি) নামক নানা চিত্রে বিভূষিত উপাদেয় পুস্তক পাঠ করিতে পারেন। তাহা হইলে এই সম্বন্ধের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন।

এই সমস্ত চিন্তামূর্ত্তি সাধারণতঃ মানব-নয়নের অগোচরীভূত হইলেও যজ্ঞের দ্বারা বা তীব্র ও একাগ্র চিন্তায় এই সমস্ত মূর্ত্তি এত স্থূলীভূত হয় যে, সাধারণ মানবও তাহাদিগকে কখন কখন দেখিতে পায়। প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার জন্য যজ্ঞের সাহায্যে যে সমস্ত "কৃত্যা" সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা সকলের স্থূল-চক্ষের গোচরীভূত হইয়াছিল। অলৌকিক রহস্যের পাঠক সূক্ষ্ম পদার্থ বা জীবের স্থূল আকার ধারণের অনেক উদাহরণ

পাইয়াছেন। ফরাসিস্ বিজ্ঞানাচার্য্যগণ চিন্তামূর্ত্তিকে স্থূলীকরণ করিতে যে প্রয়াস করিতেছেন এবং সে বিষয়ে, (ধন্য তাঁহাদিগের অধ্যবসায়), তাঁহারা কতদূর যে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়।



ঋণ-বন্ধন।

ত্রিশপেনীর জন্য।

পার্থশায়র মঠের পৌরহিত্য কার্য্যের ভার লইবার জন্য আমি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে এডিনবরা সহর পরিত্যাগ করি। পার্থ নামক ষ্টেশনে পৌঁছিবার পর (প্রেসবেটিরিয়ান দলভুক্ত) এনি সিমসন, একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমাকে ডাকিয়া পাঠান। তখন শুনিতে পাইলাম যে উক্ত স্ত্রীলোকটী প্রায় ৭ দিন পর্য্যন্ত একটী ধর্ম্মযাজক পুরোহিতের সহিত সাক্ষাতের জন্য বিশেষ ব্যগ্র আছেন। আমার নিকট তিনি কি প্রার্থনা করেন, এই প্রশ্নে বলেন যে, কোন একটী লোক আমার নিদ্রিত অবস্থায় প্রায় কয়দিন পর্য্যন্ত আসিয়া আমায় বড়ই কষ্ট দিতেছেন। ইহার পর আমি তাহাকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন "আমি প্রেসবেটিরিয়ান দলভুক্ত।" আমি একজন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পুরোহিত। আমার নিকট

---

*অলৌকি রহস্য ৩য় ভাগ ৩২৯ পৃষ্ঠা।

তাঁহার আসিবার আবশ্যক কি জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন যে, আমার নিদ্রাবস্থায় যে স্ত্রীলোকটী আমার নিকট উপস্থিত হইতেছেন তিনি আমাকে একটী পুরোহিতের নিকট যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আমিও সেই জন্য প্রায় ১ সপ্তাহ পর্য্যন্ত একটী পুরোহিতকে খুঁজিতেছি। ইহাতে আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম "কেন তিনি আপনাকে পুরোহিতের নিকট যাইতে অনুরোধ করেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন "তিনি কিছু ঋণী আছেন, আমার নিকট হইতে উহা লইয়া পুরোহিত মহাশয় তাহার উত্তমর্ণকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবেন।

"তিনি কত টাকার ঋণী ?"

"ত্রিশ পেণী মাত্র।"

"কাহার নিকট তিনি ঋণী ?"

"তাহা আমি জানি না।"

"তুমি কি নিশ্চয় বলিতে পার উহা তোমার স্বপ্নের খেয়াল নহে ?"

"ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন উহা স্বপ্ন নহে। মোটেই আমার বিশ্রামের উপায় থাকে না।"

"যে স্ত্রীলোকটী তোমার নিকট উপস্থিত হয় তুমি তাহাকে জান কি ?"

"আমি ব্যারাকের নিকট গরীবের মত বাস করি। অনেক সময় তাহাকে ব্যারাক হইতে যাতায়াতের কালীন দেখিয়াছি ও তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছি তাহার নাম সম্বন্ধে সে বলিয়াছিল যে, ম্যালর বলিয়া সে সাধারণের নিকট পরিচিত।

উক্ত স্ত্রীলোকটী (ম্যালর) সম্বন্ধে অনুসন্ধানে জানা গেল ঐ নামে একটী স্ত্রীলোক ব্যারাকে ধোপার কাজ করিত, কিন্তু কিছু দিন হইল মারা গিয়াছে। আরও অনুসন্ধানে জানিলাম যে, একটী মুদির নিকট হইতে সে

জিনিষপত্র আনিত। ঐ মুদীর খোঁজ পাইয়া, তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে উক্ত ম্যালর নাম্নী স্ত্রীলোকটীর বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সে খাতা খুলিয়া বলিল, তাহার নামে ত্রিশ পেনী পাওনা আছে। আমি এ প্রাপ্যটা মুদিকে দিলাম। মুদি তাহার ঐ খাতকের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানিত না, কিম্বা তাহার স্বভাব চরিত্রও বিশেষ অবগত ছিল না। কেবলমাত্র জানিত সে ব্যারাকেই থাকে। ইহার পর সেই প্রেসবিটীরিয়ান দল ভুক্ত স্ত্রীলোকটী আমার সহিত দেখা করিয়া বলিল এখন আর রাত্রে সে কোন উদ্বেগ ভোগ করে না।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরি।



পুনরাগমন।

ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে প্রবিষ্ট হইতেই দেখি, বেচু চক্ষু মুদিয়া একটা থেলো হুঁকায় তামাকু টানিতেছে। আমি প্রবেশ করিলাম, সে দেখিতে পাইল না। শান বাঁধান মেজের উপর জুতার শব্দ করিলাম, বেচু শুনিতে পাইল না। অথচ বেচু নিদ্রিত নয়। মস্তক অবনত করিয়া, মুদ্রিতচক্ষে, ধ্যানমগ্নের ন্যায় বসিয়া আছে। শুধু হুঁকার শব্দ তাহার জাগরণের সাক্ষ্য দিতেছে।

মনে করিলাম, বেচুকে একবার ডাকি; কিন্তু ডাকিতে কি জানি কেন আমার সাহস হইল না। তাহাকে সম্বোধন করিবার প্রতি চেষ্টায় আমার মনে হইতে লাগিল, আমি তাহারও কাছে যেন অপরাধী। আমি অগ্রসর হইলাম, তাহার ধূমপানের তন্ময়ত্বে আর বাধা দিলাম না।

দরজা অতিক্রম করিলেই দুই পার্শ্বের দুই ঘরের মধ্য দিয়া পথ চলিতে হয়। সেই পথ বহির্ব্বাটীর উঠানে যাইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বাবু নিজে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিলেও তিনি আমাদের মত পূর্ব্বে দরিদ্র ছিলেন না। তিনি বনিয়াদী ঘরের ছেলে। তাঁহার পৈত্রিক বাটী নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে বাটীর কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিত করিতে হয় নাই। তাঁহার পিতার আমলে বাড়ীটি যেমন ছিল, আজিও তেমান আছে। সম্মুখের দুইটী ঘর ও মধ্যস্থ পথের উপরে দ্বিতলে বারাণ্ডা যুক্ত নাচ ঘরের মত একটী বৈটকখানা। বৈটকখানাটী সুসজ্জিত হইলেও ডাক্তার বাবু তাহাতে কদাচ বসিবার অবসর পাইতেন। তিনি পিতার এক সন্তান, তাহার উপর তাঁহার গৃহে আত্মীয় কুটুম্বের বড় উৎপাত ছিল না। প্রাতঃকালের এক সময় ও বৈকালের এক সময় তাঁহার বহির্ব্বাটীতে রোগীর ভিড় হইত। অপর সময় বাড়ী একরূপ নির্জ্জন থাকিত। বাহিরে সর্ব্বদা থাকিবার মধ্যে থাকিত কম্পাউণ্ডার ও জন দুই ভৃত্য।

আজ সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার বাবুর বাড়ী লোকপূর্ণ বোধ হইল। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার পথে যে দুই ঘর, তাহার একটীতে কতকগুলি লোক বসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেক গুলি রোগী। সকলেই ডাক্তার বাবুর অপেক্ষায় নীরবে বসিয়াছিল। অন্য ঘরটীতে ডিস্পেন্সরী ; দ্বারে পরদা। সেই পরদার অন্তরালে, লোকচক্ষুর অগোচরে, বিধাতা পুরুষের মত কম্পাউণ্ডার মানুষের জীবন-মরণের সোণার ও রূপার কাটী লইয়া নাড়াচাড়া করিত। মধ্যে মধ্যে সেই কাটী ঠোকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত, এইমাত্র। কম্পাউণ্ডারকে কেহ কখন দেখিতে পাইত না।

সুতরাং ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে লোক সমাগমের নিদর্শনে আমি একটু বিস্মিত হইলাম। আমার মনে হইল, মাথার উপরে বৈটকখানার ঘরে

অনেক লোক চলাচল করিতেছে। ক্রমে ডাক্তার বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। সেই শব্দে কাহারও জন্য তাঁহার যেন একটা বিশেষ ব্যস্ততা বুঝিতে পারিলাম।

সদর দরজার পথ অতিক্রম করিলে আবার বারাণ্ডা। বারাণ্ডার পরেই সদর বাড়ীর উঠান। উঠানের পূর্ব্বদিকে পশ্চিমমুখী ঠাকুর দালান। পূর্ব্বে দালানে পূজা হইত। এখন ইহা গোলাপায়রার আবাস-ভূমি হইয়াছে।

পথ হইতে বারাণ্ডার উপর উঠিতে উভয় দিকেই সিঁড়ি। উপরে দ্বিতলে যাইতে হইলে, বামদিকের বারাণ্ডায় উঠিতে হয়। সেই বারাণ্ডার শেষে দ্বিতলে যাইবার পথ।

উপরে যাইয়া ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি বামের বারাণ্ডায় উঠিলাম। তাহার পর কিয়দ্দূর যাইয়াই উপরে যাইবার সিঁড়িতে পা দিলাম। দুই ধাপ উঠিতে না উঠিতে পশ্চাত হইতে কে যেন আমাকে উপরে উঠিতে নিষেধ করিল। কে কোথা হইতে কথা কহিল বুঝিতে না পারিয়া চারিধারে চাহিলাম। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আবার উঠিতে লাগিলাম। ইদানীং ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমাদের এতই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল যে, কাহাকেও কিছু না জানাইয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ হইত না।

এইখানে সর্ব্বপ্রথম আমি ডাক্তার বাবুর নাম আপনাদের কাছে প্রকাশ করিব। বহুকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গে আপনারা পরিচিত, আজিও পর্য্যন্ত তাঁহার নাম আপনাদের অজ্ঞাত থাকা শিষ্টতার পরিচায়ক নহে। কিন্তু কি করিব, এতকালের মধ্যে একটি দিনও তাহার নাম প্রকাশ করিবার সুবিধা পাই নাই। আমাদের বাটীর সকলেই—মাতা, পিতা, আমি, দাস দাসী সকলেই প্রথম পরিচয়ের দিন হইতে

আজিও পর্য্যন্ত তাঁহাকে ডাক্তার বাবু বলিয়া আসিতেছি। আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম। সুতরাং আমাদের কাহারও মুখ হইতে তাহার নাম শুনিবার অবকাশ ছিল না। তিনি বয়সে বিজ্ঞ, তাহার উপর পাণ্ডিত, সর্ব্বোপরি চিকিৎসা ব্যবসায়ে কলিকাতার মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রসার। বহু গৃহস্থের কাছে তিনি ধন্বন্তরি বলিয়া পরিচিত। যেখান হইতে যত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁহার গৃহে আসুন না কেন, তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকে, এমন ব্যক্তি আমি কখন দেখি নাই। আজ আমি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে শুনিলাম।

কাহারও নিষেধ বাক্য শুনিতে না পাইয়া, আরও দুইচারি ধাপ আমি উঠিয়াছি, এমন সময়ে আবার শুনিলাম—"বাবু, উপরে উঠিও না। উপরে জেনানা আছে।"

আমি বলিলাম, "কে তুই ? কোথা হইতে নিষেধ করিতেছিস্ ?"

উত্তর হইল, "ডাক্তার বাবুর নিষেধ। কেহই আজ এ পথ দিয়া উপরে যাইতে পারিবে না।"

আমি তাহাকে সম্মুখে আসিতে আদেশ করিলাম। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সিক্ত বস্ত্র নিঙ্‌ড়াইতে নিঙ্‌ড়াইতে এক কৃষ্ণকায় পুরুষ পশ্চিমদিকের বারাণ্ডা অবলম্বনে আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, লোকটা শৌচাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার পর পাতকুয়ার ধারে বস্ত্রধৌত করিতেছিল। আমি প্রথমে তাহার জানুদ্বয় দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই জানুদ্বয়ের সৌন্দর্য্যই তাহার মধুরমূর্ত্তি পূর্ণভাবে আমার কল্পনার চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘনকৃষ্ণ জানু দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন চিতার অনল হইতে উত্থিত অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ দুটা হাঁটিয়া আসিতেছে। লোকটা কাছে আসিতে, "একি ! কালু, তুমি !"

কালু বলিল, "বাবু ! তুমি উপরে যাইতেছিলে !"

"উপরে কে কে জেনানা আসিয়াছে কালু?"

"আর কেন বাবু, তুমি নিজেই যাও—দেখিয়া আইস। অন্য কেহ পাছে উপরে যায়, এইজন্য ডাক্তার বাবু তাহাকে নিষেধ করিতে আমার উপর হুকুম করিয়াছেন।"

এমন সময় উপর হইতে সম্বোধন ধ্বনি হইল—"হরিচরণ! একবার নীচে গিয়া দেখিয়া আইস ত। আমি যেন গোপীনাথের গলা পাইতেছি।"

কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম। কালুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার ঠাকুর দাদার গলা শুনিতেছি না?"

কালু বলিল, "জামাই বাবু, জামাই বাবুর বাপ, দুর্গা ও পিসিমা—এক আমাদের বাবু ছাড়া আর সকলে আসিয়াছে।"

শুনিবামাত্র আমার হৃৎপিণ্ড প্রবলবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শত চেষ্টাতেও আমি হৃদয় স্থির রাখিতে পারিলাম না। আমার সর্ব্বশরীর যেন নিস্পন্দ হইবার উপক্রম করিল। কালু নিম্নে দাঁড়াইয়া আমার পানে চাহিয়া আছে। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। বুঝিবা এই ভৃত্যটার সম্মুখে আমার দুর্ব্বলতা প্রকাশিত হইয়া, আমার সকল মর্য্যাদা নষ্ট হয়।

কিন্তু তাহা আর হইতে পাইল না। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী সত্বর উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। এবং আমাকে দেখিয়াই আগ্রহে আমার হাত ধরিলেন। শক্তিময়ীর করস্পর্শমাত্র আমার দেহের সমস্ত দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া গেল।

ডাক্তার বাবু নিজে বয়সে প্রবীণ হইলেও, তাঁহার স্ত্রী তদ্বৎ প্রবীণা ছিলেন না। ইনি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীকে আমরা দেখি নাই। আমাদিগের কলিকাতায় আসিবার তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার গর্ভের কোন সন্তান ছিল না বলিয়া, ডাক্তার বাবু দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। ইনি বয়সে ডাক্তার বাবু অপেক্ষা অনেক

ছোট। আমার চেয়ে চারি পাঁচ বৎসরের বড়। তিনি পূর্ব্বে আমার সঙ্গে কথা কহিতেন না। ক্রমে তাঁহার স্বামীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলে, আমার সহিত একটী আধটী কথা কহিতেন। তাহাও সসম্ভ্রমে। ডাক্তার বাবু আমার মাকে মা বলিতেন। সেই সূত্রে আমি তাঁহার দেবরের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে গোপীনাথ বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। কেবল তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র আমাকে 'কাকাবাবু' বলিয়া সম্বোধন করিয়া, তাহার পিতার সঙ্গে আমার ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধটা পরিস্ফুট রাখিত।

এইরূপ অবস্থায় ডাক্তার বাবুর স্ত্রী যে এত আত্মীয়তার উল্লাসে আমার হাত ধরিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। তিনি হাত ধরিবামাত্র উল্লাসের বিভিন্ন-মুখ স্পন্দনে আমার হৃদয়কে এক মুহূর্ত্তে প্রকৃতিস্থ করিল। অবসাদের পরিবর্ত্তে উল্লাসে আমি আকুল হইলাম। কিন্তু বিস্মিত হইলাম না। কেন না, দুইদিন পূর্ব্বে ডাক্তার বাবুর আচরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী কোনও কথা না কহিয়া, সুধু হাত ধরিয়া ঈষৎ স্মিতমুখে একবার আমার পানে চাহিয়া, আমাকে উপরে লইয়া চলিলেন।

শেষের সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া, উপরের বারাণ্ডায় পা দিবামাত্র ডাক্তার বাবুর স্ত্রী আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন; এবং বলিলেন, "ঠাকুর পো, একবার দাঁড়াও; আমি মনে করিলাম, বোধ হয় দুর্গার পিসি ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে আগে হইতে সাবধান করিবার জন্য, তিনি আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছেন। গোপালের অনুসন্ধানে যে সময় দুর্গার পিতামহের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, সেই সময় তাঁহার ভৃত্যের মুখে বাড়ীর আব্রুর কথা যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার মনে উক্তরূপ সন্দেহ স্বতঃই উপস্থিত হইল।

তাহার আদেশমাত্র আমি দাঁড়াইলাম। কিন্তু তিনি কোথাও না গিয়া গলে অঞ্চল সংলগ্ন করিলেন, এবং আমাকে ভূমি সংলগ্ন হইয়া প্রণাম করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "অন্য সময় হইলে বউদিদি, আপনার এই আচরণে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। ডাক্তার বাবু আগে হইতেই আমার বিস্ময়ের ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তবে বলিয়া রাখি, আজি যা করিবার করিয়া লইলেন বারংবার এরূপ করিলে, আমি আর আপনাদের ঘরে আসিব না।"

তখন বারাণ্ডায় কেহই ছিল না। বিস্ময়ের কারণ না হইলেও, কেহ সেখানে সে সময় থাকিলে, তাঁহার আচরণে আমাকে বড়ই লজ্জিত হইতে হইত। প্রণামান্তে তিনি দাঁড়াইলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহারও মুখ ডাক্তার বাবুর মুখের মত সহসা অপূর্ব্ব পবিত্র সৌন্দর্য্যে আবৃত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমি কি আচরণ করিয়াছি ?"

"এই যে পুত্রতুল্য আমাকে প্রণাম করিতেছ !"

"একি বেশি করিয়াছি ?"

"আমি তোমাদের স্বামী স্ত্রীর ব্যবহারে বড়ই বিপন্ন।"

"আমার স্বামী যদি সারাজীবন তোমার পায়ের কাছে পড়িয়া থাকেন, তথাপি তোমার যোগ্য মর্য্যাদা দেখাইতে পারিবেন না।"

"আমি আপনাদের কি যে করিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

"ঠাকুর পো, তুমি অন্য কিছু মনে করিয়ো না। তোমার কৃপায়, তোমাকে যদি কোনও দিন বুঝাইতে পারি তুমি কি করিয়াছ, তাহা হইলে আমরা জীবন ধন্য মনে করিব।"

এই বলিয়া, তিনি আমাকে সঙ্গে চলিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "ভিতরে সকলে অপেক্ষায় আছেন, আর কালবিলম্ব করিয়ো না।"

"বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, খুল্ল-পিতামহ একটী গালিচার আসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই দিকে মুখ করিয়া ডাক্তারবাবু মেজের উপর উপবিষ্ট। তাঁহারা দুইজন ছাড়া, আর কাহাকেও সে ঘরে দেখিলাম না।

প্রবেশমাত্রই খুল্ল-পিতামহ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এস ভাইজীউ।"

আমি তাঁহার সমীপস্থ হইয়াই তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন, "বসিবে কি? না, বিশেষ ব্যস্ততা আছে?"

আমি কোনও উত্তর না করিয়া ডাক্তার বাবুর পার্শ্বে উপবেশনের উদ্যোগ করিলাম। তাঁহার স্ত্রী সত্বর একখানা আসন সংগ্রহ করিয়া, আমাকে বলিলেন, "এই আসনে বস।"

আমি বসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি জেদ ধরিলেন। ডাক্তার বাবু নীরব। তিনি কেবল আমাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পরের জেদ বজায় রাখিবার চেষ্টা দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রী বসিবার মুখে আমার হাত ধরিয়া আমার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। দাদামহাশয় বলিলেন, "ব'সহ না ভাই! উহারা তোমাকে ভূমিতে বসিতে দিবে কেন?"

অগত্যা আমাকে আসনে উপবেশন করিতে হইল। আমি বসিতেই, তিনি আমাদের গৃহের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রথমে পিতার কথা। বলিলেন, "রাধানাথ কেমন আছে?"

আমি বলিলাম, "ভাল।"

"আমার বোধ হয়, সে তাহার অসুখ বুঝিতে পারে নাই। যখন জাগিয়াছে, তখন সে আপনাকে সুস্থই মনে করিয়াছে।"

"একেবারে সুস্থ মনে করেন নাই। রোগমুক্ত হইবার পরে অনেকক্ষণ

পর্য্যন্ত তিনি দুর্ব্বল ছিলেন। তবে কি অসুখ হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।"

"যাক্, মা ভবানী সেদিন যে মুখ রক্ষা করিয়াছেন, এই আমাদের যথেষ্ট। নতুবা তোমাদের আর আমি মুখ দেখাইতে পারিতাম না।"

"সেদিন মনের আবেগে, আমি আপনার যথেষ্ট অমর্য্যাদা করিয়াছি।"

"কিছুই কর নাই। সেরূপ বিপদে কয়জন মাথা ঠিক রাখিতে পারে ?"

"আপনি আমাকে দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।"

"তুমি কিছুই কর নাই ভাই ! আমিই বরং সে সময় তোমাদের রূঢ় কথা বলিয়াছিলাম। সে কথা যাক্। শুনিয়াছিলাম, তুমি গোপালের অনুসন্ধানে মুখুজ্জে মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলে। হরিচরণ তোমার আগমনবার্ত্তা আমাকে জানাইয়াছিল। কিন্তু আমি একটা দৈবকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম বলিয়া, তোমার সহিত দেখা করিতে পারি নাই।"

"আমি শুনিয়াছি।"

এই সময়ে সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী তাই শুনিয়া বলিলেন, "বাবা ! আমাকে অনুমতি করুন।"

ছোট ঠাকুরদাদা বলিলেন, "আর তোমার থাকিবার প্রয়োজন নাই। বোধ হয়, কেহ এখানে আসিতেছেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "কালুকে সিঁড়ির মুখে বসাইয়া আসিয়াছি। অন্য কেহ আসবে না। পদশব্দে বুঝিতেছি, সতীশ বাজার করিয়া ফিরিতেছে।"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে, বাহির হইতে সতীশ তাহার মাকে ডাকিল। তাহার জননীও সত্বর গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

পিতামহ ডাক্তার বাবুকে বলিলেন, "আর কেন বসিয়া হরিচরণ,

তুমিও যাও। অনেক রোগী ব্যাকুল হইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে।”

এই সময়ে বারাণ্ডায় আবার লোক কোলাহল উঠিল। একটা কুলী এই সময়ে দরজা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিল, “বাবু! সব ঠিক করিয়া দিয়াছি।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন, “সকলে নীচে যা। সেইখানে পয়সা দিতে বলিয়া দিতেছি।

কুলীটা মাথায় হাত ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, “বাবু, কিছু বক্সিস দিতে হুকুম কর। বড় মেহনত হইয়াছে।”

ডাক্তার বাবু বলিলেন, “এখানে গোল করিসনি, নীচে যা।”

মুটেরা গোল করিতে করিতে নীচে চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবুও গৃহত্যাগ করিলেন। বাড়ীতে যখন প্রথম প্রবেশ করি, তখন উপরে লোকের গোলমাল শুনিয়াছিলাম। কিন্তু উপরে আসিয়া সমস্ত নিস্তব্ধ দেখিয়া আমার বিস্ময় হইয়াছিল। এখন বুঝিলাম, মুটেরা বৈটকখানার কাজ সারিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়াছিল। কালুর কাছেও শুনিলাম, কেবল মুখুজ্জে মহাশয় আসেন নাই, আর সকলেই আসিয়াছে। কিন্তু এক ছোট ঠাকুদা ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে এখনও পর্য্যন্ত দেখা হইল না। যে গোপালকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল, তাহার আগমনের নিদর্শন এখনও পাইলাম না।

সে ঘরে এখন আর কেহই রহিল না। রহিলাম আমি, আর আমার সম্মুখে খুল্ল-পিতামহ। প্রশান্তমুখে কি যেন কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকা লুকাইয়া, তিনি অতি মধুর কথায় আমার সহিত আলাপ করিতে ছিলেন। আমি তাঁহার কথার উত্তর দিতেছিলাম। কিন্তু প্রতি কথার সঙ্গে সেই অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার অনুরূপ, আমার বোধের সম্মুখে পূর্ণাবগুণ্ঠিত ভয়

আমার বুকটাকে থাকিয়া থাকিয়া স্পর্শ করিতেছিল। এতক্ষণ ডাক্তার বাবু ও তাঁহার স্ত্রী নিকটে থাকায় আমার অনেকটা সাহস ছিল। তাঁহারাও চলিয়া গেলেন, আমারও ভয় বাড়িয়া উঠিল।

ভয়ের আর একটা কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। এবারে সর্ব্বপ্রথম খুল্লপিতামহকে গৈরিকবস্ত্র পরিহিত দেখিলাম। যদিও গাঢ় নয়, তথাপি বস্ত্রের সেই বর্ণ, স্মৃতিতে অলসভাবে অবস্থিত অনেক গুলা পূর্ব্বঘটনাকে যুগপৎ স্পন্দিত করিয়া তুলিল। সেই গৈরিকধারিণী কপালিনীকে মনে পড়ল। পিতামহের কুম্ভক ভাগীরথীর লালজলে কুম্ভের মত ভাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে ভাসিল, তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্যশীল, কপালিনীর সেই বিকট হাসি।

আমার চক্ষুচাঞ্চল্য পিতামহ বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি কি যাইতে ইচ্ছা কর।"

আমি মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া বলিলাম, "আমি মায়ের কাছে অল্পক্ষণের জন্য বিদায় লইয়া আসিয়াছি।"

"গোপালের সঙ্গে দেখা করিবে না?"

"গোপাল কোথায়?"

"এইখানেই আছে। একটু অপেক্ষা কর, ডাক্তার বাবু ফিরিলেই তাহার সঙ্গে দেখা হইবে।

"ডাক্তার বাবুকে রোগী দেখিয়া ফিরিতে হইলে অনেক বিলম্ব হইবে। বাড়ীতে বিশেষ কাজ রহিয়াছে। আমি ততক্ষণ কি বিলম্ব করিতে পারিব?"

আমার এই উত্তর শুনিয়া পিতামহ ক্ষণেক নীরব রহিলেন। তারপর আমার মুখের পানে একবার চাহিলেন। দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাসিকা হইতে একটী দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল। আমি দেখিলাম, তাঁহার সদা

প্রফুল্ল মুখে সহসা একটা ক্ষীণ মালিন্যের আচ্ছাদন পতিত হইল। আমি বুঝিলাম, আমার হৃদয়হীনের উত্তরই তাঁহার এই ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ। এইজন্য আমি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলাম, "দাদা মহাশয়, আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি মাতৃ কর্ত্তৃক একটা কার্য্যে আদিষ্ট হইয়াছিলাম। সেই কার্য্যটা পথের মধ্যেই নিষ্পন্ন হওয়ায়, আমি পথ হইতেই এখানে আসিয়াছি। মায়ের সঙ্গে আর দেখা করিবার অবকাশ পাই নাই। আপনারা যে এমন সময় এখানে আসিবেন, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। তা জানিলে, প্রস্তুত হইয়া আসিতাম। পিতা বাড়ীতে নাই, মা একা—আমি কোথায় আছি তিনি জানেন না। বাড়ীতে রাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা আছে।" সত্যের অর্দ্ধেক কহিয়া অর্দ্ধেক তাঁহার কাছে গোপন করিলাম। বিবাহের পাকা দেখার কথাটা তাঁহার কাছে তুলিতে সাহস করিলাম না। তাহার পর বলিলাম, "আমি মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া—যদি অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন না থাকে, আপনার কাছে ফিরিতেছি।"

ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ভাল, তা হ'লে এখন তুমি আসিতে পার। কিন্তু হরিচরণ না আসিলে গোপালের সঙ্গে তোমার দেখার সুবিধা হইবে না। গোপাল অসুস্থ। সে বাড়ীর ভিতরের কোন গৃহমধ্যে এখন অবস্থান করিতেছে, আমি জানি না। হরিচরণ তাহাকে লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছে। তোমাকে দেখিলে তাহার অতি উল্লাস হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্যই আমি নিজে তোমাকে গোপালের সঙ্গে দেখা করাইতে সাহস করিতেছি না।"

"গোপাল অসুস্থ! তবে আমি তাহাকে না দেখিয়া যাইব না।"

"না, যাইবার যখন মনন করিয়াছ, তখন যাও। তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া, অবকাশ পাইলে আসিতে পার। তবে, যাইবার পূর্ব্বে

একটা কথা শুনিয়া রাখ। তুমি আমার কাছে কিছুমাত্র সঙ্কোচ দেখাইয়ো না। তুমি গোপালের চেয়ে অধিক প্রিয় বলিলে মিথ্যা হয়, তবে এইটী জানিয়ো, তুমি গোপাল হইতে কোনও অংশে আমার কম স্নেহের পাত্র নও। আমিও গোপাল উভয়েই তোমাদের কাছে ঋণী। বালক! তুমি তোমার স্তায্যপ্রাপ্য মাতৃস্তন্যের অংশ দিয়া গোপালকে রক্ষা করিয়াছ।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "ও কথা আপনি মুখেও আনিবেন না।"

আমার বাধা না মানিয়া আবেগভরেই তিনি বলিতে লাগিলেন— "গোপীনাথ! বাল্যের অবস্থা তোমার কিছু স্মরণে আসে কি?"

আমি বলিলাম—"আসে।"

"সেই ক্ষুদ্র পল্লীর অরণ্য বেষ্টিত পর্ণকুটীর কয়খানি এখনও কি তোমার মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"তোমার পিতামহকে মনে পড়ে?"

"কই, মনে পড়ে না।"

"তুমি তখন নিতান্ত শিশু। দুই বৎসরের বালক। আমার জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর হইতেই আমাদের অবস্থা হীন হইয়া আসে। দাদার শেষ জীবনেই দারিদ্র্য আমাদের ঘরের কোণে উঁকি মারিতেছিল। কিন্তু তিনি, কর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ; তাঁহার জীবদ্দশায় গৃহের ভিতরে দারিদ্র্যকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তোমার মা যেমন গোপালের মা, তোমার পিতামহী সেইরূপ আমার মা ছিলেন। তাঁহার সে মূর্ত্তি দেখিলে লক্ষ্মী দূরে পলাইত। মা আমার সতী, স্বামীকে মরণাপন্ন দেখিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুকে ডাকিয়া স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাঁচখানা গ্রামের লোক শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিল।"

"সেটা আমার যেন অল্প অল্প মনে পড়ে। সে দৃশ্যের অতি সামান্য স্মৃতি ক্ষীণছায়ার মত আমার মনে যেন অঙ্কিত আছে।"

"মনে না থাকাই সম্ভব। তবে নাকি তোমাদের দুই ভাইকে দুই কোলে লইয়া তোমার মাতা সেই শ্মশান ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। দুই বৎসর বয়সের দৃষ্ট ঘটনা, কচিৎ দুই একজন স্মরণে রাখিতে পারে। যথার্থই গোপীনাথ, দুই বৎসর বয়সের ঘটনা তোমার যদি স্মরণে আসে তাহা হইলে তুমি ধন্য।

"যাক্, কি বলিতে কি বলিতেছি। শুন, আমরা পিতাপুত্রে উভয়েই তোমাদের বংশের কাছে জীবন ভিক্ষা পাইয়াছি। আমার ভ্রাতৃজায়া এক সদ্যোজাত মাতৃহীন শিশুকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। গোপালেরও ভ্রাতৃজায়া গোপাল সম্বন্ধে তাহাই করিয়াছিলেন। তাই কেন গোপীনাথ, সত্য যদি বলিতে হয়, এই করুণার কার্য্যে আমার মা হইতে তোমার মায়ের গৌরব অধিক। কেন, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ। আমি তোমার পিতার পিতৃব্য, কিন্তু গোপীনাথ, গোপাল তোমার আপনার খুড়া নয়, জ্ঞাতি। তথাপি শুন ভাই, তুমিই আমাদের পিতাপুত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উত্তমর্ণ।"

খুল্ল পিতামহের এই অসম্ভব সুখ্যাতি আমার শ্রুতি সুখকর না হইয়া, ক্রমে আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে লাগিল। আমার মনে হইল, ছোট ঠাকুরদাদা স্তুতিচ্ছলে আমাদের পিতাপুত্রের নিষ্ঠুর আচরণের উপর ব্যঙ্গ করিতেছেন। আমি উঠিবার উদ্যোগ করিতে করিতে বলিলাম—"আমরা আপনাদের উপর অতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি।"

ছোট ঠাকুরদা যেন আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি আমার কথা শুনিয়াই বলিলেন—"তুমি মনে করিতেছ, আমি তোমাদের অযথা স্তুতি করিতেছি। না গোপীনাথ, আমি তা করিব না। আমি

বলিয়াছি, তা সত্য বোধেই বলিয়াছি। তোমার মা করুণাময়ী হইলেও, তিনি যখন তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন, তখন তোমার পেয় স্তন্যে অপরের সন্তানকে পুষ্ট করিতে তাঁহার অধিকার ছিল না। বিশেষতঃ সে সময় আমাদের অবস্থা হীন হইয়া আসিতেছিল। গোদুগ্ধদানে তোমাদের উভয় শিশুর ক্ষুধার সম্যক নিবৃত্তি করিবার অর্থও আমাদের ছিল না!"

"একথা এখন তুলিতেছেন কেন?"

"আর তুলিবার সময় থাকিবে না বলিয়া। আমি সত্বরই বিশ্বনাথের আশ্রয় লইতে কাশী যাইব স্থির করিয়াছি। ইহজন্মে আর বোধ হয়, তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবে না। তোমাদের দয়ার প্রতিদানে দিবার মধ্যে—এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের শুধু দুই একটা উপদেশ আছে। কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে তাই তোমাকে শুনাইব। তোমাকে কি বলিতে চাহি শুন। গোপালকে কখনও তোমার মিত্র ভাবিয়ো না। আর যদিই মিত্র ভাব, তাহা হইলে তাহার অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া কদাচ আক্ষেপ করিও না। আর পিতার চরিত্র সম্বন্ধে যখন যে ভাবই তোমার মনে উদিত হউক না কেন, তুমি কদাচ তাঁহার প্রতি ভক্তিহীন হইও না। ইচ্ছা হইয়াছে, এখন যাও। আসিতে ইচ্ছা কর বৈকালে আসিও। সময়ে আমার এই কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।"

এই প্রহেলিকাপূর্ণ উপদেশ কয়টী শুনিয়া, আমি ছোট ঠাকুরদাদাকে প্রণাম করিয়া উঠিলাম।

এ কি কথা! পিতা পুত্র সম্বন্ধে এরূপ কথাও বলিতে পারে! আমি গোপালকে মিত্রজ্ঞান করিব না? তবে কি গোপাল আমার,—শুধু আমার কেন, আমাদের পিতাপুত্রের শত্রু? তাহাকে কলিকাতা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি বলিয়া কি আমাদের উপর তাহার এত ক্রোধ হইয়াছে?

তাহার পিতা মূর্খ হইলেও আজন্ম ধর্ম্ম লইয়া আছে, সেইজন্যই কি দাদা আমাকে দেখিয়া সত্য গোপন করিতে পারিল না।

দাদার শেষ কথা শুনিয়া আমি একরূপ স্তম্ভিত। যতই সেই কথা লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলাম, ততই আমার বিস্ময়ের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি একরূপ জ্ঞানশূন্যের মতই গৃহত্যাগ করিলাম। জ্ঞান শূন্যের মত নীচে আসিলাম। দাদার ওই এক কথায় গোপালের প্রতিকার্য্য আমার বিসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। আমাদের গৃহত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া গোপাল এযাবৎ যে যে কার্য্য করিয়াছে, সমস্তই যেন ঈর্ষাপ্রণোদিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। চটিতে বসিয়া সে যে সমস্ত কথা আমাকে শুনাইয়াছিল, এখন বোধ হইল, সে সকল কথা মিথ্যা। মূর্খ হইলে যা হয়, গোপাল তাই হইয়াছে—মিথ্যা কথা কহিতে শিখিয়াছে। আমরা মাসে মাসে যে সমস্ত অর্থ পাঠাইয়াছি, সে সে সমস্ত অসৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছে। তারপর দুর্গাকে বিবাহ করিয়া সে আমার সঙ্গে জ্ঞাতিশত্রুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। আমার মনে হইল, গোপাল তাহার দারিদ্র পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে না। সে সমস্ত মাসোহারা আত্মসাৎ করে, পিতাকে এক কপর্দ্দকও সাহায্য করে না। তাই মনের আবেগে ব্রাহ্মণ আমার কাছে গোপাল চরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটন করিয়াছে।

এইরূপ চিন্তার প্রবাহে আমার চিত্ত বিকৃত হইয়া পড়িল। আমি আর কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাটীর বাহিরে চলিলাম—ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইলাম।

ডাক্তার বাবুর ঘর ছাড়িয়া সবে মাত্র সদর দরজায় পা দিয়াছি, এমন সময় বাটীর ভিতর দিক হইতে ব্যাকুল আগ্রহে কে যেন আমায় ডাকিল, "গোপীনাথ!" ফিরিয়া দেখি এক কৃষ্ণকায় প্রেতমূর্ত্তি যুবক, ব্যাকুল-

ভাবে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি তাহার আচরণ দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলাম। সদর দরজায় বেচুকে বসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"বেচু ও কে আসিতেছে ?"

প্রশ্ন শুনিবামাত্র বেচুর ক্রোধ হইল। তাহার উত্তরেই সেটা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। সে বলিল "কে তুমি জান গে—আমি কি জানি।" এই বলিয়া প্রবলতরবেগে সে তামাকু টানিতে লাগিল। আমার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

যুবকটী অবিরত আমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমার দিকে আসিতেছে দেখিয়া আমি বেচুকে বিনীত ভাবে বলিলাম,—"ভাই বেচু, আমাকে রক্ষা কর।"

বেচু দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত বলিয়া উঠিল, "কচি খোকা। পালাও না। আমি বুড়ো মানুষ তোমাকে কি রক্ষা করিব।" এই বলিয়াই সে সহসা চিত্তের কি এক আবেগে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার এরূপ আচরণের বৈচিত্র্য দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম।

এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে তার স্বরে নারীকণ্ঠ উঠিল—"ওগো! ধর ধর, গোপালকে ধর।" তাইত, একি গোপাল! মুহূর্ত্তমধ্যে ডাক্তার বাবু ব্যবস্থাগৃহ হইতে বাহির হইয়া যুবককে ধরিয়া ফেলিলেন। যুবক সংজ্ঞা-শূন্য, ডাক্তার বাবুর বক্ষে ঢলিয়া পড়িল। বহুলোক সেখানে সমবেত ছিল। তাহারা সকলে ডাক্তার বাবুর কার্য্যের সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসিল।

"ডাক্তার বাবু জল চাহিলেন। সতীশ ভিতর হইতে জল আনিয়া জলপাত্র পিতার হস্তে দিল। ডাক্তার বাবুর সুশ্রূষায় অল্পক্ষণ মধ্যেই যুবকের সংজ্ঞা ফিরিল। পাঁচজনে তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল। ডাক্তার বাবুর আদেশে তাহারা তাহাকে আর আমার দিকে মুখ ফিরাইতে দিল না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত আমি ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কি গোপাল ?"

ডাক্তার বাবু আমার প্রশ্নে যেন তুষ্ট হইলেন না! তিনি ঈষৎ বিরক্তির সহিত বলিলেন—"তোমার কি মনে হয় ?"

"গোপালের একি মূর্ত্তি! দেহ অঙ্গারের মত কালো, মাথায় একগাছি কেশ নাই, ভ্রূ নাই!—"

"কেমন করিয়া থাকিবে? গোপালের ঘরে আগুন দিয়াছিল। গোপাল প্রাণ থাকিতে যে বাহির হইতে পারিয়াছে, এই তার ভাগ্য। এ যাত্রা বাঁচে, তবে তার পুনর্জ্জন্ম।"

আগুন দিয়াছিল! প্রশ্ন মনে উত্থিত হইতে না হইতে গোপালের চরিত্র-হীনতার কথা আগেই আমার মনে জাগিয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম, গোপাল গ্রামের কোন কুলবধূর উপর অত্যাচার করিতে গিয়াছিল, অথবা করিয়াছিল। সেই জন্য অত্যাচারিত ব্যক্তি গোপালকে পোড়াইয়া অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে তাহার ঘরে আগুন দিয়াছে। এই মনে করিয়া ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে ঘরে আগুন দিয়াছিল ?"

ডাক্তার বাবু উষ্মাকর্কশকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"আবার কে? তোমার ওই পশ্চাতের মহাপুরুষ।"

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি পিতা। ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন—"তোমার ওই পাণ্ডিত্যাভিমানী নরাধম পিতা।"

পিতার হস্ত আমার স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে। আমি বুঝিলাম, তাঁহার হাত কাঁপিতেছে। তিনি অনুচ্চকণ্ঠে আমাকে বলিলেন—"গোপীনাথ চলিয়া আইস।"

আমি তাঁহার কণ্ঠেরও জড়তা লক্ষ্য করিলাম। বুঝিলাম, তিনিও যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। ব্যাপার দেখিয়া আমার যেন সব বুদ্ধ

লোপ পাইল। আমি হতভাগ্যের মত পিতার করাকৃষ্ট হইয়া চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে শুনিলাম, ডাক্তার বাবু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'শুন গোপীনাথ, তোমার পিতাকে বল। তাঁহার ধর্ম্ম ও বুদ্ধি, তিনি নিজে লইয়া থাকুন। আজি হইতে তাঁহার গৃহের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘুচিল। তিনি আজি হইতে নূতন পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করুন। এক একবার মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদিবে। কিন্তু কি করিব, সতী না বুঝিয়া পাষণ্ডের গৃহে কেন অবতীর্ণ হইয়াছেন?"



জীবিত মনুষ্যের যমপুরী দর্শন।

আমার বাড়ীর প্রায় আড়াই মাইল পশ্চিমে, ঝুরিয়া নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেই গ্রামের দক্ষিণ ভাগে কাঁড়রা নামে এক জাতি বাস করে। তন্মধ্যে এক গৃহস্থের ঘরে চনি নামে এক মেয়ে থাকে। ঐ মেয়েটী রোগাক্রান্ত হইয়া ক্রমে দুর্ব্বল ও অবশেষে একদিন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় গৃহস্থ, তাহার জীবন রক্ষা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, অগ্রে হইতে অন্ত্যেষ্টি কার্য্যের আয়োজন করিতে উদ্যত হয়।

পোড়াইবার জন্ত কাষ্ঠাদি আয়োজন করা হইতেছে, এমত অবস্থায় দেখিতে পাইল যে, চাঁন আর ইহলোকে নাই। তখন কালবিলম্ব না করিয়া কাষ্ঠাদি শ্মশানে বহন করত চাঁনর মৃতদেহ দাহ করিয়া ফেলে।

শব দাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সকলে দুয়ারে বসিয়াছে, এমন সময়ে গৃহের ছাপরটীতে কট কট শব্দ হইল, বোধ হইল যেন কে উহার উপরে আসিয়া বসিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চালের উপর হইতে শব্দ শোনা যাইতে লাগিল, "তোরা কি আমার শরীরটা পোড়াইয়া ফেলিয়াছিস্? যাঃ! কি কাজ করিলি! আমাকে যমদূত ফেরত দিয়া গেল, আমি কোথায় থাকিব?" কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল। একজন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তোমায় ফেরত দিয়া গেল?" তখন চাঁন, সমস্ত বিবরণ একে একে বলিতে আরম্ভ করিল।

"আমাদের গ্রামের পূর্ব্বপার্শ্বেই যে সান কুণ্ডরদা গ্রাম আছে তাহাতে ও চনি নামে একটী মেয়ে মানুষ আছে, সে চনি ও রোগাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহারই আয়ুশেষ হইয়াছে। তাহাকেই আনিতে পাঠাইয়াছিল। ভ্রমক্রমে আমাকে লইয়া গিয়াছে। সেখানে যাইবামাত্র, হাতে খাতা কানে কলম, এক ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে কএক কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমার প্রত্যুত্তর শুনিয়া সে বলিল, "এ চনি ত নয়, ইহাকে ত্বরায় ফিরাইয়া দিয়া আইস। ঐ গ্রামের পূর্ব্ব পার্শ্বে সান কুণ্ডরদা গ্রামে যে চনি আছে, তাহাকে লইয়া আইস।" তখন যমদূত আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া আমার বাড়ীতে ছাড়িয়া সান কুণ্ডরদার চনিকে লইতে গেল। কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং নিকটস্থ সান কুণ্ডরদার বিষয় জানিতে গেল। দেখিল সে অল্পক্ষণ পঞ্চত্ব পাইয়াছে।

যমপুরী হইতে পুনরাগত চনি বলিল, "আমার আরও এত দিন পরমায়ু

রহিয়াছে। আমার দেহ পোড়াইয়া ফেলিয়াছিস, এখন বায়ু রূপ একটা শরীর আশ্রয় করিয়া আমাকে থাকিতে হইবে।" উহার ঘরের একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছ ও আমাদের কথা বার্ত্তা সমস্ত শুনিতে পাইতেছ?" সে বলিল, "হাঁ আমি সমস্তই দেখিতে শুনিতে পাইতেছি; এবং যে সমস্ত কার্য্য তোমরা আমাকে করিতে বলিবে তাহা আমি করিতে পারি। আমি সংসারের যাবতীয় কার্য্য, যে যাহা করিতেছে বা যে যেখানে যাইতেছে, আসিতেছে, খাইতেছে, তৎ সমস্তই দেখিতে পাইতেছি। তখন তাহারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কোন জিনিষ হারাইলে অথবা চুরী হইলে তাহাও তুমি বলিয়া দিতে পার?"

চনি উত্তর করিল, "তাহাও পারি।"

তবে তুমি যতদিন সংসারে থাকিবে, ততদিন আমাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর প্রদান করিয়া আমাদের কিছু কিছু উপকার করিতে পার?" চনি তাহাতে স্বীকৃত হইল।

এই বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য একদিন নিকটস্থ কোন ব্যক্তি আসিয়া চনিকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ঘরের গরু একটা দুইদিন হইল খুঁজিয়া পাই নাই। কোথায় আছে চনি বলিতে পার?" শুনিয়াই চনি বলিল, "গরুটাকে কেহ বাঁধে নাই। অমুক গ্রামের অমুক পার্শ্বে যে বড় একটী পুষ্করিণী আছে তাহার পাড়ে চরিতেছে। আনিতে পাঠাও, পাইবে।" আগন্তুক ব্যক্তি স্বয়ং তথায় গিয়া দেখিল গরুটী চরিতেছে। ইহার পর তাহার গণনার প্রসার হইয়া গেল। তখন গৃহস্থ প্রত্যেক গণনার জন্য এক আনা চার্য্য করিলেন। সে যতদিন ইহ জগতে ছিল, ততদিন বেশ দুই পয়সা রোজগার করিয়া দিয়া গৃহস্থের উপকার করিয়াছিল। এ ছাড়া অনেক সময়ে সে গরুর গলার দড়ি খুলিয়া দিত এবং গৃহের আবর্জ্জনাদি ঝাঁটার দ্বারা ঝাঁটাইয়া দিত।

এক সময়ে আমার জ্যেষ্ঠতাত চৌধুরী তারাপ্রসাদ মিত্র ঐ সমস্ত শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া চনিকে দেখিবার জন্য কুরিয়া মৌজাতে উপস্থিত হইলেন, এবং একদিন চনির গণনাদি দেখিবার নিমিত্ত বেড়াইতে বেড়াইতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র চনি বলিল, "ওরে (অমুক) চৌধুরী মহাশয় আসিয়াছেন, বসিবার জন্য চৌকী দে।" তখন বাড়ীর লোকেরা ব্যস্ত হইয়া জ্যেষ্ঠতাতকে চৌকী আনিয়া দিল। তাঁহার বসিবার পরেই শুনা গেল, উপর হইতে কে যেন বলিতেছে, "তামাক সাজিয়া দে।" এই কথা শুনিবার পরেই জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় বলিলেন, "উঁহারা তামাক কোথায় পাইবে, তুই তামাক আনিয়া দে।"

তাঁহার আদেশমাত্র খানিকটা তামাক তাঁহার সাম্‌নে পড়িল! তামাক খাওয়ার পর জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় বলিলেন, "চনি আমার একটী কার্য্য করিতে পারিস ?" চনি উত্তর করিল "আজ্ঞা হাঁ। কি করিব বলতে আজ্ঞা হোক।" তিনি বলিলেন, "আমাদের গড়ের উত্তর পার্শ্বে যে ব্রাহ্মণ পাড়া আছে, তন্মধ্যে জগমোহন মিশ্রীর বাড়ীর ভিতর প্রস্থে একটী ডালিম গাছ আছে। সেই ডালিম গাছে চারিটী ডালিম ন্যাকড়া জড়াইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সেই চারিটীর মধ্যে উত্তর পার্শ্বে যেটী আছে, তাহা আমাকে আনিয়া দিতে হইবে।" তখন চনি বলিল, "যে আজ্ঞা হজুর, আমি চলিলাম।" সেই সময়ে গৃহের চালটীতে একবার শব্দ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ন্যাকড়া জড়ান ডালিমটী ঠক করিয়া তাঁহার সাম্‌নে পড়িল। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া, আর কতক গুলি কথা জিজ্ঞাসিয়া ডালিমটী লইয়া বাড়ী প্রত্যাগত হইলেন; এবং অনতি বিলম্বে জগমোহন মিশ্রীর বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার ডালিম গাছে সে ডালিমটী নাই। ডালিমটি কোথায় গেল, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলে তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

চনি, এইরূপ কিছুকাল থাকিয়া, তাহার আয়ুষ্কাল শেষ হইবার দিন সকলকে বলিয়া গেল যে আমি চলিলাম, আর থাকিব না। তদবধি আর তাহার কথাবার্ত্তা শুনা যায় নাই।*

শ্রীচৌধুরী ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।

পরিত্যক্ত মন্দির।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একদিকে আমি সেই অবস্থায় আমার ছাত্রের প্রতি ন্যস্তলক্ষ্য, অন্যদিকে দেওয়ালস্থিত সেই সমস্ত খোদিত চিত্রাবলী বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় আমার দৃষ্টিপথ হইতে অপসারণশীল! দুঃখের বিষয় সেই সমস্ত চিত্রের সম্যক্ পরিচয় দিতে আমি অসমর্থ, কিন্তু সে সমূহ যে প্রকৃতির সম্যক প্রতিমূর্ত্তি, তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে—প্রথম দৃষ্টে আলেখ্য গুলি জীবন্ত ও সোৎসাহী বলিয়া ভ্রম হয়। কিছুক্ষণ এইরূপ প্রদর্শনী চলিয়াছিল—হঠাৎ আমার সংজ্ঞাশক্তি পুনরায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না থাকিয়া

---

* মৃতের প্রত্যাবর্ত্তনের কথা পাঠকবর্গ অনেকে শুনিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের মুখে দেহনাশ, যমকিঙ্করের অপরাধে দেহীর ভৌতিকদেহ প্রাপ্তি, এ বিচিত্র ব্যাপার আর কখন শুনা যায় নাই। তবে অনন্ত লীলাময়ের রাজ্যে কি অসম্ভবের সম্ভব যে না হইতে পারে, তাহা আমাদের জড় মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তার সাহায্যে অনুমিত হওয়া অসম্ভব। তবে ইহাতে একটী শিক্ষণীয় বিষয় আছে। আত্মঘাতী ও অপহৃত দেহত্যাগে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাও অনেকটা তদ্রূপ। দেহ না থাকিলেও পৃথিবীর সঙ্গে এ অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। তবে এ দেহীকে আত্মঘাতীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। চনির দেহত্যাগ তাহার নিজকৃত অপরাধে নয়, অপদেবতার ভ্রান্তিবশে।

অং সং

এক হইল। আমি তখন নিজের স্থূলদেহ দর্শন করিবার অবসর পাইলাম। দেখিলাম আমি দুই হাতে খাটের পায়া ধরিয়া তাহাতে দেহভার অর্পণ করিয়া বালকের মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছি।

যে সময়ে আমি সেই স্থানে নিস্পন্দ ভাবে অসহায় অবস্থায় মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থিত ছিলাম, তখন কাহার উচ্চারিত বাক্য সহসা আমার শ্রবণ স্পর্শ করিল। বেশ স্বাভাবিক সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ স্বরে বাক্য উচ্চারিত হইল "লিওনেল্ কে অনিষ্ট করিওনা, ইহা তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে।"

সত্বর আমি চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অপর কোন কথা আমার শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল না। আমি বার বার আমার হস্তে 'চিমটি' কাটিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। কিন্তু হায় তাহাতে ফলের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না। মনে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কিন্তু শীঘ্রই বুঝিলাম, যদি আমি এই আতঙ্কের আশ্রয়ে থাকি, তবে আমার উপর তাহার আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে বিস্তার করিবে। এই ভাবিয়া নিজেকে পুনরুৎসাহিত করিয়া ধীরে ধীরে বিছানার সন্নিহিত হইলাম।

আমি সম্পূর্ণভাবে লিয়নেলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম। তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া তাহাকে বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহার সামান্য মাংস পেশীরও চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল না। তাহার সেই অপার্থিব চক্ষুর ভাবের পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হইল না! তাহার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া কিছুক্ষণ আমার বাক্যস্ফুরণ হইল না। আমার নিশ্বাস লইবার শক্তি অন্তর্হিত হইল। তারপর উচ্ছ্বসিত উদ্দমে মনের আতঙ্ক জলাঞ্জলি দিয়া আমার সম্মুখস্থ মূর্ত্তিকে, হস্ত প্রসারিত করিয়া, বজ্রমুষ্টিতে ধরিলাম। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহাকে স্পর্শ করিলাম সেই মুহূর্ত্তেই অন্ধকার আমার নয়নদ্বয় অন্ধ করিল !! আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে,

আমি অর্দ্ধোপবিষ্ট ভাবে অন্ধকারময় কক্ষে আমারই শয্যার চাদর দুইহাতে ধরিয়া রহিয়াছি !!

আমি উঠিলাম, দুই হস্তে চক্ষু মুছিয়া দেখিলাম, আমার কাগজ কলমগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দেখিয়া সেগুলি যথাস্থানে রাখিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম যে, আমি চেয়ারে বসিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিলাম এবং সেই অবস্থায় শয়নগৃহে গিয়াছিলাম। কিন্তু বলিতে কি, কোন প্রবোধ বাক্যেই আমার মন উঠিল না। সাধারণতঃ এইমাত্র বুঝিলাম যে, এ সমস্তই মিথ্যা। যাহা হউক সে রাত্রিতে আর বেশী কাজ করিবার সামর্থ্য নাই দেখিয়া শীতল জলে স্নান করিয়া শয্যার আশ্রয় লইলাম।

তারপর দিন নিয়মিত সময়ের বহুক্ষণ পরে শয্যা ত্যাগ করিলাম। কিন্তু তবুও দৌর্ব্বল্য ও অবসাদ অনুভব করিতে লাগিলাম। স্বপ্নের প্রভাবে আমার শারীরিক অবস্থার যে এই পরিবর্ত্তন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, এ সকল বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিব না। এই ঘটনা আমার মাতার শ্রবণগোচর হইলে তাঁহার ভয়ের সীমা থাকিবে না। আমার স্মরণ আছে, 'চিম্‌টী' কাটিলে যেরূপ দাগ হয় পরদিন আমার বাম হস্তে সেরূপ কাল্‌সিটা দাগ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

সে দিনও ঘটনাক্রমে সন্ধ্যার সময় লিওনেল্‌ আমাদের বাটীতে আসিল। সে যে কি জন্য আসিয়াছিল, তাহা এখন আমার মনে হয় না। কিন্তু আমার বেশ স্মরণ হয়, সে কথায় কথায় আমাকে এই কথাটী বলিয়াছিল :—

"মাষ্টার মহাশয়, কাল রাত্রে এক বড় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি।" এই কথা শুনিয়াই আমার শরীরাভ্যন্তরে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তবুও খুব কষ্টে আত্মসংযম করিয়া তাহাকে কহিলাম :—

"তাই নাকি? তা বেশ চল, যেতে যেতে পথে শোনা যাবে। আমি এখনই বেরুবো।"

তখনও পর্য্যন্ত, সে কি বলিবে, তাহা জানিতাম না। তথাপি একটা অস্বচ্ছন্দতা-জনক পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বলে, না শুনিলে পাছে বিপদ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে তাহাকে বাহির করিয়া আনিলাম। বাহিরে আসিয়া আমি তাহাকে তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে কহিলাম। সে তখন বলিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া আমার শরীর বিকম্পিত হইল।

সে বলিতে লাগিল—"আমি দেখলুম যে, আমি একটা বিছানায় শুয়ে আছি, কিন্তু নিদ্রিত নই। যদিও আমি হাত পা নাড়তে পারছিলুম না, তবুও আমি চোখ চেয়ে বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম, সে রকম ভাব আর কখন আমার আসে নি। আমি তখন আমাকে এত জ্ঞানী বলে জান্‌তে পেরে ছিলুম যে, কেহ আমাকে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিতে পার্‌তুম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লিওনেল্ তুমি কেমন ভাবে শুয়ে ছিলে।" তার উত্তর শুনতে শুনিতে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল!

"আমি চিৎ হ'য়ে ছিলেম হাত দুখানি আমার বুকের উপর আড়াআড় ভাবে ছিল।"

"তুমি এখন যে পোষাকে আছ, সেই পোষাকই পরে ছিলে বোধ হয়।"

"না মাষ্টার মহাশয়, আপনার ধারণা ভুল। আমি পুরোহিতদের মত একরকম সাদা আঙ্‌রাখা পরে ছিলুম। আর আমার বুক বেষ্টন ক'রে কাঁধের উপর একটি সোণার চাপরাশ ছিল। সে যে দেখ্‌তে কিরূপ, তা আপনি কল্পনাই কর্‌তে পার্‌বেন না।"

সেটী কেমন দেখ্‌তে আমি তা বেশ জানি তবুও আমি আমার অভিজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন রাখিলাম। অবশ্যই এ সময় থেকে আমার আর বুঝিতে

বাকি রহিলনা যে, গত রাত্রির ঘটনা স্বপ্ন অপেক্ষা একটু বিশিষ্ট। আমি যেমন দেখেছিলুম সেও তেমন বলিবে। তবুও প্রচণ্ড মানসিক ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা চালিত হইয়া যদি তাহার ও আমার স্বপ্নের ভিতর সামান্যও তারতম্য লক্ষিত হয়, এই আশায় যতদূর পারি তাহাকে জেরা করিতে লাগিলাম।

"তুমি নিশ্চয়ই তোমার শোবার ঘরে ছিলে ?"

"না। প্রথমে আমি এমন একটা ঘরে ছিলুম যেটা আমার চেনা চেনা বোধ হ'ল। তারপর ক্রমে ক্রমে ঘরটা বাড়তে লাগল। তারপর সে ঘর দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা প্রকাণ্ড মন্দিরে পরিণত হ'ল। আমার বইএর ছবিতে এরকম মন্দির আছে। তার চার দিকে বড় বড় থাম। দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি।"

"লিওনেল্‌ গল্পটা বেশ মজার দেখ্‌ছি। যে স্থানে মন্দিরটা ছিল, সে সহরটা কেমন ?"

এ চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। আমি তাহাকে ভ্রান্ত করিতে পারিলাম না। যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, আমি সেইরূপই উত্তর পাইলাম।—

"সে জায়গাটা সহর নয়। মন্দিরটা একটি বিপুল বালুকাময় প্রদেশে। ভূগোলোক্ত শাহারা মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত, চারদিকেই বালি ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনি। শুধু আমার ডানদিকে তিনটে বড় তালগাছ ছিল।

"তোমার মন্দিরটি কিসের তৈয়ারী ?"

"উজ্জ্বল কাল পাথরের, কিন্তু অস্তগামী সূর্য্যের আলোকে সিঁড়ির ধাপ গুলি আগুণের মত দেখাচ্ছিল।"

"কিন্তু তুমি ভিতরে থেকে এ সব কেমন করে দেখলে ?"

"এটা ঠিক বল্‌তে পারলুম না। দু'দিকই যেন দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম।

এটা একবার বাইরের দিক আবার ভেতরের দিক বলে বোধ হচ্ছেল। যদিও আমি কখন নড়িনি তবুও আমার বোধ হ'ল, আমি গিয়ে দেওয়ালের সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে এলুম। কেমন ক'রে যে এটা সম্ভব তা' এখনও বুঝতে পারি নি।"

অবশেষে তাকে আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। এই প্রশ্নের উত্তরই আমার শেষ অবলম্বন।

"তুমি তোমার এই আশ্চর্য্য স্বপ্নরাজ্যে কাকেও কি দেখ্‌তে পেয়েছিলে পিওলেন্?"

সে তার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উত্তর দিল "হ্যাঁ মাষ্টার মহাশয়—আমি সেখানে আপনাকে দেখেছিলুম। আপনি ছাড়া সেখানে আর কেউ আমার চোখে পড়ে নি।"

আমি হাস্য করিবার চেষ্টা করিলাম, যদিও আমি জানিতাম এরূপ উত্তর পাইব। তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম "আমাকে কি করিতে দেখিয়াছিলে?"

"যখন আমি প্রথমে সেই ঘরে ছিলুম, তখন আপনি সেই ঘরে এলেন; আপনি দোর গোড়া থেকে ঘরের ভিতরটা দেখ্‌লেন। আপনি যখন আমায় প্রথম দেখতে পান তখন আপনি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হন। এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। তারপর আপনি ঘরের ভেতর এসে আস্তে আস্তে আমার খাটের কাছে আসেন। সেই সময় আপনি আপনার ডান হাত দিয়ে বাঁম হাতটি খুব জোরে ধ'রে চিম্‌টী কাটেন বা টানাটানি করেন। আর আপনি আমার খাটের পায়া ধ'রে বরাবর ছিলেন, সে ঘরে, সেই মন্দিরে—দুইস্থানেই। যখন আমার ছবি দেখা শেষ হয়, তখন আপনি আবার ধীরে ধীরে আমার কাছে আসেন। আপনি তখন এরূপ উগ্র দর্শন ও পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ছিলেন যে,

আমিও তাতে ভীত হ'য়েছিলুম। (আমি মনে মনে ভাবিলাম এসব কার্য্যাবলী যে আমারই তাহাতে সন্দেহই নাই) তারপর আপনি আমার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। এবং আমার মুখের কাছে মুখ এনে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর হঠাৎ বোধ হ'ল আপনি লাফিয়ে উঠলেন। দু'হাতে আমাকে ধর্‌লেন এতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি দেখিলাম, আমি আমার বিছানায় নিরাপদে শুয়ে আছি।"

এখন এটা সহজেই অনুমেয় যে আমার ও বালকের স্বপ্নবৃত্তান্ত একই। সে যখন আমার সামান্য কার্য্যের বিষয় বলিল, তখন আমার মনে এক অভূত-পূর্ব্ব চিন্তার উদয় হইল। তাহার সহিত সেই সুস্ফুট চন্দ্রালোকে সাক্ষাৎ, সেই পরিত্যক্ত মন্দিরে অবস্থান, সেই মন্দির বহির্ভাগে বিস্ময়ে কাল যাপন, সবই আমার মানস চক্ষে ফুটিয়া উঠিল! কিন্তু আমি এসব সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে বিস্ময় ও স্বার্থ দেখাইয়াই নিরস্ত হইলাম। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত লিওনেল এর স্বপ্নটী যে কিরূপ অদ্ভুত সে বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা হয় নাই।

আমার জীবনের এই অত্যদ্ভুত কাহিনী যথাযথ বর্ণনা করিলাম। এখন ইহার কি অভিধান দেওয়া যাইতে পারে? দুইটী অনুমান আমার সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। আমার জীবনের এই ঘটনাটি পরস্পরাপেক্ষ স্বপ্নের একটী উদাহরণ স্থল বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু দুই জন ব্যক্তির এক সময়েই একই স্বপ্ন দর্শন। আমার নিজের বিশ্বাস অনুসারে আমার মনে হয় যে, যখন এক ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে স্বপ্ন দেখে, তখন তাহার দৃষ্ট দৃশ্যাবলী ও ঘটনাবলী দ্বিতীয় ব্যক্তির মনোদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। কিম্বা সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে তাহার মস্তিস্কে চালিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে দুই ব্যক্তিই একই বিষয় দর্শন ও কর্ম্মের অনুষ্টান করেন। কিন্তু আমাদের ঘটনায় তাহার ব্যতিক্রম হইল যদিও আমরা দুই

জনেই একই দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়াছিলাম এবং দুই জনেরই সংজ্ঞা শক্তির বিভাগ উপস্থিত হইয়াছিল, তবুও আমরা এক কাজ করি নাই পরস্পর পৃথক পৃথক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং পরস্পর পরস্পরের কৃতকর্ম্মের বিষয় বলিতে সমর্থ হই।

আমার দ্বিতীয় অনুমান এই যে, লিওনেল্ তাহার সূক্ষ্মশরীরে যথার্থই আমার শয়ন কক্ষের বিছানায় শুইয়াছিল। হয়ত তাহার স্থূল দেহের ছায়া ছিল বা আমি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অন্বেষণ করিয়াছিলাম, এবং সেই জন্য তাহাকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবিকই আমরা দুইজনেই সূক্ষ্ম দেহে পৃথিবীর অজ্ঞাত মরু প্রদেশস্থ পরিত্যক্ত মন্দিরে যাত্রা করিয়াছিলাম, এবং সূক্ষ্ম দেহের প্রভাবে নিমেষের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু এই অনুমানের সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ সমস্যা রহিল। যাঁহারা এই বিষয় কিছুই অবগত নহেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা পূর্ব্ব অনুমান অপেক্ষা অসঙ্গত বোধ হইবে। কিন্তু আমার ধারণা ও বিশ্বাস ইহা আংশিক সত্য। আমার বিশ্বাস যে লিওনেল্ যথার্থই সূক্ষ্ম দেহে আমার গৃহে আনীত হইয়াছিল এবং আমিও যথার্থই তাহাকে দেখিয়াছিলাম, এবং সম্ভবতঃ পরিত্যক্ত মন্দিরের স্বপ্ন আমাদের উভয়ের মনে কোন একজন উন্নত ইচ্ছাশক্তিসঞ্চারকের ইচ্ছানুসারে প্রেরিত হইয়াছিল।

আরও একটি সন্দেহ জনক বিষয় আছে সে বিষয়টি আর কিছুই নহে স্বপ্নে তৃতীয় ব্যক্তির আদেশবাণী, এই বাণীই আমাদের স্বপ্নের ভিত্তি এই কথাটি আমাকে জানাইবার জন্যই যেন এই সকল ঘটনার অবতরণা। কারণ আমাদের অধিবেশনে সফলকাম হই বলিয়া, আমাদের গীর্জ্জার এক সাধু লিওনেলকে আবিষ্ট করিয়া তাহার সমাধি অবস্থায় অনেক আশ্চর্য্য অপার্থিব ঘটনাবলীর বিকাশ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি এই ইচ্ছার তীব্র প্রতিবাদ করি। আমি যখন স্বপ্নে এইরূপ আদিষ্ট

হইয়াছি তখন তাহা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এবং কেহ যাহাতে তাহাকে আবিষ্ট না করে তাহার ব্যবস্থা করি। যাহা হউক উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমার এই ঘটনা বিকাশের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র আমাকে ঐ নিষেধ বাণী বলা এবং যাহাতে তাহা মনে সর্ব্বদা জাগরুক থাকে ও আমাদের স্থির বিশ্বাস জন্মে সেই জন্য এই অদ্ভুত উপায়ে তাহা আমাদের নিকট বর্ণিত।*



হিষ্টিরিয়া পীড়া নহে, ভূতাবেশ।

বাল্যকাল হইতে হিষ্টিরিয়া একপ্রকার পীড়া ইহাই ধারণা ছিল। হিষ্টিরিয়া যে কখনও ভূতাবেশ হইতে পারে বা হইবে, ইহা কখন কল্পনাতেও আইসে নাই। প্রথমে অলৌকিক রহস্যে পড়িলাম যে হিষ্টিরিয়া পীড়া নহে, ভূতাবেশ। কিন্তু তাহাতে সম্যক্ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম ও অলৌকিক রহস্যে যিনি ইহাকে ভূতাবেশ বলিয়া ছিলেন, তাঁহাকেও কতকগুলি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সেই চেষ্টার ফল নিম্নে লিখিলাম,—

আমাদিগের বাটীর নিকটে গোপালচন্দ্র স্বর্ণকার নামক এক ঘর গৃহস্থ বাস করে। শুনিলাম তাহার ভগিনীর আজ দুই বৎসর হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। ঐ হিষ্টিরিয়া, পীড়া কি ভূতাবেশ তাহা জানিবার জন্য, যে সময় সেই স্ত্রীলোকটী হিষ্টিরিয়াক্রান্ত হয়—সেই সময় আমাকে সংবাদ দিবার জন্য গোপালকে বলিয়া রাখি। গোপাল সেই অনুসারে গত অগ্রহায়ণ

* বিলাতের কোনও অলৌকিক রহস্যবিৎ মনীষীর দৃষ্টঘটনা। অং সং।

মাসের প্রথমে হিষ্টিরিয়াক্রান্ত হওয়ার সংবাদ প্রদান করে। আমি তাহার বাটীতে যাইয়া দেখি যে, স্ত্রীলোকটী সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। সময় সময় হাত পা ধনুষ্টঙ্কার-গ্রস্থ রোগীর ন্যায় খেঁচিতেছে; এবং দাঁতে দাঁতে পিশিয়া কিড়মিড় শব্দ করিতেছে। মুখ দিয়া লালা বহির্গত হইতেছে। আমি উহাকে ভূতাবিষ্ট মনে করিয়া, আবেশকারী আত্মাকে আবদ্ধ করিবার কতকগুলি ক্রিয়া অবলম্বন করি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্পূর্ণরূপ অকৃতকার্য্য হই এবং সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ হই। তথাপি কয়েকটী কারণে আমার ধারণা হয় উহা পীড়া নহে, ভূতাবেশ।

গোপালকে পুনর্ব্বার সংবাদ দিবার জন্য বলিয়া আসি এবং অকৃতকার্য্য হওয়ার কারণ অন্বেষণ করিতে থাকি। চিন্তা করিয়া ও পূর্ব্বোক্ত লেখক মহাশয়ের নিকট জানিয়া এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আমার অনভ্যাস ও ব্যস্ততা বশতঃ কতকগুলি নিয়মের ওলট পালট হইয়া যাওয়ায় আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সেই হইতে বিশেষ সাবধানতা সহকারে সংবাদ পাইবার অপেক্ষা করিতে থাকি। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে একদিনং রাত্রি নয়টা সাড়ে নয়টার সময় গোপাল আসিয়া তাহার ভগিনীর সেইরূপ আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ প্রদান করিল। আমি পীড়িতার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, পীড়িতা ঠিক পূর্ব্ববৎ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। যে প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকটী আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাকে আবদ্ধ করিবার প্রক্রিয়া গুলি যথাযথ অবলম্বন করিলাম; কিন্তু তাহাতেও যে উহা ভূতাবেশ এমন কিছুই প্রমাণ পাইলাম না। তখন রোগীকে কিছু কিছু যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলাম। অবশ্য সে যন্ত্রণা কোন শারীরিক আঘাত-জনিত নহে। একটু যন্ত্রণা দেওয়ার পরেই পীড়িতা "বলি বলি" করিয়া উঠিল, কিন্তু যন্ত্রণা দেওয়া বন্ধ করার সঙ্গেই আবার নীরব হইল। জিজ্ঞাসা

করিলে কোন উত্তরই দিল না। তখন আবার যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করায় প্রথমেই বলিয়া উঠিল, "আমায় ছেড়ে দাও, আমি যাচ্ছি।"

আমি। তুমি কে পরিচয় না দিলে, ছাড়িয়া দিতে পারিব না।

আত্মা। আমি যখন যাচ্ছি, তখন আমার পরিচয়ের দরকার কি?

আমি। তুমি পরিচয় না দিলে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। তোমার ক্ষমতা থাকে যাইতে পার।

আত্মা। তুমি আমাকে বন্ধ করে রেখেছ, আমি যাব কি করে?

আমি। তাহা হইলে তুমি কে পরিচয় দাও।

কিছুক্ষণ আর কোন উত্তর না দেওয়ায়, আবার পূর্ব্বের ন্যায় যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলে, কহিল—"আমায় আর কষ্ট দিও না, আমি বলছি।"

আমি। আচ্ছা তুমি যদি যথাযথ উত্তর দাও—তাহা হইলে আর যন্ত্রণা দিব না। তুমি কোথায় থাক?

আত্মা। মুক্তারপুর।

আমি। সেখানে কোথায় থাক?

আত্মা। আমাদের বাটীর পিছনে শজিনা গাছে।

আমি। এই স্ত্রীলোকটীকে তুমি কোথায় প্রথম আশ্রয় করিয়াছিলে।

আত্মা। এইখানে, ঐ বাটীতে।

পূর্ব্বে গোপাল এই গ্রামে অন্য বাটীতে বাস করিত। বর্ত্তমানে সে সে বাটী ছাড়িয়া ৬।৭ মাস হইল এই বাটীতে আসিয়াছে। সেইজন্য আত্মা উত্তর করিল 'ঐ বাটীতে।' আমি প্রথমে একবার অকৃতকার্য্য হওয়ায় অনেকে আমাকে পরিহাস, বিদ্রূপ ইত্যাদি করিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি এবার একটু গোপনে উক্ত কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। ইচ্ছা ছিল যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি, তখন সাধারণকে জানাইব। যদি ন

পারি, তবে আর অধিকতর হাস্যাস্পদ না হই; কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইল। একটুখানি অগ্রসর হইতে না হইতে স্থানীয় জমিদার গুরুপ্রসন্ন বাবু, সাহিত্যিক প্রবর জগৎপ্রসন্ন বাবু আরও কতকগুলি ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং জগৎ বাবু প্রথম হইতেই বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া বিশেষ আগ্রহ সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বাবুরাও রোগিণীর নিকট শুনিয়া স্তম্ভিতভাবে শেষ দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি। কি অবস্থায় তুমি ইহাকে আশ্রয় করিয়াছিলে?

আত্মা। ইহার জ্বর হইয়া ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত হতচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল। সেই অবস্থায় ইহাকে পাইয়াছিলাম।

আমি। তুমি স্ত্রীলোক কি পুরুষ?

আত্মা। আমি স্ত্রীলোক।

আমি। কি জাতি?

আত্মা। গোয়ালা।

আমি। তোমার কিসে মৃত্যু হইয়াছিল?

আত্মা। আঁতুড় ঘরে জ্বর হইয়া মৃত্যু হয়।

আমি। তোমার গতি হয় নাই কেন?

আত্মা। অশুচি অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় ও ভাল প্রকার শ্রাদ্ধাদি না হওয়ায় আমার গতি হয় নাই।

আমি। তোমার স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে নিয়ম মত শ্রাদ্ধশান্তির জন্য বল নাই কেন?

আত্মা। তাদের আর বলিব কি, তাদের কি আর রেখেছি, সব নিকাস করিয়া তুলিয়াছি।

আমি। তাদের কি কেহই নাই?

আত্মা। আছে—দুই একজন আছে।

আমি। তুমি ইহাকে পাইলে কেন?

আত্মা। ইহার সহিত আমার বালক-কাল হইতে বড় ভাব ছিল।

আমি। ভাব ছিল, তবে ইহাকে এরূপ ভাবে কষ্ট দাও কেন?

আত্মা। ইহাকে আমি ত কিছুই কষ্ট দিই না—সময় সময় মাত্র আসি, আবার চলিয়া যাই।

আমি। এখন তুমি কি করিতে চাও? ইহাকে ছাড়িবে না?

আত্মা। তুমি যদি থাকিতে দাও তবে থাকি, নতুবা যাই।

আমি। তোমার নাম কি?

আত্মা। আমার নামে তোমার দরকার কি? আমি মেয়ে মানুষ, মেয়েমানুষের নাম জেনে তোমার কি হবে? আমি কালাচাঁদ ঘোষের বোন।

আমি। তোমার নাম বলিতে হইবে, নতুবা শুনিব না। তোমার স্বামীর নাম কি?

আত্মা। স্ত্রীলোকে কখন কি স্বামীর নাম বলে? আর আমার নাম আমি বলিব না।

আমি নাম জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুতেই নাম বলিতে স্বীকৃত হইল না। তখন আবার যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করায় বলিল, "বল্‌ছি, বল্‌ছি। আমার নাম ভবরাণী। তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই। আমি আর আসিব না। আমি দেশের মানুষ দেশে যাই।

আমি। তুমি যে যাইবে তাহার প্রমাণ কি?

আত্মা। তুমি বাঁধন ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই। আমি চলে

গেলে আপনিই বুঝিতে পারিবে। ইহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না এখন আর উত্তর পাইবে না।

আমি। আচ্ছা, তুমি যদি যাও, তবে ঐ গাছ হইতে একটী নারিকেল পাড়িয়া যাও।

আত্মা। এমনিই কত পাপ করেছি সেজন্য এই কষ্ট পাচ্ছি। আবার গাছের ফল ছিঁড়ব, তাহা আমি পারিব না। আমি বলছি যে, আর আসিব না। আমি এলেই ত টের পাবে, তখন আমায় যে শাস্তি হয় দিও।

আমি। আচ্ছা এই বাবুরা উপস্থিত আছেন, যাহা জিজ্ঞাসা করেন তাহার উত্তর দাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি।

আত্মা। আচ্ছা যিনি যাহা জিজ্ঞাসা করেন করুন, আমি উত্তর দিতেছি।

তখন জগৎবাবু অগ্রসর হইয়া তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যে উত্তর পাইলেন তাহা নিম্নে লিখিলাম।

জগৎ। তোমার নাম কি?

আত্মা। আগেই ত বলিয়াছি আমার নাম ভবরাণী।

জ। তোমার কোন সন্তানাদি কিছু আছে কিনা?

আ। বলিলাম—আঁতুড় অবস্থাতেই মৃত্যু হইয়াছে। তবে আবার ছেলে পিলে থাকিবে কি করে।

জ। আঁতুড়ে মৃত্যু হইয়াছে বটে—কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও ত ছেলে পিলে হইতে পারে।

আ। না, সেই প্রথম গর্ভ। প্রসবের সময় আঁতুড়ে মৃত্যু হয়। একটী ছেলে হইয়াছিল, সেটি ছয় দিনের দিন মরিয়া যায়। তার পরই আমার মৃত্যু হয়।

জ। তোমার স্বামী তোমাকে ভাল বাসিত ?

আ। হাঁ, ভাল ব্যাসত বই কি! আঁতুড়ে, জ্বর হয়ে ধুঁকে ম'লাম,—একদিন একটী কবিরাজ ডাক্তার এনে দেখাল না।

জ। তুমি কি সব সময় এখানে থাক ?

আ। না, আমি এখানে থাকিনা, মুক্তারপুরে থাকি। সময় সময় এখানে আসি।

জ। তুমি এখন চলে যাও না কেন !

আ। আমি যাব কেমন করে। আমারে যে আটকে রেখেছে। ছেড়ে দিলেই আমি যাই। আমি তোমাদের এদেশ মুখে আসব না।

তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আচ্ছা "তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি ; কিন্তু আমি যখন ডাকিব তখন আসিবে ? আর আমার একটী উপকার করিতে পারিবে ?"

আ। তুমি ব্রাহ্মণ আমি গোয়ালা, আমি তোমার কি উপকার করিব। আর আমি কোথায় থাকি না থাকি তাহার স্থিরতা নাই। তুমি আমায় ডাকিবে, আমি না শুনিতে পেলে কেমন করিয়া আসব !

জেদাজিদি করায় শেষে বলিল "আমি আসিব।" কিন্তু আমি যখন মা কালীর নামে শপথ করিয়া বলিতে বলিলাম, তখন আর কিছুতেই স্বীকার করিল না। উপস্থিত সকলেই বলিতে লাগিলেন, আর প্রয়োজন কি ? উহাকে ছাড়িয়া দিন। তখন বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলাম। রোগিণী ঘোর অচৈতন্য হইয়া পড়িল। সকলে নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও আর তাহার দ্বারা একটী কথাও বাহির করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ জগৎবন্ধু ঐ স্ত্রীলোকটীকে কথা কহাইবার জন্য যারপরনাই চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন। ২ ঘণ্টা ২॥ ঘণ্টা পরে রোগিনীর চৈতন্য হইল। তখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে সে এই সময়

বলিয়াছে কিনা তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। ভবরাণী ঘটিত ব্যাপার বলিলে সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "ইহা তোমরা জানিলে কি করিয়া?" সে আত্মার বর্ণিত প্রত্যেক কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল।

মুক্তারপুর এখান হইতে ৭।৮ ক্রোশ দূরে। প্রেতের বর্ণিত বিষয় সমস্ত সত্য কিনা তাহা আমাদের জানার কোন উপায় ছিল না। কেবল গোপাল যতদূর জানিত তাহাতে কতকাংশ সত্য বলিয়া জানা গেল।

জগৎবাবু বলিলেন "মুক্তারপুরের কোন লোকের নিকট যতদিন না জানা যাইতেছে ও স্ত্রীলোকটী রোগ মুক্ত না হইতেছে, ততদিন আমি ইহা প্রেতাত্মার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিনা।"

ঘটনাক্রমে ঐ ঘটনার ৩।৪ দিন পরে মুক্তার পুরের দুইটী লোক এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা প্রত্যেক কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিল, এবং বলিল, "আঁতুড়ে সেই বৌটীর মৃত্যুর পর হইতে সেই গৃহস্থ ঘরটী মরিয়া মরিয়া উৎসন্ন যাইবার মত হইয়াছে।"

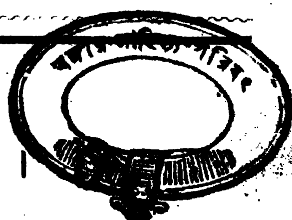
সেই অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটী ভগবানের কৃপায় সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। একদিনের জন্যও সে অসুখের কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। পূর্ব্বে এমন মাস যাইত না সে যে মাসের মধ্যে নূ্যনকল্পে ২।৩ বার সে আক্রান্ত না হইত। যে সময় অধিক হইত সে সময় দিনের মধ্যে ২।৩ বার হইত। আমি আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণের চেষ্টায় আছি, জানিতে পারিলেই এই পত্রিকায় তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রীপতিতপাবন রায়।



অলৌকিক রহস্য।

৪র্থ সংখ্যা] চতুর্থ বর্ষ। কার্ত্তিক, ১৩১৯।



যমালয়ের ফেরৎ।

১। হাবড়ার উত্তরাংশ শালখিয়া নামে প্রসিদ্ধ। এইখানে পেলী নামক একটি দরিদ্রা বিধবার কলেরা হয়। রাত্রে তাহার অবস্থা মৃতের মত হইল। আত্মীয়বর্গ তাহাকে মৃত মনে করিয়া তাহার দেহের সৎকারের জন্য আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় পেলীর দেহে প্রাণের অস্তিত্ব চিহ্ন প্রকাশ পাইল। পেলী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। আমার সময় হয় নাই। যমদূতেরা আমাকে ভুল করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কে একজন বলিলেন যে, ইহাকে কেন আনিলি, ফিরিয়া রাখিয়া আয়, পেলাকে আনিতে হইবে। এই কথার পরই আমাকে ফিরাইয়া দিয়া গেল।"

রাত্রের এই ব্যাপার পাড়ায় রাষ্ট্র হইল। একজন ভদ্রলোক রাস্তায় যাইতে যাইতে পেলাকে কাষ্ঠ কাটিতে দেখিতে পাইলেন। পেলারাম কাষ্ঠ কাটিয়া মজুরি করিয়া জীবন যাপন করে সে ব্যক্তি দীর্ঘকায় বেশ বলিষ্ঠ ও প্রৌঢ় বয়স্ক ছিল। শালকিয়ায় পেলীর নিকটেই তাহার বাটী ছিল।

তিনি পেলারামকে বলিলেন "ওহে প্যালারাম! পেলী কি বলে শুনিয়াছ? এবার যে তোমার পালা, তুমি কাট কাটিতেছ কি তোমাকে যে যাইতে হইবে।"

পেলারাম, তখন বেশ সুস্থকায়, দেহে রোগের নাম গন্ধ নাই, এক সের চাউলের প্রত্যহ খবর রাখিয়া থাকে। তদুত্তরে বলিল "ঢের বেটী ও রকম বলিয়া থাকে, মশায়! পেলারামের এখন যাইবার ঢের দেরি আছে।"

পরদিন প্রভাতে শুনা গেল, পেলারাম গত রাত্রে কলেরায় আক্রান্ত হইয়া ভোরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। শালকিয়া অঞ্চলের প্রাচীন অনেক লোকের নিকট এখনও এই কথা শুনা যায়।

২। আমাদের কোন আত্মীয়ের বাটীতে একজন চাকরাণী ছিল। তাহার নাম সারদা দাসী, লোকে তাহাকে সারিঝি বলিত। হাবড়ায় তাহার একখানি মাটির ঘরও ছিল, তথায় তাহার এক ভগিনীও থাকিত। সারি ঝিয়ের একবার বড়ই অসুখ। সে নিজের বাটীতে শয্যাগত আছে, শুনা গেল সারি আর বাঁচিবে না, যায় যায় হইয়াছে। সারি মরিল, কান্না উঠিল। গরীব, কে তাহার সৎকার করিবে, খরচাই বা কোথা হইতে আসে? কাজেই মরা পড়িয়া রহিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে শুনিলাম, সারি বাঁচিয়াছে, কথা কহিতেছে। তাহাকে ভুলিয়া যমদূতেরা লইয়া গিয়াছিল। তথায় তাহার বড় ক্ষুধা বোধ হয়। সে দূতেদের নিকট খাদ্য চায় ও নানাপ্রকার খাদ্য সে সাজান দেখিতে পায়। কিন্তু জীবিতকালে তাহার বড় দান ধ্যান না থাকায় অপর খাদ্যাদি তাহার ভোগের জন্য নহে জানিল, কেবল সেকয়েকটি চিড়া পাইল। পরক্ষণেই তাহার ফিরিবার আদেশ হওয়ায় সে চিড়া গুলি হাতের মুঠার ভিতর করিয়া লইয়া আসিয়াছে। হাত খুলিয়া নাকি সে দেখিয়াছিল তাহা চিড়া নহে। সে গুলি [illegible] ও চুলে পরিণত হইয়াছে। পরে আমরা সারি

ঝীকে জীবিত থাকিয়া কয়েক বৎসর কাজ করিতে দেখিয়াছি ও তাহার মুখে অনেক বার তাহার যমালয় হইতে ফেরত আসার কথা শুনিয়াছি। *

৩। একটি পরিচিত পদস্থ ব্যক্তি ওকালতি করিয়া থাকেন। এখনও তিনি জীবিত আছেন। ইহার একবার দারুণ বসন্ত হয়। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া আকার বীভৎস হইয়া উঠে। কলাপাতা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখা হয়, দুর্গন্ধের জন্য তাহার ঘরে কাহারও

---

* ইহারই একটী অনুরূপ ঘটনা বিষ্ণুপুরে ঘটিয়াছিল। আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোনও প্রয়োজন বশে বিষ্ণুপুরে গিয়াছিলাম। সেই খানেই জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তির কাছে নিম্ন লিখিত ঘটনাটী শুনিয়াছিলাম। বিষ্ণুপুরে ধুনী কামারণী বলিয়া জনৈকা স্ত্রীলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেও যমদূত কর্ত্তৃক অসময়ে যমালয়ে নীত হইয়াছিল। মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরেই সে পুনর্জ্জীবিত হয়। সে বলিয়াছিল যমালয়ে প্রবল ক্ষুধায় সে কাতর হয়। সম্মুখে নানাবিধ আহার্য্য দেখিয়া সে তাহা গ্রহণের অভিলাষ করে। কিন্তু যমদূত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। যমদূতে তাহাকে বলে "এ সব সামগ্রী তোর নয়। এ সমস্ত খাদ্য অযোধ্যার লালমোহন বাঁড়ুয্যের। তোর খাদ্য এদেশে নাই।" অযোধ্যা বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের সন্নিহিত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ দেশ প্রসিদ্ধ। এই বংশের লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ দাতা ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি একটা দুর্ভিক্ষের সময়ে তাঁহাদের গৃহে অনেক ধান্যের আমদানী হইয়াছিল। লালমোহন বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর বাবু সেই ধান্য বাঁধিতে অর্থাৎ গোলাজাত করিতে দাদাকে অনুরোধ করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "এ দারুণ দুর্ভিক্ষের দিবসে ইহাকে নীচে না বাঁধিয়া উপরে বাঁধাই কর্ত্তব্য। তাঁহার আদেশমত সেই সমস্ত ধান্য দরিদ্রদিগকে বিতরিত হইয়াছিল। ধুনি ফিরিয়া বুঝিয়াছিল, এখানে সে কখন কাহাকেও কিছু খাওয়ায় নাই, এই জন্য পরলোকে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির আহার নাই। সে যতদিন বাঁচিয়াছিল, ততদিন যথাশক্তি খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ডাকিয়া দান করিত। শাস্ত্রে উক্ত আছে এখানে যে যাহা ত্যাগ করিবে উপরে তাহা সঞ্চিত হইবে। যাহা রাখিবে তাহা তোমার পক্ষে নষ্ট হইবে। তন্নষ্টং যদ্দীয়তে।

অং সং

যাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভক্তিমতী সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষাদি করিতেন। তিনি দেখিতেন, যেন তিনি একটি মনোরম সরোবর তীরে মনোরম তৃণশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। পদ্মাদি পুষ্পের সৌরভে ঐ স্থান সৌরভান্বিত হইতেছে। অন্তরেও তিনি শান্তি বোধ করিতেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শিরোদেশে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা ও গঙ্গাজল তাঁহার আদেশমত রাখা হইয়াছিল।

কয়েকদিন পরে তাঁহার বোধ হইল যেন কয়েকজন ভীমকায় দ্বারবান আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে "ঠাকুর চল।" তিনি বলিলেন, "তোমরা কে বাপু?" উত্তর হইল, "আমরা যমদূত।" তিনি বলিলেন, "কেন তোমাদের ত আমাকে লইয়া যাইবার অধিকার নাই, আমার মস্তকের নিকট গীতা ও গঙ্গাজল রহিয়াছে।"

যমদূতগণ যেন একটু গা-টেপাটিপি করিয়া হাস্য করিল। পরক্ষণেই তিনি অনুভব করিলেন যেন তিনি একটি খট্টায় শায়িত আছেন ও ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্যে উঠিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে একটি প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য মধ্যে যেন তিনি নীত হইলেন। তথায় সূর্য্যের মত একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে ও একটি পুরুষের গুরুগম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। কিন্তু তাঁহাকে তিনি দেখিতে পাইলেন না। অনেক লোকে "বাপরে, গেলাম রে" করিয়া চীৎকার করিতেছে। চকিতের মধ্যে একটি শব্দ হইল, "একে কেন, লে যাও।" অমনি তাহার খট্টা ঘুরিতে ঘুরিতে নামিতে লাগিল ও তিনি যেন আপনার বাটীর সেই রুগ্নশয্যায় আসিয়া পড়িলেন। কিছুদিন পরেই তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন। ইহা প্রায় আজ দশ বৎসরের কথা হইবে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বি, এল

ভৌতিক মূর্চ্ছা ও উন্মাদ।

"ভৌতিক মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া ফিট"কে লোকে একটী সাধারণ রোগ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। মূর্চ্ছা একটী রোগ বটে কিন্তু অধিকাংশ সময় উহা সাধারণ রোগের পরিবর্ত্তে কিছু দ্বারা জুষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়। এই মূর্চ্ছা রোগ হইতে অনেক সময় উন্মাদ রোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে দুষ্ট আত্মাগণ বা দেব, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতিরা নিজ নিজ কার্য্য সিদ্ধির আশায় অথবা খেলা করিবার জন্য মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

প্রাচীন-বৈদিক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রোগ নির্ণয়ের একস্থানে লিখিত আছে—

অমর্ত্ত্য বাগ্বিচেষ্টো জ্ঞানাদি বিজ্ঞান বলা দিভির্যঃ।

উন্মাদ কালো নিয়তশ্চ যস্য ভূতোত্থমুন্মাদ মুদাহরেত্তম্॥

ভূতোন্মাদ রোগে রোগীর বাক্য, বিক্রমশক্তি ও শারীরিক চেষ্টা সকল অমানুষিক হইয়া থাকে ; এবং তাহার তত্ত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানদি বিষয়ক ক্ষমতা এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে মনুষ্যে সেরূপ কখনই সম্ভবে না। বাতিকাদি উন্মাদ রোগের যেমন বৃদ্ধিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে, ভূতোন্মাদ রোগের তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধিকাল নাই।

সন্তুষ্টঃ শুচিরতি দিব্যমাল্য গন্ধো নিস্তন্দ্রীরবিতথ সংস্কৃত প্রভাসী।

তেজস্বী স্থির নয়নো বর-প্রদাতা ব্রহ্মণ্যো ভবতি নরঃ স দেব জুষ্টঃ॥

দেব গ্রহ জনিত উন্মাদ রোগে রোগী সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, শুদ্ধাচার, দিব্যমাল্যের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট, অনিদ্র, বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষী, তেজস্বী, স্থির নয়ন, বরদাতা ও ব্রাহ্মণানুরক্ত হইয়া থাকে।

সংস্বেদী দ্বিজগুরুদেব দোষ বক্তা জিহ্মাক্ষো বিগত ভয়ো বিমার্গ দৃষ্টিঃ।
সন্তুষ্টো ন ভবতি চান্ন পান জাতৈর্দুষ্টাত্মা ভবতি দেব শত্রু জুষ্টঃ॥

অসুর গ্রহ জনিত উন্মাদ রোগে রোগী ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর ব্রাহ্মণ গুরু ও দেবগণের দোষ বক্তা, কুটিল নেত্র, ভয়হীন, বিমার্গ-দৃষ্টি, দুষ্টাত্মা ও প্রচুর পান ভোজনেও অসন্তুষ্ট চিত্ত হয়॥

হৃষ্টাত্মা পুলিন বনান্তরোপসেবী স্বাচারঃ প্রিয় পরিগীত গন্ধ মাল্যঃ।
নৃত্যন্‌বৈ প্রহসতি চারুচালপ শব্দং গন্ধর্ব্ব গ্রহ পরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥

গন্ধর্ব্ব গ্রহজনিত উন্মাদ রোগে রোগী হৃষ্টাত্মা, পুলিন সেবী, বনমধ্য-বিহারী, অনিন্দিতাচারী, সঙ্গীত প্রিয় ও গন্ধমাল্যানুরক্ত হয়। এবং মনোহর নৃত্য করিতে করিতে মৃদু মধুর হাস্য করিতে থাকে।

তাম্রাক্ষঃ প্রিয় অনুরক্ত বস্ত্রধারী গম্ভীরো দ্রুতগতি রল্প বাক্ সহিষ্ণুঃ।
তেজস্বী বদতি চ কিং দদামি কস্মৈ যো যক্ষগ্রহ পরিপীড়িতো মনুষ্যঃ॥

যক্ষগ্রহ জনিত উন্মাদ রোগে রোগী তাম্র নেত্র, অতি সুন্দর সুক্ষ্মরক্ত বস্ত্রধারী, গম্ভীর প্রকৃতি, দ্রুতগামী, অল্পভাষী, সহিষ্ণু ও তেজস্বী হয় এবং কাহাকে কি দান করিব এই কথা বারংবার বলিতে থাকে।

প্রেতানাং সদিশতি সংস্তরেষু পিণ্ডান্ শান্তাত্মা জলমপি চাপসব্যবস্ত্রঃ।
মাংসেপ্সু স্তিল গুড় পায়সাভিকামস্তদ্ভক্তো ভবতি পিতৃগ্রহাভি জুষ্টঃ॥

পিতৃগ্রহজনিত উন্মাদ রোগে রোগী বামোত্তরীয় হইয়া শান্তচিত্তে কুশপ্রদ রচিত আস্তরণে মৃত পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ড ও জল প্রদান করে। এই পিতৃ গ্রহ জুষ্ট ব্যক্তি একান্ত পিতৃভক্ত এবং মাংস-তিল-গুড়-পায়সাভিলাষী হয়॥

যস্তুর্ব্যাং প্রসরতি সর্পবৎ কদাচিৎ সৃক্কন্তৌ বিলিহতি জিহ্বয়া তথৈব।
ক্রোধালুর্গুড় মধুদুগ্ধ পায়সেপ্সু র্জ্ঞাতব্যো ভবতি ভুজঙ্গমেন জুষ্টঃ॥

নাগ গ্রহ জনিত উন্মাদ রোগে রোগী, কদাচিৎ সর্পের ন্যায় বুকে ভর

দিয়া ভূমিতে পরিসর্পণ ও জিহ্বা দ্বারা মুহুর্মুহুঃ ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয় লেহন করে। এই ভুজঙ্গম জুষ্ট ব্যক্তি ক্রোধালু এবং গুড় মধু দুগ্ধ পায়সাভিলাষী হয়।

মাংসাসৃগ্বিবিধ সুরা বিকার লিপ্সু
নির্ল্লজ্জো ভৃথামতি নিষ্ঠুরো হতিশূরঃ।
ক্রোধালু র্বিপুলবলো নিশা বিহারী
শৌচদ্বিড়্ ভবতি স রাক্ষসৈ র্গৃহীতঃ॥

রাক্ষস গ্রহ জনিত উন্মাদ রোগে রোগী মাংস রক্ত এবং সুরাজাত বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রিয়, অত্যন্ত নির্লজ্জ, অতিশয় নিষ্ঠুর, অতি শূর, ক্রেধালু, বিপুল বলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচ বিদ্বেষী হইয়া থাকে! (রাক্ষস শব্দে ব্রহ্ম রাক্ষসাদিও বুঝিতে হইবে)।

উদ্ধস্তঃ কৃশ পরুষোহচির প্রলাপী দুর্গন্ধো ভৃশ মশুচি স্তথাতিলোলঃ।
বহ্বাসী বিজন বনান্তরোপসেবী ব্যাচেষ্টন্ ভ্রমতি রুদন্ পিশাচ জুষ্টঃ॥

পিশাচ গ্রহ জনিত উন্মাদ রোগে, রোগী ঊর্দ্ধবাহু (কোন কোন গ্রন্থে উদ্বস্ত্র অর্থাৎ উলঙ্গ এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়,) কৃশ, রুক্ষাঙ্গ, সদা প্রলাপ ভাষী, দুর্গন্ধ দেহ, অতি অশুচি, অন্ন পানাদিতে বড়-লোলুপ, বহু ভোজী, জনশূন্য বনস্থলে ভ্রমণ শীল, বিরুদ্ধাচারী ও রোদন পরায়ণ হইয়া থাকে; এবং সর্ব্বদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়॥

স্থূলাক্ষো দ্রুত মটনঃ স ফেনলেহী নিদ্রালু পততি কম্পতে চ যোহি।
যশ্চাদ্রিদ্বিরদ নগাদি বিচ্যুতঃ স্যাৎ সো হসাধ্যো ভবতি তথা ত্রয়োদশাব্দে॥

গ্রহগণ, হিংসার্থ বা ক্রীড়ার্থ অথবা পূজা প্রাপ্তির জন্য মনুষ্য দেহে প্রবেশ করে। হিংসার্থ গৃহীত ব্যক্তি স্থূলাক্ষ, দ্রুতগমন শীল, ফেনলেহন-কারী ও নিদ্রালু হয় এবং পতিত হইয়া কাঁপিতে থাকে। এরূপ রোগীকে অসাধ্য জানিবে।

কিম্বা যে পর্ব্বত, হস্তিপৃষ্ঠ বা বৃক্ষাদি উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়াই

গ্রহ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তাহাকেও ত্যাজ্য জ্ঞান করিবে। এবং ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে সকল প্রকার উন্মাদ রোগীকেই চিকিৎসার বহির্ভূত মনে করিবে॥

দেব গ্রহাঃ পৌর্ণমাস্যামসুরাঃ সন্ধ্যয়োরপি।
গন্ধর্ব্বাঃ প্রায়শোঽষ্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপদ্যথ॥
পিত্র্যাঃ কৃষ্ণক্ষয়ে হিংস্যুঃ পঞ্চম্যামপি চোরগাঃ।
রক্ষাংসি রাত্রৌ পিশাচাশ্চতুর্দ্দশ্যাং বিশন্তিহি॥

দেবগণ প্রায় পূর্ণিমা তিথিতে, অসুরেরা সন্ধ্যাদ্বয়ে, গন্ধর্ব্বগণ অষ্টমীতে, যক্ষগণ প্রতিপদে, পিতৃগণ অমাবস্যায়, নাগগণ পঞ্চমীতে, রাক্ষসগণ রাত্রিতে, পিশাচেরা চতুর্দ্দশীতে নরদেহে প্রবেশ করে।

দর্পণাদীন্ যথাচ্ছায়া শীতোষ্ণং প্রাণিনো যথা।
স্বমণিং ভাস্করার্চ্চিশ্চ যথা দেহঞ্চ দেহধৃক্॥
বিশন্তি চ ন দৃশ্যন্তে গ্রহাস্তদ্বচ্ছরীরিণঃ।
প্রবিশ্যাশু শরীরে হি পীড়াং কুর্ব্বন্তি দুঃসহাম্॥

যেরূপ প্রতিবিম্ব দর্পণাদিতে, শীতোষ্ণ প্রাণিগণে, সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যকান্ত-মণিতে এবং জীবাত্মা জীবশরীরে প্রবেশ করে অথচ কাহারও দৃশ্য হয় না। সেইরূপ গহগণও মনুষ্য শরীরে কখন প্রবেশ করে তাহা কাহারও দৃষ্টি গোচর হয় না, তাহারা শরীরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুঃসহ পীড়া উৎপাদন করে॥

সেই বৈদিকযুগের মনীষী ধার্ম্মিক মুনি ঋষিগণ এইরূপে ভূত যক্ষাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন। (কুমারটুলি)



প্রেতত্ত্ব

চাঁদপুরের কোনও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যারি হিষ্টিরিয়া ফিট হইতেছিল। কোন বন্ধু বিশেষের অনুরোধে তাহাকে দেখিতে গেলাম। ইতিপূর্ব্বে নানাস্থানে অনেক রোগীই আমাদের হাতে আরোগ্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু, আমরা চাঁদপুরেই লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত বলিয়া উক্ত স্থানের অনেকেই আমাদের প্রতি ততটা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। অতএব আমরাও প্রথমত চাঁদপুরের কোনও রোগীকে উৎসাহের সহিত দেখিতে যাইতে পারিতাম না।

যাহা হউক, আমার বন্ধু-প্রবর, রোগিণীর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। আমিও একটু লজ্জিত ও সান্দগ্ধ চিত্তে রোগিণীর পার্শ্বে যাইয়া বসিলাম। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমরা (আমি এবং আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়) আমাদের আধুনিক প্রক্রিয়া গুলা জানিতাম না। তাই, মেস্‌মেরাইজ্ করিয়াই আত্মা আহ্বানের সঙ্কল্প করিলাম।

পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন যে, অবিশ্বাসীর সহবাস কিরূপ ভীষণ। অবিশ্বাসীর পরীক্ষাগার কারাগার অপেক্ষা কোন অংশেই উত্তম স্থান বলিয়া মনে হয় না। আমার পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। বহু সংখ্যক আস্থা-শূন্য পরীক্ষকের মধ্যস্থানে বসিয়া, বিধাতাকে স্মরণকরতঃ কার্য্য আরম্ভ করিলাম। জানিতাম না বিধাতা আমার এই পরীক্ষায় সাফল্য প্রদান করিবেন কি না।

যাহা হউক মেস্‌মেরাইজ করিয়াই আত্মা আহ্বান করিলাম এবং কোনও আত্মা আসিয়াছেন অনুমান করিয়া রোগিণীকে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলিলাম। রোগিণী কিছুকাল যাবৎ নানা পীড়ায় এত কাতর

হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহার উত্থান শক্তি পর্য্যন্ত একপ্রকার রহিত হইয়াছিল, এমতাবস্থায় তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সকলেই একটু বিস্মিত হইলেন। ক্রমে রোগিণীকে কেবলমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর করিয়া দাঁড় করাইলাম এবং পরে শয়ন করাইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলাম :

প্রঃ। আপনি কে ?

উঃ। আমি বনদেবী।

প্রঃ। কোথায় থাকেন ?

উঃ। বিন্ধ্যাচলে।

প্রঃ। এই মেয়ের কি রোগ ?

উঃ। ইহার ফিট হয়।

প্রঃ। ইহার (আবিষ্টার) উপর কি কোনও আত্মার দৃষ্টি আছে ?

উঃ। না কোনও আত্মার দৃষ্টি নাই ; তবে সেদিন একটা আত্মা এসেছিল।

প্রঃ। তিনি কি এখন এখানে আছেন ?

উঃ। না।

প্রঃ। কি হইলে ইহার অসুখ যাবে ?

উঃ। ইহার নামে পূজা মানসিক আছে তা' দিলেই আর কোনও অসুখ থাকবে না।

ইতিপূর্ব্বে আবিষ্টার কোনও রোগ উপলক্ষে দেবতার পূজা মানস করা হইয়াছিল, রোগিণী তাহা জানিতেন। তাই মানসিক পূজার কথা বলায়, আত্মার আগমন সম্বন্ধে কাহারো বিশেষ কোনও প্রতীতি জন্মিল না। সুতরাং পরীক্ষা স্বরূপে প্রশ্ন করাই এস্থলে স্বাভাবিক। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই হইল। পরীক্ষা যে কেবল আত্মার পরীক্ষা এমন নহে। বলিতে গেলে ইহা আমারও একটা পরীক্ষা বিশেষ। তাই আবার প্রশ্ন চলিল।

প্রঃ। বলুন দেখি এঘরে ক'জন পুরুষ আছেন ?

উঃ। আট জন।

প্রঃ। মেয়ে ক'জন।

উঃ। চার জন।

প্রঃ সকল পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের নাম করিতে পারেন ?

এই প্রশ্ন করামাত্রই আবিষ্টা গৃহস্থিত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের নাম করিতে লাগিলেন। একটী বৃহৎ ইষ্টক-গৃহের কোনও একটী কামরায় বসিয়া আমরা উক্ত কার্য্য করিতেছিলাম। যে সমুদায় লোক ঐ গৃহের বিভিন্ন স্থানে ছিল এবং আবিষ্টা কখনও যাহাদের নাম জানিতেন না, তেমন লোকেরও নাম করিলেন। তথাপিও অনেকেই আত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া আবার প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত সকল কথাই সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বাহিরে কে আসিতেছিলেন, গৃহস্থিত ব্যক্তিগণ কেবল কাষ্ঠপাদুকার দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই, আবিষ্টাকে প্রশ্ন হইল :—

প্রঃ। বলুন দেখি কে আসিতেছেন ?

উঃ। হরদয়াল বাবু।

প্রঃ। বারান্দায় কে ?

উঃ। শ্যামাচরণ বাবু।

প্রঃ। জজ সাহেব এখানে আসবেন কবে ?

উঃ। আগামী রবিবার।

প্রঃ। তা'র সঙ্গে আর কেউ আসবেন ?

উঃ। হাঁ, তা'র মেম আসবেন।

প্রঃ। জজ সাহেবের মেম কোন দেশীয় লোক ?

উঃ। বাঙ্গালী।

উল্লিখিত সকল কথাই সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল। আবিষ্টার কথিত রবিবার দিবস যদিও জজ সাহেবের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু শয্যা-শায়িনী রোগিণীত দূরের কথা, অনেক পুরুষও তাহা জানিতেন কিনা সন্দেহ।

প্রঃ। আনন্দ বাবুর মোকদ্দমা আজ হবে ?

উঃ। না।

প্রঃ। কবে হবে ?

উঃ। দু' একদিন পরে।

প্রঃ। হারবেন না জিতবেন ?

উঃ। জিতবেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দবাবু ত্রিপুরা জিলার কোনও প্রসিদ্ধ জমীদারের নায়েব। ঘটনাক্রমে সে সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। একটা বড় মোকদ্দমা লইয়া তিনি অনেকদিন যাবৎ ঘুরিতেছিলেন। যে দিবস মিডিয়মের সাহায্যে এই সংবাদ লইতেছিলাম সেই দিবসই উক্ত মোকদ্দমার রায় বাহির হইবার কথা ছিল। কিন্তু পরিণামে আবিষ্টার কথা সত্য হইল।

এই সময়ে মাধ্যমিকের দেহস্থিত আত্মা যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তাই শেষোক্ত কথা দুইটার পরেই তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

প্রঃ। আপনাকে আবার পাব ?

উঃ। ডাকিলেই আসব।

ইহার পরেই রোগিনীকে চৈতন্য সঞ্চার করা হইল এবং উহার পরে আর কখনো তাহার ফিট হয় নাই।

শ্রীসতীশ চন্দ্র গাঙ্গুলী।

গঁদখালীর পতন।

"দাদা, ফের, ফের,"

বহুদিনের কথা হইলেও প্রবাদবাক্যের ন্যায় কথাগুলি পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে ও তাহার শেষ ফলও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতেছে বলিয়া আমরা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

যশোহরের ঝিকরগাছা ষ্টেশনের এক ক্রোশ পশ্চিমে গঁদখালী একটী গণ্ডগ্রাম। পূর্ব্বগৌরব বর্ত্তমান না থাকিলেও, প্রাচীন নিদর্শন এখনও যাহা আছে, তাহা পূর্ব্বের গৌরবের অবস্থা সূচিত করে। এই গ্রাম সংলগ্ন পটুয়াপাড়া গ্রামে একটী প্রাচীন কালীমন্দির আছে। উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

কোন সময় বড় গোসাঞী, ছোট গোসাঞী নামে দুই সহোদর সিদ্ধ পুরুষ এখানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই গঁদখালীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভগিনীর বাটি ও বহু ব্রাহ্মণের বাস বলিয়া এখানে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের অনুষ্ঠান ছিল। সর্ব্বদাই হাস্য কোলাহলে গ্রামখানি মুখরিত থাকিত। সান্ধ্য আরতির সময় অনেকানেক ভদ্রমহোদয় মায়ের বাটীতে আগমন করত আহ্নিকাদি সম্পন্ন করিতেন ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গোসাঞীদের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চাদি করিতেন।

কালক্রমে বড় গোসাঞী স্বর্গারোহণ করিলেন। তাহার আদেশে তাঁহাকে মন্দির পার্শ্বেই সমাহিত করা হয়। ছোট গোসাঞী বহুদিন একাকী মন্দিরে রহিলেন। অনেক শিষ্য হইয়াছিল। তাহারা তাঁহার নিকটে সর্ব্বক্ষণ থাকিত। ক্রমে তাঁহারও অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যগণকে বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখিলেন—যেন অগ্রজের

পার্শ্বে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। দুর্ব্বুদ্ধি শিষ্যগণ হিন্দু হইয়া সমাধি দেওয়া পছন্দ করিল না। সকলে মহাড়ম্বরে কপোতাক্ষ তীরে তাঁহাকে লইয়া চলিল। পথে তিন বার শববন্ধন ছিন্ন হইয়া পড়িল, তথাচ তাহাদের চৈতন্য হইল না। যথারীতি সৎকার করিয়া সকলে গৃহে ফিরিল কিন্তু ২।৩ দিনের মধ্যেই বাহকগণ একে একে ভীষণ ওলাউঠায় আক্রান্ত হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করিল। পীড়া সংক্রামক হইল ও অত্যল্পকাল মধ্যে বহুজনপূর্ণ গঁদখালীকে শ্মশানে পরিণত করিল। লেখকের বাস-গ্রাম হইতে ৪ মাইল মাত্র ব্যবধান বলিয়া উক্তগ্রাম সম্যক্ পরিচিত।

গ্রামে যখন এইরূপে লোক মরিতে লাগিল, তখন অন্য গ্রাম হইতে জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আইসেন। সন্ধ্যা অতীত হইতেই বাটীতে পৌঁছিলেন। দেখিলেন, দালান মধ্যে আলোক জ্বলিতেছে। তাঁহার ভগিনী তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বলিলেন, "দাদা, আমরা সব শয্যাগত, ঐ খানে জল আছে, হাত পা ধুইয়া তামাক খাও, কে দিবে?"

ভ্রাতাটী তাহাই করিলেন। তামাক খাইতে খাইতে মনে করিতেছিলেন, ক্ষুধা পেয়েছে, আহারের ব্যবস্থা কি হইবে? ঠিক তখনই তাঁহার ভগিনীও বলিলেন—"ভাই, পাকও নিজেকে করিতে হইবে। সব গোছানো আছে, এক পাকেই আজ সারিয়া লও।" ভ্রাতাটী পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন নিজেকেই পাক করিতে হইবে। পাক-ঘরে যাইয়া দেখেন,— আয়োজন ঠিক আছে। অন্নপাক করিয়া আহারে বসিলেন। ক্ষুধা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মনে করিলেন, এখন একটু তেঁতুল পাইলে ভাল হয়। যেই মনে করা, অমনি দেখেন অপর ঘর হইতে সুদীর্ঘ বাহু বাহির হইয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া তাহার পার্শ্বেই একবিন্দু তেঁতুল দিল! ব্রাহ্মণের চক্ষু স্থির! আহার ঐ পর্য্যন্তই শেষ। অসাড় দেহ লইয়া প্রতিবাসীর বাটীতে ছুটিয়া গেলেন। যখন ভগিনীর বাটী হইতে তিনি দৌড় দেন,

তখন গৃহ হইতে ভগিনী "দাদা, কোথায় যাও, ফের, ফের," বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল! ব্রাহ্মণের কাণে না গেলেও, তাহা প্রতিবাসীরা শুনিতে পাইল। হঠাৎ ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহাদের বুঝিতে বাকি থাকিল না। প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি জানিলেন—তাঁহার ভগিনীর বাটীতে কেহই নাই, তাঁহার ভগিনীর সেই দিন মৃত্যু হইয়াছে, সকলের শেষে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সৎকারও হয় নাই, গৃহ মধ্যেই শব আছে। কে কাহাকে দেখে? সব বাটীতেই বিপদ! ব্রাহ্মণ কোন মতে তথায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতে বাটী ফিরিলেন। তেঁতুল দেওয়া ব্যাপারটা অমর হইয়া রহিল।

গ্রামখানি তদবধি জঙ্গলাবৃত। ২।১ ঘর ব্রাহ্মণ গ্রামের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক সাক্ষী আছেন মাত্র।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ। হেডমাষ্টার, বাসুন্দিয়া।

গুরু সেবার ফল।

"ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ। গুরোঃসেবা পরংনাস্তি, নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরং॥" মন্ত্রসিদ্ধির একটি সহজ ও সুগমপথ মন্ত্রদাতা গুরুর সেবা করা। এসেবা কিরূপ, খানসামা যেমন বাবুর সেবা করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা একটু বেশী। গুরুর নিদ্রোত্থান হইতে রাত্রি কালে পুনরায় নিদ্রিত হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার সমুদয় কার্য্য নিজে সুচারুরূপে সম্পাদন করা। গুরুতন্ত্রে এই মর্ম্মে উপদেশ থাকা দেখা যায়। এস্থলে

তাহা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমরা এই প্রবন্ধে দুইটি শিষ্যের গুরুসেবার ফলে অলৌকিক অবস্থা লাভ করার কথা বর্ণনা করিব। বলা বাহুল্য ইহার ভিতর বিন্দু মাত্র রঞ্জিত নাই।

(১) আমার সহোদর শ্রীমান গণেশচন্দ্র গুরুদেবের সহিত হাকোলা হইতে আন্দুলে রথযাত্রা দেখিতে যায়। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল পদব্রজে চলাফেরা করায় সন্ধ্যায় বাটীতে আসিয়া গুরুদেব একটু ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন। সন্ধ্যার 'আরতি' অন্তে তিনি আসনে শুইয়া পড়েন ও গণেশকে পদসেবা করিতে বলেন। গণেশ তাঁহার পদ প্রান্তে বসিয়া পদসেবা করিতে থাকে। ঘণ্টাধিক কাল নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে পদসেবা করিতে করিতে সে একটু ক্লান্ত বোধ করিয়া পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়ে, এবং একটু তন্দ্রা বা বাহ্যজ্ঞান শূন্য হওয়া মত অবস্থা হইয়া পড়ে এই অবস্থায় সে দেখিল, তাহার আরাধ্য ধন ৺কালিকা মাতা তাহাকে বলিতেছেন "গণেশ তুই আমাকে একজোড়া শাঁখা দিস" গণেশ বলিল "মা কোথায় দিব?" উত্তর, "তুই গঙ্গায় ফেলিয়া দিস।" পরে তাহার আচ্ছন্নাবস্থা কাটিয়া গেল, সে উঠিয়া বসিল। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "গণেশ কি দেখিলে?" গণেশ সমুদয় তাঁহাকে বলিল। তিনি বলিলেন "তোমার গুরু সেবার আজ এই ফল হইল।"

গণেশ তৎকালে কলিকাতায় চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করে। বাটী হইতে হাবড়ায় আসিয়া আমাকে উক্ত ঘটনা বলিল। আমি শাঁখা কিনিবার ব্যবস্থা করিলাম। আমি তখনও ওকালতি পড়িতেছি, বুদ্ধিটা কিছু খুলিতেছে, কাজেই বলিলাম "শাঁখা দুইগাছি ছুঁড়িয়া দিলে জলের দুই স্থানে পড়িতে পারে, অতএব তুমি একটি টিনের কৌটা খরিদ করিও, ঐ কৌটার ভিতর করিয়া শাঁখা দেওয়া হইবে।" শাঁখা আনিয়া কৌটা মধ্যে রাখিয়া তাহা লইয়া গণেশ হাবড়ার চিন্তামণি দের ঘাটে গিয়া, মধ্যাহ্নে যখন ঘাটে প্রায়

লোকজন থাকে না সেই সময় স্নানে নামিয়া একটু সাঁতার দিয়া, দূরে গিয়া কৌটাটি ছুঁড়িয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিল ; এবং স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ঘাটের উপর বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে গঙ্গার জলের উপর মায়ের দুই হস্ত জাগিয়া উঠিল। দুইহাতে গণেশের প্রদত্ত শাঁখা রহিয়াছে দেখিতে পাইল। অবশ্য গণেশ চক্ষু মুদিয়া থাকা কালেই এরূপ দেখিল।

(২) আমার স্ত্রীর সূতিকাগারে থাকা কালে দীক্ষালাভ ঘটে। আমার প্রথম পুত্র গুরুচরণ বাবাজীর ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রসূতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ইত্যাদি আসায় অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়, এই সময় গুরুদেব আসিয়া পড়ায় তাঁহাকে দীক্ষা দিবার কথা জানাতে তিনি পঞ্চম দিনে উহাকে দীক্ষা দিলেন। দীক্ষার দিন হইতে মূর্চ্ছা ও জ্বর আর হইল না। চিকিৎসক বলিলেন গুরু কৃপায় রোগ সারিয়া গেল। যাহা হউক দীক্ষার পরে তিনি চারি মাস যাবত তাহার ইষ্ট মূর্ত্তির দর্শন না ঘটায় গুরুদেবকে একথা জানাইতে তিনি বলিলেন, এ অবস্থায় তাহার প্রাণায়াম করা চলিবে না। কাজেই তাহাকে দর্শন জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। আরও দুই মাস কাটিয়া গেল। গুরুদেবও আমরা সকলে হাকোলার বাটীতে আসিয়াছি। পাড়াগায়ে পায়খানা না থাকায় সকলকে শৌচার্থ বাগানে যাইতে হয়। গুরুদেবের থাকিবার স্থান উপর তলায় ছিল তথা হইতে নামিয়া বাগানে যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া বাটীর ছাদের উপর তাঁহার শৌচ প্রস্রাবের ব্যবস্থা ছিল।

এক দিন ছাদে শৌচাদি করিবার পর শীতকালের রৌদ্রে এত দুর্গন্ধ হইল যে, বাটীর মধ্যে থাকা কষ্টকর হইয়া উঠিল। ছাদ পরিষ্কার করা প্রয়োজন হইল। বাটীর কেহই দুর্গন্ধ বশতঃ ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইলেন না। আমার স্ত্রী নিজে তাহা বেশ করিয়া পরিষ্কার করিল। গন্ধাদি

দূর হইল। সেইদিন সন্ধ্যায় মন্ত্রজপ কালে তাহার ইষ্ট মূর্ত্তি দর্শন হইল, ও তদবধি তাহার দৃষ্টি খুলিয়া দর্শন শক্তি অনেকটা বিকাশ লাভ করিয়াছে; জ্যোতিরভ্যন্তরে মনোরম মূর্ত্তি যাহা পৃথিবীর কোন কারিকরে গড়িতে পারে না—এরূপ মনোরম মূর্ত্তি দর্শন হইতে লাগিল। গুরুর মলমূত্র পরিষ্কার করায় এইরূপ ফল হইল।

ইহা হইতে পাঠক গণ গুরুসেবার আবশ্যকতা অনেকটা অনুভব করিতে পারিবেন ও সুযোগ পরিত্যাগ না করেন, ইহাই আমার অনুরোধ। ক্ষণেকের সেবায় যেরূপ আশ্চর্য্য ফল দেখা গেল, শাস্ত্রমতে একবৎসর কাল ধরিয়া গুরুদেবের মুখ ধুইবার জল দেওয়া, গৃহ পরিষ্কার করা, স্নান করান, আহার্য্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করা, পদসেবা করা, শয্যা প্রস্তুত করা ও ব্যজনাদির দ্বারা নিদ্রিত করা প্রভৃতি সমস্ত দিনব্যাপি সেবায় যে কিরূপ মধুময় ফল তাহা বলা যায় না।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

খেয়ার নৌকায় মাঝি ভূত।

চারি পাঁচ বৎসর অতীত হইল, গোবিন্দ নামা একজন সূত্রধর কার্য্য উপলক্ষে সর্ব্বাঙ্গপুরে যাতায়াত করিত। গোবিন্দর বাড়ী কানাই নগর। কানাই নগর নদীয়া জেলার অন্তর্গত। এই নগর হইতে সর্ব্বাঙ্গপুর প্রায় চারি ক্রোশ দূর। সর্ব্বাঙ্গপুর মুর্শীদাবাদ জেলার এলাকাধীন। গোবিন্দ প্রাতঃকালে আহারাদি করিয়া কাজে যাইত। এবং সন্ধ্যার সময় ছুটী পাইলে বাড়ী ফিরিয়া আসিত। প্রতিদিন যাতায়াত নিবন্ধন রাস্তাঘাট তাহার

বিশেষ পরিচিত হইয়াছিল। পথিমধ্যে স্ুঁতি নাম্নী একটি নদী আছে। তাহা পার না হইলে সর্ব্বাঙ্গপুর যাওয়া যায় না। সুতরাং এই নদী গোবিন্দকে যাতায়াতে দুইবার পার হইতে হইত। একদিন গোবিন্দ কার্য্যাধিক্য বশতঃ সন্ধ্যার সময় ছুটী করিতে পারে নাই। সন্ধ্যা অতীত হইয়াছিল। গোবিন্দের স্বভাব এমন যে, যত রাত্রিই হউক না কেন, সে বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও থাকিত না, নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিত। যে বাড়ীতে গোবিন্দ কাজ করিত, সেই বাড়ীর কর্ত্তা রাত্রি হইল দেখিয়া, গোবিন্দকে বলিলেন, "গোবিন্দ আজি আর তোমার বাড়ী যাইবার আবশ্যক নাই। এই খানেই থাক।" গোবিন্দ বলিল—"তাহা কি হয় মহাশয়, আমি বাড়ী না যাইয়া থাকিতে পারিব না।" কর্ত্তা পুনরপি বলিলেন "রাত্রি অনেকটা হইয়াছে, বাড়ী পঁহুছিতে তোমার প্রায় দ্বিপ্রহর বাজিবে।" গোবিন্দ কহিল—"কি করিব।" এই বলিয়া গোবিন্দ সন্ধ্যার পূর্ব্বে যে শোল মাছ দুইটি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া হস্তে ঝুলাইয়া লইল এবং গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া বহির্গত হইল। শনৈঃ শনৈঃ পদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল মধ্যেই সুতির নিকটবর্ত্তী হইল। নদীর তীরে আসিয়া দেখিল, পারের নৌকা খানি ঘাটে বাঁধা আছে। খেয়া নৌকায় মাঝি নাই। আবার পরক্ষণেই দেখিল যেন নৌকার উপর সাদা মত কি একটা রহিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি, নক্ষত্রালোক ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আলোক নাই, ভালরূপ কিছুই দেখিতে পাইল না। আবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল। এবার বুঝিল যেন একজন মানুষ। এত রাত্রিতে নৌকাতে মাঝি ভিন্ন আর কে হইতে পারে, ভাব্যস্ত করিয়া গোবিন্দ ক্রমশঃ অগ্রসর হইল। জলের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মাঝি বলিয়া উঠিল "তুমি কি পারে যাইবে?" গোবিন্দ কহিল "হাঁ।" "তবে শীঘ্র উঠ। দেখ না পশ্চিম আকাশে একখানি

মেঘ উঠিয়াছে। ঝড় জলের সম্ভাবনা আছে।" গোবিন্দ নৌকায় উঠিবামাত্র, মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝি বিনা দাঁড়ে হা'ল টানিয়া নৌকা লইয়া যাইতে লাগিল। গোবিন্দ মাছ হাতে করিয়া বসিয়া আছে। মাঝি কহিল, "তোমার হাতে কি ?" গোবিন্দ কহিল—"এ দুটা শোল মাছ। আমি যেখানে কাজ করি, সেইখানেই ক্রয় করিয়াছিলাম, বাটী লইয়া যাইতেছি।" মাঝি কহিল "আমাকে একটা দিবে ?" গোবিন্দ কহিল "এর আবার একটা দিলে আমার কি থাকিবে ? একটাতে পরিবার সমূহের সঙ্কুলান হইবে না। না, আমি দিতে পারিব না।" "এই কথা শেষ হইতে না হইতেই মাঝি বলিল "এইত পারে আসা গেল।" গোবিন্দ ব্যস্ত হইয়া একটা পয়সা ফেলিয়া দিয়া চলিতে লাগিল; যাইতে যাইতে সম্মুখে দেখিল একটা বটবৃক্ষ। রাস্তা বটবৃক্ষের নিম্ন দিয়া। সুতরাং গোবিন্দ যেমন বটতলায় আসিয়া পঁহুছিল, অমনি কে বলিল "গোবিন্দ, আমাকে মাছ দে।" গোবিন্দ এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল কোন মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। গোবিন্দ চলিতে লাগিল। বৃক্ষতল উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আবার কে বলিয়া উঠিল—"গোবিন্দ আমাকে মাছ দে।" গোবিন্দের সন্দেহ আরও বাড়িল। ভাবিল "একি রকম ? কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, অথচ কে বলিতেছে 'গোবিন্দ আমাকে মাছ দে।' কি আশ্চর্য্য ! আমি ভূতের গল্প শুনিয়া আসিতেছিলাম, কদাচ তাহাতে বিশ্বাস করি নাই, এমনও দেখিতেছি ভূতযোনি নিশ্চয়ই আছে। এ ভূতযোনি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। যাহা হউক আমি শুনিয়াছি ভূতেরা এক সময়ে কোন বস্তু দুই বারের অধিক যাচ্ঞা করে না। দেখা যাউক যদি আর নাহি চাহে তাহা হইলে বুঝিব এ নিশ্চয়ই ভূত !" গোবিন্দ বৃক্ষতল অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। আর

সেইরূপ "গোবিন্দ মাছ দে" কেহ বলিল না। গোবিন্দ স্থির নিশ্চয় করিল এ ভূতযোনি। এই সিদ্ধান্ত করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "এইবার চাহিলেই মাছ দিব।" কিন্তু কেহই চাহিল না। গোবিন্দ সাহসী পুরুষ। কিন্তু এরূপ স্থলে সাহস থাকিলেও ভীতির সঞ্চার স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। কারণ ভয় সহজ বস্তু। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই জীব মাত্রই ভীতিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গোবিন্দ এখন ভীত, কম্পিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। হাতে যষ্ঠিও নাই। কেবলমাত্র মাছ আছে। যাইতে যাইতে পথপার্শ্বস্থিত একটি সোঁদালগাছ হইতে একটি ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া আত্মরক্ষার যত্ন করিল। এবার গোবিন্দর পূর্ব্বাপেক্ষা সাহস কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল। মনে মনে বলিতে লাগিল "যদি মরি, মারিয়া মরিব।"

কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে সে দেখিতে পাইল পথের দুই পার্শ্বস্থিত দুইটি তালগাছ শিরঃসংলগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চিন্তা করিয়া দেখিল, "এ রাস্তায় তালগাছ কখন দেখিনাই। এ দুইটি তালগাছ কোথা হইতে আসিল?" গোবিন্দ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গোবিন্দ ইতিকর্ত্তব্যতাশূন্য হইয়া, অবশেষে তালগাছের ভিতর দিয়া না যাইয়া তাহার একপার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। সে পার্শ্বে নানাপ্রকার ভাঙ্গা হাঁড়ি ও গৃহস্থের পরিত্যক্ত অস্পৃশ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। গোবিন্দ প্রাণভয়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া, তাহারই উপর দিয়া চলিল। আবার উপর্য্যুপরি দুইবার শব্দ হইল—"গোবিন্দ আমাকে মাছ দে।" গোবিন্দ দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে দেখিল তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে একটা বিড়াল আসিয়া তাহার সম্মুখে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। গোবিন্দ কি করিবে, হস্তে যে সোঁদালের ডাল ছিল, তাহা দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দেখিল সে যতই তাহাকে

আঘাত করিতেছে, তাহার একটি আঘাতও তাহাকে লাগিতেছে না। সে অন্য দিকে সরিয়া যাইতেছে। গোবিন্দের প্রহার করাই সার হইল। বিড়াল তারপরেই অন্তর্হিত হইল। গোবিন্দ বিড়ালকে আর দেখিতে না পাইয়া কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইল বটে, কিন্তু ভীতি তাহার হৃৎপিণ্ডকে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। এই অবস্থায় গোবিন্দ দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে একটি কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড় দেখিতে পাইল। ষাঁড়টা হাঁঃগাঁ—হাঁঃগাঁ করিতে করিতে গোবিন্দর সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ ভাবিল এ আবার কি! এ যে আরও ভয়ানক! একি বাস্তবিক ষাঁড় না আর কিছু? গোবিন্দ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ষাঁড় সম্মুখ ছাড়িয়া পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। গোবিন্দ ভাবিল কি বিপদেই পড়িলাম। আজি দেখি জীবন সংশয়। বাটী ফিরিয়া যাওয়া দুষ্কর হইল। ষাঁড়টা রঙ্ পরিবর্ত্তন করিয়া এবার শুক্লবর্ণে দেখা দিল। ষাঁড়টা নাতি দূরে নাতি নিকটে গোবিন্দের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে গোবিন্দ গ্রামের নিকটস্থ হইল। গোবিন্দর মনে কিয়ৎপরিমাণে সাহস ও বাঁচবার আশার সঞ্চার হইল। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। নিশীথিনী রাক্ষসী পূর্ণ পরাক্রমে রাজত্ব করিতেছে। পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গাদি সকলেই স্বস্বস্থানে নীরব। ঘনঘটা আকাশে কড়্‌কড়্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া এক একবার চমক দিতেছে। গোবিন্দ তাহাতেই যাহা দেখিবার দেখিয়া লইতেছে। বৃষ্টি আগতপ্রায়; দুই এক ফোঁটা জল পড়িল। পবন সহায়তা করিতে লাগিল। বৃষ্টি মুষলধারে পড়িতে লাগিল। গোবিন্দ ভিজিয়া গেল, সে চিন্তা করিতে করিতে বলিল, রে বিপদ তুই কি একলা আসিতে জানিস্ না? তোর হস্তে পড়িয়া আজি কি লাঞ্ছনাই ভোগ হইল, আবার তোর সহচর বৃষ্টি ও ঝড় উপস্থিত! বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ভাসিয়া গেল। পরিচিত রাস্তা

বলিয়া গোবিন্দ আন্দাজে আন্দাজে সাবধান হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। গোবিন্দ কেবল ভাবিতেছে কোন রকমে বাটী পঁহুছিতে পারিলে হয়। এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী ষাঁড়টা বলিয়া উঠিল—"যা গোবিন্দ যা, আজ বড় বাঁচিয়া গেলি!" এই বলিয়া ষাঁড়টা অদৃশ্য হইল। গোবিন্দ অতি কষ্টে বাড়ী পঁহুছিল। বাড়ী পঁহুছিয়াই পরিবারকে কহিল—"আজ বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। বিবরণ পরে বলিব। তুমি শীঘ্র মাছ দুটি কুটিয়া রন্ধন কর। রাস্তায় এই মাছের নিমিত্ত আমি প্রায় প্রাণ হারাইয়া ছিলাম। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ফিরিয়া আসিয়াছি। মনে হইয়াছিল আর বুঝি বাটী ফিরিয়া আসিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, মাছ ধোয়া জল যেন বাহিরে নিক্ষেপ করিও না। সাবধানে পাকাদি কার্য্য করিও।" বাটীর সকলে বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। গোবিন্দ ক্রমে ক্রমে নৌকারোহণ হইতে বাটী আসা পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল আদ্যোপান্ত পরিজনবর্গকে বিদিত করিল। এই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কাহার কাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অনন্তর পাকাদি কার্য্য সমাপ্ত হইলে সকলেই আহারাদি করিল। কিন্তু কেহই উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পারিল না। প্রেতদৃষ্ট মৎস্য রক্ষা করিলে পাছে অনিষ্ট ঘটে, এজন্য সকলেই তাহা ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিল। আহারাদি সমাপন করিয়া গোবিন্দর পরিবারস্থ সকলেই এক ঘরে শয়ন করিল। কাহারও নিদ্রা আসিল কাহারও আসিল না। গোবিন্দের চক্ষুতে নিদ্রা নাই। এই দুশ্চিন্তাই তাহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। গোবিন্দ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর কখন রাত্রিতে একাকী মৎস্য লইয়া বাড়ী আসিব না।

শ্রীমতিলাল রায়।

পুনরাগমন।

বাহিরে আমাদের গাড়ী ছিল। আমি কম্পিত-দেহ পিতাকে ধরিয়া, তাহার উপর তুলিয়া দিলাম। পথে তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। বাড়ীতে দিবসের মধ্যেও কোন কথা হইল না। আর কি কথা কহিব? আমি সুরাসেবীর মত সারাদিন যেন নেশায় টলমল করিয়াছি। বাড়ীতে সারাদিন কি ভাবে যে কাটিল, তাহাও আমার স্মরণ নাই। রাত্রিতে আমাকে পাকা দেখিতে আসিবে। মা তাহাদের আহারের কি উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন, তাহা আমি একবারও খবর লই নাই। দুই চারিজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহাও আর হয় নাই।

মা সেদিন কার্য্যে ব্যস্ত, আমাদের কোনও সংবাদ লইবার পর্য্যন্ত অবকাশ পান নাই। সংবাদ লইলে বোধ হয় আমাদের দুরবস্থা তাঁহার অজ্ঞাত থাকিত না।

একবারে মাত্র পিতার সন্ধান লইয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি বহির্ব্বাটীতে নিজের ঘরে অসুস্থের ন্যায় শুইয়া আছেন। তিনি আহার করিলেন কি না সে সংবাদও আমি পাই নাই। যে যার মনের ভাব চাপিয়া, আমরা সারাদিন অতিবাহিত করিয়াছি। সারাদিবসের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া কেবল এক একবার প্রবল যাতনার তরঙ্গ আমার বুক চাপিয়া ধরিয়াছে। এক একবার মনে হইয়াছে, এরূপ যাতনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। যাহা শুনিয়া আসিলাম, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আর আমার বাঁচিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কি বিভ্রাট! মনের এইরূপ অবস্থায় আমাকে আবার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে! একবার ইচ্ছা হইল, আত্মহত্যা করিয়া পিতার আয়োজন পণ্ড করিয়া দিই।

আমার বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না; আমাদের দেশের যে পর্ণকুটীরে গোপাল ও তাহার পিতা বাস করিত, পাপিষ্ঠ শ্যাম তাহাদিগকে সেই গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য দগ্ধ করিয়া দিয়াছে। আর এই গৃহদাহ ব্যাপারে পিতারও সংশ্রব আছে। পিতার সম্মতি না থাকিলে, ক্ষুদ্র শ্যামের সাহস কি, আমাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে! পিতা পিতা! বুক ফাটিয়া যায়—পিতাই গোপালকে দগ্ধ করিয়াছেন। "যদি সত্য হয়" —ইহাতে আর যদি নাই! আমি আমার অনুমানকে মিথ্যা করিবার জন্য —জগতের চারিদিক হইতে অনুকুল চিন্তা সকল আকর্ষণ করিতে পাগলের মত হাত বাড়াইয়াছি। একটী চিন্তাও আসিয়া পিতার পক্ষ সমর্থন করে নাই। প্রতিবারেই নরঘাতীর মূর্ত্তিতে পিতা আমার চিন্তার পথে বাধা দিয়া বলিয়াছেন—"হতভাগ্য! তুই নরঘাতীর পুত্র।"

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ঘটক আসিয়া সংবাদ দিল, আমার ভাবী শ্বশুর বারোজন লোক সঙ্গে লইয়া আমাদের গৃহে আসিতেছেন। তাঁহাদের আসিবার কথা আমি একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এইজন্য বৈঠকখানা ভাল করিয়া সাজাইবার কিছুমাত্র বন্দোবস্ত করি নাই। সংবাদ পাইবামাত্র আমি হরিয়াকে ঘর পরিষ্কার করিতে আদেশ দিয়া ও অন্যান্য ভৃত্যদের পরিচর্য্যার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া পিতার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম পিতা বালিশে ঠেস দিয়া তখনও পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়াও আমি বলিলাম—"ইহারা আসিতেছেন। বাহিরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে কেহ নাই"

পিতা বলিলেন—"আমি যাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কি কেহই এখনও আসে নাই?"

"কই, এখনও ত কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।"

"তবে আমিই যাইতেছি। তুমি ইহার মধ্যে পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।"

"পোষাক পরিয়া কি করিব? আমি বিবাহ করিব না!"

"তুমি বিবাহ কর। তার পর তুমি আমাকে যা করিতে বলিবে, আমি করিতে প্রস্তুত আছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সর্ব্বস্ব গোপালকে দিলে যদি তুমি তুষ্ট হও, আমি সর্ব্বস্বই গোপালকে দান করিব।"

"আপনি ত বহুবার এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞা থাকিল কই?"

এই কথা বলিবামাত্র, পিতা চাবির গুচ্ছ আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এই নাও। এখন হইতে তুমি আমার সঞ্চিত অর্থের অধিকারী। তোমার জননীর নামে যে কোম্পানীর কাগজ আছে, আগে হইতেই তাহা তোমার। আমার নামে যাহা আছে, এই রাত্রিতেই তোমাকে লিখিয়া দিতেছি।"

আমি চাবী তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিতে গেলাম এবং বলিলাম—"আপনার সামগ্রী আপনিই ইচ্ছামত দান করিবেন। আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। আপনার কথায় আমি সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম।"

পিতা আর চাবী গ্রহণ করিলেন না। বলিলেন—"যাহা ত্যাগ করিলাম, আর তাহা স্পর্শ করিব না। গোপীনাথ! একদিন একমুষ্টি অন্নের অভাবে কাতর হইয়াছিলাম। দারিদ্র্যের সে পেষণ মনে হইলে, এখনও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থের মুখ দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিল। বড় আগ্রহে আমি ঐশ্বর্য্যকে আঁকাড়িয়া ধরিয়াছিলাম। আজ তার অসারতা উপলব্ধি করিতেছি। গোপাল মরিলে, আমাকে হয়ত ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইত, অথবা কারাগারে বাস করিতে

হইত। সে দুর্ভাগ্য না হইলেও, যদিই বা আমি মুক্তি পাইতাম, দেশব্যাপী কলঙ্কে আমার মৃত্যুর অধিক যাতনা হইত। হয়ত আমাকে আত্মহত্যাই করিতে হইত। তখন আমার ঐশ্বর্য্যভোগ করিত কে? দগ্ধ গোপাল দামোদর মূর্ত্তিতে আমার চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াছে।"

"তবে কি সত্য সত্যই আপনি অপরাধী?"

"নিশ্চয়।" এই কথা বলিয়াই তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার গণ্ডে অশ্রু পতিত হইতেছে। উঠিয়াই তিনি বলিলেন—"তবে এখন আর আমাকে প্রশ্ন করিও না।"

পিতার সে অবস্থা দেখিয়া. আমারও চক্ষে জল আসিল। সেই চক্ষু-জল হৃদয়ের সমস্ত যাতনা যেন গলাইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিল। আজ যথার্থ জীবনে আমি প্রথম শান্তি অনুভব করিলাম। পিতাও সেই নির্ম্মল সুখের অধিকারী হইয়াছেন নিশ্চয় বুঝিয়া, আমি আর একবার জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই এমন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, মান যশও আপনি আকাঙ্ক্ষার অধিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু পিতা একবার বলুন, আজ আপনি চিত্তে যে সুখ লাভ করিয়াছেন, আর কখনও সে সুখ পাইয়াছেন কি?"

পিতা উত্তর করিলেন—"এখনও তাহা বলিবার সময় আসে নাই। আগে গোপাল বাঁচুক, আগে আমি ব্রহ্মহত্যার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব।"

এই বলিয়াই তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আমিও গৃহাভিমুখে চলিলাম। চলিতে চলিতে একবার ভাবিলাম—হায় দামোদর! ব্রাহ্মণের মোহ মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে যদিই বা দূর করিয়া দিলে, তা দিন কয়েক পূর্ব্বে দিলে না কেন? আমার মা, আমার মা—ব্রাহ্মণত্ব ফিরাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মা'টীকে কি ফিরাইয়া দিবে না?"

ইহার দুই ঘণ্টা পরেই পাকাদেখার কার্য্য শেষ হইয়া গেল। আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি উপলক্ষে আমি আমার ভাবী শ্বশুরকে ও তাঁহার সঙ্গীগুলিকেও দেখিলাম। পিতার নিমন্ত্রিত বন্ধুগণও সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। পিতার বন্ধু ও ভাবী শ্বশুরের সহচর—একদিকে শ্মশ্রুগুম্ফবিরহিত, অর্দ্ধমুণ্ডিত-মস্তক অধ্যাপকবর্গ, অপর দিকে আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রুধারী শ্বশুরের শ্মশ্রুধারী সহচর ইংরাজীনবীশ বাবু; একদিকে তর্কের আবেগে উচ্চহাস্যে পৃষ্ঠস্পর্শী শিখাগুচ্ছের ঘনসঞ্চালন, অন্যদিকে ঈষৎদন্তবিকাশে মৃদুহাস্যে আত্মগোপনের শ্মশ্রু-কণ্ডুয়ন। প্রবেশ-মুখে সকলের লক্ষ্য-স্থল হইলেও, এবং সেইজন্য লজ্জার ঈষৎ ভারে আমার মস্তক নমিত হইলেও আমি সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। এক দিকে সেই পূর্ব্বযুগের পরিচ্ছদশোভিত বাঙ্গালীর খাঁটী জাতীয় চিত্র, অপর দিকে নানাপ্রকারের পোষাক-বিভূষিত নব্যবঙ্গের জাতি নামধেয় খিচুড়ী। দেখিয়া মনে হইল, কতকগুলা গম্ভীরমূর্ত্তি পেচক, সম্মুখের কোলাহল-কারী স্ব স্ব নিরীহতায় নিশ্চিন্ত শ্বেত পারাবতগুলার সম্মুখে বসিয়া, চশমার অন্তরালে লোলুপদৃষ্টি লুকাইয়া, গ্রাসের অবসর অপেক্ষা করিতেছে।

এ দৃশ্য সম্বন্ধে অধিকক্ষণ চিন্তা করিবার অবকাশ পাইলাম না। পিতার আদেশে প্রাচীরের ব্যবধানমত আমি এই উভয় দলের মধ্যে উপবিষ্ট হইলাম। নিমন্ত্রিত অধ্যাপকগণকে ও ভাবী শ্বশুরকে প্রণাম করিলাম। প্রচলিত বিধি-অনুসারে শ্বশুর মহাশয় আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—অন্তঃপুরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

আশীর্ব্বাদ লইয়া ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে ঘনঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর বাজিয়া উঠিল। বুঝিলাম, এ বাদ্যের সঙ্গে আমার আশীর্ব্বাদের সম্বন্ধ নাই। চূড়ামণি আজ অতি

উল্লাসে মা লক্ষ্মীর পূজা করিতেছে। এত উল্লাসধ্বনি আমার শ্বশুর ও তৎসহচরগণের শ্রুতিসুখকর হইবে না মনে করিয়া, আমি তাহাকে একটু মৃদুভাবে আরতি করিবার জন্য অনুরোধ করিতে দ্রুতপদে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, অগণ্য রমণী কর্ত্তৃক ঠাকুর ঘরের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়াছে। সেই প্রাচীর ভেদ করিয়া চূড়ামণির সমীপস্থ হইয়া তাহাকে কথা বলা অসম্ভব বোধে, আমি দূর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলাম—"ওগো তোমরা একটু পূজার আগ্রহ কমাইয়া দাও।"

পশ্চাৎ হইতে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন গো?"

কে কথা কহিতেছে, তাহা লক্ষ্য না করিয়া আমি উত্তর করিলাম—"তোমাদের ভক্তির উচ্ছ্বাসে বাহিরের ভদ্রলোকগুলির যে প্রাণ যায়!"

"গাছে উঠিতেই এক কাঁদি! সে কি ঠাকুরপো, শ্বশুরের জন্য এরই মধ্যে এতই মমতা!"

"একি, বউ ঠাকরুণ! তুমি আসিয়াছ?

"কেন, কি হইয়াছে তা আসিব না! শুধুই আমি আসি নাই, দুর্গাকে আনিয়াছি। ঠাকুর ঘরের ভিতরে রাখিয়া আসিয়াছি।"

"মা!"

"তিনি ও ঘরের মধ্যে আছেন। তবে এখনও তিনি দুর্গার পরিচয় পান নাই। তোমাকে অনুরোধ করি, আমার আসার কথা এখন কাহার কাছে প্রকাশ করিও না।"

"গোপালের খবর কি?"

"আজ সে সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। যে ভাবে আমার দিন গিয়াছে, তাহাত তুমি বুঝিতেই পারিতেছ! বিশেষ রূপে আমি তাহার খবর লইতে পারি নাই, স্বামী সর্ব্বদা কাছে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। সেইজন্য খবর লইবার আমি তত প্রয়োজন বোধ

করি নাই। প্রাতঃকালের ঘটনার চিন্তাতেই আমার সারাদিন কাটিয়াছে। আমি একদণ্ডের জন্যও স্থির হইতে পারি নাই। এখনও আমি স্থির নহি।”

শঙ্খ কাঁসরের ধ্বনির মধ্যে বহু কষ্টে আমরা পরস্পরের সহিত কথা কহিতেছিলাম। সহসা আরতি বন্ধ হইয়া গেল, এবং রমণীগণ মধ্যে একটা প্রবল কোলাহল উত্থিত হইল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রীও চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হইলেন।

সহসা আরতি বন্ধ হইবার কারণ জানিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম। বাহিরের কোন স্ত্রীলোকই আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিল না। তখন ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। অতি কষ্টে দ্বারের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখি, জননী মূর্চ্ছিতা হইয়া লক্ষ্মী দেবীর সম্মুখে ভূমিতে পতিত রহিয়াছেন; ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখে জল সেচন করিতেছে। চারিধারে ঘেরিয়া রমণীগণ ব্যজন করিতেছে। পদতলে দুর্গা বসিয়া অবনতমস্তকে মায়ের দুইটী চরণ ক্ষুদ্র অঙ্কে ধারণ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া যেমন আমি পাগলের মত গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে যাইতেছি, অমনি পশ্চাৎ হইতে কে আমার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল, আর বলিল, হতভাগা “তুই কোথায় যাইতেছিস্?”

ফিরিয়া দেখি সে আর কেহ নহে সেই যমকিঙ্করীরূপিণী সন্ন্যাসিনী। আমি তাহাকে দেখিবা মাত্র মন্ত্ররুদ্ধ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইলাম। বৃদ্ধা বলিতে লাগিল “আগে এ পবিত্র গৃহে প্রবেশের উপযুক্ত হ’, তবে প্রবেশ করিবি।”

বুড়ী হাত ধরিয়া আমাকে সেখান হইতে লইয়া যাইবার জন্য টানিতে লাগিল। আমিও সাহস করিয়া তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য টান দিলাম, ফলে ভূমিতে পতিত হইলাম। তখন স্থির করিলাম, উঠিয়া

বুড়ী বেটীকে লাঠী পেটা করিব। কিন্তু কোথায় বৃদ্ধা ? দণ্ডায়মান হইয়া দেখি বৃদ্ধা নাই। তৎপরিবর্ত্তে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, এখনও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। আমার অবস্থার দিকে মহিলা একবারও দৃক্‌পাতও করে নাই !

ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে বুড়ী বেটী ছিল, কোথায় গেল ?"

"কোথায় আর যাইবে ! বুড়ী বেটী এই যে তোমার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।"

"না, না। এই যে বেটী আমার হাত ধরিয়া টানিতেছিল।"

"কেহই তোমার হাত ধরিয়া টানে নাই। তুমি আপনা আপনি মাটীতে পড়িলে, আমি তাই দেখিয়া তোমাকে তুলিতে আসিয়াছি।"

"তুমি সত্য বলিতেছ ?"

"তুমি গুরুজন, তোমাকে কি আমি মিথ্যা বলিতে পারি ?" তুমি আর বিলম্ব করিও না। তোমার ভাবী শ্বশুর ও তাঁহার সঙ্গিগণের আহারের কতদূর উদ্যোগ হইল দেখিয়া আইস। বাহিরে কেহ যেন ঘুণাক্ষরে মায়ের অসুখের কথা না জানিতে পারে। জানিলে সমস্ত উদ্যোগ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কেহই আহার করিতে চাহিবেন না। মা সুস্থ হইয়াছেন। সারাদিন নিরম্বু উপবাসে মা মা-লক্ষ্মীর ভোগ রাঁধিয়াছেন। শরীর দুর্ব্বল। দুর্গাকে দেখিয়া অতি উল্লাসে মা সংজ্ঞাহারা হইয়া ছিলেন।"

বাস্তবিকই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখি, মা বসিয়াছেন। দুর্গা শোভাময় রূপ লইয়া তাঁহার অঙ্ক আশ্রয় করিয়াছে।

দেখিয়া, আর কোন ও কথা না কহিয়া আমি বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলাম।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই আগন্তুকগণের পরিচর্য্যা আরম্ভ হইল। মাছ মাংস বাড়ীর ধারে আসিতে পায় নাই। পূর্ব্বপ্রথামত আতপ তণ্ডুলের অন্ন ও নিরামিষ ব্যঞ্জন দেবীর ভোগের জন্য নিবেদিত হইয়াছিল।

বহুকাল হইতে আমাদের দেশে রাত্রির ভোজে শাদা ভাতের ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে। অতি দরিদ্রও যেমন করিয়াই হউক নিমন্ত্রিতগণকে লুচি সন্দেশ খাওয়াইয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগের সকলকেই এই প্রথা-বহির্ভূত তুচ্ছ আয়োজনের জন্য বিশেষ সঙ্কুচিত হইতে হইল। পিতা সকলের সম্মুখে বিনীতভাবে কৈফিয়ত দিলেন। বলিলেন—"নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, আজ যে লক্ষ্মী পূজা তাহা আমার মনে ছিল না। নহিলে, এ দিন আমি আশীর্ব্বাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিতাম না। আজ আমার গৃহে শাকান্ন ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর প্রবেশাধিকার নাই। আপনাদের আবাহনের অমর্য্যাদা করিতেছি বুঝিয়া সসঙ্কোচে এই তুচ্ছ খাদ্য উপস্থিত করিতেছি।"

পিতার এইরূপ বিনয় বচনে ও আহার্য্যের দুরবস্থা শুনিয়া শ্বশুরের অধিকাংশ সহচরের মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাঁহারা প্রায় সকলেই শ্বশুর মহাশয়ের সান্ধ্যভোজের সহচর। কিন্তু কি করিবে? তাঁহারা কন্যা-পক্ষীয়। কন্যাপক্ষীয়ের আবার অভিমান কি? সুতরাং সকলেই শ্বশুরের সঙ্গে মুখের কাষ্ঠ হাসির ভিতর অন্তরের ভাব লুকাইয়া, পিতার অনুরোধরক্ষার্থ আহার করিতে বসিলেন।

পরিচর্য্যার জন্য চূড়ামণি দুই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। পূজান্তে তাঁহাদের সঙ্গে সে নিজেও কোমর বাধিয়া পরিবেশনে যোগ দিল।

প্রথম প্রথম সকলেই পক্ষাঘাত রোগগ্রস্তের মত অতি ধীরভাবে যেন কত অনিচ্ছায় অন্নের সহিত ব্যঞ্জন মুখে তুলিতে লাগিলেন। ক্রমে হস্তের উত্থান-পতন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইতে লাগিল। একের পর এক করিয়া

তুচ্ছ শাকাদির ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধমূর্ত্তি তাহাদের পাতে পড়িতেছে, কিন্তু কোন ভাগ্যবান তরকারী পাতে পড়িয়া আপনার শ্রীমূর্ত্তি অধিকক্ষণ দেখাইবার অবসর পাইতেছে না। প্রথমে ভোজনকার্য্য নীরবে চলিতেছিল। ক্রমে দুই একজনের কথা ফুটিল। দুই একটী তরকারী দুই একজনের উদরস্থ হইবার জন্য পুনরাহূত হইতে লাগিল। কেহ এটা চাহিল, কেহ ও তরকারীটা চাহিল। ক্রমে সকলের মধ্যেই খাওয়া খাওয়ির ধূম পড়িয়া গেল। শেষে সমবেতকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল, "এরূপ অমৃত আর কখন আমরা মুখে তুলি নাই।"

একের পর এক করিয়া পায়স-পিষ্টকাদি লইয়া প্রায় পঞ্চাশৎ প্রকার খাদ্যে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা হইল। প্রত্যেক খাদ্যই উদরস্থ হইয়া বহু প্রশংসাবাক্য করস্বরূপ তাঁহাদিগের মুখ হইতে বাহির করিল। আমার ভাবী শ্বশুর আহারান্তে মুখপ্রক্ষালনাদি কার্য্য সমাপন করিয়া বিদায়গ্রহণসময়ে বলিলেন—"যে মুহূর্ত্তে আমি কন্যাকে আপনার পুত্রবধূ করিতে পারিব, আমি জানিব তাহা আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত।" আমি জীবনে সর্ব্বপ্রথম দাম্ভিকতার ও অসংযমের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের ঘরের স্বচ্ছন্দবনজাত শাকান্নে এত রস লুকান আছে, কর্ম্মদোষে এত কাল আমি বুঝিতে পারি নাই।"

পিতা এই সময়ে উত্তর করিবার অবকাশ পাইলেন। তিনি বলিলেন—"আপনারা মাংসাদিতে অভ্যস্ত জানিয়া, প্রাতঃকালে আমি তাহারই আয়োজন করিতে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলাম। আমার স্ত্রী তাহা হইতে দেন নাই। এইজন্য আমাকে বিশেষ চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। আপনাদিগকে আজ আসিতে নিষেধ করিবারও আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। একটা বিশেষ ঝঞ্চাটে পড়িয়াছিলাম বলিয়া নিষেধ করিবার অবকাশ পাই নাই।"

পিতার এই বাক্য শুনিয়া, শ্বশুরের এক সহচর বলিয়া উঠিলেন—"আপনার ঝঞ্ঝাট আমাদের বন্ধুর কার্য্য করিয়াছে।"

সকলেই সহাস্যে তাঁহার কথার অনুমোদন করিলেন। কেহ কেহ মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণের বায়না দিয়া রাখিলেন। চূড়ামণি এই অবকাশে দুই একটা কথা বলিয়া লইল। আজ তার মায়ের গৌরব-কথা সে শুনিতেছে। সে চুপ করিয়া থাকিবে কেন? "লক্ষ্মীর পূজা লক্ষ্মী নিজে বসিয়া পাক করিয়াছেন। মা বুঝিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলা সন্তান আসিয়াছে, যাহাদের বিদ্যা আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই, ঐশ্বর্য্য আছে কিন্তু অন্ন নাই।"

আরও কত কি সে বলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, পিতা তিরস্কারে তাহাকে নিরস্ত করিলেন। আমার শ্বশুর বলিলেন, "ব্রাহ্মণ সত্য বলিয়াছে তাঁহাকে তিরস্কারের কোনও প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া তিনি চূড়ামণিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"ভাই চূড়ামণি! তোমার মাকে বলিও, আমার কন্যার হস্ত ধরিয়া আমি তাঁহার গৃহে আশ্রয়-ভিখারী উপস্থিত হইয়াছি। করুণাময়ী অমৃতের আস্বাদ দিয়া আজ যে মরণোন্মুখ ব্রাহ্মণ-সন্তানকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, সে তাঁহার করুণা এ জীবনে বিস্মৃত হইবে না। ইহার পরেও যেন আমি সে করুণা হইতে বঞ্চিত না হই।"

চূড়ামণি সোল্লাসে মস্তকের স্খলিত-বন্ধন সুদীর্ঘ শিখায় দুই হস্তে প্রহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে করিতে শ্বশুরকে আশ্বাস দিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া আশ্বস্ত শ্বশুর সদলে বিদায় লইলেন।

ষ্টেড ও তাঁহার বার্ত্তা।

উইলিয়ম টি, ষ্টেড্ 'অলৌকিক রহস্যে'র বহু পাঠকের নিকটই সুপরিচিত। তিনি বিখ্যাত Review and Reviews পত্রের সম্পাদক ছিলেন—তাঁহার পক্ষপাতশূন্য সমালোচনায় তিনি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অলৌকিক ঘটনারাজির রহস্যোদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি যে কিরূপ উদ্যোগী ছিলেন, তাহা বোধ হয় নূতন করিয়া আর বলিতে হইবে না। যদি টাইটানিক দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু সংঘটিত না হইত, তবে তিনি আরও যে কত প্রচ্ছন্ন রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু সেথা হইতেও যে অত্যাশ্চর্য্য টাইটানিক রহস্য পাঠাইয়াছেন তাহা সকলেরই জ্ঞাতব্য বোধে তাহারই মর্ম্মানুবাদ আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

অনেকের হয়ত কৌতূহল হইতে পারে, তিনি পরজগৎ হইতে কি প্রকারে সংবাদ পাঠাইলেন? তিনি বেশ সহজ উপায়েই আপনার মনোগত ভাব মাধ্যমিকের (Medium) মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মাধ্যমিক চিকাগো গীর্জ্জার ধর্ম্মোপদেশিকা শ্রীমতী রিচমণ্ড। ষ্টেড বলিয়াছেন——

"টাইটানিক" ভাসমান তুষারগিরিতে আহত হইল। সংঘর্ষণের প্রবল কম্পন অনুভূত হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিকে কোলাহল উত্থিত হইল। নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার রক্ষায় প্রবৃত্ত, কিন্তু সবই বৃথা। যখন জানিতে বাকি রহিল না যে, 'টাইটানিক' রক্ষা অসম্ভব, পোত নিমজ্জনের আর অধিক বিলম্ব নাই, তখন যাত্রীবর্গকে রক্ষা করিবার যথাশক্তি আয়োজন করা হইল। আমিও সে সৎকার্য্যে আনন্দের সহিত যোগদান

করিলাম। আরোহীর জীবনরক্ষার উপযুক্ত নৌকা সে জাহাজে ছিল না। যেগুলি ছিল তাহা যথাশক্তি বালক ও স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ করা হইল। বাকি যাহারা রহিল মৃত্যুই তাহাদের বিরামের আশ্রয়। গম্ভীরছন্দে Band বাজিয়া চতুর্দ্দিক গভীর নির্ঘোষে কাঁপাইয়া এই সমুদ্রসমাধির কথা জানাইয়া দিল। কি সে মহান্ দৃশ্য তাহা তোমরা কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে জলের প্রতিকূলতায় আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস অবসান হইল! "ব্যাণ্ড"এর শান্তিময় ধ্বনি আর আমাদের শ্রবণ পথের পাথক হইল না। আমরা এক সুখকর নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। মৃত্যু যে কখন হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমরা যে সমস্ত মৃত্যু-কষ্টের বিষয় কল্পনা করিতাম, তাহার কোনটিরই সহিত পরিচিত হইলাম না; কিছুক্ষণের জন্য কেমন যেন সবই বিস্মৃত হইলাম। যখন আমার সংজ্ঞা পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম, তখন অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্যের সহিত আমার নয়ন পরিচিত হইল। সহসা 'টাইটানিকের' কথা আমার মনে উদিত হইল। চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে করিতেই প্রথমেই আমার পুত্রের সাক্ষাৎ পাইলাম! আমার পুত্র! আমি যে তাহাকে হারাইয়াছি; পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে যে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে! কিন্তু দেখিলাম, সে বিশেষ আনন্দের সহিত আমার সমাদৃষ্টভোগীদের সাহায্য করিতেছে! আমার বিশেষ আনন্দ হইল! মনে করিলাম, ইহার সহায়তায় আমি অনেকের সাহায্যে সমর্থ হইব। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মনে হইল আমার পুত্র মৃত, তখন আমার সমস্ত হর্ষ বিষাদে পরিণত হইল! বিষাদ উপস্থিত হইল এইজন্য যে, আমি বুঝিতে পারিলাম আমার স্থূল শরীর নষ্ট হইয়াছে। যাহা আছে তাহা সূক্ষ্ম শরীর! পূর্ব্ব শরীরের ছায়া মাত্র; সুতরাং এ ছায়াকায়া লইয়া আমি কাহারও সাহায্য করিতে পারিব না। স্থূলত্ব সম্বন্ধে এ শরীরের কোনই মূল্য নাই। তখন আমি

বুঝিতে পারিলাম, আমি আমার অজ্ঞাতসারে ভবনদীর পরপারে সমুপস্থিত!

তখনকার দু'একটী দৃষ্ট ঘটনার বিষয় তোমাদিগকে জানাইতে চাই। সে দৃশ্য বড়ই হৃদয়স্পর্শী, কিন্তু আমার বড় আনন্দদায়ক হইয়াছিল। যখন দেখিলাম, আমারই মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ নৌকারোহী তাহাদিগের জীবিত প্রিয়তমগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য কোলাহল ও অশ্রুবর্জ্জন করিতেছে, তখন সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মবিদারক হইয়াছিল! কিন্তু তাহাদের নিজেদের স্থূলত্ব সমাপ্তির বিষয়ের অজ্ঞতা ও এইরূপ আকাঙ্ক্ষা বড়ই হাস্যোদ্দীপক! কেননা তখনও তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে তাহারা ছায়ামাত্র!

আমার এই বর্ণনার আর একটী মুখ্য উদ্দেশ্য আছে। অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস যে জাহাজের নাবিকদলের দোষ এবং অসাবধানতায় এই দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসত্য। নাবিকগণ তাহাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তাহাদের কর্ত্তব্য তাহারা যথাশক্তি পালন করিয়াছিল। কিন্তু যাহা রক্ষা হইবার নহে, তাহার রক্ষা হইবে কিরূপে? দৈবপ্রভাবেই 'টাইটানিক' আপনার সমুদয় যাত্রীবর্গ লইয়া সমুদ্র-সমাধি লাভ করিয়াছে।

আমি তোমাদের সমাজ হইতে, তোমাদের জগৎ হইতে চলিয়া আসিয়াছি সত্য, কিন্তু তোমাদের সহিত আমার সম্বন্ধ সম্যক্ ত্যাগ করিতে পারি নাই। তখনও তোমাদের অদৃশ্য মূর্ত্তিতে তোমাদেরই ভিতরে আমি অবস্থান করিতেছি। মৃত্যুর পরও জীবন আছে। মৃত্যুর পরও আত্মা সূক্ষ্মদেহের ভিতরে অবস্থান করে। তাহাদেরও সংজ্ঞাশক্তি থাকে। কিন্তু তাহারা স্থূলচক্ষুর গোচরীভূত হইবার নহে। আমার এখনকার একমাত্র অভিলাষ যে, আমি আমার 'জুলিয়ার' (Bureau)

সংবাদ কার্য্যালয়কে ভূবর্লোকে লইয়া আসিব। এবং দেখিব তাহার কিরূপ উন্নতি করিলে ভূলোকের লোকদিগকে জানাইতে পারিব যে, মৃত্যুর পরও জীবন আছে। হঠাৎ তাহারা মৃত্যুরও অস্তিত্ব জানিতে সমর্থ হইবে। অনেকেই হয়ত জানেন যে, কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে বিশেষ আত্মীয় আসিয়া সে দুর্ঘটনামূলক কার্য্যে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া যায়। আমারও তাহাই হইয়াছিল। আমার মৃত পুত্রও সেইরূপ আমাকে টাইটানিকে যাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু আমি তাহার সে অনুরোধ রক্ষাকরিতে চেষ্টা করি নাই।”

এইরূপে পর জগতে গিয়া মহামতি ষ্টেড মাধ্যমিকের সাহায্যে পরলোকের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। এখানেও তিনি জীবসাহায্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইখানেও সেরূপ করিতেছেন।

আমেরিকার জনৈক কবি এই ঘটনার প্রায় পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্বে ‘টাইটান’ নামে একখানি উপন্যাস প্রণয়ন করেন। তাহাতে প্রায় এই ঘটনার সমস্ত আভাষই তিনি প্রদান করিয়াছেন। আমেরিকাবাসী কবির ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে বিস্মিত হইয়াছে।

এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থ মর্ম্ম অবগত হওয়া বড়ই কঠিন। যাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে তাঁহারা জানিতেপারেন যে, মহাত্মারা অন্তর্জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বহির্জগতের লোক সকলকেই অদৃশ্যরূপে মুক্তিপথে যাইতে সহায়তা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে অনুভব করা বড়ই কঠিন।

শ্রীদুর্গাচরণ বিদ্যাভূষণ।

গেছো-ভূত।

আমাদিগের বাসভূমি কৈকালা গ্রামের অন্যতম পটী বসুপাড়া হইতে হাঁদা বাগ্‌দী নামক জনৈক নিম্ন জাতীয় লোক আসিয়া সেদিন বলিল— "মহাশয় আমার ছেলেটী আজ বেলা আড়াই প্রহরের সময় মারা গিয়াছে। দয়া করিয়া উহার কিছু প্রায়শ্চিত্ত অর্শাইবে কিনা বলিয়া দিন এবং যদি অশায় তাহা হইলে যাহা বিধি ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিন।" আমি তাহাকে তাহার মৃত পুত্রের ব্যায়রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে—সে দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিল—"মহাশয়! যাইবার উপযুক্ত ব্যায়রাম ত কিছুই হয় নাই। কেবল উপর দেবতার (প্রেতাত্মার) আক্রমণেই এই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।"

প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেওয়া স্থগিত রাখিয়া অগ্রে আমি এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রুতিগোচর করিবার জন্যই ব্যগ্র হইলাম। আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও আগ্রহাতিশয় সহকারে এই শোচনীয় হত্যা রহস্য শুনিতে লাগিলেন। হাঁদার বাক্যে জানিতে পারিলাম যে—গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার বলিষ্ঠ পুত্র নীরদাচরণ কৈকালা ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী ভাটা নামক বাগানে একটী সিরীশগাছ কাটিয়াছিল। যেদিন এই গাছ কাটা হয়, সেই দিন হইতেই নীরদা ঘুসঘুসে জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং দিন দিন তাহার দৃঢ়কায় হীনবল ও জীর্ণশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে। অনেক চিকিৎসা হইল, ২।৩ জন ডাক্তার দেখিল কিন্তু কেহই আরোগ্য করিতে পারিল না। ২।১ দিন ভাল থাকে আবার জ্বর হয়, এইরূপে এই দৃঢ়কায় যুবক অল্পদিনের মধ্যে

প্রায় গমনাসমর্থ হইয়া পড়িল এবং তাহার শক্তিহীন দেহ শীর্ণ হস্তপদাদি সম্পন্ন ও দীর্ঘোদর যুক্তরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

গত ১২ ভাদ্র হঠাৎ তাহার মনে হইল নিশ্চিত তাহার দেহে ভূতাবেশ হইয়াছে। তজ্জন্যই সে এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বিবিধ পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছে। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সে তাহার পিতাকে ভৌতিক মন্ত্র তন্ত্রাভিজ্ঞ কোনও উপযুক্ত রোঝা (ওঝা) আনাইয়া দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

উপযুক্ত পুত্রের এরূপ সনির্বন্ধ অনুরোধ শুনিলে কোন্ প্রকৃতিস্থ পিতা স্থির থাকিতে পারে? সুতরাং তাহার জনক পূর্ব্বোক্ত হাঁদাবাগদী ভূতাপসারক চিকিৎসকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। বহু চেষ্টার পর একজন রোঝা পাওয়া গেল বটে কিন্তু সে তাদৃশ সুনিপুণ নহে। যাহা হউক এই ব্যক্তিই আসিয়া ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসারম্ভ করিল। ভূতাপসারণের নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার পর রোগী অচেতন হইয়া পড়িল এবং প্রেতাত্মা তাহার মুখ দিয়া ব্যক্ত করাইতে লাগিল যে, "গত বৎসর এই ব্যক্তি গলায় গামছা জড়াইয়া, মাথায় টেরি কাটিয়া মহাদম্ভে আমার আবাস বৃক্ষ ছেদন করিয়াছে সেই জন্য আমি ইহাকে আক্রমণ করিয়াছি। কিছুতেই ছাড়িব না।"

রোঝা অনুনয় বিনয় সহকারে বারংবার প্রেতাত্মাকে স্থানান্তরিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই যখন সে ছাড়িতে চাহিল না, তখন চিকিৎসক গর্ব্বের সহিত বলিয়া গেল ভাল, অনুরোধ উপরোধ যদি না শুন তাহা হইলে কাল আসিয়া তোমার কিরূপ শাস্তি করি দেখিও।

এইরূপ গর্ব্বিত বাক্যই সর্ব্বনাশের কারণ হইল। প্রেতাত্মা ইহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া গেল। চিকিৎসক চলিয়া যাইবার পর সে রোগীকে

আরও দ্বিগুণ ক্রোধে চাপিয়া বসিল। রোগী আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি আর ঘুমাইতে পারিল না। আচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া কেবল ভৌতিক বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে লাগিল ইহা ১৩ই ভাদ্রের কথা।

বহুকষ্টে বিপন্ময়ী রাত্রির অবসান হইল। পূর্ব্ব গগণে নবোদিত সূর্য্যের আলোকরেখা দেখিয়া রুগ্নের আত্মীয়গণের মহাশঙ্কার গাঢ় অন্ধকার যেন ক্ষণকালের জন্য সরিয়া গেল। কিন্তু এ আবার কি ভীষণ দৃশ্য! রোগী আর কথা কহিতে পারে না; গোঁ গোঁ শব্দে যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিল।

হায়, এই উপসর্গেই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। জ্বর জ্বালা নাই বিকার বিপত্তি নাই, কেবল এই মর্ম্মন্তুদ শব্দ করিতে করিতেই বেলা আড়াই প্রহরের সময় একটী অপূর্ণ বয়স্ক যুবক চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা হীরালাল সাধুখাঁ নামক এক ব্যক্তিকে গদাময়া নামক শ্মশান পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী একটী বিল্ববৃক্ষ ছেদন করার ফলে এইরূপ ভূতাবিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে দেখিয়াছিলাম,—আজ আর এক ব্যক্তির সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলাম—যে সে স্থানে বৃক্ষ ছেদন করাও যুক্তিযুক্ত নহে।

শ্রীরাজকুমার স্মৃতিতীর্থ। (কৈকালা—হুগলী)

ভূতের উৎপাৎ।

গোবিন্দপুর বরিশাল জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। এই গ্রাম মেহেন্দীগঞ্জ থানার অধীন এবং বরিশাল সহরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। সহর হইতে উক্ত গ্রামের দূরত্ব ১৫।১৬ ক্রোশ। এই গোবিন্দপুর গ্রামে বহু হিন্দু ও মুসলমানের বাস। সম্প্রতি উক্ত গ্রাম-বাসী শ্রীযুক্ত * * * কাজী সাহেব নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাড়ীতে অলৌকিক ঘটনা সকল সঙ্ঘটিত হইতেছে।

বিগত আষাঢ় মাসের প্রথম হইতেই উক্ত কাজী সাহেবের বাড়ীতে নানাপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ হয়; কিন্তু তখন উহা কোনও শত্রুপক্ষীয় দুষ্ট লোকের কৃত-কর্ম্ম বলিয়া বাড়ীর লোকদের ধারণা জন্মে। অবশেষে যখন ঘটনার বৈচিত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নিত্য নিত্য নূতন নূতন রকমের অত্যাচার আরম্ভ হইল, অথচ বহু অনু-সন্ধান এবং প্রয়াস স্বীকার করিয়াও কোন শত্রুর অস্তিত্ব অণুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারা গেল না, তখন উহা ভৌতিক কাণ্ড বলিয়াই নির্ব্বিবাদে স্থিরীকৃত হইল।

ঘটনার বিচিত্রতা অনেক,—অত্যাচারের মাত্রাও ততোধিক। পাঠক, ক্রমে ক্রমে তাহার পরিচয় গ্রহণ করুন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিগত আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে ঘটনার সূত্রপাত হয়। প্রথমতঃ দিনের বেলায় বাড়ীতে কেবল ঢিল পড়িতে আরম্ভ হয়; কিন্তু ঐ ঢিল তখন কাহারও গাত্রে পড়িত না এবং সূর্য্যাস্তের পরেও আর ঢিল পড়িত না। এই অবস্থা কিন্তু আর অধিক দিন স্থায়ী

হইল না। কয়েক দিন পরে ঢিল দিবা রাত্রি সমান ভাবেই পড়িতে লাগিল; অধিকন্তু এই সময় হইতে বাড়ীর লোকদের গাত্রেও ঢিল পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় কিছুদিন অতীত হইবার পর ঢিলের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ঠা এবং নানাপ্রকার জন্তুর অস্থিও পতিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য, এই সময় আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ইহা শত্রুর কৃত-কর্ম্ম নহে,—ইহা ভূতের কার্য্য—সয়তানের খেলা।

যে কাজী সাহেবের বাড়ীতে এইরূপ কাণ্ডকারখানা হইতেছে, তিনি নিজে একজন লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক। বিশেষতঃ মুসলমানী শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান; সুতরাং মুসলমানী ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ভূত ভাগাইবার যে সকল মন্ত্রতন্ত্র আছে, সয়তানকে দোরস্ত করিবার যে সকল তুকতাক্ আছে, কাজী সাহেব সাধ্যানুসারে তাহার প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে ফল কিছুই হইল না, বরং অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতেই লাগিল। কাজী সাহেব সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াও যখন দুষ্‌মনকে দেশছাড়া করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন দেশ বিদেশ হইতে বহু ভূতের রোজা আমদানী করিয়া অনেক ক্রিয়া-কাণ্ড—অনেক তুকতাক্ করাইলেন, কিন্তু তাহাতে ফল উল্টা হইল,—রোজা দলের খোঁচাখোঁচিতে অত্যাচার অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গেল। এই সময় অবস্থা এমন হইল যে, বাড়ীতে লোক তিষ্ঠান দায় হইয়া পড়িল। কথায় বলে,—"ঢিলের চোটে ভূত ভাগিয়া যায়" কিন্তু এ স্থলে ভূতের ঢিলের চোটে মানুষ ভাগিয়া গেল; অর্থাৎ বাড়ীর কর্ত্তা ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ও ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলিকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলেন।

যে সকল রোজা ভূত ভাগাইবার জন্য পূর্ণোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য যে, তাহারা ভূতের রোজা বলিয়া ভূত

বাহাদুর তাহাদিগকে তিলমাত্রও ভয় বা খাতির করে নাই। সুতরাং রোজা মহাশয়েরাও যে ভূতের হাতে ঢিলটা পাট্‌কেলটার আস্বাদ রীতিমত উপভোগ করিয়াছেন, তৎপক্ষে আর কোনই সন্দেহ নাই। একটী ওস্তাদ রোজা কিঞ্চিৎ অধিক বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। আর রোজা সাহেব রসিক কি না—তাই ভূতের ভগিনীর সহিত (সত্য সত্যই ভূতের ভগিনী আছে কি না, তাহা আমরা জানি না) একটা রসাল সম্পর্ক পাতাইয়া ভূতের উদ্দেশ্যে সুমধুর সম্বন্ধসূচক নানাপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু হাজার হইলেও ভূত ভূত ত বটে? তাই রোজা সাহেবের ঐ রসিকতার মর্ম্ম-গ্রহণ করিতে না পারিয়াই হউক, কিম্বা অ-ভূত রোজা সাহেবের করে ভূত তাহার ভগিনীকে সমর্পণ করিয়া রোজা সাহেবের সঙ্গে ওরূপ মধুর সম্বন্ধ পাতাইতে গররাজী হইয়াই হউক, রোজা সাহেবের উপরে ভূত ভারি খাপ্পা হইল এবং রোজা সাহেবকে নাকালের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িল। ভূতের হাতে রোজা সাহেব কিরূপ জব্দ হইয়াছিলেন, পাঠক তাহা শুনুন।

একদা দুপুর বেলা রোজা সাহেব খানা খাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় কোথাও কিছু নাই—তাহার খানার ব্যসনে কতকগুলি তরল বিষ্ঠা আসিয়া পড়িল! রোজা সাহেবের খাওয়া বন্ধ হইল, তিনি 'তোবা তোবা' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আর একদিন রোজা সাহেব পুকুর হইতে গোসল করিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন, এমন সময় এক প্রকাণ্ড ঢিল আসিয়া সজোরে তাহার মস্তকোপরি পতিত হইল। ঢিলের চোটে তাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; তিনি "বাবারে" "মা'রে"—"শালার ভূত খুন করলে রে" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। ঐ দিবস গভীর রজনীতে রোজা সাহেব ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন ঐ সময় কে যেন আসিয়া তাহার বক্ষঃস্থল চাপিয়া বসিল। চাপনের চোটে রোজা সাহেবের দম

আটকাইবার উপক্রম হইল। তিনি "ওরে ছেড়েদে প্রাণ যায়" বলিয়া নিদ্রাবিজড়িত বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। নিকটেই আর একজন লোক ঘুমাইতেছিল, সে রোজা সাহেবের চীৎকার শুনিয়া ঘরে আলো জ্বালিল, রোজা সাহেবও ভূতের হাত হইতে রেহাই পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তৎপরদিবস রোজা সাহেব তাহার তল্পী তল্পা গুটাইয়া লইয়া ঐ বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলেন এবং যাইবার সময় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গেলেন যে,—"এ বড় বে-আড়া ভূত, একে কায়দা করা আমার কর্ম্ম নয়।"

ইহার পর বাড়ীর কর্ত্তা দেশ বিদেশ হইতে আরও অনেক ওস্তাদ আনাইয়াছেন, কিন্তু কেহই ভূতকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত রোজার দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া এই সকল ওস্তাদদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ ভূতকে লইয়া অধিক নাড়া-চাড়া করিতেও সাহস করেন নাই।

ঢিল পাটকেল ও বিষ্ঠা, ইহাই ভূতের প্রধান অস্ত্র। বলা বাহুল্য যে, উহার প্রয়োগ দ্বারাই ভূত বাড়ীর লোকদিগকে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিয়াছে। রান্না-বান্না করিয়া রাখিলে কিম্বা বাটনা বাটিয়া কুটনো কুটিয়া রাখিলে তাহা প্রায় প্রত্যহই বিষ্ঠা সংলিপ্ত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অত্যাচারের মাত্রাও বড় কম নহে। পাঠক, দুই একটী অত্যাচারের কথা শ্রবণ করুন ;—

এককড়া দুগ্ধ উনানের উপরে চাপান আছে, হয়তো হঠাৎ কড়া উল্টাইয়া সমস্ত দুগ্ধ পড়িয়া গেল।

ঘরে এক কলসী জল তোলা আছে, হয় তো কলসীটা আপনা আপনি কাৎ হইয়া সমস্ত জল পড়িয়া গেল।

কুটা মাছ তরকারী পুকুরে ধুইতে লইয়া গিয়া দেখা গেল যে, হাতের

ভাণ্ড হাতেই রহিয়াছে, অথচ তাহার মধ্যস্থিত মাছ তরকারী কোথায় উড়িয়া গিয়াছে।

ঘরে হয় তো এক জালায় ধান, এক জালায় চাউল ও এক জালায় গুড় আছে, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, ঐ তিনটা জালা ভাঙ্গিয়া ঘরের মেজেতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং ধান, চাউল ও গুড়—এই তিনে মিশাইয়া কে তাল পাকাইয়া রাখিয়াছে।

একদিন বাড়ীর কর্ত্তার ভাগিনেয় ভৌতিক ব্যাপার দেখিবার জন্য মাতুলালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। এই ভাগিনেয় মহাশয় একজন সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য লোকজনও দুইচারিজন আগমন করিয়াছিল। ভাগিনেয় সাহেবের আগমনে মাতুল সাহেব খানা-পিনার বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনেক মুরগী খাসীর গলায় ছুরি পড়িল। কালিয়া পোলাও কোপ্তা কাবাবের বিশেষ বন্দোবস্ত হইল। ক্রমে যথাবিহিত সুপ্রণালী মতে তাহা প্রস্তুত হইল; কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! আহার করিতে যাইয়া দেখা গেল যে, ঐ কালিয়া পোলাও কোপ্তা কাবাব সমস্তই বিষ্ঠা সংলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে!

আর একদিন একব্যক্তি রান্না ঘরে একখানা কলাপাতার উপরে কতকগুলি কুটা মাছ রাখিয়া পেছন ফিরিয়া বাট্‌না বাটিতেছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঐ ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে, কলাপাতা শুদ্ধ মাছ গুলি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! অনন্তর এই ঘটনার তিন দিন পরে বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার ভৃত্যকে বলিলেন যে,—"আজ পুকুর থেকে কিছু মাছ ধরিতে পার কি না দেখ, আজ আর ঘরে মাছ নাই।" এই কথা বলা মাত্রই তিন দিন পূর্ব্বে রান্না ঘর হইতে যে মাছগুলি অপহৃত হইয়াছিল, ঐ মাছ গুলি কলাপাতা সহ শূন্য হইতে ধপাস্ করিয়া কর্ত্তার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। ব্যাপার দেখিয়া সকলের তো চক্ষুস্থির! আশ্চর্য্যের বিষয়

মাছ গুলি তিন দিন পূর্ব্বে যেরূপ টাটকা ছিল, ঠিক সেইরূপ টাটকাই রহিয়াছে, কিছুমাত্রও বিকৃত হয় নাই। আর উহা হইতে একখান মাছও অপহৃত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, সেই মাছ গুলি কেহই আর খাইতে সাহস করিল না, উহা তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দেওয়া হইল।

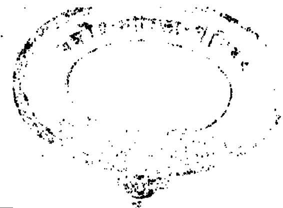
শুধু ঢিল নহে,—বাড়ীতে যে সকল নোড়া-নুড়ী শীল বাট্‌খারা আছে, তাহাও সময় সময় সবেগে আসিয়া বাড়ীর লোকদের অঙ্গে পতিত হয়। তজ্জন্য বাড়ীর কর্ত্তা যত শীল নোড়া ও লোহার বাট্‌খারা প্রভৃতি সমস্তই একটা সিন্ধুকে পুরিয়া চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অত্রাবস্থায় একদা একটা লোহার বাট্‌খারা আসিয়া সজোরে একজনের মাথায় পড়ে। তখন ঐ বাট্‌খারাটা সিন্ধুক হইতে কিরূপে বাহিরে আসিল জানিবার জন্য সিন্ধুকের নিকটে গিয়া দেখা গেল যে, উহা যেমন তালা বন্ধ ছিল, ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। সিন্ধুক খুলিয়া দেখা গেল যে, উহার মধ্যে আর সমস্ত শীল বাট্‌খারা গুলিই রহিয়াছে, কেবল ঐটা, অর্থাৎ যেটী যাইয়া মাথায় লাগিয়াছিল সেইটাই নাই।

এরূপ অত্যাচার,—এরূপ অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা প্রতি নিয়তই সঙ্ঘটিত হইতেছে। বাড়ীর কর্ত্তা এই সকল অত্যাচার ও উপদ্রবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে নানা স্থান হইতে অনেক রোজা,—অনেক ওস্তাদ আনাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ যাবৎ কেহই ভূতকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় নাই।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই আখ্যায়িকা বর্ণিত ঘটনাটী আগা গোড়া সত্য, ইহার এক বর্ণ ও মিথ্যা বা অতি রঞ্জিত নহে। এই ঘটনার অনেকাংশ আমি নিজের চক্ষে দেখিয়াছি। আমি কৌতুহল পরবশ হইয়া দেখিতে গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর একটী খানসামার গায়ে ঢিল পড়িল। বহু সন্ধানেও কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। অবশ্য অবিশ্বাসের

চক্ষে দেখিয়াছিলাম বলিয়া কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হইয়াছিলাম। আমি ও আমার সঙ্গীগণের সমুদয় যত্নাবফল হইয়াছে। কাজী সাহেব অতি সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া তাঁহার নাম প্রকাশ করিলাম না। তবে যদি কেহ শক্তিমান কাজীসাহেবকে বিপন্মুক্ত করিবার আশা প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কাছে সমস্ত সংবাদ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি; এবং পরীক্ষার ফলও সাধারণ্যে প্রচার করিতে প্রস্তুত আছি।

শ্রীরাজকুমার সেন গুপ্ত।



অলৌকিক রহস্য।

ম সংখ্যা]		চতুর্থ বর্ষ।		অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

ভৌতিক বিদ্যা।

এক্ষণে আমরা আয়ুর্ব্বেদ হইতে ভূত-সম্বন্ধিয় বিষয় দেখাইতে চেষ্টা করিব। সুশ্রুত সংহিতায় ৬০ অধ্যায়ে বলিতেছে—রাক্ষসদিগের অধিষ্টান হইতে ক্ষত রোগীদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এক্ষণে তাহারই বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে। গুপ্ত ও ভাবী বিষয়ের জ্ঞান, চিত্তের অনবস্থিতত্ব, অসহিষ্ণুতা ও অমানুষী ক্রিয়া এইগুলি কোন ব্যক্তিতে দৃষ্ট হইলে তাহাতে গ্রহের আবির্ভাব হইয়াছে বলা যায়। ক্ষতই হউক আর অক্ষতই হউক, মানুষ অশুচি ও মর্য্যাদাহীন হইলে গ্রহেরা হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য বা পূজা প্রাপ্তির জন্য তাহাকে হিংসা করিয়া থাকে। সেই সকল গ্রহ অসংখ্য। উহারাই দেব দৈত্যাদি। উহারা বিবিধাকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং আট শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। দেব, দেবারি (দৈত্য), গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিতৃগণ, ভুজঙ্গ, রাক্ষস ও পিশাচ এই অষ্টপ্রকার দেব গ্রহ। ইহাদের বিষয় "ভৌতিক উন্মাদ ও মূর্চ্ছা" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি এখানে পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তীব্র তপস্যা, দান, ব্রত ধর্ম্ম, নিয়মও অষ্ট প্রকার গুণ ইহাদের কোনটী বা সমস্ত দেবযোণী গ্রহদিগের নিত্য বর্ত্তমান থাকে।

তাঁহারা কখন মনুষ্যের সহিত সংবিষ্ট হন না বা মনুষ্যে আবেশ করেন না। যে বৈদ্য মোহ বশতঃ কহে যে "তাহারা ঐরূপ সংবিষ্ট হয় বা আবেশ করে।" তাহাকে ভূত বিদ্যার অধিকার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিৎ। ঐসকল গ্রহের অসংখ্য পরিচারক আছে। তাহারাই অসৃক্‌, বসা, ও মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারা অতি ভয়ঙ্কর, তাহারাই নিশা-বিহারী এবং তাহারাই মানবে আবেশ করে। ঐসকল নিশাচর পরি-চারকের মধ্যে যাহারা যে দেবগণের সংসৃষ্ট, তাহারা সেই গণের সংসর্গ হেতু সেই গণের ন্যায় লক্ষণান্বিত হয়। আবার অনুচরেরা শুচি হইলে দেববৎ নমস্য ও দেববৎ মাননীয় হইয়া থাকে। সুরাদি গ্রহের পরিচারক -দিগের স্ব স্ব স্বামীর ন্যায় শীল, ক্রিয়া, আচার ও ক্রম হইয়া থাকে। কিন্তু রাক্ষসদিগের শুচি স্বভাব হয় না, উহাদের মাতারা নৈঋতের কন্যা ও রাক্ষসী, তাহাদের সন্তানেরা মাতারই অশুচি স্বভাব প্রাপ্ত হয়। অনু-চরেরা শাস্ত্রোক্ত পক্ষ হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহাদের অধিপতি গ্রহেরা তাহাদের জন্য বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহারা দিব্য ভাব প্রাপ্ত অথচ হিংসাপ্রিয়, তাহাদিগকেই সংজ্ঞাকারেরা ভূত এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু এই বিদ্যা দ্বারা গ্রহ সংজ্ঞক ভূতদিগের বিষয় জানা যায় এই জন্য ইহাকে ভূত বিদ্যা কহে। ভূতদিগের শান্তির জন্য প্রথমে জপ, নিয়ম ও হোম করিয়া পরে চিকিৎসা করিবে। রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য, সর্ষপ, যব প্রভৃতি বীজ, মধু ও ঘৃতের নানাপ্রকার ভক্ষ্য এই সকল সাধারণও সর্ব্বপ্রকার গ্রহকেই নিবেদন করিবে। বস্ত্র সমূহ, মদ্য সমূহ মাংস সমূহ, ক্ষীর সমূহ, রুধির সমূহ, ইহাদের মধ্যে যাহা যার প্রিয় তাহা তাহাকে দিবে।

যে ভূত যে দিনে মানুষকে প্রাপ্ত হয় তাহাকে সেই দিন বলি দিবে। দেবাবির্ভাব হইলে প্রত্যেক দেবগৃহে অগ্নি হোম করিয়া বলি দিবে।

দৈত্যাবেশ হইলে কুশ, স্বস্তিক, পূগ. ঘৃত, ছত্র, ও পায়স সমূহ চত্বরাদি স্থানে বলি দিবে। রাক্ষসাবেশ হইলে চতুষ্পথে বা ভীষণ গহনে বলি দিবে। পিশাচ প্রাপ্তি হইলে শূন্যাগারে তীব্র বলি দিবে (তীব্র অর্থাৎ আম পক্ক মিশ্রিত রস)। পূর্ব্বে ভূত বিদ্যাদি অধ্যায় সমূহে ভূতশান্তির জন্য যে সকল মন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহাতে ভূত শান্ত না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধসকল প্রয়োগ করিবে।

রোগীকে ছাগল ও ভাল্লুকের চামড়া ও লোম এবং শল্লকী ও পেচার লোম আর হিঙ্গু ও ছাগমূত্রের ধূপ দিবে। ইহাতে বলবান গ্রহও শান্ত হয়। গজ পিপুলের মূল, ত্রিকটু, আমলকী, শারশা, গোধানফুল, মার্জ্জার ও ভাল্লুকের পিত্তে উত্তমরূপে ভাবনা দিয়া আর নস্য, অভ্যঙ্গ, ও পরিষেকে প্রয়োগ করিবে। গর্দ্দভ, অশ্বতর, উলূক, করব, কুকুর, গৃধ্র কাক ও বরাহের পুরীষ পেষণ করিয়া তৈল পাক করিবে। এস্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্তুর বিষ্টা পর পর জন্তুর বিষ্টার দ্বিগুন হইবে। এই তৈল্য, নস্য, অভ্যঙ্গ, ও পরিষেকে প্রয়োগ করিতে হয়। শিরীষ বীজ, রসুন, শুঁঠ, শরিশা, বচ, মাঞ্জিষ্ঠা, হলুদ ও পিপুল ছাগমূত্রে পেষণ করিবে। এই বর্ত্তি গরুর পিত্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং অঞ্জন করিবে। নাটকরঞ্জের ফল, ত্রিকটু, শোনাক ও বেলছাল, হলুদ, এবং দারু-হরিদ্রার বর্ত্তি পূর্ব্ববৎ অঞ্জন করিবে। যে সকল গ্রহ অসাধ্য তাহাদের সকলেরই অঞ্জন সৈন্ধব, কটুকি, হিঙ্গু, ও গোলঙ্ক (অথবা হরিতকী) এবং বচ এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া ও মৎস্য পিত্তের সহিত পূর্ব্ববৎ শুষ্ক করিয়া বর্ত্তিকাকারে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। পুরান ঘৃত লশুন, হিঙ্গু, সর্ষপ, বচ দূর্ব্বা শ্বেতদূর্ব্বা, জটামাংসী, গন্ধমাংসী, কুক্কুটী, সর্পগন্ধা কাম (ক্ষীর কাকোলা) মৌরী, বস্তকন্দা. গুড়ুচী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বটপত্রিকা, অর্কমূল, ত্রিকুট, প্রিয়ঙ্গু, স্রোতোঞ্জন, রসাঞ্জন মনঃশিলা,

হরিতাল, শ্বেত সর্ষপ, এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মার্জ্জার, দ্বীপী, ঘোটক, গো, সজারু, শম্বক, গাধা, উষ্ট্র ও নকুলের বিষ্ঠা, ত্বক্, রোম, বসা, মূত্র, রক্ত পিত্ত ও নখাস্থি এই সকল দ্রব্য, এই রোগের চিকিৎসার্থ তৈলে, ও ঘৃতে প্রয়োগ করা যায়। ঐ সকল তৈল, ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। আর ঐ সকল দ্রব্যের বর্ত্তি অবপীড় ও অঞ্জনে প্রয়োগ করিবে। আর উহাদের ক্বাথ পরিষেক করিবে। আর উহাদের চূর্ণ উদ্ধূলন করিবে।

আর উহাদিগকে শ্লক্ষ পিষ্ট করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে সর্ব্ব-প্রকার মানস বিকার অল্পকালে নষ্ট হয়। এই রোগের নাম অপরাজিতে গণ। ভূতযোগে যথাকালে স্নেহ বমনাদিও প্রয়োগ করা আবশ্যক। ভূতরোগে দেবগৃহে কোন প্রকার অপবিত্র বস্তু রাখিবে না। আর পিশাচ গ্রহ ভিন্ন অন্য গ্রহে প্রতিকূল আচরণ করিবে না। কেন না অন্যান্য গ্রহ মহাতেজা তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে বৈদ্য ও আতুর উভয়কেই বিনাশ করিতে পারে। হিতাহিতীয় অধ্যায়ে যে সকল অন্ন পানাদি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এই রোগে নিত্য প্রয়োগ করিবে। তাহাতে বৈদ্যের সিদ্ধি ও যশ হইয়া থাকে। এই সকল রোগে অনেক সময় ঔষধাদি ব্যবহার করিয়াও ফল পাওয়া যায় না তাহার কারণ

বিষমেণো পচারণে কর্ম্মভিশ্চ পুরাকৃতৈঃ।
অনিত্যত্বাচ্চ জন্তূনাং জীবিতং নিধনং ব্রজেৎ ॥
প্রেতাভূতাঃ পিশাচাশ্চ রক্ষাংসি বিবিধানিচ।
মরনাভি মুখং নিত্যমুপ সর্পন্তি মানবম্ ॥
তানি ভেষজবীর্য্যাণি প্রতিঘ্নন্তি জিঘাংসয়া।
তস্মাম্মোঘাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভবন্ত্যেব গতায়ুষঃ ॥

অর্থাৎ জীবদিগের মৃত্যু তিন কারণে ঘটিয়া থাকে যথা অপচার,

পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও জীবনের অনিত্যতা। মুমূর্ষু মানবকে প্রেত, ভূত পিশাচ ও রাক্ষসগণ নিত্য উপসর্পন করিয়া থাকে। সেই সকল প্রেতাদি হিংসা-বশতঃ ঔষধের বীর্য্য হরণ করে বলিয়া সমস্ত চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়াতে রোগীরা গতাসু হইয়া থাকে। বারান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন কবিরাজ।

অলৌকিক ঘটনাবলী।

১। ভূত না যমরাজ ?

আজকালকার লোকে ভূতের কথা শুনিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। কিন্তু আমি যে বিষয় লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি তাহা সত্য ঘটনা; বিশ্বাস করা-না-করা পাঠকদিগের ইচ্ছা। এই ঘটনাটী প্রায় দুই বৎসর হইল ঘটিয়াছে ঘটনাটী এই—

আমি ও আমার তিনজন বন্ধু আমার একটি ঘরে বসিয়া গল্প করিতে-ছিলাম, গল্পগুলির মধ্যে কতকগুলি কার্য্যের ও কতকগুলি ভূতের। এই ভূতের কথা বলিতেছি, এমন সময় আমার বন্ধুগণের মধ্যে কামিনীকান্ত নামক এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন "আমি ভূত প্রেতকে বিশ্বাস করি না; তুমি যাহা বলিতেছ সব মিথ্যা; অতএব তুমি যে কার্য্যের কথা বলিতেছিলে তাহাই বল। আমি ও গল্প শুনিতে চাহি না।" আমি বলিলাম "ভাই! আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য; ইহার মধ্যে রঞ্জিত বিষয় কিছুই নাই।"

কিন্তু ইহাতেও তিনি অবিশ্বাস করিলেন। সুতরাং সেই কাজের কথাই বলিতে লাগিলাম।

এই কথা বলিতে বলিতে রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিল, তথাপি শেষ হইল না। ইতোমধ্যে আমার উল্লিখিত বন্ধু অস্ফুটস্বরে বলিলেন "আজ ভাই আমি গল্প শুনিব না। আমার অন্তঃকরণে একপ্রকার অদ্ভুত ভয় হইতেছে কিসের ভয় বলিতে পারি না। যাহা হউক এখন আমি বাড়ী যাইব।" বন্ধুকে ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া একাকী যাইতে দেওয়া বিবেচনা করিলাম না; সুতরাং একখানি অশ্বশকট ভাড়া করিলাম। তন্মধ্যে আমি বন্ধুবরকে উঠাইয়া কোচ্‌মানকে বন্ধুর বাটী পটলডাঙ্গায় যাইতে বলিলাম। কোচ্‌মান অতি দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল।

স্বার্দ্ধঘণ্টার মধ্যে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ীর দরজা খুলিয়া বন্ধুকে নামাইলাম এবং উপযুক্ত ভাড়া প্রদান করিয়া শকটচালককে বিদায় দিলাম। বন্ধুর বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ ছিল; সেই নিমিত্ত দরজার কড়া নাড়িতে হইল।

কড়ার খট্ খট্ শব্দ শুনিয়া বন্ধুর ভৃত্য নীলরতন আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। কামিনীকান্তকে অন্দর মহলে লইয়া যাইয়া মস্তকে জল, বরফ ইত্যাদি দিয়া একটু সুস্থ করিলাম। বলা বাহুল্য, আমি বন্ধুর বাড়ীর সকল লোককেই চিনিতাম।

সুস্থ করিবার দুই কিংবা তিন মিনিট বাদে কামিনীকান্ত বলিলেন, "আমার অতিশয় ক্ষুধা লাগিয়াছে। না খাইয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না।" কথা শেষ হইতে না হইতেই বন্ধুর মাতা পাক চড়াইয়া দিলেন। একঘণ্টার মধ্যে রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইলে, বন্ধুর মাতা ভাত থালায় ঢালিতে লাগিলেন এবং আমিও ইত্যবসরে বসিবার জায়গা করিয়া দিলাম। মাতা ভাত আনয়ন করিয়া দিলে, বন্ধু খাইতে বসিলেন। পাকের

মধ্যে কেবল ভাত আর ডাল হইল। বন্ধুর পক্ষে উহা যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু একি! বন্ধুবর যে বসিয়া আছেন? সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে! কারণ কি? বন্ধুর অন্নের মধ্যে কেবল অস্থি ও নরমাংস! কোথাও কিছু নাই, এ সমস্ত কোন্ স্থান হইতে আসিল? কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত! আহা! ভগবানের কি অপরূপ লীলা!

এস্থলে বলা কর্ত্তব্য বন্ধুর পিতা ইহার পূর্ব্বেই কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছেন। তাই কামিনীকান্তর মাতা পুত্রকে ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিজের পুত্রকে ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া কে না ক্রন্দন করে? আমি বলিলাম "আপনি কাঁদিবেন না; আপনার কিছুই ভয় নাই, আমি এখনই ওঝা ও ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে যাইতেছি।"

উভয়ই যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হায়! তাঁহারা বন্ধুকে অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় দেখিলেন, কামিনীকান্ত দুই ঘণ্টা পরে পঞ্চভূতাত্মক দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

এখন পাঠকদিগের নিকট আমার এই জিজ্ঞাস্য—বন্ধুর জীবন কে গ্রহণ করিল? ভূত না স্বয়ং যমরাজ?

শ্রীকুমারেশচন্দ্র শীকদার।

২। দ্বারিকের-মা।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অনন্তকাল-ভাণ্ডার হইতে খসিয়া পড়িয়া আবার অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে যে অদ্ভুত ব্যাপারের অভিনয় হইয়া গিয়াছে তাহার স্মৃতিটুকু কেমন যেন থাকিয়া থাকিয়া মনোমধ্যে উদিত হইয়া, তখন আর এখন কে তুলনায় আনিয়া ফেলে! বাস্তবপক্ষে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করি বা না করি, ভৌতিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব যে একবারে নাই তাহা কোন মতে স্বীকার

করিতে পারি না। আমার বাল্যকালের কথা বলিতেছি। বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার নিকট অগ্রদ্বীপ বলিয়া একটি গ্রাম আছে, গ্রামখানি অনেকের পরিচিত। ৺গোপীনাথ প্রভুজীর অধিষ্ঠানে গ্রামখানি ধন্য, বর্ষে বর্ষে বারুণী গঙ্গাস্নান উপলক্ষে মহা সমারোহে একটি মেলা হইয়া থাকে। বহু দূরদেশ হইতে লোক সমাগম হইয়া দিবারাত্রের জন্য গ্রামখানি কুল কুল ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া থাকে। এই গ্রামে আমাদের বাস, বাড়ীখানি দুই চত্তর, বহির্বাটিতে একখান বৈঠকখানা এবং একখানি গোশালা।

আমাদের বাড়ীর নিকটে একঘর চাষী-কায়স্থের বাস ছিল, কালস্রোতে একটি বিধবা রমণী ভিন্ন সকলেই ভাসিয়া গিয়াছিল। বিধবার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর—তাহার নাম কেহ জানিত না বা নাম ধরিয়া কেহ ডাকিত না, সকলেই তাহাকে দ্বারিকের-মা বলিয়া ডাকিত। দ্বারিকের-মা আমাদের বিশেষ অনুগত ছিল, আমরাও তাহাকে খুব ভাল বাসিতাম। দ্বারিকের-মা সর্ব্বদাই আমাদের বাটীতে থাকিয়া সম্ভবমত গৃহস্থালীর কার্য্য করিত, ফল কথা দ্বারিকের মা আমাদের পরিবারভুক্ত ছিল—দিনমানে আমাদের বাড়ীতে থাকিত, রাত্রে আপন ক্ষুদ্র গৃহখানিতে শয়ন করিত। দ্বারিকের মা আমাদের সুখে সুখী এবং আমাদের দুঃখে দুঃখানুভব করিত। আমাদের গাভী কয়েকটি দ্বারিকের মার পরিচর্য্যাধীন ছিল। পাড়াগাঁয়ে বাঁধা খাওয়াইয়া গাভী রক্ষা করার পদ্ধতি ছিল না, গাভীগণ জনৈক রক্ষকের অধীনে দিবাভাগে গোচরণ ভূমিতে উদরপূরণ করিয়া গোশালায় সুরক্ষিত হইত, অনেকে আবার বেশী দুগ্ধের লোভে দুগ্ধবতী গাভীকে রাত্রিযোগে ছাড়িয়া দিতে কুণ্ঠিত হইত না। আমাদের বহির্বাটিতে একটী কুলগাছ ছিল, দ্বারিকের মা ঐ গাছের কুল বড় ভাল বাসিত।

ক্রমে ক্রমে দ্বারিকের মা আমাদের বাড়ীতে বেশ প্রসার প্রতিপত্তি

করিয়াছিল, সময়ে সময়ে অনেকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেও ত্রুটি করিত না। কোন কারণে দ্বারিকের মা একদিন আমাদের বাড়ী না আসিলে আমরা চক্ষে অন্ধকার দেখিতাম। কয়েকবৎসর পরে করালকাল দারুন মুখব্যাদান পূর্ব্বক দ্বারিকের মার নিকট দাঁড়াইল, দ্বারিকের মা ধীরে ধীরে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল—বৃদ্ধা কায়স্থবাড়ীর চিহ্ন লোপ করিয়া অনন্তে মিশিয়া গেল। আমরা কয়েকদিন হাহুতাশ করিলাম কিন্তু দ্বারিকের মা কোথায়? যে দেশে জ্বালা যন্ত্রণা নাই সেই দেশে চলিয়া গিয়াছে, যেস্থান হইতে কোন পথিক এ পর্য্যন্ত ফিরে নাই, সেই স্থানে চলিয়া, গিয়াছে। কয়েকদিন পরে পাড়ার লোকে কানাকানি করিতে লাগিল—দ্বারিকের মা প্রেতিনী হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করিলাম না, গঙ্গাতীরে শ্রীহরি স্মরণ পূর্ব্বক তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সে কেন প্রেতিনী হইবে? এ সংস্কারকে মন হইতে বিদুরিত করিতে পারিলাম না—কিন্তু লোকের কথাতেই হউক বা অন্যবিধ কারণেই হউক, রাত্রিমানে আমরা বহির্বাটিতে যাইতে পারিতাম না, গাটা কেমন যেন কাঁটা দিয়া উঠিত; মনে হইত দ্বারিকের মা কুলতলায় কুল কুড়াইতেছে, কখন বা মনে হইত দ্বারিকের মা গাভীপরিচর্য্যায় রত রহিয়াছে।

এইরূপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল, একদিন রাত্রিশেষে দেখা গেল কয়েকটি গাভী গৃহ প্রবেশ করিতেছে এবং সদর দরজা উন্মুক্ত রহিয়াছে। সেদিন কিছু বুঝা গেল না। দুই একদিন পরে আবার সেই ঘটনা। তখন মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, আমরা কারণ অনুসন্ধানে যত্নবান হইলাম। রাত্রিকালে চুপি চুপি ছাদের উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে হঠাৎ কে যেন সদর দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে গাভীগুলি বাটির বাহির হইয়া গেল, তাহার কিছুক্ষণ পরে কুলগাছটা আলোড়িত হইয়া উঠিল, সুপক্ক কুলগুলি পতনের শব্দও শ্রুতি বিবরে প্রবেশ করিল,

ভয়ে গাটা কাঁটা দিয়া উঠিল, আমরা তৎক্ষণাৎ নিচে নামিয়া আসিলাম। চেষ্টা করিয়াও দ্বারিকের মার প্রেতিনীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু দ্বারিকের মা প্রতি রাত্রিতেই গাভীগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া চরাইয়া আনিত। দেখিতে দেখিতে গাভীগুলি বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল—গৃহস্থালীতে দুগ্ধেরও প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

দ্বারিকের মা জীবিতাবস্থায় যে পরিমাণ আমাদের উপকার করিত—মৃত্যুর পরও তাহা হইতে কম উপকার করিত না। রাত্রিমাণে গাছ নাড়া দিয়া সুপক্ক কুলগুলি পাড়িয়া রাখিত, প্রত্যুষে আমরা সেগুলি বিনা আয়াসে লাভ করিতাম। নিকটস্থ গ্রাম মাটিয়ারিতে আমাদের একঘর কুটুম্ব আছেন, তাঁহারা জমিদার। আমরা বর্ষে বর্ষে শারদীয়া পূজোপলক্ষে তথায় যাইতাম এবং মাসাধিক কাল সপরিবারে তথায় থাকিতাম। বাবুরা একজন রক্ষককে ঐ সময়ের জন্য আমাদের বাটীতে পাঠাইতেন, কিন্তু দ্বারিকের মার তাহা সহ্য হইত না, সে নানারূপ উপদ্রব করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিত, সে সমুদয় অত্যাচারের কাহিনী শুনিলে আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। সে সমুদয় রক্ষকের প্রমুখাতশ্রুত এজন্য তা লিপিবদ্ধ করা হইল না। দ্বারিকের মা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কিছু করে নাই তবে একদা রাত্রিমানে পিতা ঠাকুরের একাকী আহারকালে দ্বারিকের মা হস্তপ্রসারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পায়সান্ন চাহিয়াছিল, তদ্দর্শনে পিতৃদেব ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রমশঃ কথাগুলি সকলের কর্ণে উঠিল, পিতাঠাকুর অনিষ্টাশঙ্কায় পণ্ডিত মণ্ডলীর পরামর্শানুসারে ৺গয়াধামে গমন করতঃ দ্বারিকের মার পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি দ্বারিকের মার কার্য্যকলাপ বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় গাভীগণ তাহাতে কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কাটোয়া

৩। আর একটি ঘটনা।

গত মাঘ মাসে আমার বড় ভ্রাতৃজায়া দুইটী শিশুকন্যা সন্তান রাখিয়া একরাত্রি একদিনের ভিতর বিশুচিকা রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শিশু কন্যা দুইটীকে বড়ই আদর করিতেন, কন্যা বলিয়া তাচ্ছল্য করিলে তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিত। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের সময় আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে শ্বশুরালয় হইতে আনান হয়, আমার ঐ ভগ্নী বৌদির পীড়ার সময় উপস্থিত ছিল না। বৌদি পাঁচ বৎসর বাদে দেশে আসিয়াছিলেন, তিনি দাদার সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন, বৌদিকে আমরা সকলেই অনেকদিন বাদে দেখিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু বাড়ী আসার তিন দিনের ভিতরই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বৌদির মৃত্যুর পর বড় মেয়েটীকে আমার মাতা প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন এবং ছোটটিকে আমার মেজ বিধবা ভগ্নী প্রতিপালন করিতে থাকেন। শ্রাদ্ধের পরই আমরা বিদেশে চলিয়া আসি।

কতক দিবস বাদে আমার ছোট ভগ্নী স্বপ্নে দেখিতে পায় যে বৌদি আমাদের বাড়ীর এমন একস্থানে দাড়াইয়াছেন, যেখান হইতে বাড়ীর লোক জনের গতায়াত দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদির চক্ষু দুইটী বড় বড় ছিল, একখানা লাল পাছাপেড়ে সাড়ী পরিয়া একদৃষ্টে বাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে, লাল পাছাপেড়ে সাড়ী পড়িয়াই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া আমার ভগ্নী আমাদের বাড়ীর আর একটী স্ত্রীলোককে ডাকিয়া দেখাইল যে দেখ বড় বৌদী চাহিয়া আছে। অপর স্ত্রী লোকটী বৌকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। তুমি মরিয়া আবার এখানে কেন আসিয়াছ? উঃ। আমি আমার মেয়ে দুইটী দেখিতে আসিয়াছি। প্রঃ। না তুমি চলিয়া যাও, তুমি এখানে আসিতে পারিবেনা, মরা মানুষ

কেন আবার ফিরিয়া আসিবে। বড় বউ আর কোন কথার জবাব না দিয়া একদৃষ্টে বাড়ী দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় প্রায় সন্ধ্যা, ছেলে পিলে যে যেই ঘরে থাকে তাহাকে সেই সেই ঘরে নিয়া যাইতেছিল ইহা দেখিয়া বড় বউ চলিয়া গেল। স্বপ্ন কথা আমার ভগ্নী পরদিন মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া ছিল।

তাহার অল্প কয়েকদিন পরেই দাদার ছোট মেয়েটীর পেটের অসুখ করে, দুই তিন দিন বাদে সারিয়া যায়। তাহার পর আমার একটী এক বৎসরের ছেলের পেটের অসুখ হয় তাহা আর সারে না, প্রায় ৭দিন গত—এই সময় আমি পুসা এগ্রিকালচারেল কলেজে দাদার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তিনি P. W. Dতে 1st grade overseer. নূতন সেখানে বদ্‌লী হইয়া গিয়াছেন, আমি তখন কানপুরে থাকি। তিনি বলিলেন তাহাকে পুসা রাখিয়া আমি কানপুরে চলিয়া যাইব। আমি পুসা হইতে কার্য্যগতিকে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম এবং কলিকাতায় আমার কতক দিবস থাকিতে হয়, সেই সময় মাতাঠাকুরাণীর চিঠি পাইলাম, যে, তোমায় একবার বাড়ী আসিলে ভাল হয়, গোলার বড় অসুখ (আমার ছেলের নাম ছিল গোলা।) আমি তত গা করিলাম না। তাহার তিন দিন বাদে বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম পাইলাম, দাদার দুই মেয়ে এবং আমার ছোট ছেলে সাং-ঘাতিক পীড়িত। তাহার পরদিবস বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম দাদার বড় মেয়েটী পূর্ব্ব রাত্রিতে গত হইয়াছে, আমার ছেলেটী ও দাদার মেয়েটী যায় যায়। সেই সময় দাদার চিঠি পাওয়া গেল, তিনি লিখিয়াছেন, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন তাহার বড় মেয়ে ‘পটল’ পুকুরে ডুবিয়া যাইতেছে; এই চিঠি পটল মরবার পূর্ব্বের দিনের তারিখের। তাহার পরের দিনের তারিখের চিঠি পাওয়া গেল তাহাতে লিখিয়াছেন পটল অন্ধ জলে ডুবিয়া গিয়াছে, বাড়ীতে কি সংবাদ সত্বর টেলিগ্রাম করিবে। সেই সময়

দাদাকে পটলের মৃত্যু সংবাদের টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, তাহার কেরাণী টেলিগ্রাম দিয়াছিল না। আমি বাড়ীতে পৌছিবার পরদিনে ছোট মেয়েটী এবং শেষ রাত্রিতে আমার ছেলেটী মারা গেল। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম যে যাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসা যায় তাহার অমঙ্গল হইলে মনে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমার নিবাস ঢাকা জেলা বিক্রমপুর গ্রাম টাঙ্গিবাড়ী পোঃ ঐ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

পুনরাগমন।

এই লক্ষ্মীপূজার দিন আমার চিরস্মরণীয়। এই একদিনে—দিনের এক মুহূর্ত্তে,—আমাদের পিতৃপিতামহ প্রতিষ্ঠিত শান্তির আলয়খানি, ভূমিসাৎ হইবার পূর্ব্বক্ষণে, দেবতার কৃপায় দৃঢ়ভিত্তিতে পুনঃ স্থাপিত হইয়াছিল। দেবতার অশ্রুজলে গৃহদেহস্থ আবর্জ্জনারাশি বিধৌত হইয়া, নবারুণের কাঞ্চনরাগে রঞ্জিত হইয়াছিল।

অতীতের সেই দুরাবকাশ হইতে সে দিবসের প্রতিঘটনা যথার্থই দেবতার মূর্ত্তি ধরিয়া আমার চক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে। আমি দেখিতেছি, প্রবল ভোগবাসনা, দম্ভ, অবিশ্বাস, অনাচার প্রভৃতি কতকগুলা আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের উপকরণ, রাক্ষস রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধরিয়া, বাহির হইতে আমাদিগের আশ্রম-কুটীর-পৃষ্ঠে

আঘাত করিতেছে। আমরা আপাতমধুর উচ্ছৃঙ্খলতার মোহে, সভ্যতার চসমায় চক্ষুলজ্জা আবৃত করিয়া আগ্রহে তাহার পতনমুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতেছি। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে দেবশ্রী আসিয়া, নিজের অধিকার বজায় রাখিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আমাদের অত্যাচারে নিরাভরণা, তথাপি স্বরূপের উজ্জ্বলতায় ঘরখানি আলোকিত করিয়া দেবী আসন পাতিয়া বসিল। অমনি চারিদিক হইতে হিন্দু কুললক্ষ্মী তাহার সহচরীগণ সেই গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঘরখানির দেওয়ালে দেওয়ালে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইল। রাক্ষস রাক্ষসীর আক্রমণ ব্যর্থ হইল।

সে রাত্রিতে আমাদের কাহারও নিদ্রা হইল না। আমাদের না উল্লাস, না অবসাদ, না হর্ষ, না বিষাদ। সুখ দুঃখের ব্যবধান মধ্যে কোন প্রকারে নিজ নিজ অস্তিত্ব লুকাইয়া আমরা সে রাত্রি যাপন করিলাম।

এই রাত্রিতে পিতার কাছে দুর্গার পরিচয় হইল। চিরাগত প্রথামত সমস্ত নিমন্ত্রিতের ভোজনান্তে যখন আমরা পিতাপুত্রে দেবীর প্রসাদ গ্রহণে বসিলাম তখন, দুর্গাই আমাদিগকে অন্ন পরিবেশন করিল। আমাদিগকে অন্নদান করিয়া আমাদের কুলভুক্তা হইল। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী পিতার পদ প্রান্তে পতিত হইয়া স্বামীর আচরণের জন্য বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমি এই রাত্রিতে সর্ব্ব প্রথম লতিকার কমনীয়তা-সম্মুখে জ্ঞান-কর্কশ আকাশ স্পর্শী শালতরুর অবনমন নিরীক্ষণ করিলাম। কলিকাতা সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র, আবালবনিতা-বৃদ্ধের নমস্য আমার পণ্ডিতাগ্রণ্য পিতা ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে প্রতিপ্রণাম করিলেন; এবং বলিলেন—"কিসের ক্ষমা মা! আগে জানিতাম, তোমার স্বামী আমার ও আমার বংশের চির

হিতৈষী। এখন জানিলাম, তিনি আমার গুরু। তিনি এই অভিমানান্ধের চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। তবে এখন আমি কোনও কথা কহিতে পারিব না। আমাকে আজ রাত্রির মত তোমরা সকলে ক্ষমা কর। যদি দামোদর মুখ রক্ষা করেন, যদি গোপাল বাঁচে, তবেই তোমার স্বামীর সঙ্গে আবার কথা কহিবার আমার অধিকার হইবে।”

মাতা একে দুর্ব্বল তাহার উপর রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত উপবাসিনী। দুর্গার প্রথম দর্শনের উল্লাসবেগ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। এই জন্য আমাদের কেহই সে রাত্রিতে তাঁহাকে গোপালের কথা শুনাইতে সাহসী হইলাম না।

দুর্গা সারারাত্রি আমাদের ঘরেই রহিল, মা তাঁহাকে রাত্রির মধ্যে আর এক দণ্ডও কাছ ছাড়া করেন নাই। ডাক্তার বাবুর স্ত্রীও সে রাত্রিতে বাড়ী যাইবার অবকাশ পান নাই। কেন পান নাই, তাহার কারণ পরে বুঝিতে পারিলাম। সারারাত্রি জাগরণ—ভোরে বিশ্রাম লইতে গেলে পাছে বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইতে হয়, এই ভয়ে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া কোম্পানীর বাগানে বেড়াইবার জন্য আমি বাটীর বাহির হইতেছিলাম। সেই সময়ে ডাক্তার বাবুর স্ত্রী আমার কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন—“গোপীনাথ আমাকে একটু সাহায্য করিতে হইবে।”

আমি কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেটা এমন কিছু কঠিন কার্য্য নয় যে, তাহার জন্য আমাকে তাঁহার অনুরোধ করিতে হয়। তিনি ইচ্ছা হইলেই আমাদের বাটীতে আসিতেন, এবং ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেন। আমার অজ্ঞাতসারে তাঁহার এইরূপ কতবার যে আগম নির্গম হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। নিজেদের গাড়ী না

থাকিলে আমাদের গাড়ী করিয়া তিনি কতবার গৃহে ফিরিয়াছেন। সে কার্য্যে মা কিম্বা তিনি আমাদের সম্মতির অপেক্ষা রাখিতেন না। ভৃত্য কিম্বা দাসীগণের যাহাকে হউক একজনকে দিয়া কোচোয়ানকে আদেশ করিয়া পাঠাইতেন।

আমি বলিলাম—"একার্য্যের জন্য আমাকে আদেশ করিতেছেন কেন? চাকর দাসীরা কি কেহই জাগিয়া নাই?"

তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"চাকর দাসীর কাজ হইলে তোমার কাছে আসিব কেন? আমার বাড়ীর অবস্থা তুমি নিজ চক্ষে একরূপ দেখিয়াই আসিয়াছ। আমি দুর্গাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিতেই ফিরিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু মা দুর্গাকে এমন করিয়া জড়াইয়াছেন আমি তাঁহার নিকট হইতে চাহিতে সাহসী হইতেছি না।"

"আমিই বা কেমন করিয়া বলিব!"

"অথচ বলিতেই হইবে। ঠাকুরই আমাকে দুর্গাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। অন্যে বলিলে আমি ফেলিয়া যাইতাম।"

"আপনিই কি মায়ের কাছে দুর্গার পরিচয় দিয়াছেন?"

"আমি দিই নাই। হয় দুর্গা নিজে দিয়াছে, নয় মা নিজের অন্তর্দৃষ্টির বলে তাহাকে জানিতে পারিয়াছেন। পাছে মা আমাকে প্রশ্ন করেন, এই জন্য আমি বালিকাকে দূর হইতে মাকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম। দুর্গাকে আনিবার সময় আমি ঠাকুরের অনুমতি লইতে যাই। সেই সময় তিনি দুর্গাকে বলিয়াছিলেন, 'যদি দেবতার সম্মুখেও তুমি মাকে প্রথম দর্শন কর, তাহা হইলে আগে মাকে প্রণাম করিয়া তবে দেবতাকে প্রণাম করিও।' দুর্গা যদি তাই করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই মা যদি সমস্ত বুঝিয়া থাকেন।"

"গোপাল কেমন আছে?"

"আমি নিজে গোপালকে দেখি নাই। তবে বাবুর মুখের অবস্থা দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, গোপাল ভাল নাই।"

"বেশ আমি মাকে বলিতে চলিলাম।"

"মাকে বলিবে তাহার পিতার পিশিমা আসিয়াছেন। তিনি দুর্গাকে কালীঘাটে লইয়া যাইবেন।"

"একি সত্য কথা?"

"যাইবার কথা আছে। তবে আজই যে যাইবেন এমন কথা নাই। গোপাল যতদিন সুস্থ না হয়, ততদিন বোধ হয় যাওয়া হইবে না।"

"শুন বউঠাকরুণ, আমি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি, মায়ের কাছে আর মিথ্যা কহিব না।"

"বেশ তবে সত্যই বলিও।"

আমি মায়ের কাছে যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে মা নিজেই আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই ডাক্তার বাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ বউমা, বালিকার কি কুশণ্ডিকা হয় নাই? তাহার মাথায় আয়তির চিহ্ন দেখিলাম না কেন?"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"হয় নাই।"

"ব্যাঘাত ঘটিয়াছে?"

"ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।"

"গোপাল আমার বাঁচিয়া আছে ত?"

"বালাই, গোপাল বাঁচিয়া থাকিবে না কেন?"

"তবে কুশণ্ডিকা হইল না কেন?"

ডাক্তার বাবুর স্ত্রী উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আমি অবকাশ পাইয়া বলিলাম—"গোপাল হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছে।"

"সত্য কথা বল গোপীনাথ, সংশয়-যুক্ত কথা কহিতেছ কেন?"

এই বলিয়া পিতা আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন—"বল গোপাল দগ্ধ হইয়াছে। আর বল, আমিই তাহাকে দগ্ধ করিয়াছি।"

"এই কথা শুনিবা মাত্র মাতা স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন। তারপর পিতার মুখ পানে চাহিলেন, কি বুঝিলেন। বুঝিয়া বলিলেন "গোপাল কোথায় ?"

আমি বলিলাম—"ডাক্তার বাবুর বাটীতে।"

মা ডাক্তার বাবুর বাটীতে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিলেন

পিতা বলিলেন—"তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করিলে না ?"

মা উত্তর করিলেন—"এ অসম্ভব কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব।"

পিতা। না ব্রাহ্মণী, সত্য সত্যই আমি গোপালকে দগ্ধ করিয়াছি। কেমন করিয়া করিয়াছি, বলি শুন।

মাতা। তোমার কিছুই বলিতে হইবে না। আমি গোপালকে দেখিতে যাইব, তুমি অনুমতি দাও।

পিতা। যাও। গোপালকে বাঁচাইতে যত অর্থ ব্যয় করিতে ইচ্ছা কর, করিতে পার। আমাকে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

মাতা। তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, সারারাত্রির মধ্যে তুমি একবারের জন্যও চোখ বুজ নাই। ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর। বাস্তবিকই যদি গোপাল দগ্ধ হইয়া থাকে, তাহার অদৃষ্ট তাহাকে দগ্ধ করিয়াছে। তুমি বিজ্ঞ পণ্ডিত, সমস্তই জান। জানিয়া শুনিয়া এক মূর্খের মত কথা কহিতেছ। বিশ্রাম নাও, আমি গোপালকে দেখিয়া সত্বরই ফিরিতেছি।

পিতা। তোমার মনে যে কত প্রকারে কষ্ট দিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণী, তাহাতেও আমার মনের ক্ষোভ মিটে নাই। সেই জন্য আমি—

মাতা। তুমি আমাকে কোনও কষ্ট দাও নাই। পূর্ব্বজন্মে বহু তপস্যা করিয়া তোমাকে পাইয়াছি। ওরূপ কথা তুমি আর কখনও মুখে আনিয়োনা। সংসার বিষম স্থান। এখানে সকল সময়ে ভাল মন্দ বিচার করিয়া কাজ করিবার সুবিধা হয় না! কখন কি ভুল করিয়াছ, তাই কি আমি চিরকাল মনে করিয়া রাখিব। আমিও ত তোমার উপর সময়ে অসময়ে কত অভিমান করিয়াছি। তুমি ওরূপ কথা আর কহিয়োনা, তা'হইলেই আমার মনে কষ্ট হইবে।

পিতা। বেশ, আর বলিব না। তবে একটা কথা বলি, যদি গোপালকে বাঁচাইয়া ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পার, তবেই তোমার সতীত্বের মহিমা আমি হৃদয়ঙ্গম করিব।

তড়িতাহত হইলে মানুষের সর্ব্বশরীর যেরূপ শিহরিয়া উঠে, পিতার মুখের এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিবামাত্র মাতা সেইরূপ শিহরিয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম, মাতা যেন অতি কষ্টে প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। পিতার কথার উত্তরে তিনি আর কোনও কথা কহিলেন না। আমি স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া, ডাক্তার বাবুর স্ত্রীও স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া। প্রকৃতিস্থ হইয়াই মা নীরবে সাষ্টাঙ্গে পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। তার পর, উঠিয়াই ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে বলিলেন— "বৌমা, দুর্গাকে শয্যা হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া আইস।"

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী দুর্গাকে আনিতে চলিলেন, পিতা স্থানত্যাগ করিলেন, সেখানে রহিলাম, আমি আর মা। আমি মাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা, আমার কি কর্ত্তব্য?"

"কি, বিবাহের কথা ?"

"কেমন করিয়া করিব ?"

"সব মীমাংসা এক সঙ্গে হইবে !"

"আমি সমস্ত ঘটনা বলিয়া, তাহাদের নিষেধ করিয়া পাঠাই।

এক অপূর্ব্ব ভাবগম্ভীর বাক্যে মা আদেশ করিলেন "না।"

"তবে আমি তোমার সঙ্গে যাই।"

"না।"

"ভাল, তোমার সঙ্গে যাইতে যদি নিষেধ করিলে, তাহা হইলে একটু পরে যাইব বল।"

আরও গম্ভীরতরস্বরে মা উত্তর করিলেন—"না। আমি যতক্ষণ না ফিরিতেছি ততক্ষণ গৃহত্যাগ করিয়োনা। তুমি শীঘ্র কোচোয়ানকে বলিয়া আমার গাড়ীর ব্যবস্থা কর।"

এই বলিয়াই মা মুহূর্ত্তে সেস্থান ত্যাগ করিয়া ঠাকুর ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

আমিও মায়ের আদেশ পালন করিতে বহির্ব্বাটীতে চলিলাম।

যাইতে যাইতে মায়ের অপূর্ব্ব চরিত্রসম্বন্ধে একবার চিন্তা করিয়া লইলাম। অন্য সময় হইলে, গোপালের বিপদের কথা মায়ের কর্ণ-গোচর হইবামাত্র মা নিশ্চয়ই মূর্চ্ছিতা হইতেন, অথবা এতই ব্যাকুল হইতেন যে, তাহা আমাদিগের পক্ষে মূর্চ্ছার অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইত।

কিন্তু সেদিন পিতার সেই ব্যাকুলতা ও অনুতাপ-বিদগ্ধ হৃদয়ের প্রতিবিম্বস্বরূপ মুখের শ্রী, মায়ের ব্যাকুলতাকে যেন কোন দিগন্তে ভাসাইয়া দিল। গোপালের অসুস্থতার কথা শুনিবামাত্র মায়ের মুখে অন্তর্ঘাতনার গাঢ়চ্ছায়া আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তারপর স্বামীর

অনুশোচনা শ্রবণে মর্ম্মপীড়িতা সতীর শ্রীমুখের ভাব পরিবর্ত্তনও আমি লক্ষ্য করিয়াছি, আজিও পর্য্যন্ত সে মুখসৌন্দর্য্য আমার মানসপটে সুস্পষ্ট অঙ্কিত রহিয়াছে।

কিন্তু পিতার শেষকথায় জননীর মুখ সহসা যে ভাব ধারণ করিয়াছিল, কোন কুশলী শিল্পী যুগান্তব্যাপী কল্পনার সাহায্যেও তাহা অঙ্কিত করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি তাহা পলমাত্র সময়ের জন্ম দেখিয়াছিলাম। দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে মাথা নামাইয়াছিলাম, সে মাথা বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তুলিতে পারি নাই। এখনও পর্য্যন্ত সে স্মৃতির ক্ষীণস্পর্শ হৃদয়-যন্ত্রটীকে ওতঃপ্রোত করিয়া আমাকে আত্মহারা করিয়া ফেলে।

সতী আজ পরীক্ষায় পড়িয়াছেন। বুঝিয়াছেন, গোপাল হয় মরিয়াছে, নয় তার মরিতে বিলম্ব নাই। দূর যুগান্তে স্বপ্নসারাণু-গঠিত কাননমধ্যে এক সতী মৃত স্বামীকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। নিতান্ত জ্ঞানগৌরবহীন নিরক্ষর ভিন্ন, এই উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিজিত রাজ্যে, আর কেহ এ কথা বিশ্বাস করে না। এই দুর্দ্দিনে, অবিশ্বাসের সূচীমুখ অগণ্য দৃষ্টির সম্মুখে, স্বামীর আদেশে আর এক সতীকে মৃত অথবা মরণোন্মুখ সন্তানকে যমের আয়ত্ত হইতে ছিনাইয়া আনিতে হইবে। কি বিষম পরীক্ষা !! পিতা এক লোষ্ট্রনিক্ষেপে দুই পক্ষীকে আহত করিয়াছেন। গোপালের প্রাণ বাঁচাইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সতীত্বের পরীক্ষা হইবে। এই ভীষণ পরীক্ষামুখে পড়িয়া উপবাসক্লিষ্টা জননীর ক্ষীণ শোণিত-প্রবাহে অবসন্নপ্রায় শরীর-যন্ত্র প্রচণ্ড তড়িতাহতের ন্যায় প্রবলবেগে যেন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শোক তাপ তাঁহার অন্তর হইতে দূরে পলাইল। সে মনে তন্মুহূর্ত্তে কোন দেবতার শক্তি প্রবেশ

করিয়াছিল জানি না, প্রকৃতিস্থা হইবার সঙ্গে সঙ্গে মা যেন একবার ধরিত্রীর বুকে বিশ্বম্ভরের ভারে বামচরণ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

মায়ের সে বিষম অবস্থা সদ্যোমাত্র দুইজনে দেখিয়াছি। আমি ও পিতার সেই মর্ম্মবিকম্পী বাক্য শ্রবণে স্তম্ভিত-প্রায়া এক রমণী। আমাদের মধ্যে কে কি বুঝিয়াছিল, জানি না। কিন্তু যে বুঝিয়াছিল, সেই বিশ্বপালিকা প্রকৃতি মায়ের এই বিষম বিপদ সময়ে সহানুভূতি না দেখাইয়া হাসিল। উপরে চাহিয়া দেখিলাম, তীব্র শরজালের মূর্ত্তি ধরিয়া উষার উল্লাস আকাশমার্গে ছুটিতেছে।

মা চলিয়া গেলে আমি একবার নবোদিত রবিকিরণপ্লাবিত, ক্ষুদ্র জলদখণ্ডব্যবহিত নীললোহিতবর্ণা গগণ-প্রকৃতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম। তার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যুক্ত করে বলিলাম—"হাসিতেছিস্ কি জগদম্বিকে! এ পরীক্ষা আমার মায়ের নহে—এ পরীক্ষা তোর। ধর্ম্মের ভিত্তি, এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের স্থিতি তোর আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিতেছে।"

আমরা পিতাপুত্রে উৎকণ্ঠার সহিত মাতার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। নয়টা বাজিয়া গেল, মাতা ফিরিলেন না। তখন হরিয়াকে সংবাদ লইতে পাঠাইলাম। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেল; হরিয়া ফিরিল না। তখন নানা বিভীষিকায় আমাদের মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ পিতা ভয়ে সংজ্ঞাশূন্যের মত হইয়া পড়িলেন। আমি মনের যন্ত্রণা মনে চাপিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে করিতে কহিলাম—"কোনও একটা দুর্ঘটনা ঘটিলে, আমরা নিশ্চয় এতক্ষণে তাহা জানিতে পারিতাম। কেহ না কেহ আমাদের খবর দিত। আমার মনে হয়, খুল্লপিতামহের অনুরোধে মায়ের আসিতে বিলম্ব হইতেছে। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি নিজেই যাইয়া সংবাদ আনিতেছি।"

পিতা তখনও পর্য্যন্ত মুখে জল দেন নাই। আমি তাঁহাকে স্নানাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম।

কিন্তু কোথায় যাইব? যাইবার নামে, উঠানে পা দিতে আমি বিভীষিকা দেখিতেছি। প্রতি উদ্যম-মুখে মনে হইতেছে, গোপালের মৃত্যুকথা আমাকে প্রথমেই শুনাইবে বলিয়া কে যেন বহির্ব্বাটীর দ্বারে কবাটের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাটীর বাহির হইতে পারিলাম না। তখন মনে করিলাম, এতক্ষণ যখন অপেক্ষায় আছি, তখন আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষায় রহিব। যদি ইতিমধ্যে মা অথবা হরিয়া ফিরিয়া না আসে, তখন বাধ্য হইয়াই আমাকে বাটীর বাহির হইতে হইবে। চাকর দাসীদের মধ্যে কেহই আমাদের বিপদের কথা জানিত না। তাহারা পূর্ব্বদিন যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে, রাত্রি জাগিয়াছে, বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়াছে। এইজন্য মায়ের সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিবার অবকাশ পায় নাই। মাঝে মাঝে কালীঘাটে যাওয়ার উপলক্ষে তিনি প্রত্যুষে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসেন। আজও সেইরূপ একটা কিছু হইয়াছে মনে করিয়া তাহারা মাতৃ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছে। এইজন্য তাহাদিগকে কোনও কথা শুনাইতে সাহসী হইলাম না।

যখন একান্ত দেখিলাম, কেহ আসিল না, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে গৃহত্যাগ করিতে হইল। তখন বেলা তিনটা। কয়দিন আকাশ বেশ নির্ম্মল থাকিয়া সেদিন আবার অল্পে অল্পে মেঘাচ্ছন্ন হইবার উপক্রম করিতেছে। একটা অপ্রীতিকর বদ্ধবায়ু যেন একটা প্রবল ঝঞ্ঝাকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য সমস্ত সহরটা জুড়িয়া বসিয়াছে।

মনের অবস্থার সঙ্গে প্রকৃতির অবস্থার সামঞ্জস্যে আমি যেন পূর্ব্ব হইতেই নানা অমঙ্গলের সূচনা দেখিতে লাগিলাম।

তখন গোপালের মৃত্যুর আশঙ্কা যেন দেখিতে দেখিতে বলবতী হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, হয় গোপাল মরিয়াছে, নয় তার মরিতে বিলম্ব নাই! কিন্তু গোপাল মরিলে, অনেককে সঙ্গে লইয়া মরিবে। গোপাল মরিলে, সতীত্বে সন্দেহ আরোপ করিতে মা আর এ গৃহে পদার্পণ করিবেন না। আমাদের অজ্ঞাতসারে কোন নিভৃতদেশে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করিবেন। গোপাল মরিলে, একটা দশম বর্ষিয়া বালিকা সীমন্তে সিন্দুর উঠিবার পূর্ব্বক্ষণেই বিধবা হইবে। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার বৃদ্ধা ভগিনী তাহারাও কি আর বাঁচিবে?

এইরূপ দুশ্চিন্তার তাড়নায় অস্থির হইয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। সদর রাস্তায় পা দিতে না দিতে পিতা পশ্চাৎ হইতে আমাকে ডাকিলেন। দেখিলাম, তিনিও আমার মত বাগানে পায়-চারি করিতেছেন। আমি দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন—"তুমি এখনও যাও নাই?"

আমি। আমি আর একটু অপেক্ষা করিতেছিলাম।

পিতা। তবে যখন আছ, আরও কিছুক্ষণ থাক। ইহার মধ্যে যদি কেহ না আসে, তাহা হইলে সন্ধ্যার পর পিতাপুত্রে এক সঙ্গেই গোপালকে দেখিতে যাইব। যাহা ঘটিয়াছে এখন হইতেই বুঝিতেছি। সারা জীবনের অসৎকার্য্য ব্রহ্মহত্যারূপ ফলের উপঢৌকন লইয়া আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তথাপি একবার ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে যাইব।"

অনেকবার পিতার মুখে ব্রহ্মহত্যার কথা শুনিলাম। পিতার অবজ্ঞায় দরিদ্র গোপাল পর্ণকুটীরদাহে মরিতে পারে, কিন্তু তাহাতে

পিতার ব্রহ্মহত্যা হইবে কেন? আমি এবারে পিতাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম—"আপনি যে বারম্বার "ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মহত্যা" বলিতেছেন, একথার অর্থ কি?"

পিতা বলিলেন—"বেশ, বলিব। বলিবার এই উপযুক্ত অবসর। তা হইলে আমার ঘরে আইস।"

পিতার সঙ্গে তাঁহার ঘরে ফিরিলাম। আমি উপবেশন করিলে পিতা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এক দুই তিন—শুনিতে শুনিতে চারিঘণ্টা আমাদের অজ্ঞাতসারে অতিবাহিত হইয়া গেল। পিতার শৈশব হইতে সপ্তাহ পূর্ব্বের সমস্ত জীবনচিত্র আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হইল।

সব কথা বলা অসম্ভব, সব কথা বলিবারও প্রয়োজন নাই। এই আখ্যায়িকার সঙ্গে যে কথার একান্ত সম্বন্ধ, শুধু তাহাই বলিব! সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের অনুসন্ধানে যাহা কিছু জানিয়াছি, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়া এই মর্ম্মচ্ছেদী পিতৃনিন্দা কাহিনীর পরিসমাপ্তি করিব।

ক্রমশঃ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ।

যমালয়ের ফেরত।

আমার বাড়ীর ৪ মাইল পশ্চিমে খড়ইগড়। সেখানকার রাজা কৈলাস চন্দ্র গজেন্দ্র মহাপাত্র আমার পরম সুহৃদ্। তাঁহার যে কোন কার্য্য উপস্থিত হউক বা কুটুম্ব বন্ধুর সমাগম হউক, তৎসময়ে আমাকে না লইয়া গেলে তাঁহার মনের তৃপ্তি সাধন হইত না। একদা তাঁহার

বাটীতে তাঁহার প্রথম পক্ষের কনিষ্ঠ শ্যালক উপস্থিত ; আমি তৎসময়ে তাঁহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী আমাদের ঝুরিয়া মৌজাতে ছিলাম। ঝুরিয়া হইতে খড়ই গড় প্রায় সওয়া মাইল অন্তর হইবে। কুটুম্ব সমাগমে রাজা মহাশয় একদিন আমায় বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার বাটীতে আসিয়া আহারাদি করিতে হইবে, তৎসময়ে যাইবার জন্য একটী ঘোটকও প্রেরণ করিয়াছেন। আমি স্নানাদি সমাপন করিয়া রাজবাটী অভিমুখে চলিলাম। ঘোটকটী অত্যন্ত ভীতু, সম্মুখ ভাগে কোন বস্তু বা গরুর গাড়ী দেখিলে অত্যন্ত ভয় পাইয়া প্রবল বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিত এমন কি মধ্যে মধ্যে বিপথগামী ও হইত।

আমি যখন খড়ইগড়ের সীমাতে উপস্থিত, তখন দেখি একখানি গরুর গাড়ি তথায় পড়িয়া আছে, আর একটী বর বিবাহ করিয়া সেই সময়ে সেই পথ দিয়া যাইতেছে। আমি ঘোটকারোহণে উক্তস্থলে পঁহুছিলে, ঘোটকটী আর কোনরূপে অগ্রসর হইতে চাহিতেছেনা, নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কোন রূপে ঘোটকটী যাইতেছেনা, সহিস অনেক পিছুনে আছে। ভরসা দিয়া চুমাইয়া চুমাইয়া দুই এক পা অগ্রসর করিতে ছিলাম। ঘোটকটী যখন গাড়ী ও বরের মধ্যবর্ত্তী হইল, তখন ঘোটক আর বাগ না মানিয়া পবন বেগে দৌড়িতে আরম্ভ করিল, আমি অসাবধান অবস্থায় অধিক্ষণ থাকিতে পারিলাম না ; আসন টলিয়া যাওয়ায় ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া ঘোড়াটীকে ধরিলাম। আমার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল, অন্য দুই একস্থানে সামান্য লাগিয়াছিল, মস্তক হইতে অজস্র রক্তস্রাব হইতে লাগিল। আমি বেগতিক দেখিয়া ঘোড়াটীকে সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া সন্নিকটস্থ একটী শিবালয়ের পশ্চাতে ক্ষুদ্র কুণ্ড ছিল, তথায় গিয়া জল দিতে আরম্ভ করিলাম, কুণ্ডটী রক্তে লাল হইয়া গেল। রক্ত তখনও বন্ধ হয় নাই দেখিয়া বিপদ

ভাবিয়া নিজের চাদর খানি ভিজাইয়া মস্তকে জড়াইলাম, এবং তদবস্থায় রাজ বাটীতে খুনী আসামীর ন্যায় উপস্থিত হইলাম। রাজা দেখিয়া তটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন একি ! আনুপূর্ব্বিক সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম রাজা বলিলেন এরূপ ঘোড়া রাখিতে নাই, ইহাকে এখনই দূরীভূত কর, আর অনেক দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ শ্যালক বলিলেন কিছু চিন্তা নাই, আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য করিয়া দিব। আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম এমন অশ্বিনী কুমার সদৃশ কবিরাজ সংসারে জীবিত আছেন বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। তখন তিনি বলিলেন মহাশয় এ কবিরাজ যে যমপুরী হইতে ফেরত আসিয়াছে তাহা বুঝি আপনি জানেন না, ঘটনাটী অতীব আশ্চর্য্য, আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুণ।—

এই বলিয়া আমার ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়া বিষয়টী যাহা যথাযথ বর্ণনা করিলেন তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম।—

অল্পদিন হইল আমার গুরুতর পীড়া হয়। অনেক দিন রোগে ভুগিতেছি কিছুতেই আরোগ্য হইতেছেনা, নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হওয়াতে, সকলেই আমার মৃত্যু নিশ্চয় কল্পনা করিয়াছিল। এক দিন আমি মোহ অবস্থাপন্ন, তেমন সময়ে দেখিতেছি যে. একটী পুরো পাঁচ হাত লম্বা কৃষ্ণ-বর্ণ পুরুষ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার চক্ষু দুইটীর দিকে দৃষ্টিপাত করাতেই আমার আত্মজ্ঞান শূন্য হইয়া গেল, সেই গোলাকার চক্ষু ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে, স্কন্ধো একটী লোহাঙ্গী ; সেই লোকটা আসিয়াই আমাকে বলিল চল। তোকে লইয়া যাইতে হইবে, এই বলিয়া আমার হস্তদ্বয়ে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

এই কথাটা শুনিয়াছি আমি বলিলাম মহাশয় ! আপনি বোধ হয় চণ্ডী চরণ ঘোষের মানব লীলা গ্রন্থ খানি পাঠ করে ছিলেন, কেননা যমদূতের এই চিত্রটা তাহাতে বিশেষ আঁকা আছে।

তখন তিনি উত্তর করিলেন মহাশয়! আমি যথার্থই যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই বলিতেছি আপনি উপহাস করিবেন না। তৎপরে সেই লোকটা আমার দুই হাতে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এমন বিশ্রী রাস্তার উপর দিয়ে টানিয়ে লইয়া যাইতে লাগিল যে কণ্টকাদির দ্বারা আমার পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। আর রৌদ্রের উত্তাপে মস্তক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি তখন নানা প্রকার স্তুতি মিনতি করিয়া বলিলাম, বাবু গাছের তলায় একটুকু বসুন আপনার কষ্ট হচ্ছে আর আমার ত কথাই নাই। তখন যমদূত বলিল, আমার বসিবার সময় নাই, তবে সামনে ঐ যে নদী দেখিতেছিস্, ঐ নদীর নিকট একবার বসাইব চল্। আর তুই যে ভাল পথ খুঁজছিস্ ও ছায়ার জন্ম ব্যস্ত হচ্ছিস, তুই কখন ব্রাহ্মণকে পাদুকা কি ছাতা দান করেছিস্ যে ভাল পথে ছায়ায় যাইবি। তোকে এই রকম পথেই যেতে হবে। ক্রমে নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম, সেখানে বটাদি বৃক্ষ কতকগুলি রহিয়াছে, আর তাহার তলায় কতক গুলি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। আমাকে সেখানে একবার ছাড়িয়া দিল। আমি নদীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, নদীর জল টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। দূতটী বলিল, কাঁটা খোঁচা দেখিয়া এত ব্যস্ত হচ্ছিলি এখন এই নদীটী নামিয়া পার হইতে হইবে।

আমি ভীত হইয়া বটবৃক্ষ তলস্থ প্রৌঢ় বয়স্ক সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া বসিলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিলাম বাবা এই নদীর নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন, ইহার নাম "তপ্তাবৈতরণী নদী।" তুমি কখন শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলে, সেখানে যাহারা বিধি পূর্ব্বক বৈতরণী নদী পার হয়, তাহাদিগকে এখানে তপ্ত জলের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। তখন আমি ভীত হইয়া বলিলাম আমি কখন জগন্নাথ দর্শন যাই নাই এবং বৈতরণী ও পার হই নাই; সন্ন্যাসী ঠাকুর আমি কি উপায় করিব, এই বলিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে

জড়াইয়া ধরিলাম। বাবাজী বলিলেন, বাবা, তুমি দেখিতেছ অনেকেই সুখে পার হইয়া যাইতেছে এবং ঐ জল আবার অনেকের চামড়া ফাটাইয়া দিতেছে, তাহাদের চীৎকারে দশদিক পূর্ণ হইতেছে। আমি বলিতেছি তুমি এই উপায়টি অবলম্বন করিলে সুখে পার হইয়া যাইতে পারিবে। একটী গরুর লেজ ধরিয়া থাকিবে কদাপি উহা ছাড়িয়া দিবে না তাহা হইলে আর তোমার কোন কষ্ট হইবে না।—

আমাদের এই কথা শেষ হইয়াছে এমন সময় দূত বলিল চল আর বিলম্ব সহিবেনা, তখন আমি মহাপুরুষের উপদেশানুসার একটী গরুর লেজ ধরিয়া রহিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় আমার গায়ে জলের তাপ কিছুমাত্র অনুভূত হইল না। পর পারে গিয়া দেখি, সুবর্ণ ময় প্রাচীর বেষ্টিত পুরী সম্মুখে এক তোরণ। তাহার মধ্য দিয়া আমাকে পুরীর ভিতর লইয়া গেল। আমি কত যে চিত্র বিচিত্র রত্নাদি খচিত পুরী মধ্যে মধ্যে দর্শন করিলাম তাহা কি বর্ণনা করিব। এইরূপ দেখিয়া যাইতে যাইতে একটী সুবৃহৎ পুরীর দ্বারদেশে গিয়া উপনীত হইলাম, দূত সেইখানে বসিতে আদেশ দিয়া ভিতরে গেল। আমি তথায় উপবিষ্ট রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী পুরুষ হস্তে খাতা ও অন্য হস্তে কলম লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করত বলিলেন, ইহাকে কে আনিতে বলিল, যাও শীঘ্রযাও উহাকে পঁহুচাইয়া আইস, তখন দূত পুনরায় পুনরায় আমাকে নইয়া আসিল আমার গৃহের নিকট আমাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি যে সংজ্ঞাশূন্য নিস্তব্ধ ভাবে পড়িয়াছিলাম, তখন আমার শরীরে জ্ঞান সঞ্চার হইল এবং ক্ষুধা বোধ হইতে লাগিল। ঘরের সকলে আমার জ্ঞান সঞ্চার দেখিয়া আনন্দিত হইল, কবিরাজেরা আমার জ্ঞান সঞ্চারে মনোকষ্টের সহিত চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহাদের ধারণা যে, নির্ব্বানোম্মুখ প্রদীপ

যেমন একবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই নির্ব্বাণ হইয়া যায় তদ্রুপ আমার জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার পূর্ব্বেই আমার এরূপ জ্ঞান সঞ্চার বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করত অবসরণেচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন আমি ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলাম।—

বন্ধু মহাশয়ের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমি আর চুপদিয়া থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম মহাশয়! অপনি বুঝি গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডটা ভাল করে পড়েছেন বা কাহারও মুখে শুনেছেন তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন মহাশয়। কোন পুরাণ অদ্য পর্য্যন্ত আমার কর্ণ কি নয়ন গোচর হয় নাই। আপনার নিকট আমি তিলার্দ্ধ কোন কথা গড়িয়া বলি নাই। ইহার প্রমাণ এই পর্য্যন্ত আমি দেখাইতে পারি আতনি দেখুন আমার হাতে যে বন্ধন দিয়াছিল তাহার দাগ রহিয়াছে, আমি দাগ প্রত্যক্ষ করিয়া আরও বিস্ময়ীভূত হইলাম, কারণ যে শরীরে বন্ধন দিয়া দূত লইয়া গিয়াছিল তাহাত এ শরীর নয়, তবে বন্ধনের দাগ কিরূপ আবার স্থূল শরীরে আসিল। কোন গূঢ় রহস্য থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস করিলাম।

শ্রীচৌধুরী ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র। জমিদার।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিদ্রাবস্থায়—পিণ্ডদেহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গত বারে আলোচিত হইয়াছে যে, আমরা অহর্নিশ অপরের চিন্তারাজ্য পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করি। সাগর মধ্যস্থিত প্রবাল-শৈল যেমন তন্দ্রাহীন সমুদ্রের লহরী-লীলার মধ্যে অবস্থিত, মানবও তদ্রূপ। মহাশূন্যে

ভাসমান মানব-পরিত্যক্ত চিন্তা-তরঙ্গ অনন্তধারায় একটির পর একটি আসিয়া তাহার মস্তিষ্কে আঘাত করে, এবং কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহা অধিকার করিয়া থাকিয়া, আবার একটির পর একটি সরিয়া পড়ে। সমুদ্রের লহরী-লীলার ন্যায় চিন্তা-তরঙ্গের বিরাম নাই, অবসাদ নাই। তবে যদি আমরা নিজেরাই চিন্তা করি, এবং আমাদিগের মস্তিষ্ক, আমাদিগের নিজের নিজের ভাবনায় সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত থাকে, এই সমস্ত বাহ্য চিন্তা-স্রোত আমাদিগের বড় একটা কিছুই করিতে পারে না; কিন্তু, যে মুহূর্ত্তেই আমরা নিশ্চিন্ত হই, নানা লোকের অসংলগ্ন, সম্বন্ধহীন চিন্তারাজি আমাদিগের মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া ফেলে।

মস্তিষ্কে আসিয়া ঘাত প্রতিঘাত করিলেও, এই সমস্ত চিন্তা-তরঙ্গের অধিকাংশ গুলির আমরা কোনই সংবাদ রাখি না; তবে আমরা যেই প্রকৃতির লোক তৎপ্রকৃত্যনুযায়ী যদ্যপি কোন চিন্তা আমাদিগের সূক্ষ্মদেহস্থিত মস্তিষ্কে আসিয়া আঘাত করে, এবং স্বভাবতঃ যেইরূপ প্রকারের ভাবনা করিতে আমরা অভ্যস্ত, তজ্জাতীয় ভাবনা যদ্যপি আসে, তাহা হইলে আমাদিগের মস্তিষ্ক সাগ্রহে তাহা ধারণ করে এবং অপরের সেই চিন্তাকে নিজস্ব করিয়া, তাহাকে আপন বর্ণে রঞ্জিত করে। এই চিন্তা আবার তজ্জাতীয় অপর চিন্তারাজিকে আকর্ষণ করে; কখনও বা তজ্জাতীয় অপর আর এক প্রকার চিন্তার উদ্ভাবনা করে। এইরূপে অলীক চিন্তা-রাশি আমাদিগকে সদাই ঘিরিয়া থাকে।

সাধারণ মানব যে গুলিকে নিজের ভাব বলিয়া বর্ণনা করে, তাহাদিগের অধিকাংশই এই জাতীয়। যিনিই একটু স্থিরভাবে বিশ্লেষ করিয়াছেন, তিনিই জ্ঞাত আছেন যে, তাঁহার ভাব রাশির প্রায় সমগ্র অংশই অপর অপর ব্যক্তির পরিত্যক্ত চিন্তার অংশাবশেষের সংযোজনা মাত্র। পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত ধান্যাদি আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করার

বৃত্তিকে, লোকে "উঞ্ছবৃত্তি" বলে অতএব অপরের পরিত্যক্ত ও উপেক্ষিত চিন্তারাশিকে সংগ্রহ করিয়া সাধারণে যে নিজ নিজ চিন্তা-শক্তির পুষ্টি সাধন করে তাহাকেও এক প্রকার উঞ্ছবৃত্তি বলা যাইতে পারে।

মন বা মনের স্থূল ক্রিয়া-ক্ষেত্র মস্তিষ্কের উপর সাধারণের কোনই অধিকার নাই ; কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে যে কি চিন্তা করিতেছে, বা এই চিন্তা কেন আসিতেছে, বা কোথা হইতে আসিতেছে, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সে মনকে নিবদ্ধ রাখিতে পারে না। কোথায় মন মানবের ইচ্ছাধীন হইয়া চলিবে, না তাহা স্বাধীন ভাবে কার্য্য করে। কখন ইহা নানাজাতীয় চিন্তাবলি সৃষ্টি করে, কখনও বা ইহাতে অপরের চিন্তা অঙ্কুরিত হইয়া ফল ফুলে সুসজ্জিত জটিল ভাবনা লতার সৃষ্টি করে। তখন আর সেই ভাবনা-ব্রততীর যে কোথায় মূল তাহা নিরাকরণ করা যায় না।

ইহার ফল এই হয় যে, যদি কেহ কোনও বিষয় লইয়া, তাহা ধারাবাহিক ক্রমে চিন্তা করিতে যায়, তাহার চিত্তকে সেই বিষয়ে সে নিবদ্ধ রাখিতে পারে না ; কোথা হইতে অসঙ্গত ও অসংলগ্ন চিন্তারাশি আসিয়া তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। সে মনকে সংযত করিতে কখনও অভ্যাস করে নাই, অতএব এই চিন্তা-স্রোতের গতিরোধ করিতে সে এখন অক্ষম। মনের একাগ্রতা যে কি, তাহা তাদৃশ লোক বুঝিতেও পারে না। চিন্তারাজির একাগ্রীকরণ-শক্তির অভাব, অসংযত মনোবৃত্তি ও অটল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে অক্ষমতাই যোগমার্গ প্রবেশের অন্তরায়। শাস্ত্রকার বলেন যে, রজোভাগের আধিক্যবশতঃ যে চিত্ত চলিত হইয়া তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করে, বা তামস গুণের প্রাধান্য বশতঃ আলস্য, মোহ বা তন্দ্রা আচ্ছন্ন যে চিত্তে অপরের চিন্তাবীজ সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারে, তাদৃশ চিত্তে সমাধির সম্ভাবনা নাই।

বিশেষতঃ মূঢ় চিত্তের অর্থাৎ যে চিত্তে তামস গুণের প্রাধান্য আছে, তাহার বর্ত্তমান কালে একটী মহা বিপদের আশঙ্কা আছে। এখন মানব বিশেষভাবে স্বার্থপর, পাপাচারী ও অসৎচিন্তা পরায়ণ। তাই অহরহঃ যে চিন্তামূর্ত্তি কর্ত্তৃক মহাশূন্য পরিপূরিত হইতেছে * তাহা ঘৃণ্য ও অনিষ্টকারী। এই সমস্ত ভাবনা-তরঙ্গ মূঢ়চিত্ত অধিকার করিয়া বসে এবং মানবকে স্বার্থপরতা, লোভ, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি চিন্তায় নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। বিশেষতঃ যাহারা তথাকথিত সভ্যতার কেন্দ্রস্থল নগরীতে অবস্থান করে, তাহাদিগের এই বিপদের সম্ভাবনা অধিক। শঠতা, প্রবঞ্চনা, ইন্দ্রিয়-লালসা, দ্বেষ ও হিংসার অনন্ত চিন্তারাশি নগর-বাসীকে সদাই পরিবেষ্টন করিয়া থাকে এবং তাহারা নানারূপ চিত্তমালিন্যের কারণ হয়। মানব যদ্যপি চিত্তসংযমে অভ্যাস করে, তাহা হইলে সে অনেকপ্রকার অশান্তিকর মানসিক উত্তেজনা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। কিন্তু, চিত্তসংযম অতি সুলভ নহে; বহুকাল ধরিয়া অভ্যাসের ফলে ইহা সংসাধিত হয়। ভগবান্ শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতায় তাহাই বলিয়াছেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৬।৩৫

[হে মহাবাহো, মন যে দুর্নিরোধ ও অস্থির, এ বিষয়ের সন্দেহ নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।]

নিদ্রার সময় এই সমস্ত বাহ্য চিন্তা-তরঙ্গ মানবকে অধিকতর অভিভূত করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সেই সময়ে প্রকৃত দেহী সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন করিয়া স্থূল-দেহ সংশ্রব ত্যাগ করিয়া অবস্থিত থাকে।† তাই পিণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্কের উপর দেহীর সেরূপ শাসন থাকে না। অতএব তখন বাহ্য চিন্তা-স্রোত মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া

* ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† [২৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

থাকে। পিণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্কের উপর এই সমস্ত বাহ্য চিন্তা-স্রোতের কিরূপ ক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে অধুনা অনেক পরীক্ষা হইয়াছে। আমরা এই সমস্ত পরীক্ষার বিষয় পরে আলোচনা করিব। আমরা দেখিব যে, কোনও উপায়ে ওই সমস্ত বাহ্য চিন্তা-স্রোতগুলিকে যদ্যপি এরূপভাবে অবরোধ করা হয় যে, তাহারা যেন পিণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্ককে স্পর্শ করিতে না পারে, তাহা হইলে যে ওই মস্তিষ্ক উদাসীনভাবে থাকিবে তাহা নহে। অতীতের চিন্তারাজি মস্তিষ্কের গুপ্তভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া নবীন উদ্যমে, নবীন-বেশে, উজ্জ্বলবর্ণে আবার বিরাজ করে। পরে আমরা এই বিষয়ের একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিব। ৩। সূক্ষ্ম-দেহ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রকৃত দেহী নিদ্রার সময় এই দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। যাঁহারই দিব্যদর্শনশক্তির অভিব্যক্তি হইয়াছে, তিনিই দেখিতে পান যে, এই শরীরটী শয্যাশায়িত স্থূলদেহের অনতিদূরে ভাসমান থাকে। সকলের সূক্ষ্মদেহ যে দেখিতে একপ্রকার তাহা নহে। মানবের উন্নতির ন্যূনাধিক্যের উপর তাহার সূক্ষ্ম দেহের আকার প্রকারের তারতম্য নির্ভর করে। একেবারে যাহার বিকাশ হয় নাই, তাদৃশ লোকের সূক্ষ্ম-দেহ ডিম্বাকার কুজ্মটিকা-মেঘের মত; তাহার বাহ্যাকারের বা সেই ডিম্বাকার কুজ্মটিকাপুঞ্জের বাহ্য রেখার সীমা নির্দ্দেশ করা যায় না। তাহার মধ্যদেশে আপেক্ষিক স্থূলতর ভুবর্লৌকিক অনু-সংগঠিত, অপরস্ফুট, স্থূলদেহের অনুরূপ তাহার মূর্ত্তি বিরাজ করে। সেই মূর্ত্তি অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট হইলেও, তাহা দেখিলে উহা কাহার সূক্ষ্ম-দেহ ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতি স্থূল, অতি নিকৃষ্ট কাম-চিন্তার আঘাতে ইহা স্পন্দিত হইতে থাকে। এতাদৃশ লোকের সূক্ষ্ম-দেহের আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা স্থূলদেহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া, তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থান করিতে পারে না

উন্নত লোকের সূক্ষ্ম-দেহ। মানব যতই অভিব্যক্ত হইতে থাকে, উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহার অণ্ডাকার সূক্ষ্ম-দেহের সীমা নির্দ্দিষ্ট ও স্পষ্ট হইতে থাকে; এবং তাহার অভ্যন্তরস্থিত আকৃতিটীও স্পষ্ট ও স্থূল-দেহের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি হইতে থাকে। আবার ইহার বাহ্য-পদার্থ-বোধ-শক্তিও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ব্বে যেমন অতি স্থূল ও নিকৃষ্ট কামনার উত্তেজনায় ইহা প্রতিসংবাদী হইত, এখন কেবল তাহাই হয় না; অতি স্থূল হইতে অতি সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত ভুবর্লোকের সমস্ত স্পন্দনে ইহা অনুস্পন্দিত হইতে থাকে। অবশ্য যিনি উন্নত, যিনি পবিত্র, তাঁহার সূক্ষ্ম-দেহ নিকৃষ্ট কাম উত্তেজনায় স্পন্দিত হইতে পারে না; কারণ, তাঁহার দেহে নিকৃষ্ট কাম উত্তেজনার প্রতিসংবাদী স্থূলতর অনু থাকে না। তাই তাদৃশ লোক নিকৃষ্ট কাম-উত্তেজনা-সম্পাদক চিন্তা-তরঙ্গের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও কাম-ভাব-পরিপূরিত হ'ন না। তবে, যেমন পূতি গন্ধময়, অসাস্থকর স্থানে থাকিলে আমাদিগের স্থূল-দেহের অশান্তি উৎপাদন করে, ঐরূপ নিকৃষ্ট কাম-উত্তেজনার পরিপূরক চিন্তা-সাগরের মাঝে অবগাহিত থাকিলে পবিত্র লোকের সূক্ষ্ম-দেহে অশান্তি ও অসুস্থতা বোধ হয়।

অনুন্নত ব্যক্তির সূক্ষ্ম-দেহ, নিদ্রাবস্থায় যেরূপ তাহার স্থূল-শরীরের সন্নিকটে ভাসমান থাকে, সুদূরে সচরাচর গমনাগমন করিতে পারে না, উন্নত পুরুষের সেরূপ হয় না। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সূক্ষ্মদেহের গতি শক্তির বৃদ্ধি হয়, এবং ইহা স্থূল-দেহ ছাড়িয়া সহজে ও কোনওরূপ অসুস্থতা-বোধ না করিয়া সুদূরে পরিভ্রমণ করিতে পারে। এই সত্যের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বপ্নে যে অজ্ঞাত ও অপরিচিত স্থানের ও তত্রস্থ লোকের বিষয় কখনও কখনও জানা যায়, তাহা ইহার একটী বিশিষ্ট উদাহরণ। (ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

দুইটী অলৌকিক ঘটনা।

প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে বিশ্বাস করেন না, তাহারা বলেন যে যদ্যপি তাঁহার কোন অলৌকিক ক্রিয়া দেখিতে পান তা হইলে বিশ্বাস করিতে পারেন, না দেখিলে কিরূপে বিশ্বাস করিবেন ? এই ধারণা লইয়া আমাদের সংসারে অনেক জীব বিচরণ করিতেছেন। আমার প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ভুতনাথ বসু মহাশয় পূর্ব্বে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না ; কিন্তু দুই একটী ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া এক্ষণে তাহার একটু বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এখন তিনি আমাদেরও ঐ বিষয় একটু আস্থা স্থাপন করিতে বলেন। তাঁহার ঘটনার বিববরণ।

আজ ২০ বৎসর কাল অতীত হইল আমি একবার আমাদের সার্কাসের সহিত ঢাকায় উপস্থিত হই। এখানে আসিয়া আমরা আমাদের দলের উপযুক্ত সহরের ভিতর কোন বড় বাড়ী না পাওয়ায় বাধ্য হইয়া এক ময়দানের ধারে একটী বাড়ীতে উপস্থিত হই। এবাড়ীটী দ্বিতল এবং ইহাতে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। বাড়ীর প্রাঙ্গণ ও খুব বড় সেইখানে আমাদের ২০।২৫ ঘোড়া হাতি বাঘ বাঁধিয়া রাখা হইত। আমাদের দল খুব বড় কাজেই এখানে সাহস করিয়া কোন বদমায়েস লোক আমাদের সংসর্গে আসিত না কিংবা সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারিত না। আমরা এই বাড়ী অধিকার করিলে ২।৪ দিন আমাদের বেশ চলিল। তারপর কেহ বলিল মহাশয় এযে ভূতের বাড়ীতে আপনারা আছেন ; আমরা শুনিয়া হাসিলাম এবং তাহাকে বিদ্রুপ করিয়া বলিলাম যে আমরাইত ভূত আমাদের আবার ভূতে কি অনিষ্ঠ করিবে। এই রূপে ২।৪ দিন পর রাত্রে ঐ বাড়ীতে ঢিল পড়িতে লাগিল। আমরা প্রথম প্রথম উহা কোন দিক হইতে

আসিতেছে তাহা ধরিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে পুলিশের সাহায্য চাহিলাম। আমাদের দলের লোক ও পুলিশের লোকে কেহই এই বদমায়েস ধরিতে পারিল না, শেষে আমরা এ কাজ মানুষের নয়, ভূতের বলিয়া স্থির করিলাম। আমাদের হিন্দুস্থানী দাস দাসীগণ ইহা ভৌতিক ক্রিয়া স্থির করিয়া রোজার আশ্রয় লইল, কিন্তু তাহাতেও ইহার কোন উপশম হইল না এবং আমরা নিস্তার পাইলাম না। শেষে আমরা ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলাম। বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক আমাদের ঐ বাড়ীতে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি আমাদের নিকট ভাড়া লইতে চাহেন নাই। আমরা কিন্তু মনে মনে বুঝিলাম যে, ভূত আমাদের ঘাড়ে উঠে এবং ঐ বাড়ী পরিত্যাগ করে, ইহাই বাড়ীওয়ালার উদ্দেশ্য।

(২)

এ ঘটনাটীও বোধ হয় আজ ১৫ বৎসর ঘটিয়াছিল। একদিন আমাদের কোন বন্ধু একটা প্রীতি ভোজ দিবার নিমিত্ত বাঘমারিস্থিত কোন বাগানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেন। আমরাও ওই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমাদের বন্ধুর বাগানে যথা সময়ে উপস্থিত হই। এই বাগানটী কলিকাতা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে আসিয়া আমরা সকলে ভোজনাদি সমাপন করিয়া নিজ নিজআবশ্যক মত রাত্রে প্রত্যাগমন করি। আমরা যখন ঐ বাগান হইতে বাড়ী ফিরি তখন রাত্রি আন্দাজ ২৷৹ টা হইবে। এখন চারিদিকে নিস্তব্ধ, কোথাও একটী সাড়া শব্দ নাই, কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকায় অবিরাম দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। সেদিন পূর্ণিমা নিশি, চারিদিকে শুভ জ্যোৎস্না জগতকে রৌপ্যবর্ণে শোভিত করিয়াছিল। আমরা এই জ্যোৎস্নার আলোকে অনন্ত নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া দুইজনে কত গল্প করিতে করিতে আসিতেছি।

অনেক দূর আসিলে একটা পুষ্করিণীর সন্নিকট ও কোন বাগানের ধারে একটী অবগুণ্ঠনবতী যুবতী স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান আছে দেখা গেল। আমরা উভয়ে ঐ মূর্ত্তিটীকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমার বন্ধু বলিল, "ভাই এত রাতে এ স্ত্রীলোক একা কোথা যাইতেছে!" আমরা মনে করিলাম বোধ হয় এ কোন দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক হইবে! তা নাহ'লে এখানে একা কেন থাকিবে। এখন আমার বন্ধু বলিল আমি একটু এগিয়ে ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। আমি তাহাকে কোনও কথা না কহিয়া সেইখানে রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার বন্ধু উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আপনি এগিয়ে যাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকও উহাকে দেখিয়া যেন সসম্ভ্রমে আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে উভয়েই অগ্রসর হইতে লাগিল। তারপর ৪০।৫০ হাত এগিয়ে ঐ রমণী হঠাৎ হাহা করিয়া একটা নিকটবর্ত্তী বটগাছের ডাল ধরিয়া উঠিয়া পড়িল। যখন গাছে উঠিল, তখন উহার শরীরটা ১০।১২ হাত লম্বা বোধ হইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমার বন্ধু একবারে কিংকর্ত্তব্যমূঢ় হইয়া গেলেন। তখন তিনি কি করিবেন কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি অবাক হইয়া কাষ্ঠ পুতুলের ন্যায় দাড়াইয়া রহিলেন। দূর হইতে আমার বোধ হইল বন্ধুবর ভয়ানক ভয় পাইয়াছেন। কাজেই আমি সাহসে ভর করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "আসুন আর কেন!" তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমরা উভয়ে আর ঐ স্থানে অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিলাম। আমরা আসিবার কালে এই স্ত্রীলোকের বিষয় স্থির করিলাম যে, উহা কোন মতে মানুষ নহে; নিশ্চয় কোন প্রেতযোনি মানুষের রূপ ধরিয়া পথিককে এইরূপ ছলনা করিতেছিল। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি, আমরা এই প্রেতিনীর মুখ দেখিতে পাই নাই, কারণ উহা একখানি ধপ্‌ধপে শাদা কালা

পেড়ে শাড়ী পরিয়া ঘোমটা দিয়াছিল এবং জ্যোৎস্নালোকে খুব সাদা দেখাইতেছিল।

বাড়ীতে আসিয়া এই ব্যাপার বলিলে সকলেই আমাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল এবং বলিল যে এরূপ অগ্রসর হওয়া তোমাদের খুব অসম সাহসিকতার কার্য্য হইয়াছে কারণ প্রেতিনী তোমাদিগকে ভয় দেখাইয়া প্রাণ সংহার করিতে পারিত। যাহা হউক ভগবান রক্ষা করিয়াছেন।

শ্রীচুনিলাল মিত্র।

অদ্ভুত ভৌতিককাণ্ড।

মালদহ সহরের বিখ্যাত জমিদার ৺হরসুন্দর দত্তর পুত্র শ্রীমান রমেশনারায়ণ দত্তর সহিত আমার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর বিবাহ হয়। তাহার বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন সে প্রথম গর্ভবতী হইয়াছিল। এই সময় একদিন প্রাতঃকালে স্নানান্তে ছাদের উপর চুল সুখাইতে ছিল; এমন সময়ে কাহার প্রেত আত্মা (বলিতে পারিনা) শুন্যমার্গে গমন কালীন তাহার আলুলায়িত কেশ দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল; এবং তৎপর দিবস হইতে তাহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে লাগিল ও ভুল কথা বলিতে আরম্ভ করিল, গ্রামস্থ ওঝা দ্বারা নানাপ্রকার প্রক্রিয়া করা স্বত্বেও বিশেষ কোন উপকার হইল না, উক্ত দিবস হইতে প্রতিদিনই দিনের বেলায় বাটীতে বিষ্ঠা নিক্ষেপ হইতে লাগিল, গ্রামস্থ সকলেই এই ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও ইহার প্রতিকার কল্পে অনেক ওঝা ডাকা হইল, এবং

নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার পর আত্মাকে আহ্বান করিয়া রোগিনীকে প্রশ্ন করা হইল।

প্রশ্ন। তুমি কে ? এবং কেনই বা ইহাকে যন্ত্রণা দিতেছ ? ইহার উত্তরে সে বলিল ? আমি ব্রহ্মদৈত্য। আমার অধীনে মেথর ও মেথরাণীর প্রেতাত্মা আছে ; তাহারাই বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিতেছে। মহানন্দা নদীর তীরে যে দেবালয় আছে আমি সেই দেবালয়ের পুরোহিত ছিলাম ; এবং মেথর ও মেথরাণী তখন হইতেই আমার আয়ত্তাধীন ছিল। উহারা দুই জনেই কুচরিত্র ; কলহ প্রিয় ও হিংসা পরবশ ছিল বলিয়া উহাদের আত্মার মুক্তি হয় নাই, যখন দেবালয়ের পূজা হইত তখন আমি এই সকল পূজার প্রসাদ হইতে অধিকাংশ দ্রব্যই ইহাদিগকে প্রদান করিতাম এবং সেই প্রসাদ ভোজনে আমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইত। রোগিণী প্রমুখাৎ এই সকল কথা শুনিয়া ওঝা আরও বলিল যে যদি উহারা তোমার আয়ত্তাধীন তবে তুমি উহাদিগকে নিষেধ করিতেছ না কেন। তদুত্তরে বলিল যে হরসুন্দর বাবু কোন দৈব কার্য্যের নিমিত্ত ৫০৲ টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন ও কার্য্য সিদ্ধ হইলে পর আমাকে অঙ্গীকৃত অর্থ হইতে একেবারে বঞ্চিত করিল।

রমেশনারায়ণ দত্তের পিতা ৺হরসুন্দর দত্ত মহাশয় কালেক্টারীর সেরাস্তাদার ছিলেন এবং সকলের মাননীয় বলিয়া আমি তাঁহার কথায় প্রত্যয় করিয়াছিলাম, যখন আমি শূন্যমার্গে গমন করিতেছিলাম তখন আমার গায়ে উহার চুল লাগিয়াছিল বলিয়াই আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়াছি ; আর একটী বিশেষ কারণ এই যে উক্ত ৺হরসুন্দর বাবু তাহার অঙ্গিকৃত অর্থ আমাকে দেয় নাই ; এই দুইটী কারণ বশতঃ আমি উহাকে আশ্রয় করিয়াছি। উক্ত সময়ে আমার ভগ্নী ৫ মাস গর্ভবতী ছিল, ভৌতিক উৎপাৎ হেতু তাহার গর্ভস্রাব হইয়া গেল, কিন্তু বাটীর দৌরাত্ম

কমিল না; অধিকন্তু প্রত্যহই উপদ্রব বাড়ীতে লাগিল। আহারাদি করিবার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে এমন সময়ে হঠাৎ তাহাতে বিষ্টা পতিত হইল; দিনের বেলায় সকলে একত্র হইয়া বসিয়া আছে এমন সময়ে তথায় বিষ্টা পতিত হইল; এইরূপ নানাপ্রকার অত্যাচার নিবন্ধন ও বিষ্টা স্পর্শ করা হেতু রোগিণীকে প্রত্যহ ৭।৮ বার স্নান করিতে হইত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ স্নান করা স্বত্বেও, তাহার কোন ব্যাধি হয় নাই। মালদহ জেলার প্রসিদ্ধ উকিল ৺রমেশচন্দ্র শেঠ মহাশয় জেলার মুন্‌সেফ বাবুর নিকট এই অলৌকিক ব্যাপার বলায় তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন, ভূত আবার কি? দেখাইতে পার? উকিল মহাশয় একটা দিনস্থির করিয়া তাঁহাকে পূরাতন মালদহ সহরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেলেন। মুনসেফ্ বাবু একটী একটী করিয়া ঘরে প্রবেশ কালীন বলিতে লাগিলেন কোথায় ভূত? কোথায় ভূত? করিয়া প্রত্যেক ঘরই পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন; অমনি একচাপ বিষ্ঠা তাঁহার মস্তকের উপর পতিত হইল; তিনি আশ্চর্য্যের সহিত মস্তকোপরি হস্ত দিয়া দেখিলেন যে তাহার মস্তকে বিষ্টা পতিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন আরে "ছ্যা ছ্যা" "চল চল" এই কথা বলিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান পূর্ব্বক স্নান করিলেন এবং পরদিবস সেই কথা কাছারির সকলের সম্মুখে ব্যক্ত করিলেন। এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন।

জন্মাষ্টমীর দিন সকলে উপবাসী থাকে; সেদিন কেহই অন্ন আহার করে না। রাত্রি ৯টা কিম্বা ১০টা বাজিবার পর গৃহস্থ সকলেই লুচী খাইয়া থাকে। গৃহস্থ সকলের জন্য লুচী, মিষ্টান্ন, ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া একটী বৃহৎ হাঁড়ির মধ্যে ঢাকা দিয়া রাখিয়া সন্ধ্যার সময় দেবমূর্ত্তি দর্শন মানসে গমন করিয়া ছিলেন; প্রত্যাগমণ করিয়া দেখিলেন যে

হাঁড়িতে কিছুই নাই, ১৫।১৬ জনের খাদ্য যাহা রাখা হইয়াছিল তাহার চিহ্ন মাত্র নাই; সদর দরজায় চাবী বন্ধ, ঘরের ভিতরে আলোক প্রবেশ করিতে পারে এমন কোনও পথ নাই; এক্ষণে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১৫।১৬ জনের খাদ্য চাবিবদ্ধ শূন্য গৃহ হইতে কে খাইবে?

আর একদিন একটী বৃহৎ রোহিৎ মৎস্য আন্দাজ /৬ কিম্বা /৭ সের হইবে; একটী বৃহৎ তৈলপূর্ণ কটাহে ভাজা হইতেছিল ভাজা শেষ হইতে না হইতে দেখা গেল যে কটাহে কেবলমাত্র কয়েক টুকরা মৎস্য রহিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই সকল ঘটনা সাধারণের নিকট অবিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে; কারণ অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আদৌ ইহা বিশ্বাস করেন না, কিছুদিন পূর্ব্বে আমি এই কথা মাননীয় শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর দে, এম. এ; মহোদয়ের নিকট এই সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছিলাম; কেবলমাত্র তিনিই আমার পক্ষ সমর্থন করেন; ও সত্যাসত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। উপরি উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে রোগিণীর পিতা কন্যার পীড়ার সংবাদ শ্রবণে কলিকাতা হইতে কন্যাকে দেখিবার জন্য তথায় যান এবং অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়েন; এবং ইহার প্রতিকার কল্পে ওঝা আনেন, এবং তাহার নিকট হইতে একটী মাদুলী লইয়া সাধারণের সম্মুখে হস্তে বাঁধিয়া দেন। পর দিবস উক্ত মাদুলী হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্ব-সমক্ষে পতিত রহিয়াছে; পরে শুনা গেল যে এরূপ কত শত মাদুলী দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু ঐরূপ ভাবে কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। যখন তাহার শরীরে ভূতাবেশ হইত অমনি কিয়ৎক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিত ও পরে নানাবিধ প্রলাপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিত, এই সময় পণ্ডিতগণ চণ্ডিপাঠ করিত; পাঠ করিবার সময় যে স্থান ভুল বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইত তাহা রোগিণী সংশুদ্ধ করিয়া দিত; সে

কখন লেখা পড়া শিখে নাই; সুতরাং সংস্কৃত ভাষা সংশুদ্ধ করা কিরূপে সম্ভবে?

আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে দিনের বেলায় বাটীস্থ সকলে বসিয়া আছে এমন সময়ে দেখা গেল যে ঘরের এক কোণে এক জ্বালা গুড় ছিল; হঠাৎ তাহা মেজে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে; পরক্ষণেই দেখা গেল যে এক বাল্তি জল গৃহ মধ্য হইতে শুন্যে উত্থিত হইয়া নিচের উঠানে ধপাস করিয়া পতিত হইল, ঘরে সতন্ত্র বালিস বিছানা ছিল তাহা ক্রমান্বয়ে উপর হইতে শূন্যে উত্থিত হইয়া উঠানে পতিত হইতে লাগিল। এই সকল অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমুঢ় হইয়া রহিলেন। পরদিবস আবার ওঝা কর্ত্তৃক নানাপ্রকার প্রক্রিয়া করার পর আত্মাকে আহ্বান করিয়া রোগিণীকে আবার প্রশ্ন করা হইল :--

প্রঃ। তুমি উহাকে ত্যাগ করিতেছ না কেন?

উঃ। আমি উহাকে ত্যাগ করিব না।

প্রঃ। তবে কি সে চিরকালই এইরূপ ভাবে কষ্টভোগ করিতে থাকিবে?

উঃ। না? আমি শীঘ্রই উদ্ধার হইয়া যাইব।

প্রঃ। তুমি যে যাইবে তাহা আমরা কিরূপে জানিতে পারিব?

উঃ। প্রস্থানকালীন নিদর্শন রাখিয়া যাইব।

প্রঃ। এক্ষণে তোমার বাসস্থান কোথায়?

উঃ। তোমাদের বাড়ীর পশ্চাৎভাগে যে গাছটী আছে আমি এক্ষণে সেই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছি।

প্রঃ। যদি তুমি ইহাকে পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে ঐ বৃক্ষটী কাটীয়া ফেলা হইবে।

উঃ। যদি তোমরা ঐ বৃক্ষটী কাটীয়া ফেল তাহা হইলে অন্য বৃক্ষে আশ্রয় করিব ?

প্রঃ। তুমি এইরূপ উৎপাৎ হইতে বিরত হইবে কিনা ?

উঃ। হইব ? কারণ আমি শীঘ্রই উদ্ধার হইয়া যাইব ?

প্রঃ। তুমি উদ্ধার হইয়াছ কিনা তাহা কিরূপে জানা যাইবে ?

উঃ। আমি যাইবার সময় একটী চিহ্ন রাখিয়া যাইব যদ্দারা তোমরা জানিতে পারিবে যে আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি।

এই সকল প্রশ্নের পর রোগিণীকে আর কোন প্রশ্ন করা হয় নাই ; ও আত্মাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল ; এবং ক্ষণপরেই রোগিণীর চৈতন্য সম্পাদন করা হইল ; এবং যখন সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান হইল ; তখন তাহাকে পূর্ব্বোক্ত কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কিছুই বলিতে পারিল না, ইহার পর দিবস হইতে আর কোন অত্যাচার হইত না, এই ঘটনার কিছুদিন পরে আকাশ বেশ পরিস্কার রহিয়াছে ; ঝড় বৃষ্টির লেশ মাত্র নাই ; হঠাৎ একটী বৃহৎ বৃক্ষ (নামটা ঠিক মনে নাই) মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল ; এবং উক্ত স্থান হইতে গাঢ় ধূমরাশি শূন্যে উত্থিত হইয়া গেল, এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে উপরোক্ত যে সকল ঘটনা লিখিত হইল ; তৎসমুদয় দিনের বেলাই সংঘটিত হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর হইতে এখন পর্য্যন্ত আর কখনও উপদ্রবের কথা শুনা যাই নাই। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে এই সকল ঘটনার একবিন্দুও অতিরঞ্জিত নহে, উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে যদি কেহ মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ করেন তাহা হইলে আমরা তাহা সপ্রমাণ করিতে পারি।

শ্রীননীভূষণ শেঠ।

প্রেতাত্মার প্রতিহিংসা।

হারাধন দাস কলিকাতার উপকণ্ঠে * * * * কোন স্থানের অধিবাসী। সেই স্থানে তাহারা তিন চারি পুরুষ ধরিয়া বাস করিতেছেন। কলিকাতায় তাহার একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী, দুইটি দোকান, একটি বস্ত্রের আর একটি ষ্টেশনারী দ্রব্যের, আর নিজগ্রামে পৈত্রিক বসতবাটী ছিল। পল্লীমধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। দোকানের কেনাবেচা অধিক পরিমাণে হইত ও সেই আয় হইতে তাহার সংসার যাত্রা স্বচ্ছলভাবে নির্ব্বাহিত হইত। তাহার পুত্র ও একটী ভৃত্য ছাড়া আর কেহ ছিল না। তিনি যেরূপ মিতব্যয়ী ছিলেন যে তিনি অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন। দরিদ্র দুঃখী দেখিলেই তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত ও যথাসাধ্য অর্থ দান করিয়া তাহাদের কষ্ট দূর করিতেন, এইটিই যা তাহার প্রধান দোষ ছিল।

হারাধন এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন। পুত্রকে উপযুক্ত দেখিয়া দোকানের কাজকর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুত্রই দোকান দুইটির তত্ত্বাবধান করে। বৃদ্ধ আরও দুই তিনটি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এখন আর তাঁহাকে, কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। কেবল চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া গল্প গুজব করেন আর তামাক পোড়ান। তাহার জীবনের শেষ সাধ তাহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাঁকে সংসারী করিয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন্। ভগবান বুঝি সে আশায় তাহাকে বঞ্চিত করিলেন।

বৈশাখ মাসের এক শুভদিনে তাহার পুত্রের বিবাহ হইয়া গেল।

কন্যাটী দরিদ্র হইলেও দেখিতে সুশ্রী। বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রের বিবাহে যথা-সম্ভব লৌকিকতা রক্ষা করিলেন। পুত্রবধূ গৃহে আসা অবধি বৃদ্ধের পত্নীকে আর কোন কাজ কর্ম্ম করিতে হয় না। পুত্রবধূর দ্বারা সংসার-যাত্রা উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। পুত্রবধূর অশেষ গুণ ছিল, স্বামী, শ্বশুরশ্বাশুড়ীর যথেষ্ট ভক্তি করিতেন ও তাহাদের সেবা করিতেন। বৃদ্ধের দোকান হইতে এমন আয় হইতে লাগিল যে, বৃদ্ধ মনে করিলেন তাহার গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী আসিয়াছেন। তিনি পুত্রবধূকে এক দণ্ড দেখিতে না পাইলে বা পুত্রবধূ অসুস্থ হইলে অধীর হইতেন।

পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধের পুত্রের নাম হরেন। হরেনের তিনটি সন্তান হইয়াছে একটি কন্যা ও দুইটি পুত্র। বৃদ্ধ তাহাদের মায়ায় আজ যাইব কাল যাইব করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া আর তীর্থে গমন করিতে পারে না।

বৃদ্ধের পুত্রবধূ পুনরায় গর্ভবতী। দুই এক মাস পরে প্রসব হইবে। পাছে তাহার কোনরূপ ক্লেশ হয় বলিয়া তাহার জন্য একটি অতিরিক্ত চাকরাণী রাখিয়া দিয়াছেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে পুত্রবধূর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। কেবল রক্তস্রাব হইতে লাগিল, বধূর অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হইল। বড় বড় ডাক্তার ধাত্রী আসিল, তাহারা বলিল, উদরের ভিতর ছেলে মারিয়া ফেলিয়া বাহির না করিলে প্রসূতি বাঁচিবে না। বৃদ্ধ প্রথমে সম্মত হইলেন না, পুত্রবধূ বাঁচিবে এই আশায় অগত্যা সম্মত হইলেন। ছেলে মারিয়া ফেলিয়া উদরের ভিতর হইতে বাহির করিতে করিতে করিতে প্রসূতির শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। তখন সকলেই বুঝিল যে প্রসূতির বাঁচিবার সম্ভাবনা খুব অল্প। ডাক্তারেরা ও ধাত্রীরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল, প্রসূতি মারা পড়িল। চিকিৎসক এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা যে

যাহার প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাহার প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করা হইল, সে জনমের মত কোথায় চলিয়া গেল, আর সে মুহূর্ত্তের জন্যও ফিরিয়া আসিবে না।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সকলের শোক নিবারিত হইল বৃদ্ধ আবার পুত্রের বিবাহ দিলেন। হরেন্দ্র পুত্র-কন্যাদিগের মুখ চাহিয়া প্রথমে বিবাহ করিতে রাজি হইল না, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত অন্যোপায় হইয়া বিবাহ করিতে হইল।

বিবাহের একমাস কাটিয়া গেল। তাহার পর হইতে বাড়ীতে নানা উপদ্রব আরম্ভ হইল কিছুদিন ধরিয়া ইট পড়িতে লাগিল। ইট কাহারও গায়ে লাগে না, অথচ চতুর্দ্দিক হইতে পড়ে। কিছুদিন ইট পড়া বন্ধ হইল। একদিন সকলে আহার করিতে গিয়া দেখিল, অন্নব্যঞ্জনের উপর রাশি রাশি বিষ্ঠার ন্যাকড়া। সেরাত্রে কাহারও আহার হইল না। ইহার পর হইতে রান্নাঘর আগুলিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। সকলে রাত্রিতে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, শীতকাল, রাত্রে উঠিয়া দেখে গৃহের জানালা দরজা সব কে খুলিয়া দিয়াছে। আর একদিন রাত্রে হরেন্দ্র ও তাহার পত্নী সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়া আছে। গভীর রাত্রিতে ঝণাৎ করিয়া দরজা জানালা খুলিয়া গেল। শশবস্তে দম্পতি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, দেখিল, জানালা দরজা খোলা, আর দরজা জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা হা হা শব্দ উত্থিত হইল। বৃদ্ধ হারাধন দেখিল যে, যেন তাহার মৃত পুত্রবধূ একটা গৃহ হইতে ছেলে কোলে করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ীর সকলেই দেখিল, একটি স্ত্রীলোক যেন ছেলে কোলে করিয়া বাড়ীময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হরেন্দ্র একদিন স্বপ্ন দেখিল, যেন তাহার মৃত স্ত্রী তাহার নিকট আসিয়া বলিতেছে যে তাহার ২য় স্ত্রীকে না মারিয়া

এবাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না। সেই হইতে আর কোন কিছু হয় না বা দেখিতে পাওয়া হায় না।

*   *   *   *   *

কিছুদিন পরে বৃদ্ধ হারাধন পরিবারবর্গকে লইয়া গয়ায় পিণ্ড দিতে গেল। ভরসা করিয়া কাহাকেও বাড়ী রাখিয়া গেল না।

গয়া হইতে ফিরিয়া আশার পর একদিন বৈকালে সকলে বসিয়া গল্প গুজব করিতেছে। হরেন্দ্রের স্ত্রী হঠাৎ "আমায় মার্লে" "আমায় মার্লে" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। সকলেই তাহার সুশ্রূষা করিতে লাগিল। প্রভাত হইবার কিছুক্ষণ-পরে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। অতি কষ্টে সে বলিল, যেন একটি স্ত্রীলোক তাহাকে লাঠির দ্বারা মস্তকে আঘাত করিল, এই বলিতে বলিতে তাহার মৃত্যু হইল। তাঁহারা সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার কপালের এক কোণে কাল্‌শিরা পড়িয়া গিয়াছে। বধূকে সকলে সৎকার করিয়া আসিল, বৃদ্ধের আর তীর্থগমন করা হইল না। হরেন্দ্রও আর বিবাহ করিলেন না। সেই হইতে আর কোন উপদ্রব হয় নাই।

শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র।

দ্রষ্টব্য—"পুনরাগমন" প্রকাশিত হইয়াছে, যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ পুস্তক পাঠ করিবার এই মহা সুযোগ। মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র।

কার্য্যাধ্যক্ষ।



অলৌকিক রহস্য।

৬ষ্ঠ সংখ্যা। চতুর্থ বর্ষ। পৌষ, ১৩১৯।

অভিশাপ।

"তুমি বেরিয়ে যাও বল্‌ছি, আমার আর ভাল লাগছে না।"

"আরে তোম্‌ত পহলা সুরু কিয়া গাধা কাঁহেকা।"

"বোঝা গেছে, কোন্ গাধা হ্যায় আমি না তুমি—তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে নেহি মাংতা। নেমকহারাম মেড়ুয়াবাদী।"

"আরে উল্লুক নিমকহারাম হম্ না তু, আপনে ভাইকা মাফিক্ তেরা মঙ্গল কিয়া, ঔর আজ আঁখ দেখলাতে হো।"

"তা বোলেগা বৈকি? দুধ কলা দেকে কালসাপ পুষেছিলাম কি না, তাই তোমার জন্যে আমি বে-ইজ্জত, লোকের কাছে চোট্টা।"

"তেরি চোট্টা কোন কহেরে হারামজাদ্—আপনা মতলবসে বজ্জাতি সুরু কিয়া? আবি বড়া আদমি হুয়া মেজাজভি নবাব বন গিয়া—চুপ রহো গাদ্ধা।

"খবরদার বল্‌ছি তোম্ কড়া কথা মত্ কহো, তোমার ও সব গাদ্ধা উল্লুক ও সব ইতরোমি কথার ধার ধারি না। বেরিয়ে যাও বল্‌ছি আমার বাড়ী হতে।"

"তবুরে শূয়ার, কোত্তাকি বাচ্ছা! হাম তুমহারা কোঠিমে আপনে সে আয়া, না বজ্জাত তু মেরা গোড় পাকড়কে লে আয়া।"

"অন্যায় হয়েছিল, ঘাট হয়েছিল। তোমাকে আশ্রয় দিয়ে, যাতে তুমি মানুষের মত হও তার চেষ্টা করে, আমি কি না লোকের কাছে জোচ্চোর? আমার খুব স্বার্থ কি না?"

"তুম্ হাম চোট্টা হ্যায়?"

"নেহি মাংতা, তোম কোন হ্যায়, ওরকম নেমকহারামের সম্পর্কও রাখতে চাই না। ফের বল্‌ছি, দূর হও এখান থেকে।"

"তোমারা মাফিক বহুৎ কোত্তা মিলেগা—তুমহারা বাড়ীমে হাম্——

তর্ক বিতর্ক, কড়া কথা, গালাগাল, চোখ রাঙ্গানি এমনি পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িতেছিল। পঞ্চম হইতে ক্রমে সপ্তমে উঠিতেছিল; মুখোমুখি হইতে ক্রমশ হাতাহাতির উপক্রম। কথায় বলে ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের তুল্য মানুষের শত্রু নাই। যে একবার ইহার কাছে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, তাহার আর নিস্তার নাই, একেবারে দিগবিদিক জ্ঞান শূন্য ও কাণ্ডাকাণ্ড বিহীন করাইয়া ক্রীড়া পুত্তলিকার মত নাচাইতে থাকে।

হরগোবিন্দ ও ঠাকুর মহাশয় উভয়েরই এই দুর্দ্দশা, দুজনেরই সম্পূর্ণরূপে ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিয়াছে। হরগোবিন্দ যেমন চটিয়া উঠিতেছিল, ঠাকুর মশায় তেমনি গরম হইয়া জবাব দিতেছিল।

বাহিরের প্রকৃতি তখন সান্ধ্যগগন ব্যাপিয়া নীরবতায় ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। কোলাহল মুখর রাজপথ যেন ক্ষণেকের তরে স্তব্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু হরগোবিন্দের বাটীর মধ্যেও উভয়ের হৃদয়ের মধ্যে তখন এই তুমুল ঝঞ্ঝাবাত। কেবল দু চার জন প্রতিবেশী এই উচ্চ চীৎকার ধ্বনিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া, সদর দরজার আশে পাশে দাঁড়াইয়া কৌতূহল নিবারণের ও পরবর্ত্তী সময়ের জন্য পুরচর্চ্চারূপ অমৃতময়ী সুখাদ্য আহরণের চেষ্টায় নিযুক্ত।

এ স্থলে উভয়ের একটু পূর্ব্ব পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। হরগোবিন্দের

উপাধি ঘোষ, পিতার নাম ৺বোলগোবিন্দ ঘোষ, সাকিম আছিপুর, থানা নবীগঞ্জ, পরগণা বোরো, জেলা চব্বিশ পরগণা, হাল সাকিম কলিকাতা, জাতি সদ্‌গোপ, পেশা বিষয় কর্ম্ম, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ।

অপরটী লছমী নারায়ণ উপাধ্যায়, পিতার নাম অজ্ঞাত, সাকিম্ জমতোল, মৌজে কাগারিয়া, তফ্‌শিল হিরাচৌকী, জেলা বালিয়া, হাল সাকিম কলিকাতা জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা ব্রাহ্মণোচিত, বয়স আন্দাজ ত্রিশ।

হরগোবিন্দ মূর্খ, ঠাকুর মহাশয় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত; হরগোবিন্দ বিষয়ী, কি করিয়া কাজ হাঁসিল করিতে হয়, লোককে ভাঁড়াইতে হয় তা বেশ বুঝে। তবে লোকটা সজ্জন ও পরোপকারী। ঠাকুর মহাশয় সরল, মারপেচ শূন্য, বিষয় বুদ্ধি মোটে নাই,—মুখের উপরই নির্ভীক সত্য কঠোর ভাবে বলিয়া ফেলে।

কিন্তু ঘটনা চক্রে উভয়ে মিলিয়াছিল। জাতি, বর্ণ, দেশ, আচার বিচার প্রভৃতিতে উভয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও বিশেষ রূপ সৌহৃদ্য ঘটিয়াছিল। তাহাতে উভয়েরি স্বার্থ জড়িত।

ঠাকুর মহাশয় হরগোবিন্দের বৈঠকখানার ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলেন ও পাশের দালানে স্বপাক হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিতেন। হরগোবিন্দের নিজের ও বাটীর অন্যান্য লোকজনের যত্ন ও শ্রদ্ধা তাঁহাকে সর্ব্ববিধ অসুবিধা হইতে দূরে রাখিবার প্রয়াস পাইত। স্থানীয় লোক বলিয়া, হরগোবিন্দের চেষ্টায় ঠাকুর মহাশয়ের পশার প্রতিপত্তি, ব্যবসায় ও উপার্জ্জন বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ঠাকুর মহাশয় নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অবধৌতিক চিকিৎসায়, সামুদ্রিকে ও শান্তি স্বস্ত্যয়নে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া, সহরের বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী অনেকেই তাঁর দ্বারস্থ হইতেন। এই সুযোগে হরগোবিন্দ বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত পরিচিত ও তাহার বিষয় কর্ম্মের বিশেষ সুবিধা

ঘটিয়াছিল। চতুর হরগোবিন্দ এ সুযোগ ত্যাগ করে নাই। তা ছাড়া ঠাকুর মহাশয়কে লওয়াইতে হইলে অনেক সময় হরগোবিন্দের সাহায্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত।

হরগোবিন্দ রাত্রিতে ঠাকুর মহাশয়ের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন ও স্বরোদয় সাধনা করিত, এবং তাঁহাকে আদর করিয়া গুরুজী বলিত।

ঠাকুর মহাশয় বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও তাহাকে অনুজের মত ভালবাসিতেন এবং আদর করিয়া চোট্টা, কোত্তা, হারামজাদ, বেইমান প্রভৃতি মধুর সম্ভাষণে প্রীত করিতেন।

কিন্তু তাহাদের এ মিলন সুক্ষণে কি কুক্ষণে ঘটিয়াছিল হরগোবিন্দ এখনো তাহা বুঝিতে পারে নাই। একটি তুচ্ছ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, তাহার সমস্ত জীবন এমন তিক্ত ও বিষময় করিয়া দিয়াছিল যে, সে আজো সে কথা ভুলিতে পারে না।

ব্যাপারটী অতি তুচ্ছ। অনেক সময় অতি তুচ্ছ বা সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কর্ম্মবীজ এরূপ ফলবতী হয় এবং দ্রুত বর্দ্ধায়মান ও অনুকূল ঘটনা স্রোতে মুকুলিত হইয়া, আমাদের ক্ষুদ্রজীবনের লক্ষ্যকে বিষাদ বা অমৃতময় ভাবে এরূপ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয় যে, তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়।

গ্রীষ্মকালে খড়োঘরে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সংযোগের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে বিপুলায়তনে এই অগ্নি এরূপ ভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে তাহাতে উভয়কেই পুড়িতে হইল।

ইটালির দত্ত বাবুদের সেজকর্ত্তা একদিন গণনার জন্য ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী সাংঘাতিক রূপে পীড়িত। ঠাকুর গণনা করিয়া বলিলেন যে, চারিটী গ্রহ এককালে বিরূপ, তন্মধ্যে মঙ্গল মারকেশ। সুতরাং এরূপ স্থলে জীবনের আশা বড়ই অল্প; তবে

লগ্নাধিপতি স্বস্থানে ও প্রবল, এইজন্য মৃত্যু যোগ যে অনিবার্য্য এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। নতুবা বিশেষ আশা কিছুই নাই।

সেজকর্ত্তা একটু কাতর ও চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন দৈব কার্য্য বা গ্রহ শান্তি করিলে ফল হয় না?

ঠা। ভগবৎ-শক্তি লইয়া প্রবল গ্রহগণ বিরূপ হইয়াছে সুতরাং এখানে ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষুদ্র কর্ম্ম কি প্রতিরোধ করিবে? প্রবল কর্ম্মচক্রের ঘূর্ণায়মান গতির রোধ করা সামান্য জীবের সাধ্য নয়। সুতরাং এ অবস্থায় আমার পরিশ্রম ও আপনার উদ্যোগ ও অর্থ ব্যয় নিরর্থক হইবে।

অনন্যোপায় সেজকর্ত্তা হরগোবিন্দের শরণ লইলেন।

হরগোবিন্দের সুপারিস্ অকাট্য। ঠাকুর একেবারে অনিচ্ছুক, হরগোবিন্দ ও নাছোড় বান্দা।

ঠা। শাস্ত্রে আছে "মীন লগ্নে জন্ম যদি জাতক সৌর প্রথমে" তখন বরষার পর ধরণীতে রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে অর্থাৎ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে, তাহার একপ্রকার ধ্রুব মৃত্যু।

শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হইল যে, এক্ষেত্রে যখন মৃত্যুযোগ একেবারেই অবধারিত বলিয়া সূচিত নয় এবং অপরদিক হইতে রক্ষা পাইবার ক্ষীণ আশা ও আছে, তখন দৈবকার্য্যে কোন হানি হইতে পারে না বরং সুফল ফলিতে পারে, তখন চেষ্টা করাই বিধেয়।

সর্ব্বসম্মতি প্রতিধ্বনি ও সমর্থন করিয়া বলিল, চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

তখন স্বস্ত্যয়নের কিরূপ ব্যবস্থা করা যায়, তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা ও ফর্দ্দ হইতে লাগিল।

ঠাকুরের স্বস্ত্যয়নে একটু বৈচিত্র ছিল। ইহা বহুব্যয় সাধ্য এবং অন্ততঃ মাস ব্যাপী হইল। সমস্ত দ্রব্যাদি নূতন হওয়া চাই। তবে তিনি নিজে

প্রাপ্য দক্ষিণা ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করিতেন না। সমস্ত দ্রব্যাদি অগ্নিদেবকে আহুতি প্রদান করা হইত। কেবল তিনি যে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া কার্য্য করিতেন, সেইটী পরিধান করিয়াই চলিয়া আসিতেন।

সেজকর্ত্তা পুত্রের অসুখের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত, তজ্জন্য ব্যবস্থা হইল যে, তিনি অর্থ ধরিয়া দিবেন এবং হরগোবিন্দ সমস্ত বন্দোবস্ত করিবে।

দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইলে হরগোবিন্দ প্রস্তাব করিল যে, ঠাকুর তোমার বাক্সে ত বিস্তর নূতন কাপড় পড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং আবার নূতন কাপড় কিনিবার প্রয়োজন কি? বরঞ্চ এ অর্থের দ্বারা তোমার অন্য প্রকারে সাশ্রয় হইতে পারে।

ঠাকুর বলিলেন বেশ তাহাই হউক।

তিনি দত্ত বাড়ীতে মাসব্যাপী দৈবক্রিয়ার নিমিত্ত যথারীতি ব্রতী হইলেন। আরম্ভ হইবার সময় বাড়ীর মেয়েরা লক্ষ্য করিল যে, পরিধেয় বস্ত্র যদিও আনকোরা, তবু একেবারে নূতন নয়; তাহা বস্ত্রের নানা সঙ্কোচ দেখিয়াই বুঝা যায়।

ইহাতে তাহারা একটু ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইল। ধনবানের পুত্রে সঙ্কটাপন্ন পীড়া, তাহাতে অর্থব্যয়ে কোন কাতরতা নাই, সুতরাং এ ত্রুটী হইবার প্রয়োজনীয়তা কি?

শেষে স্পষ্ট ভাবেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে, পরিধেয় একবারের ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহা কি সত্য?

ঠাকুর তখন ব্রতী, অন্য কথা কহিবার সময় ও ছিল না, প্রবৃত্তি ও ছিল না। সরল সত্যবাদী ব্রাহ্মণ সংক্ষেপে উত্তর করিল "হরগোবিন্ মতলব দিয়া।

সেদিন সোমবার। হরগোবিন্দ Week-end টিকেটে প্রাতঃকালে দেশ হইতে ফিরিয়া, একটা ডিক্রিজারীর মোকদ্দমার জন্য ছোট আদালত

হইতে ফিরিতেছিল। পথে দত্ত বাটীর একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

লোকটী কিয়ৎক্ষণ নানা আড়ম্বর সহ ভূমিকার পর আরম্ভ করিল "এরকমটা কেন হলো ঘোষজা।"

হ। কি রকমটা হয়েছে? কেন কোনইত ত্রুটী হয় নাই?

লো। হয়েছে বৈকি, হয়েছে বৈকি। ত্রুটী বিলক্ষণ হয়েছে, একটু দুঃখের কারণ না হলে আর বলতে হচ্ছে।

হ। বলুন না ব্যাপার কি শুনি? ভাল পাগলের পাল্লায় পড়েছি।

লো। আজ্ঞে হাঁ, পাগল ছিলাম না, তবে হয়েছি বটে! আপনাকে আর বলবো কি, আপনার মতলবেই ত হয়েছি।

হ। আমার মতলব! সে কি কথা! প্রাণপণে চেষ্টা করে ঠাকুরজীকে লওয়াইয়ে, কাজের ক্ষতি করে সমস্ত উদ্যোগ করলাম! আর একি কথা বলছেন!

লো। আপনি ত সমস্তই করেছেন, সে কথা আর কে অস্বীকার করছে। তবে কি জানেন শেষ রাখাই রাখা। শেষে অঙ্গহানি হলো বলেই ত দুঃখ।

হ। আরে বলেই ফেলুন না মশায়? ভূমিকা যে ফুরোয় না দেখছি।

লো। সবই নূতন হবে শুনলাম, তার জন্য মূল্য ও ধরে দেওয়া গেল, কিন্তু কাপড় চোপড় পুরাণো হলো কেন? আপনার যদি আশ্রয় করবার উদ্দেশ্য ছিল ত স্পষ্ট বলিলেই হ'ত। আরো কিছু ধরে দেওয়া যেত। দেখছেন ত প্রাণের দায়, সব স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি।

হ। আমার উদ্দেশ্য?

লো। ঠাকুর ত নিজেই বলিলেন যে, হরগোবিনের মতলবে হয়েছে।

তিনি ত আর আমাদের মত সংসারী নন্ যে, কেবল লাভ লোকসান খুঁজবেন।

লোকটা আর দাঁড়াইল না। ঈষৎ বিদ্রূপ-বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেল। সে নীরব দৃষ্টি যেন ইঙ্গিতে একটা ধিক্কার জানাইয়া দিল।

রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় ও অপমানে হরগোবিন্দ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। ভাবিল, কি ? যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর! নহিলে আমার কি স্বার্থ; যাতে ব্রাহ্মণের ভাল হয়, দুপয়সা আসে তারই জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি, আর আমার কিনা, বিনা দোষে এই অপমান! আসুক সে বামুন, আজ এর বিহিত করে, তবে ছাড়ব। এস্পার কি ওস্পার।

প্রাতঃকালে আহার হয় নাই; আহার করিতে রুচি বা ইচ্ছা ও হইল না। আহত ব্যাঘ্র যেমন আততায়ীর উপর পতিত হইবার প্রতীক্ষায় থাকে, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের আগমনের অপেক্ষায় আসন্ন ঝটিকার মত গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

যথা সময়ে, পরিশ্রান্ত, অগ্নি-তপ্ত নিরম্বু উপবাসী ব্রাহ্মণ উপনীত ভবন দুয়ারে। দেবর্ষি বোধ হয় তৎপূর্ব্বে নিঃশব্দে ঢেঁকী হাঁকাইয়া শুভাগমন করিয়াছিলেন; তাই সঙ্গে সঙ্গেই পতন ও মূর্চ্ছা, অর্থাৎ ঝমাঝম ঝগড়া বাধিয়া গেল।

ব্যস্ত ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া কাপড়ের কসি আঁটিতে আঁটিতে হরগোবিন্দ গর্জ্জন করিয়া উঠিল "এ কেয়া আক্কেল তোমরা ঠাকুর! চোরকে বল চুরি করতে, আউর গৃহস্থকে কহো সাবধান হতে?

ঠাকুর হরগোবিন্দের উত্তেজনার কথা কিছুই জানিতেন না; তদুপরি শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত কথা কহিতে ভালই লাগিতেছিল না, তাই বলিলেন "চুপ রহো হারামজাদ, দিক করো মত্।

হ। কাহে চুপ করেগা, তুমি আমাকে অপমান করাতে পার আর আমি মুখ বুজকে চুপ রহেগা ?

ঠা। আরে বাবা, হামি বলচি যে হামার কুচ্ছু ভাল লাগছে না। চুপ কররে বদজাত।

হরগোবিন্দ থামিল না। চকিতের মধ্যে দানব ক্রোধ উভয়ের স্কন্ধে উঠিয়া উভয়কেই একেবারে অভিভূত করিল। ইহার পর যে বাক যুদ্ধ হইল, তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। শেষে গতিক এমন দাঁড়াইল যে বুঝি লাঠালাঠি, রক্তারক্তি বা অন্ততঃ হাতাহাতি হয়।

বৌঠাকরুণ অর্থাৎ রামগোবিন্দের স্ত্রী মাঝে পড়িয়া অনর্থ থামাইবার জন্য দু এক বার বৃথা প্রয়াস পাইলেন।

ঠা। দেখো ফিন যদি উস মাফিক বাত কহো, ফিন নিকাল যাও বোলেগা তো তোহার সর্ব্বনাশ হো জয়গা।

হ। তুমি বেরিয়ে যাও বলছি, তারপর যা সর্ব্বনাশ করতে পার দেখা যাবে। অমন ঢের খোঁট্টা, ঢের সর্ব্বনাশ দেখেছি।

ঠা। তোমারি মুস্‌কিল তোম্ আপনেসে বলাতে হো। হুঁসিয়ার কুত্তা, ফিন চড়া বাৎ কহেগা ত তোমকে ভসম্ কর দেগা ?

হরগোবিন্দের বড় দুঃখে হাসি আসিল। সে দুই হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল "ঠাকুর এ আর সত্যযুগ পাওনি। বামুন চোখরাঙ্গাইলে যদি সত্যই ভস্ম হয় ত দেশের সমস্ত লোক এতদিন ছাই হইয়া যাইত।"

ঠা। দেখো, জরুর তোমকো ভসম্ করেগা ; দেখো উল্লুক, তুমহারা কোন বাপ রোখে !"

এবার হরগোবিন্দ একটু শঙ্কিত হইল ; স্বরোদয় সাধনা কালীন দেখিয়াছে যে ঠাকুর বাক সিদ্ধ। এতক্ষণে সে কথাটা স্মরণ হওয়াতে হঠাৎ শঙ্কিত হইল।

ক্রোধেই তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, মানুষ যদি মানুষকে ভস্ম করিতে, বাঁচাতে, মা'রতে পারিত তা হলে আর ভাবনা ছিল না। অদৃষ্টে মন্দ না থাকিলে কার বাপের সাধ্য কি করে? যদি ললাটে লিখিতং ধাতা, কোন শালা কিংকরিষ্যতি। তা ছাড়া জগৎ ব্যাপারে জীবের কোন কর্ত্তৃত্বই নাই।

সামলাইয়া হরগোবিন্দ বলিল "দেখো যদি আমার মাতৃপদে কিছুমাত্র ভক্তি থাকে যদি তাঁর আশীর্ব্বাদের কোনও ফল থাকে, তা হইলে তুমি আমার এই কচুটী কোরবে?"

হরগোবিন্দ অত্যন্ত মাতৃভক্ত।

ক্রোধে উন্মত্ত ঠাকুর অভিসম্পাৎ দিল যে, "মাতারি কো নাম লেতা? ইয়াদ রাখো তোমারি মাতারি ভি খতম্ হোগা, চৌবিশ ঘণ্টাকো বিচমে খতম হোগা, কালে সাম ছয় বাজে হোযাগা! দেখো বদ্‌মাস, তোমকো তোমারো বাপকা এক্তিয়ার নেহি হ্যায় যে রোখেগা। য্যায়সা কোত্তা ত্যায়সা চাবুক মিলে গা।

অভিসম্পাতের বহর দেখিয়া হরগোবিন্দের একবার একটু ভয় হইল। কিন্তু সে সেই দিন প্রাতঃকালে তার মাকে সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছে সুতরাং চোখ রাঙ্গানিতে কিছুমাত্র ভয় না পাইয়া বলিল "কি যত বড় মুখ তত বড় কথা, এখুনি ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবো। গা মতন না দিলে শিক্ষা হবে না দেখছি।

"জরুর তেরা মাতারি খতম্ হোগা; কাল নয় বাজে খবর মিলেগা, তব তেরা আক্কেল হোগা শূয়ার।" বলিয়াই ঠাকুর বেগে বাটী হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় ও ক্রোধে পাড়ার লোক জন ও দোকানদারকে পুনরায় বলিয়া গেল "উসকো খেয়াল কর দেও, কাল জরুর নয় বাজে খবর মিলেগা, চব্বিশ ঘণ্টাকো বিচমে উসকো মাতারি খতম্ হো যাগা।

অতঃপর পাড়ার লোকজন আসিয়া জমিল। তাহারা সকলেই হরগোবিন্দের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং তাহার বাক্যের ও কার্য্যের পূর্ণ সমর্থন করিল এবং ওই খোট্টা পণ্ডিতের ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইলেন।

ইতি মধ্যে রামগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত। সে সমস্ত শুনিয়াই প্রথমটা স্তম্ভিত হইল, পরে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হরগোবিন্দকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল।

"তুই কল্লি কিরে কুলাঙ্গার? নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক তেজস্বী ব্রাহ্মণ, অভুক্ত পরিশ্রান্ত, অতিথি ও গুরুতুল্য; তাকে কি না তুই ভরসন্ধ্যা বেলা অপমান করে তাড়ালি? তোর নরকেও স্থান হবে না। ব্রাহ্মণের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদের জোরে আমাদের আজ ভাত কাপড়ের ভাবনা নেই। তুই কি না, সেই ব্রাহ্মণের অভিসম্পাৎ কুড়াইয়া বাপ পিতামহকে নরকে ডুবালি? মা এমন কুলাঙ্গারকে ও গর্ভে ধরিয়াছিলেন। যা এখনি ছুটিয়া গিয়া যেখান হতে পারিস, ব্রাহ্মণকে হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া এনে সন্তুষ্ট কর্, নহিলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!

দাদার তীব্র ভর্ৎসনায় কনিষ্ঠের প্রাণে আঘাত করিল। একবার মনে হইল কাজটা গর্হিত হইয়াছে। কিন্তু তখনো ক্রোধের দাস প্রকৃতিস্থ হইতে পারিল না।

কাজেই রামগোবিন্দ লোকজন লইয়া ঠাকুরের তল্লাস করিতে বাহির হইলেন, কিন্তু কোন আস্কারাই হইল না।

গভীর রাত্রি, দুইটা কি তিনটা হইবে। হরগোবিন্দ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিল যে, সে শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছে। শ্মশান পরিচিত—তাহাদের গ্রামের শ্মশান। অপরাহ্ণ কাল অস্তগামী রবি। নিম্নে নদী-তটে, বাঁশ ও আমবাগানে সন্ধ্যার শ্যামছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। উর্দ্ধে তরুশির মণ্ডিত

হৈমকরোজ্জল আভা ঝিকমিক করিয়া স্থানটীকে আলোক প্লাবিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

শ্মশানে শায়িত এক মুমুর্ষু। চতুর্দ্দিক রক্তাক্ত, শয্যা প্রভৃতি লোহিত রঞ্জিত। কেশ রুক্ষ, দেহ শীর্ণ, চক্ষু কোটর গত। অন্তিমের করাল ছায়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত প্রাণশক্তির মুহুর্মুহু অভিব্যক্তির চেষ্টায়, দাহ, তৃষ্ণা ও কাতরতার সঙ্গে মরণ যাতনা ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছিল।

স্বপ্নের ঘোরে, বিস্ময়ে ও সভয়ে হরগোবিন্দ দেখিল যে, মুমুর্ষু তাহারই মাতাঠাকুরাণী। দারুণ অন্তর্দাহে সে ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল।

শব্দে বাড়ীর ও পাড়ার লোক জাগরিত হইল। রামগোবিন্দ অনুমান করিলেন, বুঝিবা নির্ম্মম খোট্টা প্রতিহিংসা মানসে গভীর রাত্রে একটা খুনোখুনি বাধাইয়াছে।

সকলে আশ্বাস দিলেন যে, ও কিছুই নয় স্বপ্ন, একটা কাল্পনিক খেয়াল মাত্র। মাথা গরম হওয়াতে, দারুণ মানসিক উত্তেজনার জন্য, ঠাকুরের অভিশাপ বাক্য মনে মনে তোলাপাড়া করিতে করিতে, মানসিক বিকার উপস্থিত হওয়াতে এই স্বপ্ন।

আবার আত্মাভিমান প্রবল হইল, হরগোবিন্দ ও আশ্বস্ত হইল। কিন্তু যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল ততই সেই কথা—"চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মার মৃত্যু হইবে ও বেলা নয়টার সময় খবর আসিবে।" মনে হওয়াতে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রাণপণে চিত্তস্থির করিতে গেল, কিন্তু এক অনির্দ্দেশ্য যাতনা তাহাকে ক্রমশই অন্তরে দোদুল্যমান করিয়া তুলিল। আবার আত্মাভিমান প্রবল হইয়া বুঝাইয়া দিল যে, পাগল আর কি, বামুন চোখ রাঙ্গাইলেই যদি মানুষ ভস্ম হইত, তাহলেত দেশের সমস্ত লোকই এতদিনে একযোগে শিঙ্গা ফুঁকিত।

আবার পরমুহূর্ত্তেই মনে জাগিল যে, এ তেজস্বী বাক্‌সিদ্ধ ব্রাহ্মণ। কখনো ইহার কথা মিথ্যা হইতে দেখি নাই।

যত বেলা হইতে লাগিল ততই তার বুক রাহিয়া রাহিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ঘড়ি যখন টং টং করিয়া জানাইয়া দিল বেলা নয়টা, তখন তার আপাদমস্তক আলোড়িত হইল।

বাহির হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগা এইটে কি রামগোবিন্দ ঘোষের বাসা"।

সকলে এক সঙ্গে "কে কে" করিয়া উঠিল। হরগোবিন্দ তিন লাফে বাহিরে আসিয়া বলিল "কে হারু যে? কি খবর, তুমি কখন এলে"? হারু একজন দেশস্থ প্রজা।

হা। আজ্ঞে, এই আসিয়াছি, শীঘ্র চলুন, বাড়ীতে বড় বিপদ। কাল সন্ধ্যার পর হইতে মা ঠাকুরুণের রক্তাতিসার হইয়াছে, অবস্থা খুবই সঙ্কীন, ডাক্তারেরা হাল ছেড়ে দিচ্ছে"।

হরগোবিন্দ তখন উন্মাদ, তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হইল।

এই আকস্মিক ও অভাবনীয় বিপদেও ধৈর্য্য ধরিয়া রামগোবিন্দ তাড়াতাড়ি কিছু বেদানা আঙ্গুর প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া, ভাইকেও গৃহ-চিকিৎসক ও বিনোদ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া বাটী প্রস্থান করিল। বিপদ নানামুখী; দুর্ভাগ্য-ক্রমে ১২টার ট্রেণ ফেল হইয়া ২৷৹ টার ট্রেণে বাটী পৌঁছিয়া শুনিল যে, গ্রাম্য বৃদ্ধগণের পরামর্শে ও সাহায্যে অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই মাতাঠাকুরাণীর শ্মশান যাত্রা সম্পন্ন হইয়াছে।

দৌড়িয়া যখন শ্মশানে পৌঁছিল তখন হরগোবিন্দের চক্ষুস্থির। সেই স্বপ্ন দৃষ্ট দৃশ্য, বাহিরের প্রাকৃতিক আলো আঁধারের খেলা ও সন্ধ্যার শ্যাম ধূসর ছায়া, আর মুমূর্ষুর ভিতরেও আলো আঁধারের জীবন মরণের খেলা, আর মৃত্যুর কাল করাল ছায়া। সেই রুক্ষকেশ, শীর্ণকায়, কোটর গত

চক্ষু, দাহ, তৃষ্ণা ও সর্ব্বাঙ্গীন অন্তিম যাতনা! শয্যা ও দেহ রক্তাপ্লুত। অশ্রুজলে ভিজিয়া, অনন্ত পথের যাত্রী, ইহ কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পার্শ্বে বসিয়া হরগোবিন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "মা মা, আমার পাপে তোমার এই অকাল মৃত্যু, তোমার এই নরাধম কুলাঙ্গার বেটার জন্ম এই যাতনা, সর্ব্বনাশ—মা মা।" তীব্র অনুতাপ ও অন্তর্দাহ! লোকে ধরাধরি করিয়া হরগোবিন্দকে সরাইয়া দিল।

ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বৃদ্ধার বক্ষের শেষ স্পন্দন থামিয়া গেল। তখন অপরাহ্নের ক্ষীণ আলোক রশ্মিটুকু ঢাকিয়া আঁধার চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছে।

হরগোবিন্দের অবস্থা বর্ণনাতীত। বায়ুভরে চিতা হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহার ভিতরে ও চিতার আগুন বুঝি সেইরূপই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

কখনো প্রতিহিংসা পরায়ণ, ক্রোধে উন্মত্ত—সমস্ত, রাগ আবেগ ও যাতনা উদ্দেশে ঠাকুরের উপর প্রদত্ত। কখন চঞ্চল, ক্ষুব্ধ ও ক্রোধে ঘূর্ণায়মান। বোধ হয় সে সময়ে, সম্মুখে পাইলে সে ঠাকুরকে অবিলম্বে খুন করিয়া ফেলিত।

আবার কখন, হৃদয় অনুতাপমগ্ন, অনুশোচনাগ্রস্ত। বুঝিল দোষ কারু নয় শ্যামা, এ তার নিজেইর দোষ। সমস্ত বিপদ নিজ হাতে গড়া, নিজ ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতার ফল। কখন মৌণ, স্তব্ধ ও আত্মহত্যা অভিলাষী। কখন নিজেকে, নিজ কার্য্য বা অদৃষ্টকে ধিক্কার, কখনো সমস্ত ক্রোধ ও প্রতিহিংসা সেই ব্রাহ্মণের উপর। বহু কষ্টে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে হইল।

ধীরে কালস্রোতে, সর্ব্ববিধ্বংসী ও সর্ব্বসমকারী বিরাট কালের সর্ব্ব যাতনা-প্রশমক স্নেহময় করস্পর্শে, উত্তেজনার তীব্রতা ঘুচিয়া গেল।

কিন্তু এখনো রহিয়া রহিয়া সে কথা মনে জাগিয়া উঠে, সে অন্তঃক্ষোভের চিহ্ন এখনো লুপ্ত হয় নাই। জীবনে হইবে কিনা কে জানে?

বহুকাল পরে ঠাকুরের সহিত তার সাক্ষাৎ হইল। হরগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর তোমার এই আক্কেল, তোমার মনে এই ছিল; লোকে বলে, ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে আসলে সমস্ত অকল্যাণ দূর হয়, আর কিনা তোমার দ্বারা আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিল, আমাকে অবশেষে মাতৃঘাতী হইতে হইল। এ কষ্ট আমার কখন যাবে না।"

ঠা। আরে মূর্খ, এ সাদা কথাটাও বুঝতে পার না, মানুষে কি মানুষের আয়ু দিতে নিতে পারে? মানুষের আয়ু, ভাবিতব্য ও মৃত্যুযোগ বহুপূর্ব্বে এমন কি জন্মিবারও পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ও লিপি বদ্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণের ক্রোধ বা অভিশাপ একটা ভবিষ্যতের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেয়। তুমি সৌভাগ্যবান, তাই তোমার স্বপ্নের অগোচর মাতৃভবিষ্যৎ আমার মুখ দিয়া পূর্ব্বেই তোমার শ্রবণ গ্রাহ্য হইয়াছিল; আর তুমি দুরদৃষ্ট, তাই অভিশাপ-ব্যক্ত অলংঙ্ঘ্য ভবিষ্যত পূর্ব্বে জানিয়া ও কোন উপকারে আসিলে না। পুরাকালের কর্ম্মবিপাকগ্রস্ত অভিশপ্ত প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তি গণের ন্যায় চিত্ত স্থির রাখিয়া যদি সেই দিনই কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে, ত প্রাণ ভরিয়া জননীর চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিতে? দুরদৃষ্ট তুমি।

দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পুনরাগমন।

আমি যেমন শৈশব হইতে গোপালের উপর দ্বেষ করিয়া আসিয়াছি, পিতাও সেইরূপ শৈশব হইতে খুল্লপিতামহের প্রতি দ্বেষ করিয়া আসিয়াছেন। গোপাল যেরূপ আমা হইতেও আমার মায়ের প্রিয় ছিল, খুল্ল-পিতামহও সেইরূপ পিতা অপেক্ষা আমার পিতামহীর প্রিয় ছিলেন। আমি তবু ভাগ্যবশে পিতার স্নেহ লাভ করিয়াছিলাম আমার পিতার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। পিতার অসাধারণ প্রতিভা অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে বহুশাস্ত্রে বিশারদ করিয়াও, তাঁহার পিতার নিকট হইতে খুল্ল-পিতামহের ন্যায় প্রতিষ্ঠা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ জানিয়াও, আমার পিতামহ পিতাকে যখন তখন ছোট ঠাকুরদার নিকট হইতে সৎপরামর্শ ও উপদেশ লইতে আদেশ করিতেন।

একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে কেহ যদি একটা নিরক্ষরের কাছে জ্ঞানশিক্ষা লইতে উপদেশ দেয়, তাহা যেমন অশ্রদ্ধেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, উপদেষ্টা ক্ষিপ্ত বলিয়া গৃহীত হয়, এই উপদেশ কথা শুনিয়া পিতার নিকট পিতামহেরও সেই অবস্থা হইয়াছিল। পিতা-মহের মস্তিষ্কবিকার ঘটিয়াছে স্থির করিয়া, পিতা আর তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইতেন না।

পিতামহ পিতার মনের ভাব বুঝিয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়া-ছিলেন—"শুন রাধানাথ! অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছ, এবং বাঁচিয়া থাকিলে ভবিষ্যতে আরও অনেক গ্রন্থ পাঠ করিবে। পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর তোমার জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেও এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ

রাখিও যে, রমানাথের জ্ঞানের সর্ব্বনিম্নাংশও তোমার জ্ঞান হইতে একমানুষ উপরে অবস্থান করিতেছে।”

পণ্ডিত পিতা একথা মূল্যহীন বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি পিতামহ ও খুল্ল-পিতামহের উপর দারুণ ক্রুদ্ধ হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই পিতামহ ও পিতামহীর মৃত্যু হইল। তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পিতার সমস্ত ক্রোধ ছোট ঠাকুরদাদার উপর পড়িল। সে ক্রোধ দিবারাত্রি তাঁহার মনের ভিতর অনলের ন্যায় লীলা করিলেও ছোটঠাকুরদাদার স্বভাবমধুরতা ও সদাহাস্যময় মুখমণ্ডল, কোনও উপায়ে তাহাকে বাহির হইবার অবসর দিত না।

এদিকে পিতামহ ও পিতামহীর মৃত্যুর পর খুল্ল-পিতামহের সেবার সমস্ত ভার মায়ের উপর পড়িল।

খুল্ল-পিতামহের সুন্দর আকৃতি, তাঁহার মধুময় ভাব, খুল্ল-পিতামহীর অকাল-মৃত্যু আমার মায়ের অঙ্কে গোপালের আশ্রয় গ্রহণ, ছোট ঠাকুরদাদার পরিচর্য্যায় মায়ের আগ্রহ ও তৎপরতা—এই সমস্ত একত্র হইয়া, দুর্ব্বলচিত্ত অথচ জ্ঞানাভিমানী পিতার মনে এক প্রচণ্ড ঈর্ষাবহ্নি সঞ্চিত করিয়াছিল। দারিদ্র্যের রুদ্ধবায়ুতে প্রধূমিত অবস্থায় বহুকাল হইতে তাহা পিতার হৃদয়ে অনলরাশির সঞ্চয় করিতেছিল—শিখা-বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইবার অবকাশ পায় নাই।

ক্রমে তাহাও হইল, পিতার অবস্থা দেখিতে দেখিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দেশে যে বিদ্যা, অর্থ উপার্জ্জন বিষয়ে খুল্লপিতামহের মূর্খতা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী ছিল না, সেই বিদ্যা কলিকাতায় পিতাকে ভারে ভারে অর্থ আনিয়া দিল। সেই সময় হইতেই পিতা ছোটঠাকুরদা'র হাত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু এত গোপনে যে, আমরা কেহই ঘুণাক্ষরে তাহা বুঝিতে পারি নাই। দুর্বৃত্ত শ্যামচাঁদ এই কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল।

প্রথম প্রথম পিতার অভিসন্ধির পথে গোপাল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে সে অন্তরায়ও দুরীভূত হইল। খুল্লতাতের আর কলিকাতা আসবার উপায় রহিল না।

তথাপি পিতা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কেননা দেশে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখাইবার সাধ হইয়াছিল। ছিন্ন বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া পিতা গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পর একবারমাত্র দেশে ফিরিয়াছিলেন। তখন আমরা দেশেই থাকিতাম। তখনও পর্য্যন্ত আমার পিতার আমাদের লইয়া স্বতন্ত্র বাসায় রাখিবার সঙ্গতি ছিল না। ক্রমে পিতার সে সঙ্গতি হইল—আমরা কলিকাতায় আসিলাম। সেই সময় হইতে আজিও পর্য্যন্ত পিতা জন্মভূমির মুখ দেখেন নাই।

কিছুদিন হইতে পিতার দেশে বাড়ী করিবার বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে। কলিকাতাতেই তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। কিন্তু এ প্রতিপত্তি দেশে না দেখাইতে পারিলে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল কই! শ্যাম বহুদিন হইতে পিতাকে বুঝাইতেছে, দিন কয়েকের জন্য দেশে বসিতে পারিলে, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দেশের জমীদার হইতে পারিবেন। দেশের জমীদারের যেরূপ দুরবস্থা, তাহাতে সামান্য ব্যয়ে তাঁহাদের বিপুল আয়ের সম্পত্তি তাহার হস্তগত হইতে বিলম্ব হইবে না। পণ্ডিতের প্রতিপত্তিতে পিতার আর সেরূপ তৃপ্তি রহিল না, জমীদারের প্রতিপত্তি পাইতে তাঁহার লোভ হইল।

ন্যায্যমূল্যের অনেক অধিক দিয়া তিনি খুল্ল-পিতামহের অংশ-টুকু ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিলেন। অবশ্য শ্যামচাঁদই তাঁহার হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিল। পল্লীগ্রামে যে সম্পত্তির মূল্য পাঁচশত

টাকা হইবে না, পিতা সেই সম্পত্তি ক্রয় করিতে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তথাপি খুল্লতাত পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করেন নাই। শেষে দুরাত্মা শ্যাম তাঁহার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। শ্যাম আমাদের কলিকাতার বাড়ীতেই থাকিত। কলেজের লম্বা ছুটী পাইলে বাড়ী যাইত। সে কখন্ কি ভাবে কিরূপ অত্যাচার করিত, তাহা সমস্ত আমি জানিতে পারি নাই। তবে এটা বুঝিয়াছিলাম, অত্যাচারের ফলে খুল্ল-পিতামহকে কিছুদিনের জন্য বাড়ী ছাড়িতে হইয়াছিল। কিছুদিন অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় তাঁহার গৃহ পড়িয়াছিল। আমাদের দেশের পূর্ণকুটীর সেই কয়দিনের মধ্যে বনে আবৃত হইয়াছিল।

পিতার ঈর্ষার ছিদ্রপথ দিয়া চলিয়া চতুর শ্যামচাঁদ পিতাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছিল।

শ্যাম তাঁহাকে যখন যেরূপ বুঝাইত, তিনি সেইরূপ বুঝিতেন। সে এইরূপে পিতাকে নানা প্রকারে প্রতারিত করিয়াছিল। খুল্ল-পিতামহের নাম করিয়া সে প্রতিমাসে ত্রিশ টাকা আদায় করিয়া লইত। পাছে মাসোহারা না পাইলে খুল্লতাত ছুটিয়া আসে, এই ভয়ে মাসোহারা পাঠাইতে পিতা একটী দিনও বিলম্ব করিতেন না। ছোট ঠাকুরদাদা কিম্বা গোপাল কেহই যখন আর কলিকাতায় আসে না, তখন তিনি মনে করিতেন, তাহারা নিশ্চয়ই রীতিমত মাসোহারা পাইতেছে। কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন, অকৃতজ্ঞ খুল্লতাত যথেষ্ট টাকা পাইয়াও জ্ঞাতি শত্রুতা পরিত্যাগ করিতেছে না, কিছুতেই ভদ্রাসনের অধিকার পরিত্যাগ করিতেছে না, তখন তিনি মাসোহারা বন্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

শ্যাম পিতার এ সঙ্কল্প শুনিয়া সুখী হইতে পারিল না। তাহা

হইলে তাহারই ক্ষতি। সাতবৎসর ধরিয়া সে টাকা আত্মসাৎ করায় এখন সে মাসোহারা যেন তাহার নিজেরই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ ক্ষতি সহ্য করিতে তাহার সাহস হইল না। সে খুল্লপিতামহকে গৃহ হইতে যে কোন উপায়ে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। খুল্ল-পিতামহ বিবিধ প্রকারে অত্যাচারিত হইয়াও কোনও দিন প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই—গোপালও করে নাই। ইহাতে দুরাত্মার সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতাপুত্রকে কিছুকালের জন্য গ্রাম ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে শ্যাম আমাদের ভদ্রাসনের চারিধারে বেড়া দিয়া তাহা দখল করিয়া লইল। পিতার করুণায় শ্যাম গ্রামের মধ্যে সকলের অপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে। সুতরাং তাহার কার্য্যে প্রতিবাদ করিতে দরিদ্র গ্রামবাসী সাহস করিত না। ন্যায্যমূল্যের বিশগুণ টাকাতেও পল্লীগ্রামের মূল্যহীন জমি বিক্রয় করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায়, অনেকে দাদার উপর বিরক্তও হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে গ্রীষ্মাবকাশে শ্যাম দেশে ফিরিয়া পিতাকে সংবাদ দিল, দশসহস্র টাকা মূল্যে ছোটঠাকুরদাদা তাঁহার সম্পত্তি আমার পিতাকে দিতে সম্মত হইয়াছেন। এবং তিনি গৃহদেবতা দামোদরকে সঙ্গে লইয়া দামোদর পারে চার পাঁচ ক্রোশ দূরে গ্রামান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র পিতা সোল্লাসে দশসহস্র মুদ্রা অতি গোপনে শ্যামচাঁদকে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য শ্যামচাঁদ সে দশসহস্র মুদ্রা আত্মসাৎ করিয়া লইল।

সেই সঙ্গে পিতা এ সংবাদও পাইলেন যে, দেনার দায়ে আমাদের দেশের জমীদারের তালুক বিক্রীত হইয়া যাইতেছে। আমাদের গ্রামখানি সেই তালুকের অন্তর্ভুক্ত। পিতা আমাদের কাহাকেও না জানাইয়া সেই

তালুক ক্রয় করিলেন। পূজার ছুটীর পরে তাহাতে তাঁহার অধিকার পাইবার কথা। সেই সূত্রে তিনি হুগলি যান ও সেখানে আমার ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে পরিচিত হন।

যে গ্রামে পৈতৃক বাসভূমি, সে গ্রামের মালিক হওয়া কম গৌরবের কথা নহে। পিতা সে গৌরবের লোভ সম্বরণ করিতে পারিতে পারিলেন না। পূজার পরেই বিষয়ে অধিকার লাভ হইবে বুঝিয়া, তিনি অট্টালিকা নির্ম্মাণের উপযোগী ইট প্রস্তুত করিতে শ্যামচাঁদের উপর আদেশ দিয়াছিলেন। সেই আদেশ পালন করিবার জন্য শ্যাম পূজার ছুটীতে দেশে উপস্থিত হইয়া সংবাদ পাঠাইল যে, ছোটঠাকুরদাদা দেশে ফিরিয়া আবার নিজের গৃহ অধিকার করিয়াছে। বলিয়াছে—আরও পাঁচ সহস্র মুদ্রা না দিলে আমি গৃহত্যাগ করিব না। পিতা তখন আমার ভাবী শ্বশুর কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই পল্লীস্থ গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন শ্যামের কাছে এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। ভূমি-ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ভূস্বামীর দম্ভ তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; তিনি তৎক্ষণাৎ শ্যামচাঁদকে পত্রে আদেশ দিলেন, যেমন করিয়া পার দুর্ব্বৃত্তদের স্থানান্তরিত কর।

সেই আদেশের ফলে গোপাল অগ্নিদগ্ধ হইয়া অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলিয়াছে!

গল্পে আমরা এরূপ তন্ময় হইয়াছিলাম যে চারিঘণ্টা সময় কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি নাই। সাতটা বাজিতে আমাদের চৈতন্য হইল। তখন বুঝিলাম গৃহ পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ রহিয়াছে। ডাক্তারবাবুর গৃহ হইতে মা কিম্বা হরিয়া কেহই তখনও পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। আমি পিতাকে বলিলাম, যদি যাইতে হয়, তবে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আমি উঠিলাম, পিতাও উঠিলেন।

এমন সময় বাহির হইতে মধুর গম্ভীর সম্বোধনধ্বনি আমাদের পিতা পুত্রকে আবার স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট করাইয়া দিল।

আমরা উভয়েই বুঝিলাম, পিতামহ ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। কিন্তু কেহই মুখ তুলিয়া পিতামহের মুখের পানে চাহিতে পারিলাম না। পুত্রশোকার্ত্তের নিকট হইতে না জানি আজ কি মর্ম্মভেদী কথা শুনিতে হইবে। আমার মনে হইল, চিরদিন নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া অন্তরে স্তূপে স্তূপে সঞ্চিত মর্ম্মব্যথা আজ প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শাপানলরূপে আমাদের পিতাপুত্রকে ভস্মীভূত করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু সেই মধুর, সেই চির মধুর—মর্ম্মোচ্ছলিত কোমলতাময়ী বাণী!—"রাধানাথ! মায়ের কাছে শুনিলাম তুমি নাকি গোপালের বিপদের কথা শুনিয়া দারুণ মর্ম্মপীড়িত হইয়াছ। আমি তোমাকে সত্য কহিতে আসিয়াছি—তুমি নিশ্চিন্ত হও, গোপালের অগ্নিদাহে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। দামোদরকে আনাইবার জন্য আমি গোপালের প্রতি আদেশ করিয়া ছিলাম, গোপাল দেশে যাইয়া দেখে দামোদরের গৃহ দগ্ধ হইতেছে। দামোদরকে রক্ষা করিবার ব্যাকুলতায় গোপাল সেই দগ্ধ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়াছে।"

আমি এই দুই দিন দামোদরের স্বপ্ন একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। পিতামহের মুখে দামোদরের নাম শুনিবামাত্র প্রদীপ্ত পাবকের মত সেই স্বপ্নচিত্র আমার স্মৃতিমুখে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে এক মর্ম্মস্পর্শী আবেদন—যেন বহুদূর হইতে উচ্চারিত এক অতি সূক্ষ্ম সুর আমার শ্রবণ বিবরে স্পন্দিত হইতে লাগিল। "গোপীনাথ জল দে। আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।"

আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলাম। ছোটঠাকুরদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"উঠিয়োনা গোপীনাথ, আমার আরও কিছু বক্তব্য তোমাদের শুনাইতে আসিয়াছি।"

আমি তাঁহাকে মনের কথা শুনাইবার প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু কি জানি কেন, আমার সমুদয় প্রয়াস ব্যর্থ হইল, মুখ হইতে একটীও কথা বাহির হইল না। আমি আবার উপবিষ্ট হইলাম।

খুল্ল পিতামহ বলিতে লাগিলেন—"ভাবে বোধ হইতেছে, তোমরা আমার কথায় অবিশ্বাস করিতেছ। কিন্তু আমি আবার বলিতেছি—তোমাদের মনস্তুষ্টির জন্য বলিতেছি না—আমার জ্ঞান বিশ্বাসে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাই তোমাদের শুনাইতেছি, গোপালের অগ্নিদাহে তোমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই।"

পিতা একথার কোনও উত্তর করিলেন না। তিনি উপবিষ্ট অবস্থাতেই ছোট ঠাকুরদাদার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। ছোট ঠাকুরদাদা তখনই তাঁহাকে দুই হস্তে যেন ব্যাকুল আগ্রহে ধরিয়া ফেলিলেন; এবং বলিলেন—"একি করিতেছ রাধানাথ!"

এইস্থলে বলিয়া রাখি, এই সর্ব্বপ্রথম আমি পিতাকে বয়ঃকনিষ্ঠ খুল্লতাতের পদে প্রণাম করিতে দেখিলাম! ছোট ঠাকুরদাদা সে প্রণামে যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি পিতাকে আবার স্বস্থানে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি একি করিতেছ! আমি তোমার খুল্লতাত, এ অভিমান মনে কখনও স্থান দিই নাই। আমি চিরদিন তোমাকে সহোদর, সখা—বয়োজ্যেষ্ঠ—শ্রদ্ধার পাত্র মনে করিয়া আসিয়াছি আমি মূর্খ, তুমি পণ্ডিত—বংশের মর্য্যাদা তোমা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

অশ্রুগদগদকণ্ঠে এতক্ষণ পরে পিতা উত্তর করিলেন,—খুল্লতাত!

ও কথা আর বলিয়ো না। মৃতপ্রায় পুত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া এইরূপ আনন্দোচ্ছ্বাসে যিনি চিরনরাধম ভ্রাতুস্পুত্রের সহস্র অকার্য্য একমুহূর্ত্তে ভাসাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার তুল্য মহিময় পুরুষ এজগতে আর কে আছে আমি জানিনা। শাপানলে দগ্ধ করিতে হয় কর, ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে চাও ফিরাও, পিতৃদেব যাহাকে জ্ঞানি-শিরোমণি বলিয়া আদর আপ্যায়নে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়াছেন, পিতৃব্য, আমি আজ সেই সচল দামোদরের শ্রীচরণ-প্রান্তে শরণার্থরূপে উপস্থিত হইলাম।

এই বলিয়া পিতা দণ্ডায়মান খুল্ল-পিতামহের সম্মুখে বারম্বার মস্তক ভূমিস্পৃষ্ট করিতে লাগিলেন।

ভূতের বাক্যালাপ।

বিগত বাঙ্গালা ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাসে এই ভৌতিক ব্যাপার—ভূতের বাক্যালাপ বিষয়ক সত্য ঘটনা "বসুমতী" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সাধারণের অবগতির জন্য ও "অলৌকিক রহস্যের" পাঠক-বর্গকে উপহার দিবার জন্য অদ্য সে অদ্ভুত অভিনব ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিতেছি।

অনেকে মনে করেন ভূত কোনও কালেই কথা কহিতে পারে না, তাহারা কেবল মানুষকে ভয় দেখাইয়া উপদ্রব করে। আমরাও এতদিন তাহাই মনে করিতাম কিন্তু এই প্রত্যক্ষ বিষয় যাহাদের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে তাহারা বিশেষ বিস্ময়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন সন্দেহ নাই। আমিও

সেই অদ্ভুত, অভিনব বিষয়ের খাঁটী সত্য কথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

ময়মনসিংহ জেলার অধীনে হালুয়াঘাট থানার অধীনে গোস্তাবহুলী গ্রাম। এ গ্রাম দুই এক বৎসর পূর্ব্বে ফুলপুর থানার এলাকায় ছিল। দুই বৎসর যাবত হালুয়া ঘাটে নূতন থানা হইয়াছে। হালুয়া ঘাট হইতে গোস্তাবাহুলী গ্রাম দুই মাইল। শ্রীযুক্ত রাধানাথ চক্রবর্ত্তী এ গ্রামের বিশিষ্ট অধিকারী। চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজে অবস্থাপন্ন হইলেও তিনি ঐ জেলার দেরপুর জমিদারী এষ্টেটে কোন তরফে নায়েবী করেন, এখনও তিনি ঐ কার্য্যেই আছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার মাতুলের শিষ্য সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে প্রথমে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হই।

ঐ থানার অধীন সাখুয়াই গ্রাম বড় বর্দ্ধিষ্ণু বহু অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। ইহাদের প্রধান ব্যবসা গুরুগিরি ও জমিদারী। ৺হরসুন্দর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ইষ্ট গুরু। হরসুন্দর প্রতি বর্ষেই পূজায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে থাকেন। এবার শারদীয় পূজায় তিনি অন্যত্র ছিলেন সুতরাং শিষ্যকে পূজার অব্যবহিত পরে দেখা দিবার জন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে পঁহুছিলেন। তখন সন্ধ্যা। হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন ও আহ্নিকাদির পর আহারের আয়োজন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় স্বয়ং পাক করিবেন তাহারই আয়োজন করিয়া রন্ধনাদি হইলে তাঁহার আহার শেষ হইল। আহার শেষে তিনি আসিয়া বৈঠকখানায় তামাক, পান সেবন করিতেছেন, এমন সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়া কহিলেন "কর্ত্তা, আপনার আহারাবশিষ্ট জিনিষ বড় কদর্য্যভাবে রহিয়াছে কোন দিন ত এমন ভাবে থাকে না, আমার বোধ হয় আজ আর প্রসাদ লইতে পারিব না।" "না, আমিত পরিপাটী করিয়াই রাখিয়াছি।" এই কথা বলিয়া তিনি রন্ধনশালায় গিয়া দেখেন কে সত্যই খাদ্যদ্রব্য অপরিষ্কার

করিয়াছে যেন কেহ সেই পাত্রে খাইতে খাইতে পলাইয়া গিয়াছে অথবা কোন বিড়াল আসিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছে।

এইরূপ নানা কথায় আলোচনা হইতেছে এমন সময় কে যেন অস্ফুট স্বরে ঘরের উপর হইতে কহিল "তোমরা কেন চিন্তা কর আমি করিয়াছি, আমি খাইতে বসিয়াছিলাম তোমরা আসায় চলিয়া আসিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান—ঘরের ভূত হইয়াছি। কোন সৎ ব্রাহ্মণ পাইনা বলিয়াই আমার অনেক দিন আহার লোপ। আজ ইহাকে পাইয়া আহারে বসিয়াছিলাম তোমরা প্রতিবাদী হইলে।" সকলে ভয়ে আড়ষ্ট হইল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন "বাবা তুমি যেই হও, আমরা চলিয়া যাই তুমি আহার কর।" কিন্তু ব্রাহ্মণের দ্বিভোজন নিষেধ বলিয়া ভূত আর আহারে স্বীকৃত হইল না।

সেদিন রাত্রে সকলে বড় ভীত হইল, সকলের দুশ্চিন্তা দেখিয়া ভূত কহিল "তোমরা কেন ভয় কর, আমি কিছু করিব না।" এই আশ্বাস বাক্যে কি তাঁরা সকলে আশ্বস্থ হইতে পারিলেন? তাঁহারা সকলে একগৃহে তাঁরা বিছানা পাতিয়া শয়ন করিল। তখন গৃহ মধ্যস্থ মাচার উপর হইতে ভূত কহিল, "তোমরা ভয় কর কেন! ভয়করিও না তোমরা ঘুমাও, আমি পাহারা দিই।" এই কথায় সকলে আরো ভীত হইয়া সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইলেন।

পরদিন প্রাতে দেখা গেল ভূত সকলের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কহিতেছে কিন্তু নিরাকার। এরূপ আকারহীন পদার্থ কি আলাপ করিতে পারে! পূর্ব্বে কাহারও জানা ছিলনা। সকলে স্তম্ভিত হইল। এদিকে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাড়ীতে ভূতের আবির্ভাব হইয়াছে দেখিয়া ওঝা ডাকিলেন। ওঝা আসিলে ভূত কহিল "বাছা তুমি কি প্রাণ দিতে আসিয়াছ! আমি সাধারণ ভূত নহি!" আর বাড়ীর কর্ত্তাকে কহিল "আপনি যদি আমাকে

তাড়াইবার জন্য বেশী বাড়াবাড়ী করেন তবে আমি আপনাকে স্ববংশে মারিয়া চলিয়া যাইব।” এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আর ভূত তাড়াইবার চেষ্টা করিতেন না। ভূত গণিয়া মানুষের নানা শুভাশুভ কহিয়া দিত, ব্যায়রামের ঔষধ বলিয়া দিত। অনেকের রোগ সারিয়াছে, শুভাশুভ কথা মিলিয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ভূত বলিয়াছিল “যখন আপনার বাড়ীতে আছি তখন আমি গণকের ন্যায় শুভাশুভ বলি আর মানুষকে ঔষধ দিই, ফল হইবে। আপনিও ইচ্ছা করিলে দু পয়সা রোজ-গার বেশ করিতে পারেন।” তিনি কহিলেন “বাবা আমি কিছুই চাই না, তুমি আমার বাড়ী হইতে গেলেই বাঁচি।” ইহার পর ভূত আর ঔষধ দিত না গণিতও না। ভূত পরিবারের সঙ্গে মিলিয়া গেল, রাধানাথ বসুকে সে বাবা বলিয়া ডাকিত আর তাহার ভ্রাতৃবধুকে মা বলিয়া ডাকিত ছেলে-পেলেদিগকে ভ্রাতৃ ভগিনী সম্বোধনে ডাকিত। ছেলেপেলেদের সঙ্গে দাবা ও ঘুটি খেলাইত। দাবার ঘুটি আপনা আপনি চলিত। কি অদ্ভুত ব্যাপার। এইরূপ অদ্ভুত ভূত আসিয়াছে এ সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। ভূতের জন্য দুগ্ধ, কলা প্রচুর আসিতে লাগিল। ভূত একদিন বলিয়াছিল “আমি প্রত্যহ ভাত খাইতে পারি না, দুধ, কলা হইলেই বেশ হয়।” ইহাও সে বরাবর খাইত না। মাসে দুই তিন বার দুধ, কলা ও একবারমাত্র ভাত খাইত। ভূত নানা দূর দেশ হইতে সংবাদ তারের ন্যায় সত্বর আনিয়া দিত। এইরূপে প্রত্যহ প্রায় সহস্রাধিক লোক নানাস্থল হইতে রাধানাথ বাবুর বাড়ীতে সমাগত হইতে লাগিল। তাহার বাড়ীতে খাদ্য দ্রব্যের এক বাজার বসিয়া গেল। সকলেই ভূতের সঙ্গে কথা কহিয়া তৃপ্তি মিটাইতে পারিত। যখন শ্রাবণমাস আসিয়া পড়িল, তখন সুর, তান, লয়ে পদ্মপুরাণ গাহিত। অনেক সাধ্য সাধনায়ও তাহার পরিচয় জানা গেল না। সেকথা তুলিলেই নির্ব্বাক হইত। কোন পদস্থ ব্যক্তি রাধানাথ বাবুর

বাড়ীতে ভূত দেখিতে আসিতেছে তাহা দূর হইতেই সে বলিয়া দিত "আজ কি কাল তোমার এখানে অমুক পদস্থ লোক আসিতেছে।"

এইসকল তত্ত্ব পাইয়া তিনি আহারের আয়োজন পূর্ব্বাহ্নে করিতে পারিতেন ভূতের নিজের আকার আছে বলিত কেহ সে আকার দেখিবার জেদ করিলে সে বলিত "আমার চেহারা দেখিয়া তোমরা ভয় পাইবে বা মরিয়া যাইবে।" এই কথাশুনিবার পর আর কেহ তাহাকে দেখিতে চাহিত না। আহারের সময় তাহার বিকট আকার প্রকাশ পাইত, কিন্তু বদ্ধ ঘরে সে কেহ দেখিতে পাইত না।

মদনসরকার নামে একজন প্রতাপশালী মুসলমান রাধানাথ বাবুর পরম শত্রু ছিল। ইহা জানিতে পারিয়া ভূত একদিন রাত্রে পথিমধ্যে তাহাকে মারিয়া ফেলে। পুলিশ আসিয়া কোন জখমের চিহ্নই তাহার গায় পাইল না। তদন্ত স্থানে ভূত কহিয়াছিল "বৃথা কেন নিরপরাধ লোক ধরিয়া টানাটানি কর, মদনকে আমি মারিয়াছি।" বহু পদস্থ ব্যক্তি সহর ও অন্যান্য স্থান হইতে প্রতিনিয়ত তাহার বাড়ীতে এই উপলক্ষে যাতায়াত করিত।

আমার ভাগ্যে কিন্তু এই ভূত দর্শন ঘটে নাই। যদিও রাধানাথ বাবু আমাকে ময়মনসিংহ সহরে যাইয়া বারবার তাহার বাড়ীতে যাওয়ার অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ কাল করিয়া আর আমার যাওয়া হইল না। একদিন আমার মাতুল গৃহে কোন বিবাহ উপলক্ষে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম। আমি ভাবিলাম "রাধানাথ বাবুকে না জানাইয়া তাহার বাড়ী গিয়া ভূত দেখিয়া আসিব।" তাহার আয়োজন করিতে লাগিলাম। আমি হাতী সাজাইতে আমার হস্তী-রক্ষককে আদেশ করিলাম দেখিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাত নামা উকীল আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভ্রাতা ও খুল্লতাত ভূত দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহারাও হস্তী সাজাইতে আদেশ করিলেন। আমাদের

ইচ্ছা ছিল গোপনে রাধানাথ বাবুর বাড়ী গেলে আজই ফিরিয়া আসিতে পারিব। তিনি জানিলে হয়ত আহারের ব্যবস্থা তাঁহার বাড়ীতে করিয়া গোল বাঁধাইবেন। কিন্তু আমাদের এই গুপ্ত অভিযান আর অপ্রকাশ রহিল না। তিনি জানিয়া আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন "ভূত কয়েক-দিন যাবত আমার গৃহে নাই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ৬।৭ দিন অন্তর্দ্ধান হইয়া আবার হাজির হয়। বাড়ীতে খবর করিয়া দেখি ভূত আসিয়াছে কিনা, তার পর অপনারা যাইবেন।" আমরা ভাবিলাম রাধানাথ বাবু এই সুযোগে বাড়ীতে খবর দিয়া আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া পরদিন লইয়া যাইবেন। আমরা বলিলাম "যাই হউক, আমরা আজ যাইবই।" যখন তিনি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে কহিতে লাগিলেন তখন বুঝিলাম কথা ঠিকই।

বাড়ীতে সেই মুহূর্ত্তেই লোক পাঠাইলেন। পরদিন প্রাতে লোক আসিয়া কহিল "ভূত এখন নাই, আমি বাড়ীর চারিদিকে অনেক ডাকা-ডাকি করিয়া দেখিয়াছি ভূতের কোন সাড়া শব্দ নাই।" এই কথা শুনিয়া আমরা বড় মর্ম্মাহত হইলাম। আমাদের যে আশা ছিল তাহা নির্ম্মূল হইল। আমাদের ভূত দর্শন আর হইল না। আমি অগত্যা আরো ৩।৪ দিন মাতুলালয়ে অবস্থান করিলাম কিন্তু ভূতের কোন তত্ত্ব না পাইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ভূত রাধানাথবাবুর বাড়ীতে ১৩০৫ ও ১৩০৬ সন, এই দুই বৎসর ছিল। এখন ভূত বৎসরে ২।১ বার আসিয়া তাহার গৃহের তত্ত্ব লইয়া যায় মাত্র। কখন সে আসিবে কয়দিন থাকিবে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। এই সকল ব্যতীত আরো অনেক অদ্ভুত কার্য্য এই ভূতের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমরা শুনিতে পাইয়াছি অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার বিদ্যাভূষণ। (ময়মনসিংহ)

পরী স্ত্রী।

মানব-চক্ষের অন্তরালে আবার একটী লোক থাকিতে পারে, ইহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না। এতৎ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছি। পঠদ্দশায় পূজনীয় স্বর্গীয় দাদা (১) মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম,—তাঁহার বাসার অদূরে একটী যুবক চাপরাশী থাকিত। রাত্রিতে সে একদিন বাহিরে আইসে, আর কেহ তাহার সন্ধান পায় না। কতরূপ কল্পিত গল্প সহর-ময় রটিতে লাগিল। অকস্মাৎ একদিন সে স-শরীরে হাজির হইয়া সকল কল্পনা উল্টাইয়া ফেলিল।

সে আসিয়া প্রকাশ করে যে, রাত্রিতে প্রস্রাব করিতে বাহির হইলে একটী রমণী তাহাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করে। সে কোন মতে তাহা না শুনিয়া থাকিতে পারে নাই। যে কত স্থান সেঘুরাইয়া লইল, তাহা সে বলিতে পারে না। টাকীর অন্তর্গত একটী প্রান্তর মধ্যে প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে কয়েকজন পথিক তাহাকে উলঙ্গ অবস্থায় নামাইয়া বস্ত্রাদি দেয় ও একটু সুস্থ করিয়া দেশে ফিরিতে উপদেশ দেয়।

কয়েক দিন পরে সে সকলকে কাঁচা এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতি খাইতে দিত, এবং বলিত যে পরীটা প্রতি রাত্রে তাহার নিকট আসিয়া থাকে ও নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দিয়া যায়। কিছুদিন পরে চাপরাশীটা মারা যায়।

গল্পটী অবাক্ হইয়া শুনিয়াছিলাম এবং দাদা মহাশয়ের মুখে শুনিয়া বেদ-বাক্যের ন্যায় ধ্রুব সত্যই ভাবিয়াছিলাম। বলিতে কি, তদবধি পরী-সম্বন্ধে ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াই রহিয়াছে।

অদ্যকার ঘটনাটী প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট, ইচ্ছা করিলে যে কেহ ইহার তদন্ত করিতে পারেন। সেজন্য আমরা প্রকৃত নামই লিখিলাম।

---

(১) রাইচরণ ঘোষ। ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ইনি যশোহরের গণ্য মান্য উকীল ছিলেন।

ফরিদপুর জেলার মধ্যে কামারখালী নামে একটা প্রসিদ্ধ বন্দর আছে, তাহার নিকটে দেবীগঞ্জ নামক স্থানে জমীদারী কাছারীতে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ধ্রুবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্য করিতেন। এই কাছারীর একক্রোশ দূরে ডুমন গ্রাম। কয়েক ঘর কায়স্থ ব্রাহ্মণ ভিন্ন, কতকগুলি মুসলমানও এখানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কাদের খাঁ নামে একজন মুসলমান বেশ সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিল। তাহার ৭টী পুত্র, সকলেই যুবক ও বিবাহিত।*

সে আজ ১৫ বৎসরের কথা, খাঁ সাহেবের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র-বধূ গৃহে আসিয়াছে। তাহার ব্যবহারে বাটীর সকলেই সন্তুষ্ট। বাটীর কেন, প্রাতবাসীরাও তাহার সুমধুর বাক্যে ও ব্যবহারে মুগ্ধ। একে সুন্দরী, তাহাতে নব-যুবতী, সুতরাং পতিরও অতিশয় প্রিয়।

এই ভাবে ৩ বৎসর গত হইল। হঠাৎ কাদের খার বাটীতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। বাটীর নিকটেই নদী। একদিন ঐ বধূটী একাকিনী নদী হইতে জল আনিল। তাহার কয়েক মিনিট পরে, একজন মেড়ুয়া মাঝি ঘাটে নৌকা লাগাইয়া কাদের খাঁর বাটীতে উপস্থিত হয় ও উক্ত বধূটী কোন্ বাটীর রমণী, জিজ্ঞাসা করে। খা সাহেব তখন ২টী পুত্রের সঙ্গে চটা চাঁচাই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। একজন অপরিচিত ইতর লোকের মুখে সহসা পুরস্ত্রী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে শুনিয়া পুত্র দুটী ত চটিয়া লাল, বৃদ্ধও যে একটু বিরক্ত না হইয়াছিল, এমন নহে। সে রাগের সহিত বলিল—"কেন, কি হইয়াছে? সে আমারই পুত্রবধূ।"

মাঝি। ভালই হইয়াছে! ভাল পুত্রবধূই পাইয়াছ!

একটু বিস্মিত হইয়া কাদের কহিল,—"কেন, ব্যাপার কি?

মাঝি। আর কি? ওটী মানুষ নয়।

---

* কাদের খাঁ মরিতে পারে, কিন্তু ঘটনাটী অনেকে দেখিয়াছে। তাহারা আজও জীবিত আছে।

স্বপ্নেও বোধ হয়, কেহ ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর দৃশ্য অঙ্কিত করিতে পারে না। একটী পুত্র রাগত হইয়া বলিল—"কোথা হইতে পাগলটা আসিল? এত টাকা খরচ করিয়া ভাইয়ের বিবাহ দিলাম, সে এতদিন পরে মানুষ হইল না, তবে কি?"

মাঝি। চটিবেন না, আমি মন্দ করিতে আসি নাই।

এই সময় বাটীর মধ্য হইতে একটু গোলের শব্দ শুনা গেল। সেই বধূটী এই মাঝিকে বাটীতে উপস্থিত দেখিয়া উহাকে দূর করিবার জন্য বলিতে লাগিল।

কেহ কেহ মনে করিলেন—লোকটি বুঝি কোন মন্দ কথা বলিয়াছে। বৃদ্ধ খাঁ বাটীতে না থাকিলে মাঝির পো কিছু উত্তম মধ্যম পাইতেন, সন্দেহ নাই। কাদের খাঁ ভাবিল—বধূকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া মাঝী পিছনে পিছনে কি পাঠান-বাটীতে মাথা দিতে আসিয়াছে? নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু রহস্য আছে ভাবিয়া তাহাকে বসিতে বলিল।

মাঝি। তোমার বউ অনেক দিন মারা গিয়াছে, এটী পরী। ইহাকে না তাড়াইলে তোমার পুত্রটীর জীবনও নিরাপদ নহে। একটু অনৈক্য যেদিন ঘটিবে, সেই দিন নষ্ট করিয়া যাইবে।

কাদের খাঁর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কথাটী অন্তরে স্থান দিতে ইচ্ছা না হইলেও, পুত্রের প্রাণের মায়ায়, প্রতিকার জন্য মাঝিকে অনুরোধ করিল। মাঝি কয়েকটি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বলিয়া চলিয়া গেল। পরদিন এক প্রহরের সময় আসিয়া পরী তাড়াইবে।

বলা বাহুল্য, সতর্ক ভাবে সকলেই দিনটা কাটাইল। বধূটীর প্রতি সকলেরই নজর। আজ যেন সে একটু কেমন চঞ্চল হইয়াছে।

রাত্রি প্রভাত হইল। দলে দলে লোক কাদের খাঁর বাটীতে আসিতে লাগিল। গোপন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও, শব্দ রটিতে বাকি

নাই। গুহ্য কথা এইরূপই হয়। ভালবাসিয়া আমি একজনকে বলিয়া গোপন রাখিতে অনুরোধ করিলাম, সেও অন্যকে ঐ ভাবে বলিল। ফলে এই হয়, অধিকতর দ্রুত কথাটা ছড়াইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছিল।

ভূত ঝাড়াইতে অনেকে দেখিয়াছে। পরীর কীর্ত্তি সুপরিচিত নহে। কাছারী হইতে নায়েব মহাশয়, ধ্রুব বাবু কয়েকজন পাইক সঙ্গে লইয়া কাদের খাঁর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তাহার প্রাঙ্গণে লোক ধরে না। একজন মেড়ুয়া মাঝে বসিয়া, সম্মুখে একখানি আসন, মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে বধূটীকে ডাকিতেছে।

বধূও সহজ পাত্রী নহে। গৃহ মধ্য হইতে নানারূপ কটু কথা বলিতেছে এবং এরূপ ভাবে আজ তাহার মুখ হাসাইতেছে বলিয়া কাঁদিতেছে। আত্ম-হত্যার ভয়ও দেখাইতে বাকি রাখিতেছে না।

সকলের মনেই একটা সন্দেহের তরঙ্গ উঠিয়াছে। এমন বউ কি আর কিছু হইতে পারে? ঘটনাটী মিথ্যা হইলেই যেন একটা ঝড় সরিয়া যায় শেষে মাঝির কপালে যাহা থাকে, হইবে।

মাঝি অটল; কিয়ৎক্ষণ পরে বউ আর ঘরের কোণে থাকিতে পারিল না, আসনে আসিয়া বসিল। মাঝিকে কহিল—"আপনি বিদেশী, আমাকে তাড়াইয়া কি লাভ করিবেন?

মাঝি। আছে বৈকি, এই ছেলেটী ত বাঁচিবে?

বধূ। আমি উহার কোন অনিষ্ট করিব না। উহাকে আমি বড় ভালবাসি।

মাঝি। সে বউটিকে কোথায় রাখিয়াছ?

বধূ। তাহাকে আর পাইবে না। তাহাকে মারিয়া কাদায় পুতিয়া রাখিয়াছি।

মাঝি। দেখাইতে পার?

বধূ। কেন পারিব না? আমাকে ছাড়িবে ত?

মাঝি। তাহা পরে বলিব। এখন দেখাও।

সকলে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নদীতীরে গেল। বধূটী ঘাটের অদূরে শেয়ালার নীচে হইতে একটা কাদামাখা কঙ্কাল উঠাইল।

চক্ষু কর্ণের বিরোধ মিটিল। ছোট বউটীর এমন পরিণাম দেখিয়া সকলেরই কষ্ট হইল।

মাঝি। আর কি সর্ব্বনাশ বাকি রাখিয়াছ? এই মুহূর্ত্তে এ বাটী ছাড়িয়া যাও।

বধূ। কোথায় যাইব? আমি যাইব না।

মাঝি। যাইতে হইবে। সেই অশ্বত্থ গাছে যাইয়া থাক।

বধূ। সে গাছে আর দুইটী আছে। আমার সহিত তাহাদের মিল নাই।

মাঝি। তাহা বলিয়া এখানে আর থাকিতে পাইতেছ না। যাইতেই হইবে।

বধূ। আপনি ক্ষমা করুন। আমি এখানে বেশ সুখে আছি। কাহার অনিষ্ট করিব না।

মাঝি। তুমি দেখিতেছি সহজ পাত্র নও।

এই বলিয়া পুনরায় মন্ত্র-পাঠ করিতে লাগিল। বধূটী তখন মহা ব্যস্ত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে কেমন একভাবে চাহিয়া রহিল ও দেখিতে দেখিতে বায়ুতে মিলাইয়া গেল। বোধ হইল, যেন একটা বায়ুর দমকা সেই বৃক্ষের দিকে বেগে চলিয়া গেল।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিদ্রাবস্থায় দেহী।

পূর্ব্ববারে আমরা দেখিয়াছি, মানবের অভিব্যক্তির উপর কিরূপ তাহার সূক্ষ্ম-দেহের কার্য্যকারিতা, তাহার আকার, বর্ণ ও গঠনপ্রণালী নির্ভর করে। এইবার আমরা দেহীর বা সূক্ষ্ম-দেহাভিমানীর কথা আলোচনা করিব। দেহের পরিবর্ত্তন অপেক্ষা, অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহীর অধিকতর পরিবর্ত্তন হয়। অবশ্য আমরা প্রকৃত আত্মার কথা বলিতেছি না; তিনি স্বভাবতঃ গুণাতীত, তিনি নিত্য মুক্ত; তাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই; তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই।*

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২—২০

[ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না; এবং উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকিবেন না। কারণ ইনি জন্মরহিত, নিত্য (হ্রাসবৃদ্ধি শূন্য), শাশ্বত (অপক্ষয়শূন্য) এবং পুরাণ (পরিণামশূন্য) * * * *]

গীতা যাঁহাকে অধিভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সেই মর বা একজন্মস্থায়ী "অহং"—প্রত্যয়ীর কথা বলিতেছি।† নিদ্রাকালে তিনি

---

* অলৌকিক রহস্য ৩য় ভাগ ৯ম সংখ্যা।

† অলৌকিক রহস্য ৩য় ভাগ ৮ম সংখ্যা।

কিরূপ অবস্থায় থাকেন ? যিনি প্রকৃত উন্নত, তাঁহার সম্বন্ধেই বা কি ? যিনি একেবারে অনভিব্যক্ত, তাঁহার সম্বন্ধেই বা কি ?

সূক্ষ্ম-দেহ পূর্ণরূপে বিকসিত হইলে, নিদ্রাকালে দেহী বা সূক্ষ্ম দেহাভিমানী বা ক্ষর-আত্মা সূক্ষ্ম-দেহ অবলম্বন করিয়া সূক্ষ্ম জগতে সজাগ থাকিয়া তথায় কার্য্য করেন। আবার যে এখন সম্পূর্ণ অনভিব্যক্ত মানব, তাহার স্থূল দেহ যেমন নিদ্রাকালে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে তাহার সূক্ষ্ম-দেহও সেইরূপ সংজ্ঞাহীন চেতনা-বিবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করে ; কেহ যে তাহার অধিষ্ঠাতা আছে, তাহা মনে হয় না এবং কেহ থাকিলেও তাহা তল্লোকের যে কিছু পরিচয় রাখে, তাহা বোধ হয় না। নানারূপ, নয়নমুগ্ধকর, চিত্রশালার বিচিত্র চিত্রে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও অন্ধ সেই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে না। কেন ? যাহার দ্বারা বর্ণ অনুভূত হইবে সেই যন্ত্রের,—তাহার চক্ষুর অভাব বলিয়া। মেঘের গর্জ্জন বা বীণার মধুর মূর্চ্ছনা অশ্বের কর্কশ হ্রেষা বা কোকিলের সুমিষ্ট কূজন, আততায়ীর কঠোর হুঙ্কার বা শিশুর কমনীয় অস্ফুট ধ্বনি বধিরের নিকট যেমন সবই সমান, যেমন কিছুই তাহার অনুভবের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, সেইরূপ অনভিব্যক্ত লোকের সূক্ষ্ম-দেহের বিকাশ হয় নাই বলিয়া সে সূক্ষ্ম লোকের কোন কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি নিদ্রাকালে এতাদৃশ লোকের সূক্ষ্ম-দেহ স্থূল-দেহের ঠিক উপরে কুহেলিকার মত ভাসিতে থাকে। স্পন্দহীন অসাড় সেই দেহ প্রকৃতই যেন স্থূল-দেহের আকারে গঠিত বাষ্পরাশি। তাহার যে কোন অধিষ্ঠাতা আছে, কই তাহাত মনে হয় না। সেই দেহের কোনই সংজ্ঞা থাকে না। দেহী অবস্থিত থাকিলেও তাহার যে কোনও সংবিত্তি আছে, তাহার চিহ্নও দেখা যায় না! সূক্ষ্ম-জগতের নানা দৃশ্য ও শব্দলহরীর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও সেই সমস্ত যে অনুভব

করিবে সেই দেহীর অস্তিত্ব প্রায় উপলব্ধি হয় না। তবে যদি দৈব-ক্রমে কখনও সেই সূক্ষ্ম লোকের কোনও ভাব সে গ্রহণ করিতেও পারে, তাহ হইলেও সেই ভাব, সে স্থূল-মস্তিষ্কে সঞ্চালন করিয়া দিতে পারে না; কারণ যে উপায়ে এইরূপ দেহ হইতে দেহান্তরে ভাব সঞ্চালন সাধিত হয়, সেই কৌশল তাহার জানা নাই বা দেহস্থিত যে যন্ত্রের সাহায্যে এই ক্রিয়া হয় তাহা এখনও বিকসিত হয় নাই। তাহার পর কিয়ৎ-পরিমাণে দেহসংগঠিত হইলেও তাহা দেহীর স্বায়ত্তে আসিতেও কিছু বিলম্ব হয়। নবজাত অপোগণ্ডের হস্তপদাদির উপর যেমন প্রথম প্রথম তাহার কোনও অধিকার থাকে না, ইহারও সেইরূপ হয়। অতএব জাগ্রত হইলে এরূপ লোকের স্বপ্নাবস্থার কোনও অনুভূতি জাগ্রৎ স্মৃতিতে বর্ত্তমান থাকে না।

তবে কি অনভিব্যক্ত বা প্রাথমিক অবস্থার মানব একেবারে স্বপ্ন দেখে না। দেখে ও দেখে না এতদুভয়ই সত্য। নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম লোকে সূক্ষ্ম-দেহ সাহায্যে যে অনুভূতি হয়, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার যে স্মৃতি থাকে, তাহাকেই যদি স্বপ্ন বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এতাদৃশ লোক আদৌ স্বপ্ন দেখে না। কারণ এই মাত্র বলা হইল যে নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম-দেহ সাহায্যে সূক্ষ্ম-লোকে তাহার কোন অনুভূতি হয় না, কখনও হইলেও তাহা স্থূল-মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় না। তবে তাহার আর এক প্রকারের স্বপ্নদর্শন হয়। জাগ্রৎকালে কোনও সময়ে যে সমস্ত চিন্তা সে করিয়াছে, বা যে ভাবরাশি তাহার স্থূল মস্তিষ্কের কোনও দিন বিষয়ী-ভূত হইয়াছে, এখন অবশ্য জাগ্রৎকালে তাহাদিগের কোনও স্মৃতি নাই,—হয়ত এখন নিদ্রাকালে কোনও উত্তেজক কারণে (তা সে কারণ আন্তরিকই হউক বা বাহ্যই হউক,)—তাহার স্থূল মস্তিষ্কে তাহারা একটা ভাব অঙ্কিত করিয়া দেয়। এই স্বপ্নদর্শন ব্যাপারে সূক্ষ্ম লোকের সহিত কোনই সম্বন্ধ

নাই বা সূক্ষ্ম-দেহাশ্রয়ী দেহাভিমানী স্থূল মস্তিষ্কে সঞ্চালিত করিয়াও ইহাকে দেয় নাই ; কিন্তু মানব ভাবে যে সে প্রকৃতই স্বপ্ন দেখিতেছিল।

আমরা দেখিয়া আসিলাম, নিদ্রাকালে কাহার চৈতন্য সূক্ষ্ম-দেহে সজাগ থাকিয়া সূক্ষ্ম জগতের নানাবিষয় উপভোগ করে, কাহারও বা সূক্ষ্ম-দেহে কোনও চৈতন্যের চিহ্ন অবধি উপলব্ধ হয় না,—যেমন স্থূল শরীর নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া অচেতন ভাবে থাকে, সূক্ষ্ম-দেহও তদ্রূপ থাকে। কেহ সূক্ষ্ম-দেহ সাহায্যে তাহার যাহা কিছু অনুভব তৎসমস্ত স্থূল মস্তিষ্কে সঞ্চালিত করিয়া দেয় ; কেহবা এখনও তাহা করিতে পারে না। পূর্ণজ্ঞানে সূক্ষ্ম লোকে কার্য্য করিতেছেন, অবশ্য এইরূপ উন্নত লোক বিরল ; এবং সূক্ষ্ম-লোকে যাহা যাহা অনুভব করিতেছেন বা বোধ করিতেছেন তৎসমস্তই পূর্ণ ও অটুট ভাবে জাগ্রৎ চৈতন্যে আনয়ন করিতেছেন, এইরূপ সাধক আরও বিরল। কারণ নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম-লোকে যে সমস্ত অনুভব হয়, জাগ্রৎ স্মৃতিতে তৎসমস্ত আনয়ন করা অতি সহজ ব্যাপার নহে। মনে করুন সূক্ষ্ম-লোকে কোনও একটি বিষয় আপনি অনুভব করিলেন, আপনার উচ্চতর চৈতন্যের কিছু আভাস পাইলেন! আপনি ইচ্ছা করিলেন যে এই জ্ঞানটি আপনার জাগ্রৎ চৈতন্যের বিষয়ীভূত করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে আপনার এই ভাবটি আপনার স্থূলতর মস্তিষ্ক সঞ্চালিত করিতে যাইলেন। কিন্তু তাহা করিতে গিয়া আপনি কি দেখিবেন! দেখিবেন আপনার স্থূল-মস্তিষ্ক (etheric brain) নানারূপ চিন্তায় পরিপূর্ণ। এই একটি চিন্তা-তরঙ্গ আসিতেছে, এবং তাহা যাইতে না যাইতে আবার একটি। এইরূপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ আপনার স্থূল মস্তিষ্ককে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। এই অনন্ত চিন্তা প্রবাহের বিরাম নাই, অন্ত নাই। আমরা পূর্ব্বে ইহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।* কিন্তু এই চিন্তা

* অলৌকিক রহস্য চতুর্থভাগ—২২২, ২২৩ পৃঃ।

প্রবাহের অবরোধ না করিলে ত সূক্ষ্ম-লোকের ভাবটি স্থূল মস্তিষ্কে সঞ্চারিত করিতে পারা যাইবে না। অতএব আপনাকে পূর্ব্বে এই চিন্তা প্রবাহকে সংহত করিতে হইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে আপনার এই ভাবটি অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। এই কার্য্য অতি সহজ ব্যাপার নহে। চিন্তা সংযম একাগ্রতা ইত্যাদি কার্য্যে পূর্ব্ব হইতে অভ্যাস থাকা চাই ; তাহা না হইলে উচ্চতর জ্ঞানকে জাগ্রৎ চৈতন্যের বিষয়ীভূত করা যায় না। সাধারণ মানব ইহা করিতে পারে না বলিয়া, জাগ্রত হইলে যে স্মৃতি তাহাদিগের থাকে, তাহা অসংবদ্ধ, তাহাতে ক্রম বা পারম্পর্য্য থাকে না। নিদ্রাকালে তাহারা ভাবে যে, জাগ্রত হইয়া কত কথাই তাহারা স্মরণে রাখিবে, কিন্তু জাগ্রত হইয়া সে সমস্ত কিছুই স্মরণে আনিতে পারে না।

জাগ্রত হইয়া নিদ্রাবস্থার সমস্ত অনুভূতি বিস্মৃত হওয়া একটা অল্প আক্ষেপের বিষয় নয়। কারণ, নিদ্রাকালে এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান হয়, যাহা জাগ্রৎকালে যদি স্মরণে থাকে তাহা হইলে আমাদিগের অনেক উপকার সংসাধিত হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় হয়ত অর্থাভাবে কেহ নানা দেশ পর্য্যটন করিতে পারে না, প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডারে যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য রাশি লুকান আছে, তাহা উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু নিদ্রাকালে স্বপ্নে অর্থাভাব রূপ অন্তরায় নাই। মানব নিত্য হয়ত কত নূতন নূতন স্থানে ভ্রমণ করে নিত্য কত নূতন নূতন শোভা সন্দর্শন করে, জাগ্রৎ কালে যে আশা মিটিবার নয়, নিদ্রাকালে সে সাধ মিটে। দুঃখ কেবল, জাগ্রৎকালে তাহা স্মরণে থাকে না। স্বপ্নে বন্ধুতে বন্ধুতে মিলন হয় ; প্রেমাস্পদের সহিত সদালাপ হয়। পুত্রহারা মাতা, মৃত পুত্রকে হয়ত দেখিতে পায়, হয়ত আবার আদর করিতে পারে, হয়ত পরস্পর ভাব বিনিময় করে। বিরহিনী বিধবা মৃতপতির সমীপে হৃদয়ে গোপনে রক্ষিত অনন্ত প্রেমের উৎস নিত্য ছুটায়! কিন্তু হায় কিছুত সে জাগ্রৎ চৈতন্যে

জানিতে পারে না! মানবের যদ্যপি এই স্মৃতি অটুট থাকিত, তাহা হইলে জগতের অর্দ্ধেক দুঃখ হ্রাস হইয়া যাইত। মৃত্যু এই শব্দ মানব ভাসা হইতে লোপ পাইত। আমরা মৃত ও প্রবাসী আত্মীয় বন্ধুর সহিত নিদ্রাকালে মিলিত হই, কেবলি কি তাই! আমাদিগের অপেক্ষা যাঁহারা অধিকতর জ্ঞানী, তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা অনেক সন্দেহের মীমাংসা করিয়া লই বা হয়ত বিপদের সময় উদ্ধারের উপায় জানিয়া লই। আবার হয়ত অন্যদিকে, আমাদিগের অপেক্ষা অল্প জ্ঞানী যাহারা, তাহাদিগের অনেক সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিই। হয়ত দুর্ব্বল যাহারা তাহাদিগের সহায় হইয়া থাকি; হয়ত বা সময়ে সময়ে মহাপুরুষদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়; হয়ত তাঁহাদিগের কৃপায় আমাদিগের জীবনে নূতন স্রোত প্রবাহিত হয়। আবার হয়ত আমাদিগের সহিত অমানুষী জীবনিচয়ের সাক্ষাৎ হয়। প্রকৃতই দৈত্য দানব, গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ ইত্যাদির অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। অবার হয়ত কখনও কখনও দেব-দর্শনও অদৃষ্টে ঘটে, এবং তাঁহাদিগের সংস্পর্শে ও অনুকম্পায় আমাদিগের বিপুল কল্যাণ সাধিত হয়।

অতএব নিদ্রাকাল মানব জীবনের অমূল্য সময়ের বৃথা অপচয় নহে। আমরা জাগ্রৎকালের মত নিদ্রাকালে অনেক কার্য্য করি, অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করি। বস্তুতঃ নিদ্রাকালে আমাদিগের অধিক কার্য্য করা সম্ভব, কারণ জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রাবস্থায় আমরা অধিক স্বাধীন। যাহারা সম্প্রতি পরলোকে গিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তি অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। পৃথিবীস্থ লোকের উপরও তাহাদিগের অনেক কার্য্য, পীড়িত লোককে সান্ত্বনা দান, সত্য অনুসন্ধিৎসুকে সত্যলাভের উপায় প্রদান, শোকাভিভূতের শোকদূর করণের চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা চেষ্টা করিলেই, সাধনা করিলেই এইরূপে আমাদিগের নিদ্রাকাল সার্থক

করিতে পারি। আমাদিগের জীবনের একচতুর্থাংশ, কার্য্যপূর্ণ করিতে পারি। সময়ে একচতুর্থাংশ হইলেও কার্য্যকারিতায় ইহা জাগ্রৎকাল অপেক্ষা অনেক গুণ বড়। কারণ কাল এবং দূরত্ব (time and space) জাগ্রৎকালের এই যে দুইটি মহা প্রতিবন্ধক, নিদ্রাকালে, তাহাদিগের কোনই শক্তি দেখা যায় না। আমরা নানা উদাহরণের সহিত এই সত্যের পর বারে আলোচনা করিব। তাই বলি, আসুন আমরা সকলে নিদ্রিতকাল সার্থক করি, মধুময় করি এবং নিদ্রিতকাল মধুময় করিয়া জাগ্রৎকালকেও শান্তিময় সুধাপূর্ণ করি। কিন্তু একটা জিনিষ যেন মনে থাকে, নিদ্রিতকাল সার্থক করিতে হইলে জাগ্রৎকাল অগ্রে সার্থক করা চাই। নিদ্রিতকাল মধুময় করিতে হইলে, সৎচিন্তা চিত্ত সংযম ইত্যাদির সাধনা করা চাই।

ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

"ছায়া না কায়া"

আমাদের মনে যে প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকায় স্বজাতির সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা হয় তাহারই নাম "আসঙ্গলিপ্সা"। প্রায় জীব মাত্রেরই এই ইচ্ছার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য জাতির মনে এই ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাতেই পৃথিবীতে সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যের মনে আসঙ্গলিপ্সা না থাকিলে কখনই এপ্রকার সমাজের সৃষ্টি হইত না,

এবং মানব জাতি সভ্যতার উন্নতি সহকারে আপনাদের অবস্থার এতদূর উন্নতি সাধন করিতে পারিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মনুষ্যজাতি এই প্রকার সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস না করিলে কোন রূপেই সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইত না। আধুনিক সভ্য জগতে অনেক শিক্ষিত লোক আছেন, যাহারা প্রেতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহাদের বিশ্বাস প্রেত বলিয়া কোন কিছু নাই তাঁহাদের ধারণা উহা মানবের ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র।

অনেক সময় দেখা যায় বাসনা-গ্রস্ত জীব এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিবার সময় সংসারের মায়া ছাড়িতে পারে না। এমনও দেখা গিয়াছে যে মানব মৃত্যুর পর আবার নিজ দেহ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। জীবিতাবস্থায় যে যাহাকে ভালবাসে, মৃত্যুর পরও সে তাহার মায়া ছাড়িতে পারে না, এমন কি সুবিধা পাইলে তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। আমার বিশ্বাস, জীবিতাবস্থায় তাহার প্রতি অত্যধিক ভালবাসা প্রযুক্তই হউক, অথবা আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্যই হউক মানব এই ক্ষণভঙ্গুর দেহত্যাগ করিবার পরও সংসারের মায়া ছাড়িতে পারে না।

কয়েক বৎসর গত হইল এই সুবিস্তৃত বহুজনপূর্ণ কলিকাতা সহরে একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সিমুলিয়ার অন্তর্গত নন্দকুমার চৌধুরীর লেনস্থ ২৯।২ নং ভবনে এক ভদ্র গৃহস্থ বাস করিতেন। উক্ত বাটীর পার্শ্বে প্রসন্ন নামে এক বারাঙ্গনা বাস করিত।......বাবুর স্ত্রীকে প্রসন্ন বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছিল, সুতরাং বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার উপর তাহার আন্তরিক ভালবাসা হইতে থাকে।...বাবু অনেক দিন হইতে উক্ত স্থানে বাস করিতে ছিলেন। প্রসন্ন...বাবুর স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসিত। এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইলে পর কালের

করাল গ্রাসে প্রসন্ন একদিন মানবলীলা সংবরণ করিল। তাহার মৃত্যুর পর হইতে তাহার বাটীতে সর্ব্বদাই চাবিবন্ধ থাকিত। ইহার কিছুদিন গত হইলে পর, পাড়ার লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, প্রসন্ন প্রেতিনী হইয়াছে, কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমি তাহাকে ছাদের উপর চুল শুকাইতে দেখিয়াছি, কেহ বলিল আমি সন্ধ্যার সময় তাহাকে ছাদের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। একদিবস···বাবু সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ গোধূলির সময় কার্য্যস্থল হইতে আসিয়া বাটীতে প্রবেশ কালীন দেখেন, উক্ত প্রেতিনী মূর্ত্তি সাদা ধপ্ধপে কাপড় পরিয়া ছাদের আলিসার উপর বসিয়া রহিয়াছে। ··বাবু তাহাকে ঐরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বাটীস্থ সকলের নিকট বলিলেন যে "হ্যাঁগা, প্রসন্নর ত সেদিন মৃত্যু হইয়াছে; সে জীবিতাবস্থায় যেরূপ ভাবে ছাদের উপর বসিয়া থাকিত, আমি আজ এই মাত্র তাহাকে ঠিক সেইরূপ ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া বাটীস্থ সকলে একটু শঙ্কিত হইলেন। ইহার পর হইতে প্রত্যহই কি সন্ধ্যা, কি দিবা, সকল সময়েই উক্ত প্রেতাত্মা উহার খালি বাড়ির মধ্যে বিচরণ করিত। ····বাবুত উক্ত প্রেতিনী মূর্ত্তি প্রায়ই দেখিতে পাইতেন। যখন বাটীতে বেশী লোক জন না থাকিত, তখন উক্ত প্রেতাত্মা নিজ কলেবর ধারণ করিয়া···বাবুর স্ত্রীকে পর্য্যন্ত দেখা দিত। বাটীস্থ সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন বটে, কিন্তু ইহার প্রতিকার কল্পে বিশেষ মনোযোগী হন নাই।

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে পর এক দিন রাত্রে···বাবু বিশেষ কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে গমন করেন; যে দিবস···বাবুর স্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহ বাটীতে ছিল না। সন্ধ্যার সময়···বাবুর স্ত্রী কোন কার্য্য বশতঃ বাটীর নিচে নামেন, পরে কার্য্য সমাপন হইলে পর আলোক হস্তে উপরে

গিয়া দেখেন, গৃহের দেওয়ালে এক ছায়া মূর্ত্তি, প্রথমে তিনি মনে করিলেন যে তাহার নিজেরই ছায়া হইবে, পরক্ষণেই তিনি তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে উহাত নিজের ছায়া নয়, এ যে প্রসন্নর প্রতিমূর্ত্তি। সাধারণতঃ এরূপ অবস্থায় মানবের মনের ভাব যে কিরূপ হয় তাহা অন্যে ততটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি ভিন্ন বাটীতে আর কেহই নাই, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় তখন তাঁহার মনে আদৌ ভয়ের উদ্রেক হয় নাই, স্থির, ধীর, অবিচলিত নেত্রে চিত্রার্পিতের ন্যায় আলোক হস্তে সেই ছায়া মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কি অদ্ভুত সাহস! কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবে থাকার পর, যখন তিনি দেখিলেন যে ছায়া মূর্ত্তি অচল, অটল, তখন অগত্যা তিনি আলোক হস্তে উক্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্য গৃহে গমন করতঃ ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন।

পর দিবস বাটীস্থ সকলের নিকট ঐ কথা বলায়, সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন, এবং ইহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই ঘটনার পর দিবস হইতেই···বাবুর স্ত্রী সংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, কোন কিছু শরীরের অসুখ নাই, হঠাৎ পেটের ভিতর ভয়ানক যন্ত্রনা হইতে থাকে, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া 'বাপরে মারে' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। বাটীস্থ সকলে স্থির করিলেন যে পেটের অসুখ ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। এই স্থির করিয়া···বাবু কলিকাতার সুবিজ্ঞ ডাক্তার মহারাজ ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পারিবারিক চিকিৎসক ৺নিতাই-চরণ হালদারের নিকট গমন করেন ও তৎ প্রদত্ত ঔষধ আসিয়া তাহাকে সেবন করাইলেন। ঔষধ সেবনের পর দুই একদিন ভাল থাকেন, আবার পূর্ব্ববৎ পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইতে থাকেন। এইরূপ ভাবে কিছুদিন তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকিয়া পরে যখন দেখিলেন যে, ডাক্তারি

ঔষধে কোন উপকার হইল না, অথচ যন্ত্রণা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িতে লাগিল, তখন তিনি ওঝা দেখাইবার সংকল্প করিলেন।

একদিবস আহারাদির পর বেলা দ্বিপ্রহর সময়ে, একজন শিক্ষিত ওঝা ডাকিয়া আনা হইল, ওঝা...বাবুর নিকট হইতে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া উহা প্রতিকার করিবার মানসে নানা প্রকার আড়ম্বর আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ঘটী জল লইয়া ও একটুক্‌রা খড়ি লইয়া নানারূপ প্রক্রিয়ার পর গুন্ গুন্ শব্দে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল ও কয়েক মিনিট পরে...বাবুর স্ত্রীকে নিকটে আসিতে আহ্বান করিয়া বলিল, "দেখুন দেখি এই পাত্রস্থিত জলমধ্যে কিছু দেখিতে পাইতেছেন কি ?......বাবুর স্ত্রী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "এযে সেই মৃত প্রসন্নর প্রতিমূর্ত্তি"। ওঝা পুনরায় বলিল "ভাল করিয়া দেখুন ইহা অন্য কিছু কিনা" তদুত্তরে বলিলেন "আমি স্পষ্টই দেখিতেছি ইহা উক্ত প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কিছুক্ষণ মন্ত্র পাঠ করিয়া ওঝা আবার জিজ্ঞাসা করিল "দেখুন দেখি এখন কি আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন" ? তদুত্তরে বলিলেন "না এখন আর কিছুই নাই"। ইহার পর ওঝা বলিল এখন যান অদ্য হইতে আপনার আর কোন অসুখ হইবে না ; আর এই জলপাত্রটী রাখিয়া দিন, সকালে ও সন্ধ্যার সময় এই জল একটু করিয়া পান করিবেন। এই কথা বলিয়া ...বাবুর নিকট হইতে যে তাহার প্রাপ্যগণ্ডা বুঝিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। ইহার পর হইতে উক্ত প্রেতিনী মূর্ত্তিকে... বাবুর বাটীতে আর দেখা যায় নাই, এবং বাবুর স্ত্রীরও আর কোন ব্যাধি হয় নাই। পাঠক পাঠিকা বৃন্দ এই ঘটনাটি পাঠ করিয়া হয়ত মনে করিতে পারেন যে কলিকাতা সহরে কখন এরূপ ঘটনা সম্ভবিতে পারে না। যাঁহারা প্রেতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তাঁহারা হয়ত মনে করিবেন যে ইহা একটী রঞ্জিত গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৩ শে কার্ত্তিক ৯ই নবেম্বর শনিবার কালীপূজার বিজয়ার দিন আমার নিজের বাটীতে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হয়। আমি সে দিন রাত্রে নাট্যাভিনয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম, সুতরাং বাটী আসিতে রাত্রি অধিক হয়। আমি যখন বাটীতে আসি তখন বাটীর সদর দরজা ভিতর হইতে একটা ছিট্‌কানি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া, এত রাত্রে কাহাকেও জাগরিত করা উচিত নয় এই বিবেচনা করিয়া, একটী চ্যাচারি সংগ্রহ করিলাম, এবং ইহার সাহায্যে অতি কষ্টে দরজা খুলিলাম, ও বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম; পরে পকেটস্থ দেসালাইয়ের সাহায্যে গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া উপরে উঠিলাম, উপরে উঠিয়া দেখি আমার শয়ন গৃহ ভিতর হইতে বন্ধ সুতরাং গৃহাভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিকে ডাকিবা মাত্র আমার মাতা শয্যা ত্যাগ করিয়া আমার দরজা খুলিয়া দিলেন। তখন রাত্রি ২টা কিম্বা ২॥০ টা হইবে। পরে আমি আমার জামা কাপড় ছাড়িয়া শয়ন করিলাম। কিছুক্ষণ নীরবে শয়ন করিয়া থাকিবার পর, আমার নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে গৃহের বাহির হইতে কে সজোরে আমার গৃহ দ্বারে পদাঘাত করিল, ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ থাকায় দরজা খুলিল না আমি বেশ জানিতে পারিলাম যে বাহির হইতে নিশ্চয় কেহ দ্বারে সজোরে পদাঘাত করিয়াছে। আমি একটু বিস্মিত হইলাম ভাবিলাম এতরাত্রে এরূপভাবে কে দরজায় আঘাত করিল? এইরূপ ক্ষণিক চিন্তার পরই বাহিরে কে তাহা দেখিবার জন্য শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেছি, এমন সময়ে আমার আমার মাতা বলিলেন "ওরে দেখ্ ত' বাহির হইতে কে দরজা ঠেলিল?" আমি আলো জ্বালিতেছি এমন সময় দেখা গেল যে পূর্ব্ববৎ দরজা না ঠেলিয়া আমার ঘরের জানালায় ধাক্কা দিয়া খুলিয়া দিল, এবং আমি স্পষ্টই শুনিতে পাইলাম যেন কেহ দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অস্পষ্টভাবে কি যেন

কতকগুলি কথা বলিল ; কিন্তু সে যে কি অস্পষ্ট ভাবে কি বলিল তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আলোক হস্তে গৃহের বাহিরে আসিয়া কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত বাটী খুঁজিলাম কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সদর দরজা বন্ধ আছে কিনা দেখিবার জন্য নিচে গমন করিলাম, সে খানে গিয়া দেখি আমি যেরূপ ভাবে বন্ধ করিয়াছিলাম ঠিক সেইরূপ ভাবেই বন্ধ রহিয়াছে, পরে প্রত্যেক গৃহে গমন করিয়া দেখি সকলেই নিদ্রা যাইতেছে। সে রাত্রে বাটীর আর কাহাকেও না জাগাইয়া পুনরায় নিজ গৃহে আসিয়া শয়ন করিলাম। পরদিবস বাটীস্থ সকলকে এই কথা বলায় সকলে উপহাস করিয়া বলিলেন যে উহা কিছুই নয়, হয়ত তুমি স্বপ্ন দেখিয়া ঐরূপ মনে করিয়াছিলে। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, ইহা কখনই স্বপ্ন হইতে পারে না, কারণ তখন আমি সবেমাত্র বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়া ছিলাম। যখন ইহা সংঘটিত হয় তখন আমি সম্পূর্ণ জাগারিত। আর স্বপ্নইবা কেমন করিয়া বলা যাইবে? কারণ উক্ত সময়ে আমি এবং আমার মাতা উভয়েই জাগরিত ছিলাম ; এবং এই ঘটনাটি আমাদের উভয়েরই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ইহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। এক্ষণে পাঠক পাঠিকা গণের নিকট আমার জিজ্ঞাসা এই যে, গভীর নিশীথে এরূপ ভাবে দরজায় আঘাত কে করিল? ছায়া না কায়া?

শ্রীননীভূষণ শেঠ।

অলৌকিক শক্তি।

বিগত রুষ, জাপান যুদ্ধের সময় সংবাদ পত্রে একটী অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

জাপানী ধীবর ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া সমুদ্র হইতে মাছ ধরিয়া থাকে। মাছ ধরিতে কখন কখন তাহারা তীর ভূমি ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া যায়। এইরূপ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা একদিন সমুদ্র বক্ষে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। সে দিন সমস্ত সাগর বক্ষ ঘন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল! নৌকারোহী তিন জন ধীবর সেই ঘন কুয়াসার অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত হইল।

সেই সাগর তীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে একটি দেবালয় ছিল। দেবালয়ে একজন অতিবৃদ্ধ বৌদ্ধ পুরোহিত অবস্থান করিতেন। তিনি সেই সময়ে উক্ত দেবালয়ে কতিপয় গ্রামবাসীর সহিত দাবা খেলিতে ছিলেন। খেলিতে খেলিতে তিনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং সঙ্গীগণকে ডাকিয়া মশাল জ্বালিয়া সাগর তীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বহুক্ষণ সেই মশাল ধরিয়া রহিলেন। তাঁহার সঙ্গীগুলি বিস্মিত নেত্রে তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণ দেখিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন "যা বাঁচিয়া গেল" এই বলিয়া তিনি দেবালয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

পর দিবস প্রাতে উক্ত তিন জন নাবিক উক্ত দেবালয়ে পূজা দিতে আসিল। সেখানে উক্ত পুরোহিত দেখিবা মাত্র তাহারা বিস্ময় বিমুগ্ধের তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইল। বলিল—"প্রভু আপনিই যে কাল, আমাদের আবেদনে প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সে অন্ধকারে পথ দেখাইয়াছেন।

গ্রামবাসী সেই দিন হইতে তাঁহাকে দেবজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল।

বিজ্ঞাপন।

"অলৌকিক রহস্যের গ্রাহক মহোদয়গণকে আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি, কলিকাতার প্রসিদ্ধ রিচার্ডসন সোসাইটির সুযোগ্য সম্পাদক, বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান সেবক শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী বিএ, বি এল, এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন। অং সং।

অলৌকিক রহস্য।

৭ম সংখ্যা] চতুর্থ বর্ষ। মাঘ, ১৩১৯।

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

এইরূপ শ্রুতি আছে যে, জীব (জীবাত্মা) নিত্য এবং দেহ নশ্বর। প্রাণীশরীর পঞ্চভূতময়, সুতরাং কাল-সহকারে উহা গলিত বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস হয় না। একটী দেহ ত্যাগ করিলে আর একটী আশ্রয় না করিয়া আত্মা যাইবে কোথায়!

মৃত্যুকালে দেহের সহিত দেহস্থিত চৈতন্যের (জীবাত্মার) বিচ্ছেদ হয়। চৈতন্যময় আত্মা জীবদেহে থাকিয়া জীবাত্মা নাম প্রাপ্ত হয় ও যতদিন নশ্বর দেহের সহিত সূক্ষ্ম চৈতন্য স্বরূপ আত্মার মিলন থাকে, ততদিন জীব-দেহ রক্ষিত পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় এবং জীব, জগতে জীবিত থাকিয়া কার্য্য করে। গীতায় আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা আছে। মহাভারতে জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে এই উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।—

"ন জীবনাশোঽস্তি হি দেহভেদে,
মিথ্যৈতদাহুর্ম্ম্রিয়তীতি মূঢ়াঃ।
জীবস্তু দেহান্তরিতঃ প্রয়াতি,
দশার্দ্ধতৈবাস্য শরীর ভেদঃ॥

অর্থাৎ,—দেহ নাশ কালে জীবের বিনাশ হয় না; কিন্তু "মৃত্যু হইল" এই অমূলক কথা কেবল মূর্খেরাই কহিয়া থাকে, জীব দেহ হইতে অন্তর্হিত হইয়া দেহান্তরে গমন করে; তাহাই পঞ্চত্ব বলিয়া অভিহিত হয়।

এই লিঙ্গ শরীর দ্বারা জীব স্বর্গ বা নরক ভোগ করে। যতদিন জীবের মুক্তিলাভ না হয় ততদিন এই লিঙ্গ শরীরের বিনাশ হয় না। শিবগীতায় মুক্তির এইরূপ সংজ্ঞা আছে—

"ইদং লিঙ্গশরীরাখ্যমামোক্ষান্ন নিবর্ত্ততে, ইত্যাদি"

অর্থাৎ—যখন আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, তখন অবিদ্যা ও স্থূল শরীরের সহিত লিঙ্গ শরীরও ধ্বংস হইয়া থাকে। সেই সময়ে আত্মা পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থিত হন। ইহারই নাম মুক্তি।

সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সংসারে জীবাত্মা আপনার মন নামক সূক্ষ্ম মূর্ত্তির সহিত সর্ব্বদাই যুক্ত থাকে। সেই মনই যখন প্রাপ্তদেহে কর্ম্ম ভোগ করে, তখন সেই দেহত্যাগে মন-সংযুক্ত জীব অন্য দেহ লাভ করিয়া পূর্ব্বকর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভাগবত পুরাণের এই শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

"যে নৈবারভতে কর্ম্ম তেনৈবামুত তৎপুমান্।
ভুঙ্‌ক্তেহব্যবধানেন লিঙ্গেন মনসাস্বয়ং ॥"

ভাগবত পুরাণ। ৪।২৯.৬০

অর্থাৎ—জীব ইহলোকে যে দেহ দ্বারা কর্ম্ম করে, পরলোকে সে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়াই কর্ম্মের ফল ভোগ করে। স্থূলদেহ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু মন প্রধান লিঙ্গদেহ দ্বারাই কর্ম্মফল ভোগ করে।

স্বপ্নকালে জীব যখন ইন্দ্রিয় বৃত্তি রহিত হইয়াও জাগ্রদবস্থাকৃত কর্ম্ম মনের দ্বারা ভোগ করে, তখন মৃত্যুকালে এই স্থূলদেহ ত্যাগে অপর কোন দেহে যে পূর্ব্বকর্ম্ম সেই মনোদ্বারাই ভোগ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই জীবের দেহ

হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে। জীব আপনার মনোদ্বারা বিষয় বাসনা বশতঃ "এই আমি" এবং "দারাপত্যাদি আমার" ইত্যাদি রূপ যে ভাবনা করে পরদেহগত অভিমানী মন সেই পূর্ব্বসংস্কারানুরূপ কর্ম্ম সকল উৎপাদন করে এবং সেই কর্ম্মানুসারেই জীবের পুনর্জন্ম হয়।

এখন দেখিতে হইবে, কর্ম্মানুসারে জীবের সত্যসত্যই পুনর্জন্ম আবশ্যক হয় কি না। জ্ঞানিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমাদিগের ইহজন্মের অনুভব সকল পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না। বাস্তবিক কথাই তাই। তাহার যুক্তি এই—যে বস্তু এই দেহ দ্বারা কখন অনুভূত, দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, সে বস্তুর যে কি রূপ ও কি স্বরূপ, তাহা আমরা মনোমধ্যে কল্পনায় অনুভব করিতে পারি না। মন এমন একটী পদার্থ যাহা অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অননুভূত কোন বিষয়ই অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমান দেহে মনোমধ্যে এমন অনেক কার্য্য প্রকাশ পায়, যাহা ইহজন্মে কখনই প্রত্যক্ষ হয় নাই। অতএব পূর্ব্বজন্মে আমাদিগের তাদৃশ অনুভব অবশ্যই ছিল; সুতরাং আমাদের দেহও ছিল।

শুভকর্ম্ম শুভ বাসনা হইতে জন্মে। মন্দকর্ম্ম অশুভ বাসনা হইতে জন্মে। আবার, শুভ কর্ম্মের ফল শুভ বা সুখ, এবং মন্দ কর্ম্মের ফল অশুভ বা দুঃখ। সুতরাং শুভাশুভ কর্ম্ম হইতেই জীব সুখ দুঃখ পায়। পুরাণাদিতে যে স্বর্গের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, শুভ কর্ম্মের ফল সুখ সেখানে ভোগ হয়, এবং অশুভ কর্ম্মের ফল দুঃখ, নরকে ভোগ হয়। সুতরাং জীবের শুভকর্ম্ম-অনুষ্ঠানে স্বর্গবাস এবং নিন্দিত অশুভ কর্ম্ম-করণে নরকবাস, যুক্তিসিদ্ধ। ইহজগতে যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে তাহার ফল পাইবার জন্য যথাযোগ্য স্থানে গমন করিবে। কারণ জীবের ঊর্দ্ধগতি বা অধঃগতি তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের উপর নির্ভর করিতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মনুষ্যজীবন যতই অল্প হউক না কেন, বিবিধ প্রকার সুখভোগ করিতে কিছুই ব্যাঘাত জন্মায় না। দুর্বৃত্ত দস্যু জীবনের ৫০ বর্ষ কাল দস্যুবৃত্তি করিয়া যদি দোল দুর্গোৎসব করিয়া যায়, তবে তাহার অত্যাচারের ফল ভোগ আর কবে করিবে? লম্পট যদি জীবনের ৩০ বৎসর কাল অবৈধ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিল, পাপের ফল পাইবার ভয় তাহাকে সর্ব্বদা আকুলিত করিবার অবসর পায় কৈ? মানুষ নিজ জীবনকে খুব দীর্ঘ মনে করে, এবং চিন্তা করে, পাপ করিয়া পুণ্য করিলে, জমা খরচ হইয়া যায়,—দস্যুবৃত্তিও করিব এবং পাপ দূর করিবার জন্য প্রত্যহ কাঙ্গালী বিদায় করিব—এই মারাত্মক রোগ জীব-সাধারণকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়া আছে। পাপকে পাপ মনে না করা, "মনকে চোখ্ ঠেরা," মনুষ্যত্বের ঘোর বিকার। এই বিকার রোগ দূর করিতে সবিশেষ যত্ন না করিলে মনুষ্যলীলা যন্ত্রণাময় হইয়া ধ্বংসের পথে যাইবে সন্দেহ নাই।

স্বাভাবিক গতিতে সৎকর্ম্ম হইতে ভাবী শুভ বাসনা বা সংস্কার জন্মে। এই জন্মে সৎকার্য্যে মনসংযোগ করিলে, মনে সৎকর্ম্মের কতকগুলি ভাব থাকিয়া যায়। গ্রামোফোন রেকর্ডে যেমন বিন্দু বিন্দু দাগ থাকিয়া কোন একটী শব্দের অস্তিত্ব সূচনা করে, সেইরূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের পর মনে সেই কর্ম্মের ভাবের একটা প্রতিবিম্ব পড়িয়া যায় ও সূক্ষ্মভাবে মানব-প্রকৃতিতে মিশিয়া থাকে। ইংরাজী কাব্য দর্শনে এই সত্যটী আছে—"Mind becomes that which it contemplates."—অর্থাৎ মন যে বিষয় ভাবে, সেইরূপই হইয়া উঠে। যাহার যত বেশী এইরূপ ভাব মনোমধ্যে সঞ্চিত থাকে, তাহার মন তত সেই ভাবে বাড়িয়া উঠে। অবশেষে মন সেই ভাবময় হইয়া উঠে ও এ দেহ ছাড়িলেও সংস্কার রূপে লিঙ্গ দেহে বা সূক্ষ্ম শরীরে দেহান্তরে গমন করিয়া সংস্কার বশীভূত হইয়া সেই ভাবের

অনুকূল কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং মানুষ নিজেকে ভাল বা মন্দ যেমন করিয়া এ জীবনে গড়িবে, পরলোকে তাহার জের চলিবে—ক্রমবিকাশ হইবে। সেইজন্য সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ মনীষিগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীবের ভালমন্দ বাসনা ইহজগতে অপূর্ণ থাকিলে পরলোকে তাহার পূরণের বলবতী চেষ্টা হয়। বাস্তবিক একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মানবের অস্তিত্ব কেবল কতকগুলি বাসনা লইয়া। যে জীবের মধ্যে কোন বাসনা নাই, সে ত জড়। নির্ব্বাণপ্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ, বাসনার লোপ না হইলে হয় না। সেইজন্য সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"বাসনাতে দাও আগুন জেলে।"

অতএব পুরাণের এই সিদ্ধান্ত সহজেই অনুমেয় যে, জীব একমাত্র শুভ-কর্ম্ম প্রভাবে দেবত্ব, শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে, এবং নিরয়গামী পাপাত্মা নিরবচ্ছিন্ন অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং মনুষ্য—জন্মপরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মবীজ সম্ভার সঞ্চয় করতঃ পুনরায় সঞ্জাত হয়, এবং পুণ্য কর্ম্মকারী পুণ্য-যোনি ও পাপ-কর্ম্মকারী পাপ-যোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কর্ম্মের প্রভাব কিরূপ তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে একটী শ্লোক লইতেছি,—

"স্বকর্ম্মনা চ শক্রত্বং ব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মনা।
স্বকর্ম্মনা সুখী দুঃখী সেব্য সেবক এব চ॥
কর্ম্মনা শিবিকারোহো রাজেন্দ্রশ্চ স্বকর্ম্মনা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। ৪।৪৭।১২৬

অর্থাৎ জীব স্বীয় কর্ম্মযোগে ইন্দ্রত্ব লাভ করে, কর্ম্মযোগে জীব ব্রহ্মার পুত্ররূপে সমুৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মযোগেই জীব সুখী দুঃখী, সেব্য বা সেবক হইয়া কাল যাপন করে। এমন কি স্বীয় কর্ম্মযোগে কোন কোন জীবকে শিবিকা বহন করিতে হয়, এবং কোন কোন জীব কর্ম্মযোগে নৃপেন্দ্র হইয়া সেই শিবিকারোহণে গমন করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ, বি, এল্।

কলেজের ভুত।

ইঞ্জেল সাহেব অল্পদিন হইল ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অযোধ্যায় আসিয়া ডাক্তারী করিতেছে।

ইঞ্জেলের জন্মস্থান মান্দ্রাজ, কিন্তু বাল্যাবধি কলিকাতায় বাস করিয়া তাঁহার আদব কায়দা সমস্তই বাঙ্গালা ধরণের হইয়া গিয়াছে।

পৌষ মাস! দারুণ শীতের সময়, তাহাতে আবার হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছে। অল্প অল্প মেঘ করিয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর; আকাশে শুক্লা চতুর্দ্দশীর চন্দ্র যেন শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কৃষ্ণ কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিতেছে। মাঝে মাঝে নক্ষত্র গুলি দূরস্থিত প্রদীপের মত মিটী মিটী জ্বলিতেছে।

ইঞ্জেলের বাটীর সম্মুখে এই সময়ে এক খানি ভাড়াটীয়া গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে একটি লোক নামিয়া দরজার নিকট আসিয়া ডাকিল "ডাক্তারসাহেব।"

ইঞ্জেল তখন সুন্দর গরম বিছানায় নেটের মশারির ভিতর সাদা ধবধবে অড়লাগান বিলাতি কম্বল গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল।

যেন সে তাহার জন্মভূমি মান্দ্রাজে গিয়াছে। বহুদিন পরে আত্মীয় গণের সহিত মিলিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে সে তাহার আদরের ছোট বোন ইভার যে সরলতা মাখা কচি মুখ খানি দেখিয়া গিয়াছিল, এখন আর ইভা সেরূপ নাই। তাহার যৌবন লাবণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইভার সুনীলোজ্জ্বল নয়ন দুইটী লজ্জার হাসি হাসিতেছে। দ্বাদশ বর্ষ পরে সহোদরকে দেখিয়া ইভার স্নেহ সাগর উছলিয়া উঠিল। সে হাসিয়া হাসিয়া কত কথা কহিল, তাহার পালিত মার্জ্জার শিশুটীকে কোলে করিয়া আনিয়া আদরের স্বরে "দাদা, দাদা" বলিয়া ইঞ্জেলকে দেখাইল।

ইঞ্জেলের বিধবা পলিতকেশা জননী এতদিন একপ্রকার পুত্রহারা হইয়াছিলেন। ইঞ্জেল যে আবার মান্দ্রাজে ফিরিবে, তিনি যে আবার তাঁহার স্নেহের রতন ইঞ্জেলকে দেখিতে পাইবেন এ আশা তাঁহার বিন্দু মাত্রও ছিল না। আজ বহুদিনের পর হারাণ মাণিককে ফিরিয়া পাইয়া স্নেহময়ী জননীর বাৎসল্য পূরিত হৃদয় খানি আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। তাঁহার নয়ন হইতে টস্ টস্ করিয়া জল পড়িল। তিনি বলিলেন "আমার নয়ন মণি, আমার হারাণ মাণিক, প্রবাসে দুঃখিনী মায়ের কথা কি একটী বারও মনে পড়ে নাই? হায়! আজ যদি তোমার পিতা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কত আনন্দই না হইত?

ইঞ্জেল পঞ্চমবর্ষীয় বালকের মত দুই হাতে মা'র গলা জড়াইয়া "মা" বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিল।

জানালার ছিদ্রপথ দিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ ওয়াল ল্যাম্পের আলো আসিতেছিল; লোকটী কাহারও শব্দ না পাইয়া সেই জানালায় ধাক্কা দিয়া ডাকিল "ডাক্তার সাহেব!"

দরজার শব্দে ইঞ্জেলের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইল ; নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট কোন বস্তুই সে দেখিতে পাইল না। উঠিয়া বসিয়া জড়িত কণ্ঠে সে বলিল—"কৌন হ্যায় ?"

লোকটী বলিল "বাহিরে আসুন শীগ্‌গির বড় বিপদ মশাই। আমার মেয়ে যায় যায়।"

ইঞ্জেল তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

লোকটী ইঞ্জেলের হাতে একখানি একশত টাকার নোট দিয়া বলিল—"মশাই আমার মেয়ের বড় অসুখ—প্রাণ সংশয় ; একবার অনুগ্রহ করে দেখে আসবেন চলুন।"

ইঞ্জেল ইতিপূর্ব্বে কোনও কালে দুই টাকার অধিক পায় নাই। নোট-খানি দেখিয়া তাহার হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ইঞ্জেল মনে করিল লোকটী যখন আপনা হইতে ১০০৲ দিয়াছে, তখন চাহিলে আরও কিছু পাওয়া যাইতে পারে। সে আম্‌তা আমতা করিয়া বলিল "মশাই, এত রাত্তিরে আমি কোথাও যাই না, তবে যদি কিছু বাড়ান্ ত, না হয় একবার যেতে পারি।"

"আচ্ছা, আপনি ভাব্বেন না, চলুন, আমি আপনাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব।" লোকটী হাসিয়া আরও এক পঞ্চাশ টাকার নোট দিল।

ইঞ্জেল তখন ১৫০ টাকা লইয়া কল্পনায় কতশত সুখ ভোগ করিতে ছিল। সুখ চিন্তায় তাহার প্রাণ কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছিল। সে তখন আপনার কল্পিত সুখ স্বপ্নে বিভোর ছিল, লোকটীর হাসি দেখিতে পায় নাই। যদি দেখিতে পাইত, তাহা হইলে হয়ত একটা গোলযোগ রাধিত। বেচারি ইঞ্জেলের কল্পিত সুখ-ভোগেও ব্যাঘাত জন্মিত। কেননা মরণাপন্ন কন্যার পিতার মুখে হাসি অসম্ভব।

ইঞ্জেল সানন্দে লোকটীর সহিত গাড়ীতে উঠিল।

গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিল।

অল্পক্ষণের মধ্যে গাড়ী সরযূতীরে এক খানি বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহারা উভয়ে গাড়ী হইতে নামিল। লোকটী বলিল "মশাই, আমরা বিদেশ থেকে এসেছি ; লোকজন সঙ্গে আনি নি, বাড়ীটা অন্ধকার ব'লে কিছু মনে করবেন না, আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন।"

ইন্জেল লোকটীর সহিত ভিতরে প্রবেশ করিল।

ক্রমে সেই অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহারা ত্রিতলে উঠিল।

ত্রিতলে আসিয়া লোকটী বলিল "আপনি একটু দাঁড়ান, আমি ওপরে খবর দিয়ে আসি।

এইবার ইন্জেলের মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল। বাড়ীটী ঘোর অন্ধকার। লোক জনের সাড়াশব্দ নাই। ইন্জেলের বুক দুর দুর করিতে লাগিল। সে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, না "হাঁ" না "না" কিছুই বলিল না।

লোকটী চৌতালায় চলিয়া গেল।

প্রায় দশ মিনিটের পর সেই লোকটী পুনরায় নীচে ইন্জেলের নিকট আসিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চৌতালার একটী ঘর দেখাইয়া দিয়া বলিল "যান, ঐ ঘরে রোগী আছে, আমি আসছি।"

লোকটী কোথায় মিলাইয়া গেল। ইন্জেল তখন ভয়ে কাঁপিতেছিল। তাহার পা চলিতেছিল না। সে এক একবার মনে করিতেছিল, থাক্ আর রোগী দেখিয়া কাজ নাই, বাড়ী ফিরিয়া যাই। কিন্তু টাকার মায়া কাটান বড় দায়। কোনও রকমে ইন্জেল চৌতালায় গিয়া ঘরটীতে প্রবেশ করিল। তাহার প্রাণে একটু ভরসা হইল। দেখিল গৃহের এক পার্শ্বে খাটিয়ার উপর একজন লোক আগাগোড়া শাদা চাদরে ঢাকিয়া শুইয়া

রহিয়াছে। একটি ছোট বেতের টেবিলের উপর একটী মোমবাতি জলিতেছে। ইঞ্জেল অনুমানে বুঝিল শায়িত লোকটাই তাহার রোগী। সাহসে বুক বাঁধিয়া ইঞ্জেল খাটীয়ার নিকট গিয়া সাদা চাদর থানি খুলিয়া ফেলিল।

রোগী দেখিয়াই ত ডাক্তার সাহেবের বক্ষের শোণিত শুকাইয়া গেল।

ইঞ্জেল দেখিল বহুকালের পুরাতন কঙ্কালময় একটী শবদেহ। মাংসের লেশমাত্র নাই। কেবল অস্থিগুলি সাজান রহিয়াছে। বিকট দর্শন কঙ্কালময় মূর্ত্তি দেখিয়া ইঞ্জেল ভয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে একেবারে নীচের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইঞ্জেল আর চলিতে পারিল না। তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিল।

উঠানে ইঞ্জেল দাঁড়াইয়া আছে, অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে তাহার মস্তকে এক চড় মারিয়া হাসিয়া বলিল "কি দেখলে ডাক্তার ?"

ইঞ্জেল সবিস্ময়ে পশ্চাতে মুখ ফিরাইল। অমনি পার্শ্বের দিক হইতে কে আবার এক চড় মারিয়া বলিল—"ও, ডাক্তার কি দেখলে ?"

ইঞ্জেল চারিদিক চাহিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিন্তু সে যে চড় খাইয়াছিল, তাহা মানুষের কোমল কর পল্লব হইতে নিঃসৃত বলিয়া বোধ হইল না। তাহার যন্ত্রণায় মাথা ফাটিয়া যাইতেছিল। কোথা হইতে ভীমরবে চারিটী কণ্ঠ বলিতে লাগিল—"ও ডাক্তার কি দেখলে ? কেমন রোগী ?"

ইঞ্জেল মৃত প্রায়। তাহার শক্তি সাহস কোন সুদূর দেশে চলিয়া গিয়াছে।

বিপদের উপর বিপদ ! সর্ব্বনাশ, ও আবার কি ? সিড়িতে থড় থড় শব্দ কিসের ?

ইঞ্জেল পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সিঁড়ী দিয়া সেই কঙ্কালময় মূর্ত্তিটী সেই মোমবাতিটী হাতে লইয়া নামিয়া আসিতেছে।

ক্রমে সেই কঙ্কালময় মূর্ত্তি ইঞ্জেলের সন্নিকটে আসিয়া বাতিটী তাহার মুখের সম্মুখে ধরিয়া বিকট হাসি হাসিয়া বলিল—"ডাক্তার আমায় চেন কি? আমি সেই মেডিকেল কলেজের ভূত! বিষ খেয়ে মরেছিলুম, তুমি আমার শরীরটা ছুরী দিয়ে টুকরো টুক্‌রো করে কেটে ডাক্তারী বিদ্বে শিখেছিলে, পড়ে কি মনে? তখন নির্ভয়ে টেবিলের ওপর রেখে আমাকে কেটে ছিলে, বলেছিলে ভূত কিছু নয়, তবে আজ আমাকে দেখে এত ভয় কেন? মুখে কথাটী নেই যে!"—এই বলিয়া সে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে বাটী কাঁপিয়া গেল।

"কেমন জব্দ! কি মজা!" বলিয়া সে ইঞ্জেলের গণ্ডস্থলে সজোরে এক চড় মারিয়া অন্ধকারের সহিত মিশাইয়া গেল।

কুমারী প্রফুল্লনলিনী ঘোষ।

নর-কঙ্কাল।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় কথিত।

আজ প্রায় বিশ বৎসরের ঘটনা। আমি একজন কাঠের ব্যবসায়ী, এজন্য অনেক দুর্গম স্থানে আমার যাতায়াত আছে। এই কর্ম্ম উপলক্ষে আমি একবার নেপাল তরাই প্রদেশে যাই। এখানে উত্তম কাষ্ঠ পাওয়া

যায়, তাহা সকলেই জানেন। আমি কাষ্ঠ কাটাইয়া কলিকাতায় চালান দিবার মানসে সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য তথায় যাইতেছি। সঙ্গে চারিজন ভৃত্য ও একজন পাচক। তখনকার দিনে ওদিকে রেল হয় নাই। গোরক্ষপুর হইতে ঘোড়ায় বা অন্য কোন যানে যাইতে হইত।

আশ্বিন মাস শেষ হইয়াছে। বর্ষার পরে প্রকৃতিদেবী সদ্যস্নাতা হাস্যময়ী সুন্দরীর ন্যায় মনোমুগ্ধকর বেশ ধারণ করিয়াছেন। যাইবার পথে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রকৃতির সজীবতা দেখিয়া যেন প্রাণে নূতন বল-সঞ্চার হয়। এমন সময়ে আমি গোরক্ষপুর ছাড়িয়া রওনা হইলাম। সন্ধ্যা সমাগতা দেখিলে প্রত্যহ তাঁবু খাটাইয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিতাম; আবশ্যক খাদ্যাদি সমস্তই ভারবাহী অশ্বপৃষ্ঠে লইয়াছিলাম। ইংরাজ রাজ্যের সীমানার মধ্যেই আমার থাকিবার ইচ্ছা, সুতরাং আমি নেপাল দরবার হইতে কোনরূপ পাশ পত্রাদি লই নাই।

প্রথম দিবস পথিমধ্যে এক সুন্দর শিব মন্দির নয়নগোচর হয়। এখানে কয়েকজন হিমাচল গমনোন্মুখ সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা শিবারাধনায় দিন যাপন করিতেছিলেন; পরদিবস গন্তব্য স্থানে যাইবেন। সৎসঙ্গ বহু ভাগ্যে মিলে, এজন্য আমিও সে দিন সেই স্থানেই নিশা যাপন স্থির করিলাম। সেইজন্য শূন্য স্থানে সন্ধ্যাকালে শিবগীত বড় মধুর লাগিল। শুনিলাম সমস্বরে সন্ন্যাসীগণ গাহিতেছেন——

"চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে,
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থ বৈশ্বানরে।
দন্তিত্বককৃত সুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্য সারে হরে
মোক্ষার্থং কুরুচিত্তবৃত্তি মখিলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ॥"

আবার স্তুতিপাঠ আরম্ভ হইল, যোড় করে ঊর্দ্ধমুখে যতিগণ উচ্চারণ করিলেন—

"গঙ্গা তরঙ্গ রমণীয় জটা কলাপং
গৌরী নিরন্তর বিভূষিত বামভাগম্
নারায়ণ প্রিয়মনঙ্গমদাপহারং
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথং ॥"

প্রাণের অনেক নিভৃত জ্বালা যেন ক্ষণেকের জন্য নির্ব্বাপিত হইল। একবার ব্রহ্মচারীদের সহিত আলাপ করিবার বাসনা হইল। চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাঁহারা অত্যন্ত পরিমিত ভাষী, আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে নিশাযাপন করিলাম।

দুইদিন যাত্রার পর তৃতীয় দিবসে আমরা কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইলাম। বন্ধুর পথে চলা সুকঠিন হইল। সে দিবস বেশীদূর যাইতে পারিলাম না। একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের গায়ে তাম্বু খাটাইয়া রাত্রিযাপন করিবার ব্যবস্থা করিলাম। কিছু উপরে আমার তাম্বু খাটান হইল; কিছু নিম্নে আমার ভৃত্যদের জন্য এবং পার্কের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিন দিনের পথ পর্য্যটনে শরীর ক্লান্ত। একখানি ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়া নগ্ন-স্বভাবের সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম। এই স্থান লোকালয় হইতে কিছু দূরে, কিন্তু সঙ্গে লোক থাকায় আমার বিশেষ কোন উদ্বেগ ছিল না। শরীরও বলিষ্ঠ এবং শ্রমসহিষ্ণু ছিল, এজন্য বড় একটা কিছু গ্রাহ্য করিতাম না, কিন্তু এই যাত্রাই আমাকে বিশেষরূপ শিক্ষা দিয়াছিল।

এইস্থানে চেয়ারে বসিয়া থাকিতে থাকিতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। শরীরের কিঞ্চিৎ অবসাদ বোধ হইল—মনে করিলাম যে এখনও আহার করিতে দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে—একটু নিদ্রা যাইলে ক্ষতি কি? এইরূপ মনে করিয়া তাম্বুতে প্রবেশ করিলাম। ক্যাম্প

টেবিলের উপর ভৃত্য আলোক রাখিয়া গিয়াছিল। বাতিটা খুব কমাইয়া দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আশ্বিনের শেষে যাত্রা করিয়াছিলাম। কিছু শীত পড়িয়াছে, আবার পর্ব্বতময় প্রদেশ বলিয়া শীত কিছু বেশী বোধ হইতেছে। ক্যাম্প খাটে শয়ন করিয়া কৃষ্ণবর্ণের একখানি বিলাতী কম্বল গাত্রোপরি টানিয়া দিয়া নিদ্রিত হইলাম!

কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু বুকের উপর একটা ভারবোধ হওয়ায় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ঘুমঘোর যথেষ্ট ছিল; অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে একবার চাহিলাম, কিছু দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু বুকের উপর একটা কিছু চাপান রহিয়াছে ইহা স্পষ্টতর বোধ হইল। একটা দীর্ঘ-শ্বাস আপনা হইতেই আসিল—সজোরে শ্বাস টানিলাম; শরীর কিছু নড়িল—হঠাৎ আমার বুকের উপরও কি যেন একটা পদার্থ নড়িয়া উঠিল। ভাল করিয়া চাহিয়া যাহা দেখিলাম—তাহাতে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া আসিল, কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল, ভয়ে হতচেতন প্রায় হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আলোকটা নির্ব্বাপিত প্রায় ছিল—এই অস্পষ্ট আলোকে এতক্ষণ ভাল করিয়া দেখি নাই—এখন দেখি যে, এক বৃহৎ কৃষ্ণকায় সর্প আমার বুকের উপর রহিয়াছে। সেটা কম্বলের উপর চুপ করিয়া ছিল বলিয়া অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাই নাই। বাহিরে শীত অনুভব করিয়াই হউক বা নরম এবং গরম স্থান পাইয়াই হউক একেবারে আমার বুকের উপর আসিয়া সে বসিয়া আছে। আমি সজোরে শ্বাস লওয়ার সময় তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। সেটা তৎক্ষণাৎ ফোঁস্ করিয়া মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে মাথা দোলাইতে লাগিল। তাহার মুখ আমার মুখের খুব নিকটে, বোধ হইল আমি তাহার তপ্তশ্বাস নিজ মুখের উপর অনুভব করিতেছি। আমার অবস্থা কল্পনা করুন। মনে করিলাম, মৃতের ন্যায় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকি, যদি ভৃত্যদের কেহ কোন

কারণে আইসে তবেই রক্ষা, নচেৎ কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিতে হইবে কে বলিতে পারে ? কেবল মনে হইতেছে বুঝি এইবার দংশন করে।

সর্পরাজ কিছুক্ষণ মস্তক হেলাইয়া দোলাইয়া কি ভাবিয়া আবার কুণ্ডলীকৃত হইয়া স্থিরভাবে শয়ন করিল। আমি কিন্তু এমন অবস্থায় আর থাকিতে পারিলাম না। সময় আর কাটে না, চক্ষে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। ধীরভাবে নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু হস্তপদ বদ্ধ লোকের ন্যায় কোন যুক্তিই সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। ক্রমশঃ আর সহ্য করিতে পারিলাম না, যেন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

হঠাৎ তাম্বুর দ্বার খোলার মত শব্দে চমক ভাঙ্গিল। বড় আশা হইল বোধ হয় কোন ভৃত্য কোন কারণে আসিয়াছে, কিন্তু অনুমতি না লইয়া ত ভৃত্যেরা তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম—অতি সন্তর্পণে তাম্বুর দরজা খুলিতেছে—কিন্তু কে? পরক্ষণেই দেখি কি সর্ব্বনাশ! একটা ভীমাকৃতি নেপালী শাণিত-ছুরিকা হস্তে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে তাম্বু মধ্যে প্রবেশ করিয়া চুপে চুপে এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। আমার আসবাব কিছুই ছিল না। সঙ্গে টাকা কড়ি যাহা আনিয়াছিলাম, তাহা মাথার বালিসের নীচে রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া আমার অভ্যাস ছিল। সেই দস্যু তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ কোথাও কিছু না দেখিয়া আমার শয্যার দিকে অগ্রসর হইল। বাম হস্তে নগ্ন-ছুরিকা বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া সে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিজেকে উপর্য্যুপরি বিপদে পতিত দেখিয়া নিতান্ত নিঃসহায় ভাবিয়া বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে কাতর প্রাণে ডাকিতে লাগিলাম। সম্পদ মানুষকে বড়ই ভুলাইয়া দেয়, বিপদেই সেই দীনবন্ধুকে মনে পড়ে। মহাপুরুষদের এই কথার তাৎপর্য্য আমি সেইক্ষণে যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

কিন্তু আশা একেবারে বিলুপ্ত হইল। বুঝিবা এই কাতর প্রার্থনা জগদীশ্বরের শ্রীচরণে পৌঁছিল। আমি অনন্যোপায়, নড়িবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত নাই—ভয় পাছে সাপে খায়, না হয় দস্যুর হাতে প্রাণ যায়। যে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতেছি, তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। পরে তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু তখন এক মুহূর্ত্ত এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছিল। দস্যুটা ক্রমে আমার মাথার কাছে আসিয়া মুখের উপর শাণিত ছুরিকা খানি ধরিয়া রাখিল এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা এদিক ওদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ অতি সাবধানে বালিশের নীচে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিল। বোধ হয় কিছু না পাইয়া এবং বিলম্বে পাছে কেহ আসিয়া পড়ে এই আশঙ্কায় সে ক্রমশঃ সমস্ত হস্তটা বালিশের নীচে প্রবেশ করাইয়া ছিল। আমার বুকের উপরের সাপ বোধ হয় এতক্ষণ নিদ্রিত ছিল। দস্যুটা সেটাকে অস্পষ্ট আলোকে এবং কৃষ্ণবর্ণ কম্বলের উপর ছিল বলিয়া দেখিতে পায় নাই; নচেৎ সে কখন তাহাকে বিরক্ত করিত না। যাহা হউক দস্যুর হাতের সমস্ত অংশ বালিশের নীচে প্রবেশ করাইয়া দেওয়াতে নাড়া পাইয়া সর্পের নিদ্রাভঙ্গ হইল—ঠিক সেই সময়ে দস্যুটার মুখ আমার মুখের উপর ছিল—ছিল—সুতরাং সম্মুখে দস্যুটার মুখ দেখিয়া সর্প তাহাকেই তৎক্ষণাৎ দংশন করিল।

একটা বিকট চীৎকার করিয়া দস্যু ভয়ে ও যাতনায় তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। সর্প টাও চীৎকার ও গোলযোগে আমার বুকের উপর হইতে নামিয়া পড়িল। আমি কিন্তু বাক্‌শক্তিহীন মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া আছি। দস্যুটার চীৎকার শুনিয়া আমার ভৃত্যবর্গ দৌড়িয়া আসিল। ব্যাপার দেখিয়া কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। বাতিটা ভাল করিয়া জ্বালিয়া তুমি আমাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া মুখে জল দিয়া আমাকে প্রকৃতস্থ

করিল। আমি তৎক্ষণাৎ একজন লোককে নিকটবর্ত্তী গ্রামে একজন চিকিৎসকের অনুসন্ধানে পাঠাইলাম। ইতিমধ্যে আমাদের যতটুকু জানা ছিল সেই মত ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম, যাহাতে সর্পদষ্ট দস্যুটাকে বাঁচাইতে পারি। অন্যান্য ভৃত্য সর্পটার বিস্তর অনুসন্ধান করিল, কিন্তু সেই অন্ধকারে পাহাড়ের মধ্যে আর সেটাকে দেখা গেল না। নিকটস্থ গ্রামে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে একটী ছোট ডিস্পেন্সারি বা চিকিৎসালয় সংরক্ষিত হইত। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এই ডিস্পেন্সারি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে এখানে অনেক লোক চিকিৎসা-অভাবে মারা পড়িত। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের হিতকামনায় এই চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এই কল্যাণকর কার্য্যের ফলে অনেক দরিদ্র লোক অকাল মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। সেই রাত্রিতে সেই সর্পদষ্ট ব্যক্তিটিকে (যদিও সে চুরি করিতে আসিয়াছিল) এই দাতব্য ঔষধালয়ে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু তাহার গণ্ডে এরূপ ভাবে সর্পদংশন করিয়াছিল যে, ৪।৫ ঘণ্টা মধ্যে সে লোকটা মারা পড়ে। আমি এইরূপ অসামান্য বিপদদ্বয় হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবানের নিকট আপনার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম এবং যে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট প্রজাপুঞ্জের মঙ্গল মাত্র কামনায় এরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়াদি পুণ্যকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, সেই গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। আমি এইরূপ বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া তাহার পরদিবস আবার যাত্রা করিলাম। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া নিজের কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম, কিন্তু যে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছি তাহার কথা দিবা রাত্র স্মরণ হইত এবং শরীর যেন কিছু অপটু বোধ হইত। বিশেষতঃ জঙ্গলে বাস করা বড় সহজ নহে। ৫।৭ দিনের মধ্যে আবার কার্য্য গতিকে আমার আড্ডা হইতে ১৫ মাইল দূরে যাইবার আবশ্যক হইল। প্রাতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার মধ্যে ফিরিতে পারিব এই আশায়

লোকজন না লইয়া শীঘ্র আহারাদি সম্পন্ন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করিলাম। কার্য্য শেষে দেখি বেলা অবসান হইয়াছে, সে দিবস আর ফিরিতে পারা যায় না। সেখানে ১০।১২ মাইলের মধ্যে আর জনমানব নাই, কেবল একটী ডাক বাংলা আছে। আমার ন্যায় বিপদে পতিত পথিক ভিন্ন এই ডাকবাংলা জাতীয় চটীর উপকারিতা কে বুঝিবে? যিনি কখন এইপ্রকার দুর্গম পথিমধ্যে এই ভেলাস্বরূপ পান্থশালা দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন ইহার মূল্য কত। আমাদের রাজা এইরূপ পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া যথার্থই পথিকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। যাহা হউক সন্ধ্যার সময় এই ডাক বাংলাতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘোড়াটীকে ফটকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ছাড়িয়া দিয়া ভিতরে গেলাম; দেখি দুইটী ছোট ঘর; মধ্যে একটা দ্বার আছে, দুইটী টেবিল দুইখানি চেয়ার ও দুইখানি তক্তাপোষ আছে, তাহা মাটী হইতে একফুট আন্দাজ উচ্চ। দুইটী আলোকও ছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে ক্ষুধা বোধ করিলাম, সঙ্গে কোন আহার্য্য দ্রব্য নাই। লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না যে জিজ্ঞাসা করি। হতাশ-মনে ভাবিতেছি এরূপ জনশূন্য স্থানে কিপ্রকারে রাত্রি যাপন করিব। এমন সময়ে মনে হইল যে বাংলার বাহিরে আর একটী ক্ষুদ্র ঘর বা পাকশালা আছে, দেখি যদি সেখানে কিছু পাওয়া যায়। দরজায় ধাক্কা মারিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খোলা হইলে এক অদ্ভুত, অত্যন্ত মলিন বেশধারী মানুষ আসিয়া আমায় সেলাম করিল। আমি জানিতে পারিলাম ইনি বাংলার তত্ত্বাবধায়ক, চৌকীদার। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কোন আহার্য্য আছে?" উত্তর পাইলাম যে দিবাভাগে বলিলে মিলিত, রাত্রিতে মেলা কঠিন আমি কহিলাম, "যদি কিছুই নাই তবে তুমি কি খাইবে?" সে কোন উত্তর দিল না, একটা অট্টহাস্য হাসিল, সেই নিশীথকালে

জনশূন্য স্থানে প্রথমে তাহার হাসির শব্দে আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম, যেন ভূতপ্রেতের অট্টহাস্য বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল।

যাহা হউক একান্ত জিদ করায় সে কহিল যে ৩ মাইল দূরে কিছু দুগ্ধের সন্ধান হইতে পারে। আমি পারিতোষিকের লোভ দেখাইয়া তাহাকে তাহাই আনিতে কহিলাম। পারিতোষিকের কথা শুনিয়া সে আবার সেই অট্টহাস্য হাসিল। পরে আলোক লইয়া সে রওনা হইল। আমি তাহার সহিত বাংলার বাহিরে গেলাম এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার আলোক আমার দৃষ্টিগোচর হইল ততক্ষণ বাহিরে রহিলাম। পরে একখানি চেয়ারে বসিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতেছি। এমন সময় হঠাৎ মনে হইল যেন কোন স্ত্রীলোকের হস্তের চুড়ি বা কঙ্কণধ্বনি পাশের ঘর হইতে বাহির হইতেছে। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। পরে মনে করিলাম হয় ত চৌকীদারের স্ত্রী কিম্বা তাহার কোন পরিচিত স্ত্রীলোক এই স্থানে থাকে; সেই আসিয়াছে। এজন্য চুপ করিয়া যেমন ছিলাম তেমনিই রহিলাম। পরে অস্পষ্ট মনুষ্যকণ্ঠ শুনা গেল, যেন দুইজন কথা কহিতেছে। মধ্যে মধ্যে পদশব্দ—যেন লোকজন যাওয়া আসা করিতেছে। আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া পার্শ্বের ঘরে কে আছে দেখিবার জন্য উঠিলাম। উঠিবা মাত্র সব চুপ হইয়া গেল। ছোট ঘর। যে ঘর হইতে শব্দ শুনা যাইতেছিল। সেই ঘরে আলোক পড়িবামাত্র যাহা দেখিলাম, ভগবান করুন যেন আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেরূপ দ্বিতীয় দৃশ্য আর দেখিতে না হয়। দেখিলাম একটী স্ত্রীলোক বেশধারী নরকঙ্কাল! তাহার হাতে বালা এবং পায়ে মল আছে; সে তক্তাপোষের নীচে হইতে তাহার মস্তক বাহির ও দন্তপংক্তি উদ্ঘাটিত করিয়া এক একবার হাস্য করিতেছে, ও তাহার নীচে প্রবেশ করিতেছে, পুনরায় হাসিতেছে ও নীচে প্রবেশ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান তিরোহিত হইল। তাহাকে ৪।৫ বার

ঐরূপ করিতে দেখিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে যেখানে আমার ঘোড়াছিল, সেইখানে আসিয়া বিজন বনে ১৫ মাইল রাস্তা আসিলাম। মনে এত ভয় হইয়াছিল যে, রাত্রিতে বাঘে খায় সেও ভাল, তথাপি এ ঘরে থাকিবনা। পরদিন প্রাতঃকালে থানায় সংবাদ দেওয়াতে তাহারা আমা কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু আমি নিজ ব্যয়ে সেই তক্তাপোষের নীচের মাটী খনন করাইবার অনুমতি পাই। খনন করিতে ৫।৭ হস্ত নীচে একটী বস্ত্র, কঙ্কণ ও মল পরিহিতা স্ত্রীলোকের কঙ্কাল পাওয়া যায়। শুনা যায় সেই চৌকীদার তাহার উপপত্নীকে খুন করে কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহার কিছুই হয় নাই। এই খনন কার্য্যের পর আর কেহ কোন উৎপাত অনুভব করে নাই এবং উক্ত চৌকীদারও সেই অবধি অদৃশ্য হইয়াছে।

শ্রীমনীভূষণ শেঠ।

পুনরাগমন।

খুল্ল-পিতামহ এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন কিন্তু পিতাকে বারম্বার প্রণত দেখিয়া তিনি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এতক্ষণ আমিও নীরব ছিলাম, দাদার কথায় সাহস পাইয়া এইবারে আমি কথা কহিলাম। যদিও নানা কারণে গোপালের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গোপাল কেমন আছে?"

ছোট-ঠাকুরদাদা উত্তর করিলেন—"ভাল নাই। অগ্নি-দগ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইয়াই সে অজ্ঞান হইয়াছিল। সেই অবস্থাতেই গ্রামবাসিগণ তাহাকে পালকী করিয়া আমার কাছে লইয়া আসে। সেখানে গোপালের একবার জ্ঞান ফিরিয়াছিল। সেই সময় সে মায়ের কাছে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। হরিচরণও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। এখানে চিকিৎসা চলিবে বলিয়া সেও গোপালকে এখানে আসিতে অনুরোধ করে। সেইজন্য তাহাকে এখানে আনিয়াছি।

এখানে আসিতে আসিতে তাহার অবস্থার বেশ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তোমার আগমন সংবাদ পাইবামাত্র গোপাল শয্যা ত্যাগ করিয়া পাগলের মত ছুটিয়া আবার নিজের অনিষ্ট করিয়াছে। সেই অবধি আবার সংজ্ঞা হারাইয়াছে। মা গিয়া তাহাকে ডাকিয়াছেন, মাথায় হাত দিয়াছেন ; আমি মায়ের আগমন সংবাদ গোপালকে উচ্চকণ্ঠে শুনাইয়াছি, গোপাল কথা কহে নাই, চোক মেলিয়া চাহে নাই। হরিচরণ অনেক ডাক্তার আনাইয়াছে—তাহাদের ভিতরে দুই একজন সাহেবও ছিল। তাহারা পরীক্ষান্তে বলিয়াছে, উষ্ণবায়ু ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ফুস্‌ফুসে বিষম প্রদাহ উপস্থিত করিয়াছে। সুতরাং গোপালের জীবন রক্ষা অসম্ভব।"

পিতা বলিলেন—"গোপালকে এখানে আনিব কি ?"

দাদা। তোমাকে আনিতে হইবে কেন! গোপাল আপনিই আসিবে। আমি কি হরিচরণের বাড়ীতে রাখিব বলিয়া তাহাকে এখানে আনাইয়াছি! মা সেখানে পঁহুছিয়াই, তাহাকে এখানে পাঠাইবার আদেশ দিয়াছেন। তবে মা কিঞ্চিৎ বিপদে পড়িয়াছেন। মুখুজ্জেমহাশয়ের ভগিনী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন।

এই আকস্মিক বিপদে তাঁহারা—ভ্রাতা ও ভগিনী—মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমার সঙ্গে আসিবার ব্যাকুলতা দেখিয়া আমি তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারি নাই। তিনি এখানে আসিতে কিছু ইতস্ততঃ করিতেছেন। পুত্রবধূকেও সঙ্গে আনিয়াছি। তাহার কুশণ্ডিকা হয় নাই। যদি গোপাল বাঁচে, তবে সে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে। মা সকলকেই এক সঙ্গে আনিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহার মনের কথা, যাহা ঘটিবার এইখানেই ঘটুক। অন্যের গৃহে গোপালকে রাখিয়া তিনি তোমার মানহানি হইতে দিবেন না।

পিতা। তাইত পিতৃব্য, এই অপূর্ব্ব শুভসম্মিলনের দিনে আমরা গোপালকে হারাইব।

দাদা। দামোদরের কি অভিপ্রায় কেমন করিয়া বলিব? তাঁহারই আদেশে গোপাল তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিল। তাহার পর এই ঘটনা ঘটিয়াছে। গোপাল যদি মারা যায়, তাহা হইলে কাহার উপরে অভিমান করিব?

আমি এই কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, উঠিয়া দাঁড়াইলাম; এবং খুল্ল-পিতামহকে ঈষদুচ্চকণ্ঠে শুনাইয়া বলিলাম—"মারা যাইবে কে বলিল?"

খুল্ল-পিতামহ আমার কথা শুনিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ আমার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কি বলিবার জন্য যেন তিনি চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। দেখিয়া বোধ হইল, সন্তান-মায়া জ্ঞানীর বুদ্ধিকেও পরাস্ত করিয়াছে—তাঁহাকে আবৃত করিয়াছে। তিনি আমার আর একটী আশ্বাস বাক্যের প্রতীক্ষায় আমার মুখপানে চাহিয়া আছেন। আমি বলিলাম "কে বলিল গোপাল মরিবে?"

দাদা আশ্বাসের উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"বাঁচিবে ভাই গোপীনাথ, গোপাল বাঁচিবে ?"

কে যেন আমার মুখ হইতে কথা বাহির করিয়া দিল—"নিশ্চয়।"

দাদা আবার দাঁড়াইলেন। আমার নিকটে আসিয়া আমার মস্তকে দক্ষিণ কর স্পর্শ করিয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—"এখন গোপাল বাঁচুক আর মরুক, আর আমার দুঃখ নাই। যে পুণ্যবংশের প্রতিনিধিকে দেখিবার জন্য আমি আকাশপানে চাহিয়া ছিলাম এই আমি তাহাকে মুষ্টিমধ্যে পাইয়াছি। গোপীনাথ! সে প্রতিনিধি তুমি। মহাত্মা রামনিধির সমস্ত মহত্ত্ব আজ তোমাতে অধিষ্ঠিত হউক।"

আমি বলিলাম—"দামোদর কোথায় ?"

খুল্ল-পিতামহ গলদেশে সংলগ্ন এক থলির মধ্য হইতে— কি বলিব—সেই বহুকাল হইতে নারায়ণের লিঙ্গমূর্ত্তিরূপে পূজিত, শিক্ষিতের চক্ষে একান্ত প্রাণহীন, মূল্যহীন, সছিদ্র প্রস্তরগোলক আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। বলিলেন—"গোপাল জ্ঞান হারাইরাও ইহাকে পরিত্যাগ করে নাই। বুঝি তোমার হাতে দিবার জন্য ইহাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়াছিল। ম্লেচ্ছ স্পর্শ করে দেখিয়া আমি অতিক্লেশে ইহাকে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছি।"

"দে দে গোপীনাথ, জল দে।" আমার মস্তকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দামোদরের আবেদন ঝঙ্কারিয়া উঠিল। উঃ! দামোদরের অঙ্গ এত উষ্ণ! আমি আর কোনও দিকে না চাহিয়া, খুল্ল-পিতামহের কথায় কোনও উত্তর না করিয়া ঠাকুরঘরের দিকে ছুটিলাম।

"দে দে গোপীনাথ, পুড়িয়া মরি, জল দে।" গৃহের চারিদিক হইতে অসংখ্য কলরবে যেন ধ্বনি উঠিতেছে। আমি সেই ধ্বনির তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলাম।

গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়াছিলাম কিনা, আমার স্মরণ নাই। গৃহ প্রবেশমুখে জনপ্রাণীকে আমি দেখি নাই। গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পরেও জনপ্রাণী আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি গৃহ ভুলিয়াছি, পিতা খুল্ল-পিতামহ এমন কি গোপালকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছি। শুধু সেই বিরাট বিস্মৃতির মধ্য হইতে মায়ের কথাটা যেন এক একবার জাগিয়া উঠিতেছে। সেই অবস্থায়—এখনও আমার বেশ মনে পড়ে—আমি একটী তাম্রপাত্রে দামোদরকে বসাইয়া, একটী তাম্রঘট গঙ্গাজল পূর্ণ করিতে ছিলাম। ইচ্ছা সেই জলে দামোদরকে স্নান করাইব।

ঘট জলপূর্ণ করিয়া দামোদরের মাথায় ঢালিতে যাইতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কথা উঠিল—"দাঁড়া।" ফিরিয়া দেখি পশ্চাতে গৈরিকা-ম্বরা, ত্রিশূলকরা কপালিনী।

আমি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিলাম। কপালিনী বলিলেন—"মুখপানে কি দেখিতেছ, দাঁড়াও—ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আগে ঠাকুরের মাথায় জল ঢালিবার যোগ্য হও।"

এই এক কথাতেই আমি জল ঢালিতে নিরস্ত হইলাম। কপালিনী একটু দূরে দ্বারসমীপে দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন তাঁহাকে দূরে দেখিলাম তখন মনে হইল তিনি বৃদ্ধা। আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া বৃদ্ধা ধীরে ধীরে আমার সমীপস্থ হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা কি বলিব, তাঁহার পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বয়সও যেন এক এক গ্রাম করিয়া হ্রাস হইতে লাগিল। বৃদ্ধা প্রৌঢ়া হইল, প্রৌঢ়া আবার অপ্রৌঢ়া হইল। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে যেন রাশি রাশি রূপ আসিয়া তাঁহার সর্ব্বদেহ আবৃত করিতে লাগিল। যখন ত্রিশূলটা ভূমি সংলগ্ন করিয়া কপালিনী আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন মনে হইল, যে দেবী সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিত, তিনিই আমার কাছে আসিয়াছেন।

তাঁহার কথার সুরও গ্রামে গ্রামে নামিয়া গিরিশিখরের চিরনির্ম্মম কর্কশতা হইতে শৈলতলস্থা নির্ঝরিণীর আবেগময়ী মধুরতায় পরিণত হইল।

পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই কপালিনী বলিতে লাগিলেন—"আগে নিজে শুদ্ধ হও, তবে ত অন্যের শুদ্ধিক্রিয়ার অধিকারী হইবে!" এই বলিয়াই আমার হাত হইতে তিনি তাম্রঘট গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে এক অঞ্জলি জল গ্রহণ করিলেন, এবং সেই জল মন্ত্রপূত করিয়া আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। আমি এখনও একটী কথাও কহি নাই—তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বিস্মিত নেত্রে কেবল তাহার পানে চাহিয়া আছি! আমাকে তদবস্থ দেখিয়া সন্ন্যাসিনী ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন—"হাঁ করিয়া দেখিতেছ কি? আমি তোমারই মুণ্ডপাত করিতে আসিয়াছি। গলায় পৈতাগাছটা আছে, না সেটাকে জলাঞ্জলি দিয়াছ?" পৈতাগাছটা কখনও শিকায় তুলিয়া রাখিতাম, কখনও মালার আকারে গলায় পরিতাম, কিন্তু অধিকাংশ সময় তাহা অর্দ্ধছিন্ন মলিন বেশে কটীদেশেই সংলগ্ন থাকিত। সেদিন তাহা কোথায় ছিল, তাহা স্মরণে আসিল না। আমি কোমরে হাত দিয়া তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম।

অন্বেষণে বিফল দেখিয়া সন্ন্যাসিনী বলিলেন—"থাক্, আর খুঁজিতে হইবে না, বুঝিয়াছি। নাও, এই কুশোপবীতটা গলায় পর।" এই বলিয়া, ত্রিশূলের মস্তক হইতে তিনি একটা কুশের উপবীত লইয়া আমার গলায় পরাইয়া দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—"গায়ত্রী মনে আছে?"

এতক্ষণ পরে আমি কথা কহিবার অবকাশ পাইলাম। উত্তর করিলাম—"আছে।"

"মনে মনে দশবার জপ কর।"

"আমি সেই কুশোপবীত অঙ্গুলিতে জড়াইয়া জপ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কপালিনী কোথা হইতে কি লইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। জপ শেষ হইলে তিনি নিজেরকমণ্ডলু হইতে জল গ্রহণ করিয়া আমার হস্তে দিলেন; দিয়া বলিলেন—"আমার যজ্ঞের ভার তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, এই কথা বলিতে বলিতে এই জল আমার হস্তে প্রদান কর।" আমি আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলাম। দূর গগণের জলদমন্দ্রকে লাঞ্ছিল করিয়া কপালিনী মধুর গম্ভীরনাদে বলিয়া উঠিলেন—"নমো বৈরাগ্যায়, নমো অবৈরাগায়; নমো ধর্ম্মায়, নমো অধর্ম্মায়; নমো জ্ঞানায়, নমো অজ্ঞানায়।" বলিতে বলিতে অগ্নিতে তিনি বারত্রয় আহুতি প্রদান করিলেন। ক্ষুধিত বহ্নি চারিদিকে লক লক রসনা বিস্তার করিয়া যেন শতমুখে প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

তারপর অসংখ্য মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ যুক্তকরে কপালিনী বলিতে লাগিলেন:—

নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে,
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে,
নমো নমোঽনন্ত মহাবিভূতয়ে,
নমো নমোঽনন্ত দয়ৈকসিন্ধবে।

বলিতে বলিতে ভাবের উন্মেষে কপালিনী বিভোর হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে গৃহ যেন এক অপূর্ব্ব প্রাণে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার চক্ষু হইতে আপনাআপনি জলধারা ছুটিল, সর্ব্বশরীর থাকিয়া থাকিয়া কণ্টকিত হইতে লাগিল। অবশেষে আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। ইত্যবসরে জননী শ্রীকরে সমস্ত ভাবরাশি যেন সঞ্চিত করিয়া আমার মস্তকে অর্পণ করিলেন।"

করস্পৃষ্ট হইবামাত্র এক অপূর্ব্ব মত্ততায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার বোধ হইল, যেন আমার সমস্ত শরীর-যন্ত্র এক নূতন প্রাণের উন্মেষে হৃদয় আসনস্থ কোন অজ্ঞাত দেবতার উদ্দেশে সমস্বরে গান ধরিয়াছে।

আমি কপালিনীর পদতলে পতিত হইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"মা! এ আমার কি করিলি?"

তিনি এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া, আমাকে তাম্রঘট প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং বলিলেন—"উঠ গোপীনাথ! এইবারে জল লইয়া দামোদরের শ্রীঅঙ্গ সিক্ত কর।" তাঁহার আদেশানুযায়ী আমি সেই জল দামোদরের অঙ্গে নিক্ষেপ করিলাম। দেখিতে দেখিতে এক স্বর্গীয় সৌরভময় ধূমে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দামোদর, সন্ন্যাসিনী, গৃহের যাবতীয় পদার্থ আমার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল।

আমি সভয়ে ডাকিলাম—'মা!'

"এই যে আছি গোপীনাথ!—এতদিন পরে তোমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল! ব্রাহ্মণঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও তুমি কর্ম্ম-শুদ্র হইয়াছিলে দামোদর কৃপা করিয়া তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন। যে প্রাণহীন সে কেমন করিয়া অন্য বস্তুতে প্রাণের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবে। ধর্ম্ম-সংমূঢ়চিত্ত, আধ্যাত্মিকতা বিহীন ব্রাহ্মণ ও জড়ময় শিলাখণ্ড এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। একটু চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে দেখিতে পাইবে, অপূর্ব্ব তপস্যার বলে নির্গুণ ব্রহ্মে গুণারোপ করিয়া ব্রাহ্মণই জগতের প্রতি পরমাণুতে ভগবানের মহিমা বিকীর্ণ করিয়াছেন। তাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নারায়ণের বক্ষে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন চিরাঙ্কিত রহিয়াছে।"

এই বলিয়াই সুধাময় সঙ্গীততুল্য স্বরে কপালিনী বারংবার নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেন। "এস নারায়ণ, এস—জ্ঞানহীন বালকের আবাহন—মন্ত্রহীন, বিধিহীন—শুধু তোমার অহেতুকী করুণায় তাহকে চরিতার্থ কর। গোপীনাথ! এইবারে একবার সম্মুখে নিরীক্ষণ কর। দেখ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অনন্ত মহাবিভূতিময় নারায়ণ তোমাকে কৃপা করিতে এই ক্ষুদ্র শিলাগোলক মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।" চক্ষের নিমেষে গৃহমধ্য হইতে সমস্ত ধূম অপসারিত হইয়া গেল। আমি দামোদরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। আমার বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল।

যখন সংজ্ঞা ফিরিল, তখন দেখি, আমি একাকী গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি। আমার সম্মুখে তাম্রপাত্রে রক্ষিত দামোদর।

কিন্তু সে অন্তঃসংজ্ঞায় আমি কি দেখিলাম? শুনিবার জন্য তোমাদের আগ্রহ, বলিবার জন্য আমারও ব্যাকুলতা। কিন্তু কি করিব, নিষ্ঠুরা কপালিনী আমার স্থূল জগতে প্রত্যাবর্ত্তনমুখে আমার জ্ঞান গৃহের কবাট অর্গলবদ্ধ করিয়াছে। বিদায়ের সময় বলিয়াছে, "সময় হইলে আবার আমি আসিয়া কবাট উন্মুক্ত করিয়া দিব। এখন কেবল সতীর মর্য্যাদা রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি।"

দামোদরকে যথাস্থানে রক্ষা করিলাম ও তাঁহার চরণামৃত লইয়া দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়া গৃহ হইতে আমি বহির্গত হইলাম!

ত্রিতলের গৃহে আলো জ্বলিতেছিল। বুঝিলাম গোপালকে আনিয়া সেই ঘরে রাখা হইয়াছে। আর কালবিলম্ব না করিয়া আমি সেস্থানে উপস্থিত হইলাম। দেখি, গৃহ লোকে পূর্ণ। দূর হইতে তাহাদের কথা শুনিয়াই অনুমান করিলাম, শোকের পরিবর্ত্তে গৃহমধ্যে উল্লাসের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে—বুঝিলাম গোপাল বাঁচিয়াছে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতে খুল্ল-পিতামহ আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গোপীনাথ! সতীর মহিমা নিরীক্ষণ কর। তোমাদের গোপাল যমপুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।"

আমি গোপালের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, মুখে শ্রীচরণামৃত দিয়া ডাকিলাম—"গোপাল।"

দুর্ব্বল বাহুযুগলে গোপাল আমার কণ্ঠদেশ বেষ্টিত করিল।

অতি কষ্টে গোপালের হাত ছাড়াইয়া, আমি মায়ের চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইলাম।

প্রাণ লইয়া, ধর্ম্ম লইয়া, সতীর মর্য্যাদা রাখিতে সাত বৎসর পরে নির্ব্বাসিত গোপাল আবার তাহার নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

উপসংহার।

পশ্চাতে আমার বিবাহ হইল। গোপালের কুশণ্ডিকা বাকী ছিল, খুল্ল-পিতামহ নিজে পৌরহিত্য করিয়া দামোদর সম্মুখে আমাদের এই শুভকার্য্য এক সঙ্গে সম্পাদন করিয়া দিলেন।

মায়ের অনুরোধে সেই দিবসেই আমরা—স্বামী ও স্ত্রী—খুল্ল-পিতামহ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইলাম। পিতামহ আমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন—"ভাগ্যবতি! তোমার আগমন উপলক্ষ করিয়াই এই গৃহে শান্তি পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং এই বংশের জীবন রক্ষার ভার আমি তোমার উপরে অর্পণ করিলাম। তুমি শৈশব হইতে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবায় অভ্যস্ত হইয়াছ। এখন হইতে তোমার স্বামীকেই নারায়ণ জানিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার সেবা করিবে।" খুল্ল-পিতামহ এই সময়ে যজ্ঞধূম হইতে কজ্জল প্রস্তুত করিলেন, সেই কজ্জল আমাদের স্বামীস্ত্রীর হস্তে দিয়া বলিলেন—চক্ষুতে ইহা

সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন কর।" ছোটঠাকুরদা মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। আমরা পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। সেদিন তাহাকে যেরূপ সুন্দর দেখিলাম, এরূপ আর কখনও আমি দেখি নাই। বালিকা অবগুণ্ঠন ঈষদুন্মুক্ত করিয়া একবার আমার পানে চাহিয়াছিল। আমিও সেই সময় তাহার মুখের পানে চাহিয়াছিলাম। সে অপূর্ব্ব মধুময়ী স্বর্গীয় শ্রী আমার স্ত্রী তাহার ভিন্ন ভিন্ন বয়সের সমস্ত রূপ সমষ্টি দিয়া ঢাকিয়াও আজিও পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত করিতে পারে নাই।

মহাসমারোহে আমাদের উভয়ের পাকস্পর্শ কার্য্য নিষ্পন্ন হইল। বহু স্থান হইতে বহু লোক আসিয়া আমাদের কলিকাতার গৃহ পূর্ণ করিল। খুল-পিতামহের আদেশে পিতা শ্যামচাঁদকে ক্ষমা করিলেন। সেও এই উৎসবে আসিয়া যোগ দিল। প্রায় দুই সপ্তাহকাল অতি উল্লাসে অতিবাহিত হইয়া গেল।

ইহার পর — আর কি বলিব? প্রতি মুহূর্ত্তে আমি যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, অতি উল্লাসের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যার চিন্তা বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিত, সেই বিষম সময় আমাদিগকে অভিভূত করিবার জন্য, অতর্কিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোথাও কিছুই নাই, গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে সহসা মা একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারবাবুর প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমরা সকলে বুঝিলাম—মা আর অধিকদিন বাঁচিবেন না। মায়ের এ অবস্থার জন্য যদিও পূর্ব্ব হইতেই আমরা প্রস্তুত ছিলাম, তথাপি তাহা আমাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। এস মা! শ্রী, সম্পৎ, ধর্ম্ম—সমস্তই তুমি যখন

ফিরাইয়া আনিলে—তখন তুমিও কৃপা করিয়া ফিরিয়া এস ! আবেদন বৃথা হইল। গোপালের প্রত্যাবর্ত্তনের একমাস পরে, গুরুকে সম্মুখে রাখিয়া, পতির চরণোপাধানে মাথা রাখিয়া, আমাদিগের মায়া কাটাইয়া—পূর্ণিমার উচ্ছলিত জাহ্নবীজলপ্রবাহে জ্যোতির্ম্ময়ী সতী তাঁহার প্রাণপুষ্প অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ইহার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

এই ত্রিশ বৎসর আমি গোপালের অত্যাচারে সংসার-কূপে আবদ্ধ হইয়া পিতামহের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছি। মাতৃবিয়োগের তিন মাস পরে পিতা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ডাক্তার বাবুও তাঁহার স্ত্রীর উপর আমাদের ভার অর্পিত করিয়া তাঁহারা কাশী চলিয়া যান। কিছুকাল অতি সুখেই অতিবাহিত হইয়া গেল। তাহার পর আমাদের গার্হস্থ জীবনের চিরপ্রথামত মা 'দুর্গা' আমার স্ত্রীকে একটী রত্ন উপহার দিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন। গোপালও সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল। আমাদের আর পুত্র হয় নাই। সেই রত্নটি বুকে করিয়া, আমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পঁচিশ বৎসর দেশ দেশান্তর ঘুরিয়াছি। কপালিনী কৃপা না করিলে বুঝি সে মোহবন্ধন ঘুচিত না।

আজি ত্রিশবৎসর পরে এই বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া যুক্তকরে তোমাকে ডাকিতেছি—আয় মা ফিরিয়া আয়। এই প্রাণপুষ্পাভাবে বাঙ্গালীর গৃহ সৌরভ-শূন্য হইতে বসিয়াছে। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া দারিদ্র দন্তবিকাশ করিতেছে। উল্লাসকোলাহলের বক্ষ ভেদ করিয়া বিকার-হুঙ্কার বাণীর আশ্বাস বাণীকে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিতেছে। আয় মা ফিরিয়া আয়—সপ্তকোটী সদাপ্রফুল্ল পিতৃপুরুষের অসভ্যতার দীপালোকে সপ্তকোটী সদাবিষণ্ণ রুগ্ন সন্তানের সভ্যতার অন্ধকার দূর করিতে—আয় মা, স্বামী পুত্রের চিরহিতকারিণী গৃহলক্ষ্মী ফিরিয়া

আয়। আমাদের জ্ঞানাভিমানে আত্মপ্রসাদ দূর হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে। আমরা ঘর ছাড়িয়াছি, ঘরের কথা ভুলিয়াছি, ঘর আছে কি না এ প্রশ্ন করিবারও সাহস হারাইয়াছি। আমাদের হৃদয়ের উত্তাপে হৃদিস্থিত দামোদর নিত্য দগ্ধ হইতেছে—সে থাকিয়া থাকিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতেছে—"দে দে জল দে—আমি পুড়িয়া মরি, জল দে!"

তবে এস মা, শান্তিবারি কমণ্ডলুতে ভরিয়া, আম্রপল্লব সিক্ত করিয়া, অভয় বাণীর আশ্বাস লইয়া এস মা!

সম্পূর্ণ।

হানা বাড়ী।

প্রায় বিংশ বৎসর অতীত হইল দৈবযোগে আমাদিগকে কলিকাতার পূর্ব্বোপকণ্ঠস্থিত কাঁকুড়গাছিতে একখানি বাগানবাটী ভাড়া লইয়া বসবাস করিতে হয়। বাগানটী বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ ও মহীরুহ সমাচ্ছন্ন থাকায় তন্মধ্যে সবিতাদেবের প্রবেশাধিকার ছিল না। উহার বাহ্য দৃশ্য এতই গম্ভীর যে, সহসা কোন ব্যক্তি একাকী উহার ভিতর প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না। পারিপার্শ্বিক প্রতিবাসিবর্গের একটা ধারণা ছিল যে, ঐ বাগানে নিশ্চয়ই 'কিছু' (কোন উপদেবতা) আছে। আমরা যখন উহা ভাড়া লইবার জন্য উদ্যোগ করি, তখন তাহারা বিশেষ আপত্তি

উত্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু আমরা তাহাদের আপত্তিতে কর্ণপাত না করিয়া উহা ভাড়া লওয়াই স্থির করিলাম। বাগানটি অধিকার করিবার পূর্ব্বে উহার চতুর্দ্দিক পরিষ্কৃত এবং তন্মধ্যস্থিত অট্টালিকাখানিকে বাসোপযোগী ভবনে পরিণত করিয়া লইলাম।

বঙ্গাব্দ ১২৯৯ সালে আষাঢ় মাসে আমরা ঐ বাগানটাতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করি। মাস দু'তিন পরে দাদার ভয়ানক সাংঘাতিক পীড়া হইল এবং তাঁহার বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না; কিন্তু ভগবানের অশেষ অনুগ্রহে এবং পিতা মাতার আশীর্ব্বাদে ও পুণ্যফলে তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। তারপর, আমাদের পরিবারস্থ সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে উপর্যুপরি তিন চারিবার বেশ ভুগিলেন। যাহা হউক, প্রথম বৎসরটা এইরকম রোগে রোগে অতিবাহিত হইল, কোন উপদেবতার অস্তিত্ব উপলব্ধ হইল না।

দ্বিতীয় বৎসরও একপ্রকার নিরাপদে অতীত হইল। তখন আমরা দ্বিগুণ সাহসে উক্ত বাগানবাটী উপভোগ করিতে লাগিলাম এবং যে সকল প্রতিবেশী কপোলকল্পিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে উহার উপসত্বভোগে বঞ্চিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, তাহাদিগের উপর আমাদিগের একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, এই উদ্যান এতাবৎ অরক্ষিত ও অনধিকৃত থাকায় তত্রত্যপ্রতিবেশিবর্গ উহার উপসত্বাদি উপভোগ করিত এবং নানাবিধ অসৎ উদ্দেশ্যেও উহা ব্যবহৃত হইত। সুতরাং আমরা আসিয়া অধিকার করিলে তাহারা ঐ সকল অনায়াসলব্ধ সুখ হইতে বঞ্চিত হইবে, এতদ্‌ আশঙ্কায় আমাদিগকে ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাদের স্বানুকুল একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া ছিল। আমাদিগের প্রতি তাহাদের ঔদাসীন্য ও প্রতিকূলাচরণে উক্তপ্রকার সংশয় আমাদের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তৃতীয় বৎসরে কয়েকটি বিসদৃশ ব্যাপারে উক্ত সন্দেহ ক্রমে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ করিল। একদিন দুপুরবেলা আমাদের বাড়ীর ভিতর ক্রমান্বয়ে ঢিল পড়িল। সে সময় বাড়ীতে কোন পুরুষ মানুষ ছিল না, সুতরাং স্ত্রীলোকদের দ্বারা যতটুকু অনুসন্ধান হওয়া সম্ভব তদতিরিক্ত কিছুই হয় নাই। ইহার পরও দিনকতক দিনে দুপুরে, রাত্রে সন্ধ্যায় ক্রমাগত লোষ্ট্রপতন চলিল। অনুসন্ধানে কোন ফল হইল না। অবশেষে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করা হইল। দারোগা বাবু দুইজন চৌকিদারের সমাভিব্যাহারে আমাদের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং চারিদিক তদন্ত করিয়া পাড়ার লোকদিগকে ডাকাইয়া ভীতিব্যঞ্জক বাক্যে তাহাদিগকে শাসিত করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর, পুলিশ হইতে দুইজন চৌকিদারকে আমাদের উক্ত বাগানবাটী পাহারা দিবার জন্য পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা গেল। এই সকল প্রতীকারের পর লোষ্ট্রপতন কিছু দিনের জন্য বন্ধ রহিল।

তৃতীয় বৎসর লোষ্ট্রপতন ব্যাপারে আমরা অল্পাধিক উৎপীড়িত হইলাম। চতুর্থ বৎসর তদপেক্ষা গুরুতর অত্যাচার আরম্ভ হইল। অনিষ্টকারীরা যখন দেখিল যে, লোষ্ট্রপতনে আমরা কিছুমাত্র ভীত হইলাম না কিম্বা উক্ত বাগানটিও তাহাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলাম না, তখন তাহারা বাটীর মধ্যে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল! একদিন প্রভাতে দ্বারোদ্‌ঘাটনের পর দেখা গেল যে, দ্বারের নিকটে খানিকটা টাট্‌কা বিষ্ঠা কাগজে মোড়া পড়িয়া রহিয়াছে। এমন ভাবে রহিয়াছে যেন কেহ কাগজে বিষ্ঠাত্যাগ পূর্ব্বক দালানে নিক্ষেপ করিয়াছে। দ্বার খুলবামাত্র দুর্গন্ধে আমরা উৎপীড়িত হইয়া উঠিলাম। তখনই মেথরকে ডাকাইয়া উহা পরিষ্কার করা হইল। এ কাজ কে করিয়াছে ঘরের লোকে, না বাহিরের লোকে? আমরা বেশ বুঝিতে

পারিলাম যে, এরূপ গর্হিত ও নিন্দনীয় কর্ম্ম কোন মতেই ঘরের লোকের দ্বারা হইতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের সন্দেহ কিন্তু সম্পূর্ণ ঘুচিল না। সেদিন বিকালে পুনরায় বিষ্ঠা পতিত হইতে দেখা গেল—যেন কেহ আমাদের পায়খানার পিছন দিক হইতে ফেলিয়া গেল। তখনই আমরা বাটীর বাহির হইয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু কাহাকে ও দেখিতে পাওয়া গেল না। ইহার পরবর্ত্তী দিবসও পুনরায় বিষ্ঠা পতিত হইল। এইরূপে দিনকতক বিষ্ঠাপতনের পর্য্যায় চলিল। এসব ব্যাপার আমরা অন্যলোককে কিছুই জানাই নাই, কারণ জানি যে, জানাইয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু পাড়ার লোকেরা আপনাআপনি জানিতে পারিয়াছিল। একদিন দুপুরের পর পাড়ার দু'চার জন স্ত্রীলোক আসিয়া মা, বৌদিদি প্রভৃতির সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত আছে, এমন সময় ধপ্ করিয়া একটা শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, তাহাদের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হইবামাত্র দেখিতে পাইল যে, উঠানে কাপড়ে জড়ান এক ধাবড়া গু পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে তাহারা সেস্থানে কিছুই পড়িয়া থাকিতে দেখে নাই। এতদ্ব্যাপারে তাহারা বিশেষ বিস্মিত হইল এবং মা বৌদিদির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইল। তাহাদেরও ধারণা যে, এ সমস্ত পাড়ার দুষ্টলোকের কাজ।

ক্রমেই বিষ্ঠার পরিমাণ ও বিষ্ঠাপতনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হইতে লাগিল,—দুষ্টলোকের প্রকৃতি দুর্ভেদ্য ও তাহাদের প্রবৃত্তি বিচিত্র! এইরূপে কিছুদিন ধরিয়া বিষ্ঠা পড়িয়া বোধ হয় হতাশ হইয়া—থামিয়া গেল। বিষ্ঠাপতনের একটু বিশেষত্ব আমরা পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যখনই উহা নিক্ষিপ্ত হইত তখনই দেখিতাম যে, উহা সদ্য পরিত্যক্ত। এতদ্ব্যতীত আরও একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, পতন কালে একদিনও একবারও কাহারও গায়ে কিংবা কোন জিনিষের

উপর পড়ে নাই। শেষোক্ত বিশেষত্বটি লোষ্ট্রপতন পর্য্যায়েও দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত বিশেষত্বে আমাদের পূর্ব্ব ধারণার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয় নাই।

লোষ্ট্র ও বিষ্ঠাপতন পর্য্যায়দ্বয় পরে অধিকতর বিস্ময়কর দ্রব্যাপহরণ পর্য্যায় আরম্ভ হইল। মিষ্টান্ন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য আশ্চর্য্য রকমে চুরি যাইতে লাগিল। ঐ সকল দ্রব্য এমন স্থান হইতে চুরি যাইত, যাহাতে বাড়ীর ছেলেদের কিংবা অপর কোন ব্যক্তির উপর সন্দেহ করিবার পথ থাকিত না। প্রথম প্রথম, যেমন সাধারণে সন্দেহ করিয়া থাকে, আমরাও তদ্রূপ করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সহিত থাকিয়াও কোন চোরকে ধরিতে পারা গেল না। অবশেষে চাবিতালার ভিতর হইতে উক্ত দ্রব্য সকল অপহৃত হইতে লাগিল! তখন আমরা মনে করিলাম যে, উহা কোন বালকের কাজ নহে—নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে কোন সুচতুর বয়ঃস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। কিন্তু কে সে লোক, তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। অথচ বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাড়ীর কোন লোকের দ্বারা এই কাজ চলিতেছে! অনেক চেষ্টা করা গেল, কিন্তু গৃহতস্কর ধরা পড়িল না। সন্দেহবৃদ্ধি ভিন্ন ফলান্তর প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

এই চৌর্য্যব্যাপার এতই অদ্ভুত যে, সহজে কেহ ইহা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারিবে না। পক্ক ফলের মধ্যে রম্ভা, আম, লিচু, জাম, বেল, কমলালেবু প্রভৃতি এমন সব ফল, যাহা কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিলে কিংবা খাইয়া উত্তমরূপে মুখহাত না ধুইলে, উহাদের সুগন্ধ সহজে দূরীভূত হয় না, তাহাও পলক মধ্যে চুরি যাইতে দেখা গিয়াছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসন্ধানও হইয়াছে, কিন্তু উহাদের কোন চিহ্নমাত্রও

বাহির করিতে পারা যাইত না। ক্রমে আমরা বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু তস্কর বিরক্ত হইবার নহে, বরং সে ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। এখন আর সে কেবল মিষ্টান্ন ও পক্কফলে সন্তুষ্ট রহিল না; বোধ হয়, উহাতে তাহার অরুচি জন্মিয়া গিয়াছিল—তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়, কারণ সুবিধা পাইলে উহার লোভও সম্বরণ করিত না। এই বার তাহার দৃষ্টি টাকা কড়ির উপর পড়িল—এ দৃষ্টি ঠিক যেন শনির দৃষ্টি! এই পয়সা রাখ, আর নাই! বাক্সের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া রাখ, তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই, আর বাহিরে রাখিলে তখনই যেন উড়িয়া যাইবে। মহাবিপদেই পড়া গেল, চোরকে কিছুতেই ধরা যাইতেছে না। বাড়ীর মধ্যে বাড়ীর লোকের দ্বারা এতদিন ধরিয়া কত জিনিস চুরি যাইতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, একবারও চোরকে কেহ ধরিতে পারিল না। ধরা দূরের কথা, এমন কোন নিদর্শন বা প্রমাণপর্য্যন্তও পাওয়া যাইতেছে না, যাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সন্দেহ করিতে পারা যায়। তবে যে কাহারও উপর সন্দেহ একেবারেই হইত না, এমন নহে। অনেকের উপর সন্দেহ হইত বটে, কিন্তু তাহা অপ্রামাণিক ও কল্পনাসম্ভূত সন্দেহ মাত্র। তাহাতে কোন ফলোদয় হইত না বরং অনেক সময় সন্দেহকারীকে অনুতপ্ত হইতে হইত।

এই চৌর্য্যব্যাপার বহুদিন পর্য্যন্ত চলিল। অপহৃত দ্রব্যাদি উন্মুক্ত স্থানে থাকিত বলিয়া যে চুরি যাইত এমত নহে, বাক্সের ভিতর চাবি বন্ধ করা অবস্থায় তাহার মধ্য হইতে অপহৃত হইত, অথচ বাক্স ভাঙ্গিত না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাক্সে যে চাবি দেওয়া হইত, তাহার ডুপ্লিকেট্ বাজারে মিলিত না, অথচ সেইবাক্স হইতে টাকা পয়সা অপহৃত হইত। বাড়ীর ভিতর এমন চোর যে কে, তাহা কিছুই আমরা স্থির করিতে পারিলাম না। অনেক রকমে প্রতীকার করা হইয়াছে, কিন্তু

কোনই ফল হইল না। এ লোষ্ট্র বা বিষ্ঠাপতন নহে যে. বাহিরের দুষ্ট লোকের উপর সন্দেহ হইবে। ঘরের বিভীষণকে পার নাই।

খাদ্যদ্রব্য ও মুদ্রাদি লইয়া গৃহতস্কর এতদিন সন্তুষ্ট ছিল। এইবার পোষাক পরিচ্ছদের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। ভাল মন্দ সকল প্রকার বস্ত্র, শাল, র‍্যাপার, প্রভৃতি মূল্যবান পরিচ্ছদগুলি একে একে ভোজবাজীর ন্যায় চাবি বন্ধ করা বাক্সের ভিতর হইতে উড়িয়া যাইতে লাগিল। যাহা অপহৃত বা অপসৃত হইতেছে তাহা আর পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।

আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহোপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে বহুবিধ বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্য হইতে কয়েকখানি আত্মীয় স্বজনকে বিতরণ করা হইয়াছিল, আর অবশিষ্ট সমস্ত মাতাঠাকুরাণী একটি তোরঙ্গে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। আবশ্যক মত দু'এক খানি মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া দিতেছেন। যখন আমাদের গৃহে উক্তরূপে টাকা পয়সা চুরি যাইতেছে, সেই সময় একদিন একখানি দেশী কাপড় বাহির করিতে গিয়া দেখিলেন যে অর্দ্ধেক কাপড় নাই। তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। চাবির ভিতর হইতে কাপড় গুলা কে লইবে? এ ত আর খাবার জিনিষ নয় যে গালে ফেলিলেই হইল। অবশেষে আমরা এইরূপ অনুমান করিলাম যে, যিনি খাদ্যদ্রব্য ও মুদ্রাদি অপহরণ করিতেছেন, তাঁহারই এই কাজ। পয়সার অনাটন হইয়াছিল, তাই কাপড় চোপড় যাহা পাইয়াছিল বাজারে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে। কারণ, তিনি একজন পাকাচোর। বাড়ীর ভিতর এতদিন ধরিয়া এত দ্রব্য সামগ্রী চুরী যাইতেছে এবং প্রত্যেকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও একদিনের জন্যে ধৃত হইলেন না।

আর একদিন, আমার সেজোভাই তাহার একখানি আলোয়ান জলে

ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছিল। স্নানান্তে আহারের পর বাড়ীর বাহিরে গিয়া দেখিল যে, আলোয়ান নাই। তখনই সকলকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারা গেল যে; বাড়ীর কেহ উহা তুলিয়া আনে নাই। তবে, আলোয়ান কি হইল? কোন ভিখারী আসিয়াছিল কি? কেন না, ভিক্ষুকবেশধারী তস্কর বিস্তর আছে। কিন্তু, তাহা হইলে আমাদের কুকুরটা নিশ্চয়ই ডাকিয়া উঠিত। কারণ, বাহিরের কোন লোককে সে আমাদের বাগান বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে দিত না। বলা বাহুল্য যে স্থানে আলোয়ানটি শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল, উহা আমাদের গৃহ প্রাঙ্গণের বহির্দ্দেশ এবং তথায় আমাদের কুকুরটি সদা সর্ব্বদা বাঁধা থাকিত। অনেক অনুসন্ধান করা গেল, কিন্তু আলোয়ান কে লইল বা কি হইল তাহার কোন মীমাংসা পর্য্যন্ত করিতে পারা গেল না। নূতন জিনিষ, সবেমাত্র গত বৎসর ক্রীত হইয়াছে—বেশী ব্যবহারও হয় নাই। সুতরাং উহা অকস্মাৎ অপহরণে পরিবারস্থ সকলেই ব্যথিত হইলেন।

উক্ত চৌর্য্যব্যাপারের প্রতিবিধানার্থ পরবর্ত্তী রবিবারে আমরা দুই ভ্রাতায় চক্রবেড়ে একজন প্রসিদ্ধ গণকের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের মুদোটি সম্মুখে রাখিয়া একপ্রকার অস্পষ্ট ভাষায় মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "কিছু অর্থের হানি দেখিতেছি।" পুনরায় জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিলেন, "অর্থ বলিতে গেলে অনেক রকম বুঝায়; টাকাকড়ি, গহণাপত্র, গাইবাছুর, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিকে বুঝায়।" কিন্তু কোন্ জিনিষটা হারাইয়াছে, তাহা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলেন না। অবশ্য অর্থ হানি না হইলে, কেহ কখন গণৎকারের নিকট গমন করে না। ইহা তো স্বাভাবিক. ইহা গণনার প্রয়োজন করে না। পুনঃ পুনঃ আমরা কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু তাহাদের কোনটিরও সন্তোষজনক কিংবা বিশ্বাস যোগ্য কোন উত্তর

পাইলাম না। ক্রমেই আমরা হতাশ হইয়া পড়িলাম। অবশেষে তিনি প্রকাশ করিলেন যে, যে দ্রব্য হারাইয়াছে, তাহা অপর লোকে গ্রহণ করে নাই, নিজেদের পরিচিত লোকে লইয়াছে; পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক; বেঁটে নয়, খুব লম্বাও নয়, মাঝারি মানুষ; ফরসাও নয়, খুব কালও নয়, মাঝামাঝি। এইরূপ দ্ব্যর্থ ভাবের লোক বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পুনঃ প্রাপ্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে, একটা টাকা তাঁহাকে দিলে 'চাউল বা চিঁড়ে পড়া' দিতে পারেন; উহা পরিবারস্থ সকলকে এবং প্রতিবেশিগণকে খাইতে দিতে হইবে; যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে সে উহা খাইলে নিশ্চয়ই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিবে; যন্ত্রণার চোটে সেই জিনিষ বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু এরূপ যন্ত্রণাদায়ক উপায় অবলম্বন করিতে আমরা ইচ্ছুক হইলাম না। কি জানি কি করিতে কি হয়! আর প্রতিবেশীরাই বা আমাদের কথায় 'চাউল পড়া' খাইবে কেন? আর যদিইবা কেহ খায়, এবং খাইয়া বাস্তবিক যদি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, তাহা হইলে আমাদিগকে পুনরায় বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে; তাহার আত্মীয় স্বজনগণ আমাদিগকে সহজে ছাড়িবে না। এমন কি আমাদিগকে পুলিশে সোপর্দ্দ করিতে পারে! ঈদৃশ বিপদাশঙ্কায় উক্ত প্রতিবিধান হইতে বিরত রহিলাম। যাহা হউক, আলোয়ান পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আর কোন প্রতীকার করা হইল না।

ইহার পর দাদার তোরঙ্গ হইতে মধ্যে মধ্যে নূতন পুরাতন ধুতি উড়ানি শার্ট প্রভৃতি চুরি যাইতে লাগিল। মাতাঠাকুরাণীর তোরঙ্গ হইতেও তিন চারিবার নূতন পুরাতন অনেক কাপড় চুরি গিয়াছে। চোর তো ধরা পড়িল না, অথচ বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এ সব ঘরের লোকেরই কাজ, বাহিরের লোক কিংবা ছোট ছেলেদের কাজ নয়, এবং আমাদের তখন কোন ঝী চাকর ছিল না যে তাহাদের উপর সন্দেহ হইবে। গৃহ

মধ্যে এমন কে আছে, যাহার দ্বারা এরূপ অসম্ভব গর্হিত কাজ হইতে পারে, তাহা কেহ কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছে না। বাড়ীর মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার কিছু না কিছু যায় নাই, সুতরাং কে কাহাকে সন্দেহ করিবে। প্রায় চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা যতই সাবধান হইতেছি, চোরের সাহস ততই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অধিকতর আশ্চর্য্যভাবে জিনিষ পত্র অপহরণ করিতেছে। তৎসঙ্গে পরিবারের মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্ন অশান্তি আনয়ন করিয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমে দেখা গেল, তস্কর মহাশয় খাদ্যদ্রব্য, টাকাকড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ লইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না, অলঙ্কারাদির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার চৌর্য্যকার্য্য এতাবৎ চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা অল্পেতে উপশম হইল না। এইবারে অধিকতর মূল্যবান দ্রব্যে হস্তক্ষেপ করিলেন!

আমাদের প্রতিবেশী একজন স্ত্রীলোক মাতাঠাকুরাণীর নিকট কয়েক খানা গহণা বন্ধক রাখে। একদিন তিনি কোন প্রয়োজন বশতঃ যে বাক্সে সেই গহণাগুলি রাখিয়া ছিলেন সেই বাক্সটি খুলিয়া দেখেন যে গহণা নাই! অমনি মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। এমন সর্ব্বনাশ কে করিল! যে বরাবর ঘরের জিনিষ পত্র চুরি করিয়া আসিতেছে তাহারই কাজ, আর কে করিবে? বিশেষতঃ অন্যান্য দ্রব্যাদি যেরূপ অভাবনীয় উপায়ে অপহৃত হইয়া আসিতেছে, ইহাও তদ্রূপ হইয়া আসিয়াছে, বাক্সে চাবি বন্ধ রহিয়াছে, অথচ জিনিষ নাই! অনেক চেষ্টা করা গেল, কিন্তু কিছুতেই গহণা পাওয়া গেল না অবশেষে বন্ধকদাতাকে উহার দাম ধরিয়া দিতে হইল।

উক্ত অলঙ্কার অপহৃত হইবার পর হইতে আমরা অধিকতর সতর্ক

হইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মধ্য হইতেও পূর্ব্ববৎ অলৌকিকরূপে বিবিধ দ্রব্য অপহৃত হইতে লাগিল। এইরূপে আর এক বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সকল পারিবারিক ব্যাপার অপরের নিকট প্রকাশ করিতে ঘৃণা ও লজ্জাবোধ হয়, কেন না আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, বাহিরের লোকের কোন রকম সুযোগ পাওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঘরের লোকের দ্বারাই যে এই সকল বিশ্বাস-ঘাতকের কার্য্য চলিতেছে, ইহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ নাই। মূল্যবান দ্রব্যাদি কোন বিশ্বাসী আত্মীয়ের নিকট গচ্ছিত রাখিতে গেলে পাছে ঘরের কথা প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় আমরা কিল্ খাইয়া কিল্ চুরি করিতে লাগিলাম।

এই কাঁকুড়গাছিতে আসা অবধি আমরা একটা না একটা বিপদে ক্রমান্বয়ে উৎপীড়িত হইতেছি। একদিনের জন্যও আমরা শান্তিসুখ উপভোগ করিতে পারিলাম না। প্রথম বৎসর রোগে রোগে অতিবাহিত হইল; দ্বিতীয় বৎসর লোষ্ট্রপতন, তৃতীয় বৎসর বিষ্ঠাপতন এবং চতুর্থ বৎসর হইতে দ্রব্যাপহরণ ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি বিধ্বংসিত হইতেছি। ইহার আর কিছুতেই উপশম হইতেছে না। উক্তপ্রকার উপদ্রবে উত্তরোত্তর উত্ত্যক্ত হইয়াও আমাদের নিস্তার নাই। ইহার পর হইতে প্রাণবিয়োগ-পর্য্যায় উপস্থিত হইল! বঙ্গাব্দ ১৩০৭ সাল হইতে ১৩১১ সাল পর্য্যন্ত আমরা ক্রমান্বয়ে কতিপয় আত্মীয় স্বজনকে জন্মের মতন হারাইলাম। সন ১৩০৭ সালের ২৬ শে শ্রাবণ শুক্রবার মধ্যম খুল্লতাত মহাশয় ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সনের ২৭ শে পৌষ শুক্রবার মাতুলমহাশয় ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। ১৩০৮ সালে ২৬ শে আষাঢ় বুধবার জ্যেষ্ঠ খুল্লতাতমহাশয় উঁহাদের অনুসরণ করিলেন। ১৩১০ সালে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার মদীয় তৃতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র পরিবার বর্গকে শোকসাগরে

ভাসাইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। ঐ সনে ১৬ই মাঘ পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব ইহ সংসার আঁধার করিয়া, সংসারের কর্ত্তৃত্বের সিংহাসন শূন্য রাখিয়া, স্ত্রীপুত্রকন্যাগণকে অনন্ত শোকার্ণবে নিক্ষেপ করিয়া, স্নেহমায়া মমতা পরিহার পূর্ব্বক অনন্তকালের জন্য সেই অনন্তধামে যাত্রা করিলেন।　　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

মৃতের আগমন।

(একটী ভৌতিক কাণ্ড।)

এই সহরের এক বিদ্যামন্দিরে দুইটী রক্ষক রাত্রে রক্ষণাবেক্ষণ করে। উভয়ে পাঞ্জাবী ও সৈনিক বিভাগ হইতে অবসর প্রাপ্ত। দুই জনেই নিষ্ঠাবান হিন্দু—দীর্ঘকায়, সরল ও সৎসাহস-পুষ্ট। ইহারা সত্যবাদী এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করে। ইহাদের সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক করে না, সৈনিকের কার্য্য করিয়া ইহারা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

গত বৎসর পূজার সময় শুনিলাম যে ঐ রক্ষকদ্বয়ের মধ্যে একজনের জ্বর হইয়াছে। দুইজনই এত সুস্থ ও বলিষ্ঠ যে, তাহাদের কাহারও অসুস্থতা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিছুদিন পরে জ্বর উপশম হইলে এই রক্ষকটি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আমায় বলিল, "বাবু সাহেব! বড়ি বোখার হুয়া।" তাহাকে আমি জ্বরসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল—"শুক্রবার যখন রাত্রি ২টার সময় আমি পাহারা দিতে ছিলাম তখন অনেক দূরে ঐ বাটীর প্রাঙ্গণে একজন সাহেবকে বেড়াইতে দেখিলাম।

এত নিস্তব্ধ রাত্রিতে কে সাহেব বেড়াইতেছে জানিবার জন্য একটু অগ্রসর হইলাম এবং আমার হাতের লণ্ঠনটা ঐ দিকে ফিরাইয়া ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম। তাহাতে সাদাকোট প্যাণ্ট পরা ঐ সাহেবের মাথা দেখিতে না পাইয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাল করিয়া দেখিলাম, ঐ লম্বা সাহেবের মাথাটা ধড়ের উপর ঝুলিতেছে! এই কাণ্ড দেখিয়া আমার একটু ভয় হইল। কারণ এ ঘাড় ভাঙ্গা সাহেব কে ইহা আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি একটু সাহস করিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোন হ্যায়?' কোন উত্তর পাইলাম না।

"এখন অন্য উপায় না দেখিয়া আরও অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলাম। আমি যতই নিকটে যাইতে লাগিলাম সে ততই সরিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। শেষে কাটা মাথাটা—যেটা ধড়ের উপরে ঝুলিতে ছিল—ভয়ানক দুলিতে লাগিল। ভয় যে কি বস্তু তাহা আমি কখন জানি না। কিন্তু এই ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়া আমার প্রাণে একটু স্বাভাবিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমি অগ্রসর হইতে বিরত হইলে, ঐ মূর্ত্তিটা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। আমি একলা এই সকল কাণ্ড দেখিতেছিলাম। কাজেই এই অভিনয় শেষ হইলে আমি আমার সহচরের নিকট এই ব্যাপার বলিতে যাইলাম। আমার সহচর এই সকল বিবরণ ভৌতিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিল।

সেই দিন রাত্রি হইতে আমার একটু জ্বর বোধ হইতে লাগিল। পর দিন এমন ভয়ানক জ্বর আসিল যে, আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। সেই অবধি প্রায় এক সপ্তাহ কাল রোগ ভোগ করিয়া আজ পথ্য পাইয়াছি ও কাজে লাগিয়াছি। বাস্তবিক এই কথা শুনিলে একটা আশ্চর্য্য বোধ হয় এবং মনে এই প্রশ্ন উদয় হয় যে, এ লোকটির জ্বর

হইবার কারণ কি? আমার মনে হয়, কারণ আর কিছুই নয়, মনে একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তা ও ভয়ের উদয় তাহাকে জ্বরগ্রস্ত করিয়াছে।

এ ঘটনা শুনিবার পর আমার মনে হইল ঐ সাহেবটী কে? বোধ হয় অপঘাত প্রাপ্ত কোন মৃত ব্যক্তির ভৌতিক শরীর। ঐ স্থানের দু একটী বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম যে, ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল। কোন এক সাহেব মনের দুঃখে ঐ গাছে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। উহা বোধ হয় তাহারই প্রেতাত্মা। উক্ত সাহেবটী ঐ বিদ্যামন্দিরের যন্ত্রাগারে কর্ম্ম করিত। ইহা শুনিয়া আমাদের কৌতূহল কতক পরিমাণে প্রশমিত হয়।

ভৌতিক কাণ্ড ত শুনিলাম, কিন্তু মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল মৃত্যুর পর কত দিন মানুষের প্রেতাত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়। যে লোক ৩০।৪০ বৎসর কাল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে, সে কেন আজ তাহার নশ্বর দেহের প্রতিকৃতি ধারণ করিয়া পুনরায় তাহার জীবদ্দশার লীলাভূমিতে উপস্থিত হইল। এই সমস্যা ভেদ করা বড়ই সুকঠিন।*

শ্রীচুনিলাল মিত্র।

---

* যথার্থই সুকঠিন। শাস্ত্রে যদিও এতৎ সম্বন্ধে নানাপ্রকারে ও নানাভাবে আলোচনা আছে, সম্যক সাধনের অভাবে আমরা তাহার সম্পূর্ণ মর্ম্মগ্রহণ করিতে অক্ষম। যোগমার্গে উচ্চাধিকার না হইলে, এ সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবারও উপায় নাই। আমরা বাহির হইতে দেখিয়া শুনিয়া অনুমানে যে টুকু উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাই আমাদের জ্ঞানের সীমা। আমরা সেই টুকু লইয়াই আলোচনা করি। আমরা "কেন কেন" করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিতেছি। এই সমস্ত অতি প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে যে সত্য নিহিত আছে, সে সত্যের অনুসন্ধানের উপায় অবলম্বন করিতে সাহসী নই। সুতরাং আমাদের এ প্রশ্নের কেমন করিয়া মীমাংসা হইবে? শাস্ত্রবাক্য অবলম্বনে ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আমাদের ইচ্ছা রহিল।

অং সং।

অলৌকিক ঘটনা।

আগরতলা হইতে, তত্রত্য মেডিকেল স্কুলের ছাত্র শ্রীমান্ রসময় পুরকায়স্থ তাহার সহপাঠী একটী ছাত্রের বিস্ময়কর মৃত্যুর কথা লিখিয়াছে। তাহার পত্রের সার এই,—

দীনেশচন্দ্র রায় আগরতলা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, বয়স ১৮।১৯ বৎসর হইবে। একদিন রাত্রে সে নিদ্রিতাবস্থায় "যাইব না যাইব না" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সে স্বপ্নে দেখে, তাহার পিসী (বহু দিন পূর্ব্বে মৃত) আসিয়া তাহাকে বলে,—"তুই আমার বাড়ী যাইবি চল।" তখন সে বলিয়া উঠে—"যাইব না।"

কিন্তু দীনেশের যে পিসী ছিলেন, তাহা সে জানিত না। স্বপ্নেই তাহার পিতা অন্ধকার হইতে বলিলেন,—"তোমার ৪।৫ বৎসর বয়সের সময় তোমার পিসী মরিয়াছেন।" কিঞ্চিৎপর আবার সেই রমণী দেখা দিলেন,—আবার সেই অনুরোধ ক্রমে তাহার বাড়ীতে যাইবার জন্য পীড়া-পীড়িই করিতে লাগিলেন। দীনেশ অস্বীকৃত হইলে কর্কশস্বরে রমণী বলিয়া গেলেন,—"দশ দিনের মধ্যে তোকে যাইতেই হইবে।"

দীনেশ তাহার কোন সহাধ্যায়িবন্ধুর নিকট স্বপ্নকাহিনী বিবৃত করিলে, বন্ধু তাহাকে অন্ততঃ দশটা দিন সাবধানে থাকিতে অনুরোধ করিল। দীনেশ, স্বপ্ন অমূলক ভাবিয়া, বন্ধুর কথার প্রতি লক্ষ্য করিল না।

পরদিন দীনেশ বাড়ী চলিল। বাড়ী পঁহুছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে দীনেশ দেখিতে পাইল, সেই রমণী—স্বপ্নদৃষ্টা পিসী—দ্রুতবেগে আসিয়া তাহার বক্ষে সবলে পদাঘাত করিল, সে 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। মা ছুটিয়া আসিয়া দীনেশের শুশ্রূষা করিয়া চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। অন্যান্য লোকও আসিল, তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাহার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আনা হইল,—কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফলই হইল না, আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া দেহত্যাগ করিয়া দীনেশ অনন্তধামে চলিয়া গেল! "স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র"—কেমন করিয়া বলিব?—সুরমা।

অলৌকিক রহস্য।

৮ম সংখ্যা] চতুর্থ বর্ষ। [ফাল্গুন, ১৩১৯।

সন্দীপনী।

(ভাল মন্দ)

আমরা যাহা কিছু করি, তাহাই আমাদের কর্ম্ম বা ক্রিয়া; এবং আমরাই সেই কর্ম্মের কর্ত্তা। আমাদের কর্ম্ম অনেক প্রকার হইতে পারে। দেহের পরিশ্রমই কর্ম্ম আর কিছু কর্ম্ম হইতে পারে না, এ ধারণাটী ভুল। কর্ম্ম শরীর সাহায্যে সাধিত হয়, বাক্য দ্বারা সাধিত হয়, এবং সর্ব্বোপরি, মনের দ্বারাও কর্ম্ম করা যায়। সন্তরণ দ্বারা জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার-কার্য্য, শরীরের দ্বারা করা হয়। কুবাক্য বা গালাগালি সাহায্যে একব্যক্তিকে রাগাইয়া হত্যাকার্য্য করান যায়, অথবা ভগবানের মহিমাসূচক স্তব, বাক্য দ্বারা উচ্চারণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায়, এবং মনের দ্বারা কল্পনায় নানাবিধ সুখ দুঃখ ভোগও করা যায়। সুতরাং আমরা সকল সময়েই কিছু না কিছু করিতেছি—এক মুহূর্ত্তও নিষ্ক্রিয় নাই। যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন আমাদের কায় মন ও বাক্য দ্বারা আমরা দিবারাত্র কর্ম্ম করি।

কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম করিয়া আমরা সুখ পাই, লোকের নিকট প্রশংসা পাই, এবং অন্যের কিছু উপকারও করিয়া তাহার মনে আনন্দ ও শান্তি দিই। সেই সকল কর্ম্মকে ভাল কর্ম্ম করে।

আবার, আর এক প্রকার কর্ম্ম আছে, যাহা করিলে নিজের মনে ভয়, উদ্বেগ ও অশান্তি আসে, এবং লোকের নিকট নিন্দার পাত্র হইতে হয়, এবং অধিকাংশ স্থলেই অন্যের ক্ষতি ও দুঃখ উদিত হয়। সেই সকল কর্ম্মকে মন্দকর্ম্ম কহে।

এই ভাল মন্দের বিচার আমাদের শাস্ত্রে অতি সুন্দর ভাবে লিখিত আছে। মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া যোগবাশিষ্ঠ ও মীমাংসা দর্শন পর্য্যন্ত সকল মহাগ্রন্থে সদসৎ বিচার বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মত একরূপ নহে। কাহারও মতে, যে কার্য্যে আনন্দ জন্মায়, তাহাই সৎ এবং যে কার্য্যে দুঃখ জন্মায়, সেই কর্ম্মই অসৎ।

কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধেও যুক্তিপূর্ণ আপত্তি আছে, তাহা এই যে, অধিকাংশ পাপকর্ম্মই অপূর্ব্ব আনন্দ দায়ক। লম্পট ব্যক্তি আনন্দ পায় বলিয়াই লাম্পট্য বৃত্তির আচরণ করে; এবং কোন সুন্দরী রমণী দেখিয়া যদি সে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার সুবিধা না পায়, তাহা হইলে সে বিষম মনোদুঃখে কালযাপন করে। একজন প্রবীণ এটর্ণী যদি কোন মহারাজার মোকদ্দমার ভার পাইয়া প্রকৃত খরচের চতুর্গুণ অর্থ হতভাগ্য মহারাজার নিকট হইতে বিল পাঠাইয়া সসম্মানে আদায় করিতে পারে, তবে সেই সুদক্ষ এটর্ণী মহাশয়ের মনে কি অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়, তাহা ধর্ম্মভীরু দরিদ্র সাহিত্যসেবিগণের কল্পনার সম্পূর্ণ বহির্ভূত।

সুতরাং যে কর্ম্ম করিলে আনন্দ জন্মে তাহাই ভাল, এবং যে কর্ম্ম করিলে দুঃখ জন্মে, তাহাই মন্দ—এই মতটী সম্পূর্ণ সত্য কিরূপে বলা যাইতে পারে?

অপর একদল চিন্তাশীল লোক বলেন যে, যে কর্ম্মের ভাবীফল কেবল

আনন্দ, কিন্তু উপস্থিত ফল আনন্দজনক নাও হইতে পারে, তাহাই সৎ। তাঁহাদের মতে, পাপকর্ম্মের প্রথম প্রথম ফল বড়ই সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক, কিন্তু দূর ভবিষ্যতে ও পরিণামে দুঃখজনক না হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ পাপ কার্য্যের প্রকৃতিতে দুঃখ মিশিয়া আছে।

দার্শনিকেরা বলেন, পাপে দুঃখ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। পুণ্যে সুখ বা শান্তি বা স্বর্গবাস। পাপে, যন্ত্রণা বা নরকভোগ। পুণ্য পূর্ণ। পাপ শূন্যতার পরিচায়ক। পুণ্যে ভাবের আধিপত্য; পাপে অভাবের খেলা। ভাবে সুখ; অভাবে দুঃখ।

সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে, ভাল কর্ম্মের ফল পরিণামে সুখজনক এবং মন্দকর্ম্মের ফল পরিণামে দুঃখজনক। এই মতের যাঁহারা পোষকতা করেন, তাঁহারা কর্ম্মের পরিণাম ফল বিচার করিয়া কর্ম্মকে শুভ বা অশুভ বলেন।

আর একটী দার্শনিক সম্প্রদায় বলেন যে, আত্মরক্ষাই প্রধান ধর্ম্ম। যে কর্ম্ম করিলে নিজের জীবন সুরক্ষিত হয়, তাহাই শুভ কর্ম্ম। কুমার সম্ভব নামক সংস্কৃত কাব্যে ব্রহ্মচারী বেশধারী স্বয়ং মহাদেব তপক্লিষ্টা উমাকে বলিতেছেন, "শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্ম্মসাধনম্"— অর্থাৎ, আপনার দেহই (জীবন) ধর্ম্ম করিবার একমাত্র উপায় স্বরূপ। আমাদের চলিত কথায় আছে, "আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম।" এই স্বার্থবাদী সম্প্রদায়ের মতে, নীতি বলিয়া কোন জিনিষ নাই। ইহাদের মতে, যদি চুরি করিলে আপনার মঙ্গল হয় ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পার অর্থাৎ, যদি ধৃত হইবার আশঙ্কা না থাকে, পরন্তু লাভবান্ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, তবে চুরি করা শুভকর্ম্ম বলিয়া জানিবে। যদি মিথ্যা কথা কহিলে নিন্দিত হইবার ভয় না থাকে, পরন্তু বিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে মিথ্যাভাষণ পাপ নহে।

কিন্তু এই মতের দোষ এইটুকু যে, এই মতে চলিয়া সংসারে বাস করা যায় না। যেহেতু প্রকৃত মন্দকর্ম্ম, একদিন না একদিন জগতের লোকে ধরিতে পারে : কারণ পাপ কখন গুপ্ত থাকে না। সুতরাং এই মতটী যদিও খুব সুবিধাজনক ও নিজের অনুকূল, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আর একটী মত দার্শনিক-জগতে চলিয়া আসিতেছে তাহা এই যে, যে কর্ম্ম করিলে পরের মঙ্গল হয়, তাহাই শুভ, এবং যাহাতে পরের অনিষ্ট হয় তাহাই অশুভ। যদি একটী মিথ্যা কথা কহিলে একজন নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পায়, তবে সে মিথ্যায় পাপ নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" কথাটী এ জাতীয় মিথ্যা নহে, কারণ ইহাতে নিরীহ কাহারও ইষ্ট হয় নাই, পরন্তু দ্রোণের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। সেইজন্য এই মিথ্যার জন্য যুধিষ্ঠিরের নরকদর্শন হইয়াছিল।

শেষের এই মতটী পণ্ডিত সমাজে বড়ই আদর পাইয়াছে। যাহাতে অন্যের উপকার হয়, তাহাই শুভকর্ম্ম এবং যাহাতে অন্যের অপকার হয়, তাহাই অশুভ কর্ম্ম। এই মতের সহিত নীতি ও ধর্ম্মের বেশ মিল আছে। সকল নীতিশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে এই উপদেশ বাক্য আছে, "পরোপকারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।" সুতরাং এই মতটী বড়ই উদার।

অতএব ভাল কর্ম্মের ফল যে সুখ, আনন্দ, শান্তি ও উন্নতি এবং মন্দ কর্ম্মের ফল যে দুঃখ, অনুতাপ, উদ্বেগ, ভয়, লজ্জা ও অবনতি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফল পাইবে।

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ আমরা সোজা কথায় কর্ম্মের গতি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যদি কোন ব্যক্তি স্বহস্তে বিষপান করে, বিষ তাহার শরীরের মধ্যে যাইয়া আপন ধ্বংসকারী শক্তি প্রকাশ করে—ফলে, লোকটির মৃত্যু হয়। যদি কেহ মদ্য পান করে, মদ্য তাহার শক্তি বিকাশ করিবেই, ফলে লোকটী মত্ততা দোষে দুষ্ট হইবে। অগ্নিতে হাত দাও, অবিলম্বে অগ্নির দাহিকা শক্তি উপলব্ধি হইবে। সংযমে কাল যাপন কর অকারণ পাপজ ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হইবে না। চলিত কথায় আছে, "কাষ্ঠ খাইলে অঙ্গার (কয়লা) ত্যাগ করিতে হইবে।"

তান্ত্রিকেরা ক্রিয়ায় বড়ই আস্থা করে। তাহারা স্পষ্ট বলে যে, তন্ত্রমতে কার্য্য কর, ফল হাতে হাতে পাইবে—ডান হাতে কার্য্য কর, বাম হাতে ফল পাইবে।

পুরুষকার-বাদীরা কর্ম্ম ধরিয়া কর্ম্ম-ফলের বিচার করে। যদি কোন বালক খুব ভাল লেখাপড়া করিয়াও পরীক্ষায় বিফল হয়, পুরুষকার বাদীরা বলিবে যে, নিশ্চয়ই কর্ম্মের কোন দোষ ছিল. হয়ত বা যে ভাবে পড়িলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, সে ভাবে পড়া হয় নাই। তাহারা বলে, আপন উদ্যোগেই সব হয়; যাহারা কাপুরুষ তাহারাই কেবল দৈবের বা অদৃষ্টের দোহাই দেয়।

আবার যাহারা অদৃষ্ট-বাদী তাহারাও প্রকারান্তরে কর্ম্মের ফল স্বীকার করে। যে ব্যক্তির পুত্র হইয়া বেশী দিন জীবিত থাকে না এবং যে পুনঃ পুনঃ পুত্রশোক পায়, লোকে বলে, তাহার বরাত (অদৃষ্ট) বড়ই মন্দ। অদৃষ্ট কথার মানে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম। সুতরাং অদৃষ্ট খারাপ বলিলে

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম খারাপ বুঝায় এবং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বা অদৃষ্ট মন্দ বলিয়াই তাহার ফলও মন্দ হইবে। সেইজন্য কর্ম্মের ফল কর্ম্ম অনুসারে ভাল বা মন্দ হয়।

সুতরাং ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইল যে, প্রত্যেক জীবকে তাহার স্বকৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করিতেই হইবে। সেই কর্ম্ম ইহ-জীবনের অথবা গতজীবনের হইতে পারে। ইহজীবনের কর্ম্ম হইলে তাহাকে পুরুষকার কহে; এবং পূর্ব্বজীবনের কর্ম্ম হইলে তাহাকে অদৃষ্ট কহে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও এই সত্যটি আছে যে "Energy is indestructible." অর্থাৎ শক্তির প্রভাব ধ্বংস হয় না, শক্তি ব্যয় করিলে বাস্তবিক জগত হইতে লোপ পায় না, সে অন্য কোন আকারে গুপ্ত থাকে। অতএব ইহা সুনিশ্চিত যে কর্ম্মানুসারেই জীবের গতি হইবে।

এখন কথা হইতেছে যে, সেই গতি ইহজীবনের অথবা পরজীবনের হইতে পারে। ইহজীবনের কর্ম্মানুসারে গতি সহজেই বুঝা যায়। যেমন, ভাল করিয়া অধ্যয়ন কর, জ্ঞান সঞ্চয় কর, পরে জ্ঞানী, মানী ও ধনী হইবে। পরোপকার কর তোমাকে লোকে সাধু বলিবে। তুমি ভাল কর্ম্ম করিলেই তোমার গতি বা অবস্থা ভাল হইবে। আবার মন্দকর্ম্ম করিলে ইহজীবনেই তাহার ফল পাইতে হইবে। মিথ্যা বল, তোমার নিন্দা হইবে। বিলাসী ও অসংযমী হও, তোমার চরিত্র দোষ ঘটিবে ও লোকের নিকট তোমায় নিন্দিত হইতে হইবে এবং নানারূপ ব্যাধি উপস্থিত হইয়া তোমার জীবনকে যন্ত্রণাময় করিবে; এবং তুমি বেশ বুঝিতে পারিবে মন্দ বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে তাহার ফল এইরূপ অশুভ হয়। সুতরাং ইহজীবনে আমাদের শুভাশুভ কর্ম্ম অনুযায় আমরা শুভাশুভ ফল পাই, সেই জন্য বলে "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল।"

এখন দেখা যাউক, আমরা সকল কর্ম্মেরই কি ইহজীবনেই অনুরূপ ফল পাই?

আমরা একটু চিন্তা করিলেই দেখিব যে, সকল কর্ম্মেরই ফল একটী মনুষ্য জীবনে কড়ায় গণ্ডায় মিলিতে নাও পারে। যে সময়েই মানুষ দেহত্যাগ করিয়া পরলোকে যাউক না কেন সে কতকগুলি কর্ম্মের ফল মৃত্যুর পূর্ব্বে ভোগ করিতে অবসর পায় না। তাহার কতকগুলি কর্ম্ম ফলের বীজস্বরূপ বাসনা অপূর্ণ থাকেই। সুতরাং দেহত্যাগ করিলেও সূক্ষ্মশরীরে থাকিয়া জীব স্থূল-দেহকালীন জীবদ্দশায় কর্ম্মের ফল পরলোকে ভোগ করিতে বাধ্য হয়; যেহেতু কর্ম্মফল অমোঘ। সুতরাং পরলোকে আত্মার গতি ইহলোকের কর্ম্ম অনুসারে নিশ্চয়ই হইবে।

অতএব ইহা প্রমাণিত হইল, কি ইহলোকে অথবা কি পরলোকে জীবের শুভাশুভ গতি তাহার ভাল অথবা মন্দ কর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। ইহাই আমাদের এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

এবার আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিব। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ (৫।৭) বলিতেছেন যে, জীব কখন ধর্ম্ম পথে গমন করিয়া সুখ ভোগ করেন, কখন বা অধর্ম্ম-মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া নরকাদিতে দুঃখ ভোগ করেন, আর কখন বা জ্ঞান পথে ধাবিত হইয়া মুক্তিপদ প্রার্থনা করেন। এইরূপে জীব নিজকর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া সংসারে বিচরণ করেন।

উক্ত উপনিষদে একথাটীও আছে যে, বিহিত বা বৈধ কর্ম্ম দ্বারা জীবের সুকৃতি জন্মে এবং সেই সুকৃতি বলেই জীব উৎকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হয়; এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ সঞ্চয় হয় ও সেই পাপানুসারে অপকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হয় এবং পরে পুনর্ব্বার ক্রিয়া দ্বারা সেই জীব যথাসম্ভব দেহ প্রাপ্ত হয়।

গুণত্রয়ের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই যে তিনটী সংজ্ঞা হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সতের ধর্ম্মই সত্ত্ব, এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দ্বারা উত্তম পুরুষের

ধর্ম্মই সত্ত্ব শব্দের অর্থ ; রাগ যোগ হেতু মধ্যম পুরুষের ধর্ম্মই রজঃ শব্দের অর্থ, এবং অধর্ম্মরূপ আচরণযোগহেতু অধর্ম্ম পুরুষের ধর্ম্মই তমঃ শব্দের অর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় প্রত্যেকেই অসংখ্যরূপ হইয়া থাকে।

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্য বিষয়ে ভগবান বাসুদেব মহাত্মা অর্জ্জুনকে অনুগীতার একবিংশ অধ্যায়ে, অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মনুসংহিতায় (১২।৪০) লিখিত আছে যে সত্ত্বগুণী ব্যক্তি দেবত্ব, রজোগুণী ব্যক্তি মনুষ্যত্ব এবং তমোগুণী ব্যক্তি তির্য্যকত্ব অর্থাৎ পশু-পক্ষ্যাদি জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই সত্ত্ব রজঃ তম গুণের কর্ম্ম হইতে জীবের পরজন্মে কিরূপ গতি হয়, মনুসংহিতায় তাহা সবিস্তারে লিখিত আছে আমরা তাহার সারমর্ম্ম দিতেছি।

সত্ত্বাদি গুণত্রয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্মান্তরে যে ত্রিবিধ গতি উল্লিখিত হইল, তাহা আবার দেশকালাদি ভেদে, সংসারে হেতুভূত কর্ম্ম ও জ্ঞান ভেদে এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে, তিন প্রকার হয়।

বৃক্ষাদি স্থাবর ক্রিমি,কীট, মৎস্য, সর্প, কূর্ম্ম পশু ও মৃগ, ইহাদিগের তমোগুণ নিমিত্ত জঘন্য গতি।

হস্তী ও ঘোটক, শূদ্র ও ম্লেচ্ছ, সিংহ, ব্যাঘ্র ও শূকর ইহাদিগের তমোগুণ নিমিত্ত মধ্যম গতি।

নটাদি, পক্ষী, ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণকারী পুরুষ, রাক্ষস ও পিশাচ ইহাদিগের তমোগুণ নিমিত্ত উত্তম গতি।

শাস্ত্রজীবী এবং দ্যুতক্রীড়া ও মদ্যাদি পানাসক্ত ব্যক্তি ইহাদিগের রজোগুণ নিমিত্ত জঘন্য গতি।

অভিষিক্ত রাজা, জনপদের শাসন কর্ত্তা, ক্ষত্রিয় জাতিমাত্র, রাজ-

পুরোহিত এবং শাস্ত্রার্থে কলহপ্রিয় ব্যক্তি, ইহাদিগের রজোগুণ জন্য মধ্যম গতি।

গন্ধর্ব্ব, গুহ্যক, যক্ষ, বিদ্যাধর ও অপ্সরোগণ, ইহাদের রজোগুণ জন্য উত্তম গতি।

বাণপ্রস্থ, যতি, ব্রাহ্মণ, পুষ্পকাদিবিমানচারিগণ, নক্ষত্রগণ ও দৈত্যগণ ইহাদের জন্য সত্ত্বগুণ নিমিত্ত অধম গতির ফল।

যাগশীল, ঋষিগণ, জ্যোতিষ্ক, দেবতা, বৎসর, পিতৃগণ এবং সাধ্যগণ ইহাদের জন্য সত্ত্বগুণ নিমিত্ত মধ্যম গতির ফল।

ব্রহ্মা মরীচ্যাদি সৃষ্টিকর্ত্তাগণ, ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, এবং সাংখ্যমত প্রসিদ্ধ মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত এই দুই তত্ত্ব ও তদাধিষ্ঠাতৃ দেবতা দ্বয় ইহাদের সত্ত্বগুণ নিমিত্ত উত্তম গতি জানিবে।

এইরূপে জীবের কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন গতি হইয়া থাকে। কিন্তু কতকাল জীব এইরূপে কর্ম্মচক্রে ঘুরিতে থাকিবে! অনন্ত কাল ধরিয়া কি জীবের কর্ম্ম ও তাহার ফলের ভোগ চলিতে থাকিবে?

অধ্যাত্ম রামায়ণ বলিতেছেন;—

"এবং কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমত্যাভূত সংপ্লবং॥
সর্ব্বোপ সংহৃতৌ জীবো বাসনাভিঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অনাদ্য বিদ্যাবশগস্তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ॥৪।৩ ২৫-২৬

অর্থাৎ, এইরূপে জীব স্বকর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া খণ্ড প্রলয় পর্য্যন্ত এই সংসারে ভ্রমণ করে। খণ্ড প্রলয় সময়ে জীব স্বকীয় বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া অনাদি অবিদ্যায় লীন হইয়া থাকে।

তদনন্তর পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে জীব স্বকীয় পূর্ব্ব বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবির্ভূত হয়। এইরূপে জীব ঘটী-যন্ত্রবৎ অর্থাৎ কূপাদি হইতে জলোত্তলন যন্ত্রের ন্যায়, এই সংসারে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে।

সুতরাং ইহা বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, জীব নিজ নিজ শুভাশুভ কর্ম্ম অনুসারে এক দেহত্যাগ করিয়া অন্য একটী যোগ্য দেহ ধারণ করে। জীবের পরলোকে ভাল মন্দ গতি তাহার ইহকালের ভাল মন্দ কর্ম্মের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। জীবের বিশ্রাম নাই দেহধারণ করিতেই হইবে। তুমি এই দেহত্যাগ করিয়া ভাবিতেছ অনন্তকাল নিদ্রায় থাকিব, সেটা সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র জানিবে। তোমার নিজের কর্ম্মই তোমাকে টানিয়া লইয়া উপযুক্ত দেহ ধারণ করিতে বাধ্য করিবে।

কিন্তু এ ঘন ঘন জন্মান্তর কি নিবারিত হইবার নহে?

শিবগীতা বলিতেছেন মুক্তি লাভ হইলেই নিবারিত হইবে। মৎস্য যেমন জলাশয়ের এক তীর হইতে তীরান্তরে বিচরণ করে, সেইরূপে যাবৎ মুক্তিলাভ না হয় তাবৎ জীব স্বকর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ এক দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া এই সংসারে নিরন্তর পরিভ্রমণ করে।

আমাদের পুরাণে একটী বড় সুন্দর গল্প আছে। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে জীব কি দেখিতে পায়, কি ভাবে ও কি করে! যখন জীব এই দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন অকস্মাৎ সে দেখিতে পায় যে, এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী একটী চিত্রিত পট হস্তে করিয়া তাহার সম্মুখে আসিল ও পট খুলিতে লাগিল। মুমুর্ষু ব্যক্তি দেখিল যে সেই পটে অতি ক্ষুদ্র কীট দেহ হইতে হস্তী ব্যাঘ্রাদি জন্তুর দেহ এবং বিভিন্ন প্রকার মানব দেহও অঙ্কিত রহিয়াছে। সে স্থির ভাবে পটটী দেখিতে থাকে। সেই পট-ধারিণী দেবীকে প্রকৃতি দেবী বলে। প্রকৃতি দেবী ক্ষণকাল পট-ধারণ করিয়া সেই মুমুর্ষু জীবকে ইঙ্গিত করিয়া বলে এই পটে অঙ্কিত নানাবিধ জীবের দেহ হইতে তোমার ইচ্ছানুরূপ একটী দেহ পছন্দ করিয়া লও, যে হেতু অতি শীঘ্র তোমায় এ নরদেহ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। মুমুর্ষু জীবের চক্ষু হঠাৎ উন্মীলিত হইয়া

উঠিল ও সে ইঙ্গিত করিয়া মনের ভাব জানাইল যে নরদেহের মধ্যে রাজার দেহ সে কামনা করে।

সুখ কে না চায়! রাজার দেহ পাইলে যে সুখ ভোগের বিশেষ সুযোগ হইবে, এ ধারণা সেই মৃতকল্প জীবেরও থাকে।

রাজার দেহ যেই কামনা করে, অমনি প্রকৃতি দেবীর পার্শ্বে আসিয়া আর এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আর একখানি পট খুলিয়া সেই মুমূর্ষু জীবকে দেখাইতে থাকে। এই অদেহী পুরুষের নাম কর্ম্ম, ও তাহার পটে মুমূর্ষু জীবের সারা জীবনের ভাল মন্দ কর্ম্মের ছাব অঙ্কিত রহিয়াছে।

আমরা যখনই যাহা কিছু করি, তাহার একটী প্রতিরূপ সূক্ষ্মভাবে আমাদের প্রকৃতিতে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত থাকে।

কর্ম্মের এই পট দেখিয়া সেই জীব চমকিয়া উঠে। তাহার চক্ষের সমক্ষে এক মুহূর্ত্তে তাহার সারাজীবনের পাপ পুণ্য সে দেখিতে পাইল। সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, যে সকল পাপ কার্য্যের বা পুণ্য কার্য্যের কথা তাহার আদৌ মনে ছিল না, এই পট দেখিয়া সেগুলি তৎক্ষণাৎ তাহার স্মরণে আসিতে লাগিল। সে দেখিল যে এখন পাপ অস্বীকার করা বৃথা, কারণ হাতে কলমে সে ধরা পড়িয়াছে।

তখন ঘোর অনুতাপ আসিয়া তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। সে অশান্তি মৃত্যু যন্ত্রণার তুল্য। যেমন দেহের যন্ত্রণা দেখিয়া লোকে মৃত্যু যন্ত্রণা বলিয়া অনুমান করে, সেইরূপ অনুতাপ দগ্ধ হৃদয়ের কাতরতা হেতু অশ্রুধারাকে লোকে মায়া কান্না বলিয়া মুমূর্ষু জীবের দুর্ব্বলতা ঘোষণা করে।

কর্ম্মদেব তখন গম্ভীর ভাবে বলেন "এই তোমার সারাজীবনের কাজ এই সকল কর্ম্মের ফলাফল ভোগ তুমি ভিন্ন আর কে করিবে! এখন বল দেখি, রাজার দেহ তোমায় সাজে কি না?

মুমূর্ষু জীব তৎক্ষণাৎ অনুতাপ ভরে বলিয়া উঠিল "কখনই না ; আমি অতি মহা পাতকী আমার উপযুক্ত দেহ এইটী" বলিয়া ঈঙ্গিত করিয়া নিজকর্ম্মানুযায়ী একটী জীবের দেহ দেখাইয়া দিল, তাহা গর্দ্দভ যোনিও হইতে পারে। জীবের বাসনাই তাহার যথাযোগ্য যোনি বাছিয়া লয়।

অনুতাপ ক্লিষ্ট আত্মা যখন নরদেহ ছাড়িতে উদ্যত হয়, তখন সত্য ছাড়া মিথ্যা তাহার চিন্তায় স্থান পায় না। ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব নিয়ম যে ঐ সঙ্কট সময়ে জীব আপনিই সত্য ধরিয়া ন্যায় বিচার করিয়া ঈশ্বরের নিয়মের পরিচয় দেয়।

এখন দেখিতে হইবে সকলকেই কর্ম্মজনিত ফল ভোগ করিতে হয় কি না ?

শিবগীতায় আছে—

"আত্ম জ্ঞানাৎ পরং নাস্তিতস্মাদ্দশরথাত্মজ ॥
ব্রাহ্মণঃ কর্ম্মভির্নৈব বর্দ্ধতে নৈব হীয়তে।
ন লিপ্যতে পাতকেন কর্ম্মনা জ্ঞানবান্ যদি ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাধিকো বিপ্রো জ্ঞানবানেব জায়তে।
জ্ঞাত্বা যঃ কুরুতে কর্ম্ম তস্যাক্ষয্যা ফলং লভেৎ ॥১১।৪১—৪৩

অর্থাৎ—অতএব হে রাম! আত্মজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ কদাচ কর্ম্মদ্বারা হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে আর কর্ম্মজনিত ফলভোগ করিতে হয় না। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ পাপে লিপ্ত হন না। এহেতু জ্ঞানবান্ বিপ্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। যে ব্যক্তি এই সকল জানিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ, বি, এল।

ভৌতিক না দৃষ্টিবিভ্রম ?

৺দুর্গাপূজার পর, যাত্রা করিয়া আজ আমরা হাজারিবাগে নূতন বাড়ীতে আসিয়াছি। সঙ্গে স্ত্রী হেম-নলিনী আছেন; দুইজন ভৃত্য ও উড়িয়া পাচক একটী আসিয়াছে। হাজারিবাগ-নিবাসী আমার প্রিয়তম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারস্থ মহিলাগণের সাহায্যে সংসার গুছাইয়া লওয়া হইল।

সেই দিন রাত্রে, উদ্যানের সম্মুখস্থ কক্ষে আমরা শুইয়া আছি।

কোজাগরা পূর্ণিমার রাত্রে শারদীয় শুভ্র, অনাবিল চন্দ্ররশ্মি উন্মুক্ত গবাক্ষে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিতা হেম-নলিনীর মুখখানির উপর পড়িয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিতেছিল। আমি তাহার পার্শ্বে অর্দ্ধ শয়ানাবস্থায়, সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিতেছিলাম। মধ্যে মধ্যে বাহিরের নীলিমায় বক্ষ্যমান চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত, আমার পুষ্পোদ্যানের শোভা দেখিতেছিলাম। কি সে সৌন্দর্য্য! কত স্নিগ্ধ, কত মনমুগ্ধকর! আমার ভিতরে বাহিরে সৌন্দর্য্য!

হঠাৎ একবার উদ্যানেরদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আমি একটী যুবতী সুন্দরী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। রমণী মন্থরগতিতে আমার কক্ষের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। ভাবিলাম, জিজ্ঞাসা করি কে? কিন্তু পারিলাম না।

রমণী কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়াছে—এমন সময় একটী রাজপুত যুবক তথায় আবির্ভূত হইল। যুবতী তাহাকে দেখিয়াই যোড়করে কি বলিল। সে কথা আমি শুনিতে পাই নাই। মুখভাবে বুঝিলাম—সে তাহার

নিকট কিছু প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু, যুবক অতি নিষ্ঠুর ভাবে তাহার কেশগুচ্ছ ধরিয়া নিজ আস্তিন মধ্য হইতে একখানি বৃহৎ ছুরিকা বাহির করিয়া রমণীর বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া উত্তোলন করিল। হঠাৎ সেই নৈশ-শান্তি-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া—"খুন কর্লে—খুন কর্লে" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আমার বৃদ্ধ ভৃত্য মণিরাম উদ্যানের ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। কিন্তু কোথায় কি? কোথায় সে যুবক যুবতী? মণিয়া ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিল। ঘটনাস্থলের জমিটা পরীক্ষা করিয়া নিতান্ত নিরাশ-ভাবে বিষণ্ণ মুখে আমার কক্ষদ্বারে আসিয়া ডাকিল—"বাবু! বাবু!" আমি যন্ত্রচালিতের মত, শয্যা হইতে উঠিয়া, দ্বার খুলিতে খুলিতে কহিলাম—"কি রে মণিয়া! কি হোয়েছে?" সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু! জেগেছিলেন? কিছু দেখিয়াছেন কি?" তাহার মন পরীক্ষা করিবার জন্য আমি মিথ্যা কহিলাম—"কই, এমন কিছু দেখি নাই ত!" মণিয়া অভিবাদন করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

আমার মনমধ্যে, পূর্ব্ব হইতে একটা অলৌকিক ভাবের উদয় হইয়াছিল—একি? ইহা ভৌতিক না ইন্দ্রজাল? প্রত্যক্ষ না স্বপ্ন?

চিন্তাকুল মনে শয্যায় শুইবামাত্র শুনিলাম—হেম চীৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো! মেরো না—মেরো না—আমায় ছেড়ে দাও। আমি আর কাহারও পানে চাহিব না—এবার আমায় মাফ করো।" এ কি বিপদ! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হোয়েছে তোমার আবার হেম?"

সে একটু ভাবিয়া উত্তর দিল—"একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি—বড় ভয়ানক।"

"কিছুই নয়! ঘুমাও। পথশ্রান্ত, অবসন্ন মনের বিকার মাত্র!"

বালিকাকে প্রবোধ দিলাম বটে, কিন্তু আমার মন প্রবোধ মানে কই ?

পরদিন রাত্রে, হেমকে নানা বাজে কথায় জাগাইয়া রাখিলাম। মণিয়া আমার কক্ষের বাহিরেই খাটিয়ায় পড়িয়া গান ধরিয়াছে। আবার তেমনই চাঁদের আলো ধরিত্রীকে আলোকিত করিতেছে। বিনিদ্র যুবক যুবতী বিশ্বের এ অনুপম সৌন্দর্য্য অবাধে দর্শন করিতেছি—পার্শ্বের আমার পড়িবার ঘরের ঘড়িটায় এগারোটা বাজার শব্দ শুনিলাম। হেম বলিল—"এস ঘুমুই। অনেক রাত হোয়েছে।" আমি বলিলাম—"তুমি ঘুমাও। আমার ঘুম আসে নাই।" হেম উঠিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া খাটের কাছে আসিয়াই চমকিয়া উঠিল। আমাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিল—"বাহিরে দেখ—দেখছো ?" "চুপ কর হেম! কি ব্যাপার বুঝতে দাও।"

সেই বাঙ্গালী যুবতী আর সেই রাজপুত যুবক—উদ্যানের মধ্যে আসিয়া পূর্ব্বরাত্রের মত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তাহাদের ভিতরে, কি হইল—জানি না। যুবক আবার ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। যুবতী নতজানু হইয়া, বোধ হয় প্রাণভিক্ষা চাহিল। কিন্তু নিষ্ঠুর যুবক—তাহার হস্তস্থিত দীর্ঘ ছুরিকা তাহার কোমল বক্ষে বসাইয়া দিল। যুবতীর রক্তাক্ত দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। আমার অজ্ঞাতে, আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"মণিয়া! মনিয়া!"

মণিয়া বাহির হইতে কহিল—"অদৃশ্য হইয়াছে! কিছুই নাই ত!"

"সত্যই ত—কিছুই নাই যে!"

হেম বলিল—"ওগো! কাল যে আমি ঠিক ওই স্বপ্ন দেখেছি! এই সব, এ কি কাণ্ড ?"

কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। হেম জেদ ধরিল—আজই

২৪ ঘণ্টার নোটিশ দিয়া "বার্থ রিজার্ভ" করো। কাল মেলে কলিকাতা যাইতে হইবে।

প্রভাতে উড়িয়া পাচকের অচেতন দেহ, তাহার কক্ষমধ্যে পাওয়া গেল। জ্ঞান হইলে চেঁচাইতে লাগিল—"হায় জগন্নাথ প্রভু—এ মোর কি করিলা?"

দীননাথকে ডাকাইয়া বলিলাম—"ভাই! বাড়ীর খরিদ্দার ঠিক করো। আমি কলিকাতা চলিলাম। হাজারিবাঘের এ বাড়ীতে আর পদার্পণ করিব না।"

কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজিও আমরা তাহার কিছু মীমাংসা করিতে পারি নাই।

আমার পাঠক পাঠিকাকে জিজ্ঞাসা করি—ইহা কি? ভৌতিক কিছু, না আমাদের—আমার, হেমের, মণিয়ার—দৃষ্টিবিভ্রম?

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

গোপেশ্বরের চাকরী।

ক্ষীরোদগোপাল চাটুর্য্যে, বাড়ী চুচুড়া, বাদামতলা—মুন্সেফ। গোপেশ্বর দাস ওরফে মণ্ডল, নিবাস রাধাগোবিন্দপুর জেলা যশোহর, জাতি নমশূদ্র পেশা সর্দ্দারী ও কৃষিকর্ম্ম। উভয়ের জাতি, বর্ণ, বিদ্যা, অবস্থা ও পদবীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিলেও এক অভাবনীয় ভাবে ও আশ্চর্য্য

সূত্রে উভয়ের মধ্যে এমন একটা বন্ধন ঘটিয়াছিল যে তাহা ইহ জীবনে ছিন্ন হয় নাই।

সে অনেকদিনের কথা; তখনো দেশ কোম্পানীর মুলুক বলিয়া প্রখ্যাত। গোপেশ্বর তাহাদের দরিদ্র সমাজের পক্ষে সৌভাগ্যবান পুরুষ; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দেহ, স্থূল ও প্রচুর মাংসপেশী জড়িত ও বলিষ্ঠ গঠন প্রায় ত্রিশ বিঘা জোত ও ভুঁই জমি, চারিটা মরাই, হেলে ও গাই প্রায় চল্লিশটা কাজেই স্বচ্ছন্দ সংসার ঋণ নাই।

পুরুষানুক্রমিক সর্দ্দার বলিয়া সে স্বজাতির মোড়ল। সুতরাং খ্যাতি ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠাপন্ন। তাহার উপর তার পতিপরায়ণা সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও নবজাত শিশু কালাচাঁদ তাহার কুটীর গুলিকে আরো সুন্দর সুশ্রী ও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

তার গুণবতী ও কর্ম্মিষ্ঠা স্ত্রী রাধারাণীর জন্য তাহাকে সংসারের কিছুই ভাবিতে হইত না—কিন্তু যে বিদ্যুৎছটা "রমে আঁখি; মরে নর তাহারি পরশে!" "গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়,"—রাধারাণী অথবা তার নবযৌবন উচ্ছলিত রূপই সংসারে কাল হইয়া পড়িল।

গ্রামের জমিদার প্রাতঃস্মরণীয় ও বদান্য নবচৌধুরী মহাশয়ের যুবক পুত্র হরকান্ত বাবুই এখন সমস্ত বিষয়ের মালিক। সুযোগ বুঝিয়া বাছা বাছা ইয়ার বন্ধু আসিয়া জুটিয়াছে, এখন বাগান বাড়ীই আড্ডা; উচ্চ চীৎকার বীভৎস আমোদ, অশ্লীল গান ও নৃত্য, ব্যভিচারনিরত চারি পাঁচ খানি গ্রামের স্বনাম ধন্যা ও স্বল্প-প্রতিষ্ঠা পরায়ণা কুলটা ও বারাঙ্গনাগণের কলরবে, অতি গভীর রাত্র পর্য্যন্তও ভদ্রলোকগণের সেস্থান দিয়া যাতায়াত দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তা ছাড়া কত লোকের ছাগল অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হইতে লাগিল ও কত সতীর যে এই উদ্যানে চিরতরে সর্ব্বনাশ ঘটিল তাহা কিম্বদন্তী আকারে এখনো গ্রামবৃদ্ধগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়।

অবশেষে বাবুর অনুগ্রহ এই দরিদ্র কৃষকপত্নী রাধারাণীর উপর পড়িল; তাঁহার দূতীরা রাধারাণীকে বুঝাইতে লাগিল যে, এ হেন অভাবনীয় সুযোগ তার অনেক তপস্যার ফল, বাবুর নজর যখন পড়েছে তখন সে রাজরাণী না হয়ে আর যায় না।

একে স্ত্রীলোক তাহার উপর নিরক্ষরা পল্লিগ্রামবাসিনী ও স্বামীপরায়ণা সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও এটা যে একটা সুবর্ণ সুযোগ তাহা তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কিছুতেই যোগাইল না।

শেষে বিরক্ত হইয়া বাবুর চর ও দূতীগণকে তাহার নিকটে বা বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিল; কিন্তু তা বলিয়া ত ব্যবসা বন্ধ যাবে না— কমলী নেহি ছোড়েগা।

আবার চেড়ীদলের গোপন নিঃশব্দ শুভাগমন, যথারীতি প্রলোভন ও সুপরামর্শ প্রদান; সুতরাং বাধ্য হইয়া সে অনেক ভূমিকা অনেক ঘোর-ফের ও কথাবার্ত্তার পর, আসল ব্যাপারটাকে যতদূর সরল ও সহজ করিয়া গোপেশ্বরের কাণে তুলিল। গোপেশ্বর ত শুনিয়াই অগ্নিশর্ম্মা, এত বড় নষ্টামী বজ্জাতি ও অপমানের কথা, সে কখন ভাবেও নাই কল্পনাও করে করে নাই; শেষে কিনা রাখাল সর্দ্দারের বউ ও গুপী সর্দ্দারের পরিবারের কাছে এমন অসৎ প্রস্তাব; হোক না কেন সে নব চৌধুরীর বেটা, তারই কত টাকা আছে কত লোক আছে। সে জানে না যে গুপী সর্দ্দার হাঁক দিলে একশ মরদ বেরিয়ে আসে। একা গোপেশ্বর মনে করলে অমন কত শত নব চৌধুরীর বেটাকে বাপের জন্ম দেখিয়ে দিতে পারে, এই সব ভাবিতে ভাবিতে শয্যায় শায়িত গোপেশ্বর একলম্ফে মেঝেয় দাঁড়াইয়া রামদা-খানাকে হাতে তুলিল।

রাধারাণী দেখিল এক হইতে অন্য বিপদ—একটা বা খুনোখুনী হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি গোপেশ্বরের ডান হাত খানা ধরিয়া বলিল,

কর কি? কাটাকাটি করে লাভ কি, তাতে যে আমরা সবাই ধনে প্রাণে মারা যাব।

উত্তেজিত গোপেশ্বর বলিল, তুই বলিস কি? শুনে অবধি আমার মগজ গরম হয়ে উঠেছে; যা হই না কেন আমরা গরীব লোক ও ছোট লোক, তা বলে সত্যি কি বেইজ্জৎ হতে হবে? না আমরা খেতে পাই না?

রা। তা ত বুঝ্‌ছি, সেইজন্যেই তোমাকে সব কথা বল্লাম, কিন্তু শুনতে না শুনতেই তোমার রক্ত গরম হয়ে উঠল ওরকম হল্লা করে কি ভাল হবে, তার চাইতে বরং মাথা ঠাণ্ডা করে বেশ করে বুঝে কাল হোক বা পরশু হোক একটা বিহিত বা উপায় কল্লেই চলবে এখন। আজ রাত্রেই যাহোক একটা কাণ্ড বাধাবার দরকার হচ্ছে না।

গোপেশ্বর কি ভাবিয়া মেঝেয় চুপ করিয়া বসিল।

রাধারাণী এই সুযোগে কাঠের আগুন দিয়া তাড়াতাড়ি এক ছিলাম তামাক সাজিয়া স্বামীর হস্তে দিল, এবং কোলের ছেলে কালাচাঁদকে স্বামীর অলক্ষ্যে একটু চিমটি কাটিয়া দিতেই সে কাঁদিয়া উঠিল। এই অবসরে তাকেও তার বাপের কোলে শোয়াইয়া দিয়া, নিজে স্বামীর গা ঘেঁসিয়া বসিয়া তাকে নরম করিবার উদ্যোগ করিল।

স্বামী নামক জন্তুটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও বশে রাখিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা তার চিত্তের সমস্ত দৌর্বল্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লক্ষ্য করিয়া রাখে এবং আবশ্যক হইলে সেই সমস্ত দৌর্বল্যের উপর ঘা দিয়া একে একে সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া দেয়। এক্ষেত্রেও রাধারাণী রমণীজাতি সুলভ শাণিত অস্ত্রগুলি সবেগে নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করিল না এবং তাহাতে বোধ হয় কিছু ফলও ফলিল।

তামাকটা শেষ করিয়া অন্যমনস্কভাবে গোপেশ্বর বলিল, তুই ঠিক বলেছিস্। আমরা মরদ মানুষ, খপ করে রেগে যাই। আচ্ছা একটা

মতলব করে দেখা যাক্ তাতে যদি না শানে বা বাগ মানে তখন ওরই একদিন কি আমারই একদিন, তখন ওর কাঁচামুণ্ড নখদিয়ে ছিঁড়ে কপোতাক্ষীর জলে ভাসিয়ে দিব।

আবার ক্রোধের ক্রমবিকাশ দেখিয়া রাধারাণীর ভয় হইল। শেষে প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উভয়ে অনেক পরামর্শ, কথাবার্ত্তা তর্ক বিতর্ক জল্পনা করিয়া সাব্যস্ত করিল যে অন্যান্য বয়স্ক ও মাথাঠাণ্ডা, মোড়লদের ডেকে একটা গোপন পঞ্চায়েৎ বসিয়ে যা সলা পরামর্শ হয় সেই মত কাজ করিলেই চলিবে।

অনিদ্রা অপমান ও দুশ্চিন্তার পর প্রভাতে উঠিয়া দেখিল যে তার চোখের সম্মুখে পৃথিবীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, সেই প্রভাত বায়ু অরুণালোক, জলকলরব, পাখীর গান সবই আছে কিন্তু তার মধুরতা যেন দিগন্তের পার্শ্বে সরিয়া গিয়াছে; এই রমণীয় প্রভাতে তার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা পূর্ব্বে কেমন জাগাইয়া দিত, কিন্তু আজ এ সমস্ত তার মনের উদ্বেগ ও বিমর্ষভাব কিছুতেই দূর করিতে পারিল না।

একটু বেলা হইলে পীরের আস্তানার নিকট, অশ্বথতলায়, গোবিন্দ, দ্বারিক, রামা, উমেশ প্রভৃতি ছোট বড় মোড়লদের লইয়া এক গোপন পঞ্চায়েৎ বসিল—তারা প্রথম শুনিয়াই ত অগ্নিশর্ম্মা; সকলে বলিল, আজই রাত্রে বাবুর বাগান বাড়ীতে পড়ে যে ক বেটা আছে সকলকে এক ঝাড়ে শেষ করে দেওয়া।

গোবিন্দ দাস সকলের চেয়ে প্রাচীন, কাজেই সে ঠাণ্ডা মাথায় বল্লে তোমরা কি করছ আর বলছ তার ঠিকানা নেই; ও পথে গেলে ভবিষ্যৎ কি হবে জান? সকলের হাতে এক সঙ্গে হাতকড়া পড়বে। এখন কি আর সেদিন কাল আছে না আমাদের জাতের মধ্যে সে জোর ও জোট আছে।

উত্তেজিত উমেশ চড়িয়া বলিল, কি বলছো গোবিন্দ খুড়ো ? বুড়ো হয়ে রক্তের জোর কমে গিয়ে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে দেখছি ? এতবড় আস্পর্দ্ধা কখন কি সহ্য হয়; হোই না কেন আমরা গরীব লোক ; ওসব ব্যাপার ভদ্রলোকের মধ্যেই সাজে, আমাদের জাতের উপর আবার অত্যাচার সুরু করে কেন ?

গো। অত্যাচার ত সত্যি এখনো কিছু করে নি। ওদের বাড় বড়ন্ত কত দেখাই যাক না কেন ?

উ। আর কি দেখবে ? এর পর ত তোমার আমার বাড়ীর মেয়ে-ছেলেদের হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবে ?

গোপেশ্বর বলিল, ভারি ত বাবু, আমাদেরই বাপ পিতামহের রক্তে ওদের আজ এত বড় তালুক, আর কি না আমাদের মেয়ে মানুষের উপর নজর।

গো। সে সব কি আর আমি জানি না বা বুঝি না—তবে আমি বলছি কি যে গায়ের জোর যদি দেখাতেই হয় ত সে সব শেষে। আগে বারণ করেই দেখা যাক্ না কেন, তাতে না শোনে তখন অন্য মতলব ধরা যাবে।

অবশেষে কিরূপে, কাকে ও কে বলিবে এই সমস্ত বিষয়ের সাব্যস্ত শেষ হওয়া বেলা এগারটার পর সভাভঙ্গ হইল এবং তাহাতে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, গোবিন্দ খুড়া বাবুর বাড়ীর কোন লোককে মিঠেকড়া করে বুঝিয়ে বলবে এবং সঙ্গে শাসিয়েও দেবে যে যদি তাতেও না ফল হয়, তখন লাঠির জোরে জানিয়ে দেওয়া হবে যে যেমন কুকুর তার তেমনি মুগুর।

চাষার ঘোঁট, যা মুখে তাই কাজে।

সেই দিনই অপরাহ্ণে যখন বাবুর পেয়ারের খানসামা লক্ষণ হাট হতে

পিঁয়াজ মুরগীর আণ্ডা প্রভৃতি বাবুদের নৈশ আহার সংগ্রহ করে বাটী আসিতেছিল, তখন গোষ্ঠ রক্ষিতের দোকান থেকে গোবিন্দ বেরিয়ে এসে বল্লে, আরে এই যে, লক্ষ্মণ যে—আরে কোত্থেকে হে?

ল। এই খুড়ো হাট থেকে আস্‌ছি, এখন গিয়ে আবার এসব সন্ধ্যের পরই বানিয়ে ফেল্‌তে হবে; দুঃখের কথা বল কেন?

গো। তা বেশ, লক্ষ্মণ আমাদের বড় ভাল ছেলে, তা হবে না কেন, ওর বাবা মাধব সেও বড্ড ভাল লোক ছিল কিনা? তার পর বেশ ভাল আছ এখন?

ল। এই যেমন রেখেছ, সবাই।

গো। তা ত হলো, কিন্তু একটু মফস্বলে কথা আছে—এখন ফুসরৎ হবে কি?

ল। তার আর কি—চলনা ওই পুকুর পাড়ে। আমার একটু পরে গেলেও চল্‌বে।

গো। হাঁ দেখ, তোমাদের বাবু নাকি খুব উঁচু লোক, খুব দরাজ নজর।

ল। তা বল্‌তে কি—বাবু আমাদের লোক খুব ভাল—নজরটাও বড় উঁচু, কেউ দুপয়সা চাইলে তাকে দু আনা দিয়ে দেয়।

গো। তবে তোমাদের বাবুর নজরে পড়লে লাভ আছে বল?

ল। সে কথা আর একবার করে বলতে।

গো। আর নাকি শুন্‌ছি যে গরীব দুঃখী লোকদের উপরও বেশ নজর আছে?

ল। আছে বৈকি? বাবুর নজরে যদি কোন গরীব লোক একবার পড়ে ত তার কিনারা হয়ে গেল।

গো। সে ত ভাল কথা, তবে আমাদের মত গরীব গুর্ব্বোর উপর তোমাদের বাবুর এত নজর কেন বাপু?

ল। (বিস্মিত ভাবে) কেন কেন কি হয়েছে, বাবুর নজর পড়ে সে ত ভাল কথা।

গো। সেই কথাই বলছি, শুধু গরীব লোক নয়, তাদের মেয়ে-ছেলেদের উপরও টান আছে শুন্‌ছ।

ল। (জিব কাটিয়া) ও কথা বলো না খুড়ো ; ওসব ত জানা কথা—যার ধর্ম্মে যা আছে সেই তা করবে, তোমার আমার সে কথায় কাজ কি ?

গো। কাজ আছে বলেই বল্‌ছ, নইলে তোমার সঙ্গে গায়ে পড়ে আমার কথা কইবার দরকার ছিল না।

গোবিন্দ তখন চটিতেছিল লক্ষ্মণও তার সে ভাব টুকু বেশ লক্ষ্য করিল।

গো। তা তোমরা যাই কর, আমাদের জাতের উপর নজর কেন ? এসব কাজ গুলা কি ভাল হচ্ছে ? এর মধ্যে তোমার বাবু, বাবুর মোসাহেব ও তোমরা অনেকেই আছ। আচ্ছা বাপু আমাদের গুপীসর্দ্দারের মেয়ে-মানুষের উপর তোমাদের বাবুর অত দয়া কেন, আর তোমরাও তার ভিতরে আছ। যাই হোক সাবধান করে দিচ্ছি তোমাদের ওরকম মতিগতি থাক্‌লে, ভাল হবে না।

গোবিন্দ বেশ গরম হইয়াই কথাগুল বলিল। চতুর লক্ষ্মণ শুনিয়া প্রমাদ গণিল—বুঝিল এই চোয়াড়ের দল কি একটা মতলব করেছে।

ল। না না খুড়ো ওসব কথা কি ? তোমরা হচ্ছ আমাদের আপনার লোক—তোমাদের উপর ওরূপ ব্যবহার কি আর থাক্‌তে হবে ?

গো। (চটিয়া) ন্যাকামি রেখে দাও না—তোদের অনেক বেটাবেটী এর ভিতর আছে, নহিলে বাবু কি আর নিজে আসতে গিয়েছিল। যাই হোক ভাল কথায় বুঝিয়ে বল্‌ছি যে এ সব বজ্জাতি মতলব ছাড়, এবং ফের যদি এরকম কোন কথা শুনি ত প্রথমেই তোদের ক বেটা বেটীকে একঝাড়ে নির্ব্বংশ দেব। তারপর তোমাদের মণিবকেও একহাত দেখে নিব।

কথা গুলি বলিয়াই গোবিন্দের মনে হইল যেন কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তাই পুনরায় নরম সুরে বলিল, আমি এগুলো কথার কথাই বলছি, নাহলে মাধব দাদার ছেলে যখন, তখন তুমি ত আপনারই লোক— তা বলে কি সত্যিই তোমা হতে আমাদের অনিষ্ট হবে না আমাদের হতে তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে। তবে ওসব নোংরা কথা শুনলেই মানুষের একটু রাগ হয় কি না তাই তোমাকে বলছিলাম। যাই হোক বাবা, যাতে একটা কিছু খুনোখুনী না হয় সেটা দেখ—তুমি কি না বুদ্ধিমান ও আপনার লোক তাই তোমাকে এত কথা বলছি নইলে কি আর কোন বেটাকে ডেকে বলতে গেছি।

লক্ষ্মণ বুঝিল, গতিক ভাল নয়, এখন সে নিষ্কৃতি পেলেই বাঁচে; কাজেই বলিল, সে কি কথা খুড়ো, এ কথা কি আর দুবার করে বলতে হয়—তুমি নিশ্চিন্ত থেকো—আমরা থাকতে তোমাদের কিছু ভাবনা নাই।

সন্ধ্যার পর বাবু যখন যথারীতি মৌজে তখন ভীত লক্ষ্মণ নানারূপ কল্পনা অলঙ্কার সজ্জিত করিয়া গোবিন্দ-লক্ষ্মণ সংবাদটী বেশ করিয়া যুবক জমিদারের কর্ণে তুলিল।

লক্ষ্মণের উদ্দেশ্য সফল হইল; বাবু গুড়গুড়ির নল ছাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল হুঁ বেটাদের বড় আস্পদ্দা—আচ্ছা দেখা যাবে?

মদিরা বিহ্বল—শৃগাল কুক্কুরবৎ উচ্ছিষ্ট প্রয়াসী চাটুকারের দল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল "ওঃ! কি আস্পর্দ্ধা—বেটারা আর বামুন শূদ্র তফাৎ রাখবে না দেখছি। এর একটা বিহিত করতেই হবে, করতেই হবে, করতেই হবে।" (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

স্বপ্নাবস্থা ও কালশক্তির ক্রিয়া।

স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মলোকে যে চৈতন্যের ক্রিয়া হয় তাহা দেশ বা কাল (Space and Time) দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় না। তবে কি স্বপ্নকালে যে চৈতন্য কার্য্যকারী তাহা কালাতীত এবং দেশাতীত? প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পারে না। এক ব্রহ্মভাবই কালাতীত বা দেশাতীত ভাব। ব্রহ্ম যে দেশাতীত ও কালাতীত তাহা উপনিষদ গম্ভীর ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বলিতেছেন, "যাহা দিবের ঊর্দ্ধে যাহা পৃথিবীর অধে, যাহার অন্তরীক্ষ উদরে, যাহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলে, তাহা ব্রহ্মে (আকাশে) ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে"।*

ব্রহ্ম যে দেশাতীত তাহা মৈত্রায়নীতে সুন্দরভাবে উক্ত হইয়াছে; যথা;—

"ব্রহ্মই অগ্রে এই ছিলেন। একও অনন্ত,—পূর্ব্বে অনন্ত, পশ্চিমে অনন্ত, দক্ষিণে অনন্ত, উত্তরে অনন্ত, ঊর্দ্ধে অনন্ত, অধে অনন্ত, সর্ব্বতঃ অনন্ত। তাঁহার পক্ষে পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদ নাই; উত্তর দক্ষিণ ভেদ নাই; ঊর্দ্ধ অধঃ ভেদ নাই।†"

---

* স হোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশে এব তদোতং চ প্রোতং চেতি।

বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৭

† ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র আসীদেকোঽনন্তঃ প্রাগনন্তো দক্ষিণতোঽনন্তঃ প্রতীচ্যনন্ত উদীচ্যনন্ত ঊর্দ্ধং চ অবাঙ্ চ সর্ব্বতোঽনন্তঃ।

ন হ্যস্য প্রাচ্যাদিদিশঃ কল্পন্তেঽথ তির্য্যগ্বাঽ বাঙ্ বোর্দ্ধং বাঽনূহ্য এষ পরমাত্মাঽপরিমিতোঽজঃ।—মৈত্রায়ণী, ৬।১৭

পর অপর স্থানেও সেই একই কথা উক্ত হইয়াছে।* সেইরূপ তিনি কালের অতীত।

কাল, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ক্রমে ত্রিবিধ। তাই ব্রহ্মাকেও বলা হয়,—

"পরঃ ত্রিকালাৎ।"—শ্বেত, ৬।৫

তিনি সদাকালে বর্ত্তমান (Eternal Now) ও ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে ভিন্ন।† তাই ইউরোপীয় দার্শনিক ডুশন্ সাহেব লিখিয়াছেন,—"তাঁহার দেশাতীতত্ব জানাইবার জন্য, তাঁহাকে অণুর অণু অথচ মহানের মহান্ বলিয়া যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে, সেইরূপ আবার তিনি যে কালাতীত ইহা বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে একদিকে 'অনাদি, অনন্ত ও অপরদিকে তাঁহাকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।‡"

তিনি উপনিষদের নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া শেষে বলিয়াছেন,—(instantaneousness) ব্রহ্মের তাৎক্ষণিকত্বের উপর লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্র তাঁহাকে কালাতীত বলিয়া নানারূপে বর্ণনা করিয়াছেন।§"

---

* ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

† অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।—কঠ ২।১৪

‡ Just as Brahman, independent of space, is figuratively represented not only under the figure of infinite vastness, but also at the same time of infinite littleness, so his independence of time appears on the one hand as infinite duration, on the other as an infinitely small moment, as it is symbolically represented in consciousness by the instantaneous duration of the lighting or flash of thought"—Deussen, page 150.

§ Taken together, their aim is to lay stress upon His *instantaneousness* in time, that is in figurative language time lessness.—Deussen, page 154.

এই সমকাল-সম্ভূতত্ব বা সমকালীনত্ব তাৎক্ষণিকত্ব, যুগপৎ যায়মানত্ব বা যৌগপদ্য (Simultaneousness or synochronism) প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মপক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যাহার অতীত নাই ভবিষ্যৎ নাই, তাহাই সমকালীন ও সদাকাল বর্ত্তমান (Eternal Now)। স্বপ্নকালে যিনি অহং প্রত্যয়ী তাঁহার পক্ষে এই উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে না। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রই দেশ ও কালের অধীন, সকলই তাহাদিগের বশানুগ। কালকে ঐশ্বরিক শক্তি বলা হয়। ভগবান্ স্বয়ং কালরূপী। ভাগবৎ বলিয়াছেন,

এতদ্ভগবতো রূপং—ভাঃ পু, ৩-২৯-৩৬

এই কাল ভগবানের রূপ বিশেষ।

অতএব যাঁহার এই শক্তি, তাঁহার সহিত সমভাবাপন্ন হইলে, তবে কালাতীত হওয়া যায়, কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, স্বপ্নাবস্থায় যে চৈতন্যের বিকাশ হয়, যে ভাবের উচ্ছ্বাস হয় তাহা ঈশ-ভাব হইতে পারে না। তাহা অতি বদ্ধভাব, অতএব তাহা কালরূপী মায়া-শক্তিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু, পরিচ্ছিন্ন হইলেও ইহা জাগ্রৎ চৈতন্যের মত তত্দূর পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত হয় না। বস্তুতঃ জাগ্রৎ চৈতন্যের তুলনায় ইহাকে কালাতীত বা দেশাতীত বলা যাইতে পারে।

তাই বলি, যখন মানুষ স্থূল দেহরূপ নিগড় হইতে কোনও কারণে মুক্ত হয়, তা সে নিদ্রাবস্থায় হউক, ধ্যানকালেই হউক বা মৃত্যুর পরেই হউক, তখন সে যে মান দণ্ডের দ্বারা কালের পরিমাণ করে, তাহা পার্থিব দণ্ডের তুলনায় অতি বৃহৎ। হয়ত এক নিমিষ তন্দ্রাভিভূত হইয়াছে কিন্তু এই অত্যল্প কালের মধ্যে সে স্বপ্ন বহুবৎসরব্যাপী নানা ঘটনা সঙ্কুল জীবন নাটকের অভিনয় করে। উদাহরণ স্বরূপ শত শত ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জীবনেই এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। আমি এখানে কেবলমাত্র দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব প্রথমটী

একটি অতি প্রাচীন কাহিনী, এডিসন সাহেবের প্রসিদ্ধ The spectator (দি স্পেক্‌টেটার) হইতে সংগৃহিত হইয়াছে।

মিসর বাদসাহের স্বপ্ন। কোরাণে কোন স্থানে উক্ত আছে যে, একদা হজরত মহম্মদ শয্যায় নিদ্রিত্ আছেন। পদপ্রান্তে অনতিদূরে একটী পাত্রে কদুষ্ণ জল রক্ষিত আছে। দৈববশে নিদ্রার ঘোরে তাঁহার পদাঘাতে পাত্রস্থ জল শয্যায় নিপতিত হইল এবং তিনিও ইত্যবসরে জাগরিত হইলেন। কিন্তু এই অত্যল্প ক্ষণের মধ্যেই তিনি এক বিরাট স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি যেন, পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে উপস্থিত হইয়াছেন। নানা স্থান পরিদর্শন করিতেছেন, স্বর্গের নানা বিভাগ অবলোকন করিতেছেন। এই সমস্ত স্থান গুলির বা বিভাগ গুলির কি নাম, তাহাদিগের আবশ্যকতা কি এবং মহিমাই বা কি, এই সমস্ত তথ্যের বিশদরূপে বিবরণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আবার কোথাও কোথাও স্বর্গবাসী বা দেব-দুতগণের সহিত নানা জটিল বিষয়ের মীমাংসা নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় যোগদান করিতেছেন। অবশেষে তাঁহার তথাকার কার্য্য সাঙ্গ হইলে তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরিলেন ও স্থূল দেহে প্রবেশ করিলেন; তাঁহার স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জাগরিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, স্বপ্নে স্বর্গে প্রয়াণের সময়, তাঁহার পদতাড়নায় যে কবোষ্ণ-জল-পাত্র পতিত হইয়াছিল, নিদ্রাভঙ্গে শয্যায় উপবেশন করিয়া দেখিলেন, তাহা হইতে সমস্ত জল এখনও বহির্গত হয় নাই এবং যে বারি শয্যার উপরে পতিত হইয়া রহিয়াছে তাহা এখনও সমভাবেই উষ্ণ রহিয়াছে।

মিসরের প্রবল প্রতাপান্বিত কোন ভূপাল, পূর্ব্বোক্ত কাহিনীটিতে কিছুতেই বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-শিক্ষকের বাক্যে অনাদর ত করিলেনই, তাহার উপর তাঁহাকে মিথ্যবাদী বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা প্রকৃতই মহাপুরুষ

ছিলেন। তিনি একদিকে যেমন অমানুষী যোগশক্তির অধিকারী এবং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত গুহ্য নীতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন, অন্যদিকে আবার প্রেম, দয়া, সহৃদয়তা ইত্যাদি গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাই শিষ্যের কটূক্তিতে ক্রোধ না করিয়া, করুণার আধার তিনি কোরাণের পূর্ব্বকথিত কাহিনী যে সম্ভবপর তাহা উদ্ধত সম্রাটকে সপ্রমাণ করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন। তিনি একটি জলপূর্ণ-পাত্র আনিতে আদেশ করিলেন। শীঘ্রই বারিপূর্ণ পাত্র রক্ষিত হইল। তিনি সম্রাটকে বিনয় সহকারে বলিলেন,—জাঁহাপনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই জলে স্বীয় মস্তক একবার নিমগ্ন করিয়াই উত্তোলন করুন।

সম্রাটও কৌতুহল পরবশ হইয়া তাহাই করিলেন, জলে মস্তক নিবিষ্ট করিয়াই উত্তোলন করিলেন। কিন্তু তিনি কি দেখিলেন! তিনি যেন কোন অজ্ঞাত দূরদেশে, বজ্র নির্ঘোষিণী, তীব্র বেগবতী গিরিনদীর সৈকতে দণ্ডায়মান! তাঁহার পার্শ্বে অতি উচ্চ পর্ব্বত মালা; অদূরে অতি ভীষণ বনান্ত! কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি বহুক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কিছুই জ্ঞান নাই। দ্বিপ্রহর অতীত প্রায় মস্তকোপরি প্রখর নিদাঘ মার্ত্তণ্ড জ্বালা উদ্গীরণ করিতেছে। তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি তীব্র ক্ষুধাবোধ করিলেন এবং শীঘ্রই তাহাতে কাতর হইয়া পড়িলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি এই জনমানবহীন অজ্ঞাত স্থানে স্বয়ং আহার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। তিনি ক্ষুধায় ও শ্রান্তিতে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, একপ্রকার চলচ্ছক্তিহীন। এমন সময় দেখিলেন অদূরে কতকগুলি কাঠুরিয়া বৃক্ষছেদন করিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে তাহাদিগের সমীপস্থ হইয়া কিঞ্চিৎ আহার্য্য যাচ্ঞা করিলেন। তাহাদিগের দত্ত খাদ্যে পরে সুস্থ হইয়া তাহাদিগের

সমভিব্যাহারে তাহাদিগের আবাসে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে সম্রাট—সুবর্ণ-বিনির্ম্মিত পালঙ্কে, দুগ্ধফেননিভ শয্যা না হইলে নিদ্রা আসিত না—এই সমস্ত কথা তাঁহার স্মৃতিতে কিছুই ছিল না। তিনি তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন; প্রাতে আহারান্তে কুঠার স্কন্ধে অপরাপর প্রতিবেশীর মত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন; সন্ধ্যাকালে কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিলেন এবং এক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্যের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মহাসুখে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার এখন দাসদাসীর অভাব নাই। একটির পর একটি করিয়া দ্বাদশটি পুত্রকন্যা এখন তাঁহার গৃহে শোভা বিস্তার করিতেছে; বালকবালিকার আনন্দ কোলাহলে এখন তাঁহার গৃহ সংগীতপূর্ণ। কিন্তু বহুকাল এইরূপ সুখে অতিবাহিত হইল না। তাঁহার পত্নী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার পর বিপদের পর বিপদ আসিতে লাগিল; তাঁহার যে এত সম্পদ রাশি সূর্য্যোদয়ে নভোমণ্ডলে তারাবলির মত কোথায় অদৃশ্য হইল। আবার বৃদ্ধ বয়সে, শিথিল হস্তে কুঠার লইয়া কম্পিত চরণে ভর দিয়া অরণ্যে কাষ্ঠান্বেষণে বাহির হইলেন।

একদা তিনি সেই পূর্ব্বকথিত পার্ব্বতীয় তটিনী সৈকত অবলম্বনে যাইতেছেন; মস্তকের উপর তীব্র তপন প্রখর করজাল-বিস্তার করিতেছেন, তিনি অতিশয় শ্রান্ত, রৌদ্র ক্লিষ্ট। পূর্ব্বে যে স্থানের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি, যথায় তিনি এই স্বপ্ন জীবনের প্রারম্ভে দণ্ডায়মান ছিলেন, দৈবক্রমে তিনি ঠিক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া তীরভূমিতে কুঠার ও বস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে সেই ক্ষর প্রবাহিনী গিরি নদীতে অবতরণ করিয়া নিমগ্ন হইলেন।

তাহার পর মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখেন, কোথায় গিরি-নদী এবং

কাহারই বা কাঠুরিয়া জীবন। তিনি নিজ সভায় সামন্তগণের সহিত দণ্ডায়মান আছেন ; নিকটে তাঁহার, সেই শক্তিশালী গুরুদেব স্মিত আস্যে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। সম্মুখে সেই জলপূর্ণ পাত্র রহিয়াছে। তিনি তাহাতে মস্তক নিমগ্ন করিয়াই উত্তোলন করিয়াছেন। ইত্যবসরে এই বহুকালব্যাপী বিরাট স্বপ্ন ! মন্ত্রপূত জল সংস্পর্শে সম্রাট তন্দ্রাভিভূত (hypnotised) হ'ন এবং দক্ষ শিক্ষকের কল্পনানুযায়ী এই স্বপ্ন দেখেন। হিন্দু পুরাণেও ঠিক এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে আমরা নিম্নে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

দেবর্ষি নারদ কোনও সময়ে মায়া প্রভাব দেখিতে চাহিলে, ভগবান বাসুদেব তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গরুড়ারোহণে কান্যকুব্জ সমীপবর্ত্তী, পঙ্কজ মরাল চক্রবাক সমাকীর্ণ, দিব্য, সরোবর-তীরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় নারদকে স্নান করিয়া শ্রমদূর করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। নারদও বীণা মৃগচর্ম্মাদি তটদেশে রক্ষাপূর্ব্বক, সরোবরে অবগাহন করিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। অনন্তর যেমন তাঁহার স্নানক্রিয়া শেষ হইল, তিনি দেখেন যেন তিনি সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা মোহিনী রমণী-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন তিনি যে দেবর্ষি নারদ সে কথা তাঁহার আর স্মরণ নাই। এইরূপে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে তুরঙ্গ রথবৃন্দে পরিবৃত হইয়া মূর্ত্তিমান কন্দর্পেরমত কমনীয় কান্তি তালধ্বজ নামক কোন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি আসিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এখন তাঁহার নাম হইল সৌভাগ্য লক্ষ্মী এবং তিনি তাঁহার অতিপ্রিয়া মহিষী হইলেন। নৃপতি বারুণীমদে মত্ত হইয়া সমুদয় কর্ত্তব্যবিষয় বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর কেবল সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সহিত, কখন রমণীয় উদ্যান নিচয়ে, কখন দীর্ঘিকা সমূহে কখন বিবিধরাজ-ভবনে, কখন হর্ম্ম্যোপরি, কখন মনোহর কৃত্রিম ক্রীড়াপর্ব্বতে বা রমণীয় কেলি কাননে বিহার করত তাঁহার নিতান্ত

অধীন হইয়া পড়িলেন! এইরূপে সুখে ও প্রমোদে দ্বাদশ বৎসর কাল কাটিল; অবশেষে তিনি গর্ভবতী হইলেন ও সময়ে সন্তান প্রসব করিলেন। ক্রমে এইরূপে দুই বৎসরান্তর একটী করিয়া কালে দ্বাদশটি পুত্র জন্মিল। নৃপতি যথা কালে তাহাদিগের বিবাহ দিলেন। ক্রমে পৌত্রাদি জন্মিল এবং তাহারা নানারসে ক্রীড়াকরত তাঁহার সংসার মোহ নিতান্ত বৃদ্ধি করিল। তখন তিনি শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞান সবই ভুলিয়া ছিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, দূরদেশাধিপ কোন প্রবল নরপতি হস্তিরথাদি চতুরঙ্গ সৈন্যসমভিব্যাহারে কান্যকুব্জে আগমন পূর্ব্বক নগরী অবরোধ করিল। এই দুই মহাপরাক্রান্ত রাজার সংঘর্ষে বহুসৈন্যের নিপাত হইল। অবশেষে তালধ্বজ রণে ভঙ্গ দিলেন। এই নিদারুণ সমরক্ষেত্রে তাঁহার পুত্র পৌত্র জীবন বিসর্জ্জন দিল। তখন নারীরূপী নারদ ভূতলে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভগবান বাসুদেব শুক্লাম্বরধারী মধুরমূর্ত্তি বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপ জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া মৃত পুত্রাদির মঙ্গলার্থে তাঁহার তীর্থজলে স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনিও তাঁহার কথামত পুরুষ নামক তীর্থে উপস্থিত হইলেন এবং যেমন তাহাতে অবগাহন করিলেন অমনি পূর্ব্বমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার চিত্তে পূর্ব্বজ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং দেখিলেন হরি তাঁহার বীণা ও বসন লইয়া তীরে সেই ভাবেই দণ্ডায়মান আছেন। জলে নিমগ্ন হইতে যে সময় অতিবাহিত হয়, সেই অবকাশে দেবর্ষি নারদের এই মহতী অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। পূর্ব্ব উপাখ্যানে যেমন শক্তিমান শিক্ষকের যোগবলে সম্রাট্ শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে অভিভূত হইয়া ছিলেন, পৌরাণিক এই আখ্যায়িকায় দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া ক্ষণিকের ব্যবধানে, বহুকালব্যাপী

চিন্তাবলী সমন্বিত এক অপূর্ব্ব জীবন নাটক স্বপ্ন-চৈতন্যে অভিনয় করিয়া ফেলিলেন।

এই দুইটি ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানানুমোদিত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; তাই প্রত্যক্ষবাদী ও বৈজ্ঞানিকেরা শ্রদ্ধা করিতে পারেন এমন দুই একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। আমরা এইবার যে উদাহরণটি দিব, সেটি অল্পদিন হইল একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের স্বীয় জীবনের ঘটনা। অতএব পৌরাণিক বলিয়া তাহাকে উপহাস করা যায় না। তাঁহার দন্ত উৎপাটন আবশ্যক হওয়ায় তিনি একজন দন্ত-চিকিৎসা বিদের সমীপে উপস্থিত হন। যেমন বিধান আছে, প্রথমে বাষ্পদ্বারা তাঁহাকে সম্মোহিত করিবার উদ্যোগ হইল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কল্প করিলেন যে, বাষ্প আঘ্রাণ করিবার পরক্ষণ হইতেই তাঁহার চৈতন্যের কিরূপ বিকার হয় তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না। বাষ্প আঘ্রাণ করিবা মাত্র একপ্রকার তৃপ্তিপূর্ণ মোহে একপ্রকার আনন্দ তন্দ্রায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে যে সংকল্প করিয়াছেন, তাহার বিষয় কিছুই স্মরণে রহিলনা।

এখন তাঁহার বোধ হইতেছে যে, যেন তিনি প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতকৃত্যাদি সমাপনান্ত তাঁহার বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করিয়া নানা নূতন নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিতেছেন। তাহার পর সেই সমস্ত নবাবিস্কৃত অত্যাশ্চর্য্য সত্যসম্বন্ধে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বিজ্ঞানাচার্য্যগণ সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন। জগৎ তাঁহার আলোচনা ও আবিষ্কারে মুগ্ধ; বিজ্ঞান জগৎ একবাক্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে; রাজার নিকট বিশিষ্ট সম্মান তিনি লাভ করিতেছেন। দিনের পরদিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এইরূপ আবিষ্কার, এইরূপ সম্মান, এইরূপ প্রশংসা। সেই সমস্ত আবিষ্কার অতি মহৎ, তাহারা দার্শনিক জগৎকে

একেবারে স্তম্ভিত করিয়াছিল। মহা মহা বিজ্ঞানাচার্য্যগণের সে প্রশংসা শ্রবণ তাঁহাকে অমৃতধারায় যাহা স্নান করাইত ও তাহাতে যে তাঁহার বিপুল আনন্দ হইত, যে সন্তোষ ধবল জ্যোতিতে তাঁহার চিত্তে ক্রীড়া করিত তাহা, তিনি বলিয়াছেন, নরভাষায় প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব। কত কাল এইরূপ কাটিল। একদিন তিনি ইংলণ্ডের রাজকীয় বিজ্ঞানসভায় (Royal Society of England) বক্তৃতা দিতেছেন, এমন সময় এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, It is all over now—সাঙ্গ হইল। তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া যেমন সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, অমনি আবার শুনিলেন,—"They are both out" তাহারা দুইটিই বাহির হইয়াছে। তখন তাঁহার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি আসনে উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁহার উৎপাটিত দন্তদুইটি লইয়া দক্ষ চিকিৎসক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সবেমাত্র চল্লিশ সেকেণ্ডকাল ব্যবধানে তিনি কৃত্রিম স্বপ্নে এই ঘটনাপূর্ণ দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিলেন।

কিন্তু, এই স্থলে একটী কথা বলা যাইতে পারে—এই সমস্ত উদাহরণ যাহা দেওয়া হইল, তাহারা সমস্তই কৃত্রিম স্বপ্নের। স্বাভাবিক স্বপ্নসম্বন্ধে ঠিক ইহাই হয়। বৈজ্ঞানিকেরা স্বপ্নসম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠে এই সত্য স্পষ্টরূপে অনুমিত হয়। আমরা পূর্ব্বে তাহার কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি।* তথায় ফরাশীয় মরি সাহেবের, জারমানী দেশীয় রিচার্স (Richers) সাহেবের ষ্টিফেন্‌স (Steeffens) সাহেবের লিখিত স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সকল গুলিই সেই একই সত্য বিবৃত করিতেছে—স্বপ্ন-চৈতন্যের ক্রিয়াকে দেশ বা কাল ব্যবচ্ছেদ করিতে পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

* অলৌকিক রহস্য ৪র্থ ভাগ ৩য় সংখ্যা স্বপ্ন তত্ত্ব পৃঃ ৯৭—১০০।

হানা বাড়ী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তদনন্তর সন ১৩১১ সালে ৮ই ভাদ্র বুধবার মদীয় চতুর্থ ভাগিনেয়ী নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন। ইহার মাস ছয় পরে অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে মদীয় মাতামহী দেহান্তর প্রাপ্ত হইলেন। সন ১৩০৭ হইতে ১৩১১ সাল, অর্থাৎ এই চারি বৎসরের মধ্যে আমরা সাত জনকে জন্মের মত হারাইলাম। উহাতে আমাদিগের আন্তরিক ও বাহ্য অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়াছে, তাহা ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। অবশ্য এই সকল প্রাণবিয়োগ ব্যাপারের প্রত্যেকটি যে আমাদের এই বাড়ীতে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু, তাহা না হইলেও উহাতে আমাদের মানসিক অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছিল। একে মধ্যে মধ্যে নব নব শোকের আবির্ভাব তাহার উপর অভিনব পারিবারিক উপদ্রব!

ইহার পর একদিন রাত্রিকালে একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারে পরিবারস্থ সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। সকলেই গভীর নিদ্রায় অচেতন আছেন, এমন সময় একটা বিকট শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দে সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং প্রদীপ সাহায্যে দেখা গেল যে, ঘরের কতকগুলি বাসন এলোমেলোভাবে মেজের উপর বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমরা অনুমান করিলাম, গৃহমধ্যে নিশ্চয় কোন তস্কর প্রবেশ করিয়াছে। অনুসন্ধান করিতে করিতে আর একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার নয়ন গোচর হইল। সেই ঘরের জানালায় একটা বৃহৎ লোহার হুড়্‌কা ছিটকিনির ভিতর দিয়া আটকান ছিল উহা এত আঁট করিয়া লাগান ছিল যে, সহজে

কেহ খুলিতে পারে না। সেই হুড়কাটা মেজের উপর পড়িয়া রহিয়াছে দেখা গেল।

বাসনগুলি এলোমেলো ভাবে ছড়ান থাকিতে দেখিয়া প্রথমে দু'একজনের মনে হইয়াছিল, বোধ হয় বিড়ালে ঐরূপ করিয়া থাকিবে; কিন্তু হুড়কাটির অবস্থা দেখিয়া আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইল। গৃহমধ্যে যে তস্কর প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া প্রদীপ লইয়া সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তস্কর প্রবেশের কোন মাত্র চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। সুতরাং মনোমধ্যে নানারকমের চিন্তা ও ভীতি আসিয়া উপস্থিত হইল। কেহই কোন রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। সকলেই বিস্মিত ও চিন্তিত চিত্তে স্ব স্ব স্থানে আসিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই। এই ব্যাপার পাড়ার কাহাকেও জানান হইল না।

আর একদিন রাত্রে উক্তপ্রকারে সকলে নিদ্রিত আছেন, এমন সময় অকস্মাৎ একটা ঠক্ করিয়া শব্দ হইল যেন কি পড়িয়া গেল; সেই শব্দে আমাদের সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারা গেল যে, প্রত্যেকই ঐ শব্দ শুনিতে পাইয়াছেন! তখনই আমরা শয্যাত্যাগপূর্ব্বক উহার অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলাম এবং দেখিলাম যে, মাতাঠাকুরাণীর গৃহের কুলুঙ্গিতে যে একটা বড় লোহার স্ক্রুড্রাইভার ছিল, সেটা মেঝের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। উহা বহুদিন হইতে ঐ স্থানে ছিল, কেহ কখন উহাকে স্থানান্তরিত করে নাই। আজ এতরাত্রে কে সেটাকে ফেলিয়া দিল, কিছুই স্থির করিতে পারা গেল না। যাহা হউক উহাকে যথাস্থানে রাখিয়া আমরা পুনরায় শুইতে যাইতেছি, এমন সময় আমার ছোট ভাইয়ের গায়ের নিকট দিয়া একটা লম্বা মতন জিনিস

পড়িতে দেখা গেল এবং পতনশব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্র সকলের মনোযোগ সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। তৎক্ষণাৎ আমরা সকলেই সেইদিকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং দেখিলাম যে, কাঠের দু'টা বাতিদান মেঝের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। সেই বাতিদান দু'টা দাদার ঘরে সেলফের উপর রাখা হইয়াছিল। আমরা মনে করিলাম, বোধ হয়, ইঁদুরে ওদুটাকে ফেলিয়া দিয়াছে, তাহা না হইলে, কে আর ফেলিবে, কারণ গৃহমধ্যে চোর প্রবেশ করিলে নিশ্চয়ই তাহার কোন না কোন প্রমাণ পাওয়া যাইত। তারপর পুনরায় আমরা শুইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দাদা আমাদিগকে ডাকিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতে বলিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার ঘরে গিয়া দেখি যে, তাঁহার বিছানার উপর চাদরের নীচে কি একটা জিনিস উঁচু হইয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ চাদর সরাইয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের ভুঁজালিটা তথায় রহিয়াছে। ইতিমধ্যে ভুঁজালিটা কে তাঁহার বিছানার উপর চাদরের নীচে রাখিল, তাহা আমরা অনুমান পর্য্যন্ত করিতে পারিলাম না। ইতিপূর্ব্বে তিনি ঐ বিছানায় শুইয়াছিলেন, তখন কোন পদার্থ তাঁহার গাত্রে অনুভূত হয় নাই, আর এই কয়েক মিনিটের পরই উহা কি প্রকারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল! ঐ ভুঁজালিটা তাঁহার ঘরে সেলফের উপর উক্ত বাতিদান দুইটার সহিত একস্থানে রাখা হইয়াছিল। বাতিদান দু'টাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল ইঁদুরে ফেলিয়া থাকিবে, কিন্তু ভুঁজালিটাকে ত আর ইঁদুরে মুখে করিয়া তাঁহার বিছানার উপর চাদরের নীচে রাখিতে পারে না—তবে এ কাজ কে করিল? এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করা দুরূহ ব্যাপার। যাহাহউক, উক্ত ভুঁজালিটা লইয়া আমার আলমায়রার ভিতর চাবি বন্ধ করিয়া রাখিলাম। যেরূপ অদ্ভুতব্যাপার সমূহ আরম্ভ হইতেছে, না জানি কখন কি হয়।

এবম্প্রকারে গৃহের জিনিস পত্র কিছুদিন স্থানান্তরিত হইতে

আরম্ভ হইল। দিনে দুপুরে রাত্রে এখানের জিনিস সেখানে, সেখানের জিনিস এখানে, এইপ্রকারে নাড়া চাড়া হইতে লাগিল। আমাদের অলক্ষিতে কে যে এই সব কাজ করিতেছে এবং ইহাতে তাহার কি যে স্বার্থ, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোন রকম ...ান না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রতীকারের চেষ্টাও হইতেছে না।

আর এক রাত্রিতে—আন্দাজ তখন ১২টা হইবে—মাতাঠাকুরাণীর বিছানার নিকট কে যেন তিনবার শব্দ করিল, এইরূপ শুনা গেল। শব্দ যে খুব জোরে হইয়াছিল, তাহা নহে, কোন কবাটে বা জানালায় হাতের আঙ্গুল দিয়া চাপ্‌ড়াইলে যেরূপ শব্দ উত্থিত হয়, সেই প্রকার। উহার সঙ্গে সঙ্গে থালাঘটি ফেলিলে যেরূপ ঝণাৎ করিয়া শব্দ হয়, সেরূপ শব্দও শ্রুত হইল। সেই শব্দে আমাদের সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং প্রদীপ জ্বালিবার জন্য উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় পুনরায় তক্তাপোষ চাপ্‌ড়াইবার শব্দ তিন বার শুনা গেল। উহাতে আমরা মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে নিশ্চয় চোর ঢুকিয়াছে, প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে জানিতে পারিয়া তক্তাপোষের নীচে দিয়া পলায়ন করিতেছে; বোধ হয়, তক্তাপোষে তাহার মাথা ঠকাস্ ঠকাস্ লাগিতেছে বলিয়া ঐরূপ শব্দ উত্থিত হইতেছে। তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া চারিদিক দেখিতেছি ইতিমধ্যে পুনরায় উপর্য্যুপরি তিনবার ঐ রকম শব্দ হইল। সেদিকে মনোযোগ না দিয়া চোরের সন্ধানে ব্যস্ত রহিলাম। কিন্তু তস্কর প্রবেশের কোনমাত্র চিহ্ন বাহির করিতে পারা গেল না, কেবল কতকগুলি এঁটো বাসন এলোমেলো হইয়া ছড়ান রহিয়াছে দেখা গেল। এতদ্ব্যাপারে প্রত্যেকেই বিশেষ বিস্মিত হইলেন। সকলের সম্মুখে—অন্ধকারে নহে—আলোতে, ঐরূপ শব্দ শ্রুত হইল, অথচ কি প্রকারে এবং কাহার দ্বারা হইল, তাহা কেহই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

ইহার পর হইতে উক্তপ্রকার ব্যাপার সমূহ অপেক্ষাকৃত আশ্চর্য্য রকমের এবং সংখ্যায় অধিক পরিমাণে আরম্ভ হইতে চলিল। আমি উপর্য্যুপরি কয়েক মাসের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য, ঈশ্বরানুগ্রহে যদি কখন এতদ্ সম্বন্ধে কোন রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি! সমস্ত ঘটনা গুলি বিশদরূপে বিবৃত করিতে হইলে, এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে পাঠক পাঠিকাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা, এতদাশঙ্কায় কেবল প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি এস্থলে প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু তাহাও অল্প নহে। যাহা হউক আশা করি, ঘটনা সমূহের মৌলিকতা উপলব্ধি করিয়া শেষ রহস্যোদ্ঘাটন পর্য্যন্ত তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

সন ১৩১১ সাল ১০ই আষাঢ় শুক্রবার, রাত্রি প্রায় একটা দেড়টার সময়, অকস্মাৎ দাদার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আলো লইয়া তাঁহার ঘরে যাইবার জন্য মাকে ডাকিলেন। আলো জ্বালা হইতেছে এমন সময় তাঁহার ঘরে ঠং করিয়া কোন দ্রব্য পতনের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ প্রদীপ লইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করা হইল এবং কোথায় কিসের শব্দ হইল, তাহারই অনুসন্ধান হইতেছে, এমন সময় পুনরায় ঠং করিয়া আর একটি শব্দ হইল। শব্দ হইবামাত্র দেখা গেল একখানা গিনি মেঝের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে! তখনই উহা কুড়াইয়া লওয়া হইল। আলো লইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে আর একখানি গিনি তাঁহার তক্তাপোশের নীচে পাওয়া গেল। গিনি কোথা হইতে আসিল? যখন আমরা এই বিষয় ভাবিতেছিলাম, মাতাঠাকুরাণীর মনে পড়িল তাঁহার তোরঙ্গে কয়েকখানি গিনি আছে, সেই গুলি তো পড়িল না! এইরূপ সন্দেহ হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তোরঙ্গ খুলিয়া দেখিলেন যে, তিনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে! শুধু গিনি যায় নাই উহার সহিত টাকা

পয়সা যা' ছিল, সমস্তই গিয়াছে,—তাহার মধ্যে সবেমাত্র দুই দুইখানি পিনি এখন পাওয়া গেল। দ্রব্যাপহরণ পর্য্যায়ে টাকা পয়সা গহণাপত্র যেরূপ কৌশলে অপহৃত হইয়াছে, ইহাও তৎশ্রেণীর অন্তর্ভুত। কিন্তু সেগুলি অলৌকিক হইলেও পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি তাহাতে সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল। অন্ধকার রজনীযোগে যে অদ্ভুত ব্যাপার নয়ন গোচর হইল তাহাতে আমাদের উক্তপ্রকার পূর্ব্ব ধারণায় ব্যতিক্রম উপস্থিত হইল। কারণ ইহাতে পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি যে সংশ্লিষ্ট নাই, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যাহা হউক, এতদ্-সম্বন্ধে সে রাত্রি আমরা অধিক কিছু আলোচনা করিতে পারিলাম না।

তৎপরবর্ত্তী দিবস, অর্থাৎ ১১ই আষাঢ় শনিবার, দাদা আফিস হইতে আসিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাস্থানে রাখিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বিছানার উপর একটি 'দানাদার' (মিষ্টান্ন বিশেষ) ও একটি পচা রম্ভা কে রাখিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে, কেহ ওগুলি ওখানে রাখে নাই এবং বাড়ীতেও ওসব জিনিস আদৌ আসে নাই। ইহার পরদিবস, দুপুর বেলা, মাতাঠাকুরাণীর বিছানার নিকট দেওয়ালের গায়ে একটি ব্র্যাকেটের উপর একটা 'কিষণভোগ' আম রহিয়াছে দেখা গেল। বলা বাহুল্য, বাড়ীর কেহই উক্তপ্রকার বা অন্য রকমের কোন আম সেদিন আনেন নাই। তবে কি যে সকল দ্রব্য পূর্ব্বে অলৌকিকরূপে অপহৃত হইয়াছে, তাহার এক একটি পুনরায় অলৌকিকরূপে প্রদর্শিত হইতেছে! এ গূঢ় রহস্য কেহই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় আর একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য সর্ব্বসমক্ষে অদৃশ্য-ভাবে প্রদর্শিত হইল। আমাদের বড় ঘরের মেঝের উপর সন্ধ্যার সময় যেন শূন্য হইতে বৃষ্টিপতনের ন্যায় সিকি, দুয়ানি, পয়সা পতিত হইতে

দেখা গেল! এ ব্যাপার শুনিলে, এবং আমাদের পক্ষে মনে হইলে, গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। সন্ধ্যার সময়—সব ঘরই প্রায় অল্প অল্প অন্ধকার, ঘরের ভিতর হইতে তখন সকলেই বাহিরে আছেন; দাদা বেড়াইতে যাইবার জন্য দালানে আসিয়া কাপড় পরিতেছিলেন, এমন সময় বড়ঘরের মেঝের উপর কি যেন ঠুক্ করিয়া পড়িবার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। বৌদিদি সেই ঘরে সন্ধ্যা দিতে আসিয়াছেন। আলোর সাহায্যে দেখিতে পাওয়া গেল, একটা সিকি পড়িয়া রহিয়াছে। তারপর, নড়িতে নড়িতে, একটা দুয়ানি পড়িল। এই ব্যাপার হইতেছে, শুনিতে পাইয়া, সকলেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে উপর্য্যুপরি সিকি দুয়ানি পয়সা প্রভৃতি শূন্য হইতে পতিত হইতে আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ঐরূপ মধ্যে মধ্যে এক একটি করিয়া ঠুক্‌ঠাক শব্দ হওয়া আর উহার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি মুদ্রা নয়নগোচর হওয়া! সে যেন ঠিক স্বপ্নের মতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা বহুদিন হইতে নানারূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারে অভ্যস্ত আছি বলিয়া, সেদিনকার উক্তপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য ও অলৌকিক ঘটনায় বিশেষ বিস্মিত হই নাই, বরং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, পূর্ব্বে একদিন রজনীতে মাতাঠাকুরাণীর তোরঙ্গ হইতে গিণি সমেত যে পয়সা কড়ি গিয়াছিল, সেই গুলিই এক একটি করিয়া আজ পড়িতে লাগিল।

এই সকল অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে অবস্থান হেতু আমাদের কৌতূহল ক্রমশই বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, সুতরাং প্রতীকারের চেষ্টায় বিরত রহিলাম। পরবর্ত্তী দিবস, ভিন্নপ্রকারের এক অভিনব ব্যাপার নয়নগোচর হইল। সেদিন ১৩ই আষাঢ় সোমবার—দাদা আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! দেখিলেন মেঝের উপর

চন্দন পিঁড়ি, চন্দনকাষ্ঠ, কোশাকুশী প্রভৃতি সন্ধ্যাহ্নিকের যাবতীয় উপকরণ রহিয়াছে ; একখানি আসন ও এক ঘটী জলও দেখিতে পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, ঐ সকল দ্রব্য অন্যান্য গৃহে যথাস্থানে রাখা হইয়াছিল ; চন্দনপিঁড়ি, চন্দনকাষ্ঠ, কোশাকুশী বড়ঘরের কুলুঙ্গিতে, আসন খানা কাপড়ের আলনায় এবং ঘটীটা জলচৌকির উপর ছিল। দাদা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াই আমাদিগকে ডাকিলেন। সেই ঘরে ঢুকিবামাত্র চন্দনের সুগন্ধ আমাদের নাকে প্রবেশ করিল। তারপর আমরা দেখিতে পাইলাম, খানিকটা ঘসা চন্দন পিঁড়ির একপার্শ্বে রহিয়াছে—সবেমাত্র কে যেন উহা ঘসিয়া রাখিয়া গিয়াছে ; আর কোশার উপর কুশীটা উপোড় হইয়া রহিয়াছে ; মেঝের উপর কয়েক ফোটা জলের চিহ্নও দেখা গেল। এতদ্দর্শনে আমরা সহজেই অনুমান করিয়া লইলাম যে, যিনি অদৃশ্যভাবে বিবিধ অলৌকিক কার্য্য আমাদিগকে প্রদর্শন করিতেছেন, তিনিই অদ্য এস্থলে আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত অন্য কিছু সন্দেহ করিতে পারা গেল না। আমরা পরস্পরে যখন এতদ্‌সম্বন্ধে কথোপকথনে নিযুক্ত আছি, সেই সময় সেই স্থানে দাদার সম্মুখে একটা টাকা ঠনাম্ করিয়া শূন্য হইতে পড়িল। তাহাতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সেই অদৃশ্য পুরুষ আহ্নিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তখনও পর্য্যন্ত সেইস্থানে বর্ত্তমান আছেন এবং তাহা জানাইবার জন্য এইরূপ সঙ্কেত প্রদান করিলেন। অদ্যকার এই অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টে তাঁহার প্রতি আমাদিগের কেমন একটা ভয় ও ভক্তি জন্মিল এবং আমাদের কেমন একটা ধারণা উপস্থিত হইল—বোধ হয় সেই অদৃশ্য পুরুষ আমাদের হিতার্থে ব্যাপৃত আছেন! কারণ, যিনি এরূপ নিষ্ঠাবান যে সন্ধ্যাহ্নিক পর্য্যন্ত করেন এবং তাহা আমাদের এইখানেই সম্পন্ন করিলেন, তাঁহা দ্বারা আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট হইবার

সম্ভাবনা থাকিতে পারে না এবং উপর্য্যুপরি এই কয়দিন যে সকল কার্য্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে আমাদের হিতার্থী বলিয়াই যেন বোধ কেন যে উক্ত প্রকার ধারণা এককালে সকলের মনে প্রবিষ্ট হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উক্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আমাদের হিতার্থী বিবেচনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে আমরা নানা রকম অনুনয় বিনয় উক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলাম। যদি কখন কোনরকমে তাঁহার প্রতি আমাদের অসম্মান বা অভক্তি প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে, তিনি যেন আমাদিগকে নিজগুণে ক্ষমা করেন। এবম্প্রকার অনুনয় বিনয় চলিতেছে, এমন সময় দাদার সম্মুখে পুনরায় একটা দুয়ানি ঠুক্ করিয়া পড়িল। তাহাতে আমাদের মনে হইল যে, তিনি বোধ হয় আমাদের কাতরোক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় সঙ্কেত প্রেরণ করিলেন। তারপর খানিকক্ষণ অতিবাহিত হইল। সকলে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত আছেন এবং আমি এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দালানে পাইচারি করিতেছি, এমন সময়, আমার সাম্নে, ঠুক্ করিয়া একটি শব্দ হইল, যেন উপর হইতে কি একটা পড়িল। তৎক্ষণাৎ প্রদীপ লইয়া দেখা গেল যে, একটি সিকি পড়িয়া রহিয়াছে। তৎপতনে আমার মনে হইল যে, আমি যে সকল বিষয় চিন্তা করিতেছি, সে সকল বোধ হয় তিনি জানিতে পারিয়াছেন—তাঁহার বোধ হয় এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতাও আছে, তদ্‌জ্ঞাপক এই সঙ্কেত প্রদান করিলেন। কেন যে মনোমধ্যে এইপ্রকার অদ্ভুত ভাব ও চিন্তার উদয় হইল তাহাও বলিতে পারি না! যাহা হউক, সে রাত্রিতে এই পর্য্যন্ত অভিনয় হইয়া সমস্ত থামিয়া গেল।

পরদিবস, অর্থাৎ ১৪ই আষাঢ় মঙ্গলবার ১৩১১ সাল, অফিস হইতে বাটী আসিয়া শুনিলাম, দুপুরবেলা মা ও বৌদিদি যখন আহার করিতে-

ছিলেন, আমাদের খুকি (দাদার কন্যা, নাম রেণুকণা) তখন দাদার দাদার তক্তাপোষে ঘুমাইতেছিল। তাঁহাদের আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সে উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া পুকুরে গেলেন পুকুর হইতে বাড়ীতে আসিয়া দেখেন যে, খুকি দালানে একটা মাদুরের উপর শুইয়া খেলা করিতেছে, আর হাসিতেছে! দালানে কে তাহাকে শোয়াইয়া দিল? সে দাদার তক্তাপোষের উপর ঘুমাইতেছিল। সেখান হইতে তাহাকে দালানে লইয়া আসিবার লোক বাড়ীর মধ্যে তখন কেহই ছিল না, কেবল পঙ্কু ও নেনো (দাদার পুত্রদ্বয়) অন্য ঘরে ঘুমাইতেছিল—ইহাদের দুইজনের মধ্যে কেহই খুকিকে কোলে লইতে পারে না, আর তখন তাহারা ঘুমাইতেছিল। পাড়ার কোন কোন লোকও বাড়াতে আসে নাই যে, সে মাদুর বিছাইয়া খুকিকে দাদার ঘর হইতে আনিয়া দালানে শোয়াইয়া চলিয়া যাইবে। কারণ, আমাদের বাড়ী আসিতে হইলে পুকুরের নিকট দিয়া আসিতে হয়। মা বৌদিদি যখন পুকুরে ছিলেন, তখন কাহাকেও আমাদের বাড়ী আসিতে দেখেন নাই। তবে কে তাহাকে শোয়াইয়া দিল! এই ব্যাপারে তাঁহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। আমরা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের হিতার্থী অদৃশ্য পুরুষেরই এই কাজ! পাছে খুকি বিছানা হইতে পড়িয়া যায়, সেইজন্য তিনি তাহাকে দালানে আনিয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আমাদের একজন হিতার্থী বলিয়া পূর্ব্ব দিনে আমাদের যে একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল, অদ্যকার এই ব্যাপারে, তাহা সপ্রমাণ হইল এবং তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

সেই কি এই ?

কে বলিবে এই কিনা ? যাঁহারা পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে নিম্ন লিখিত গল্পটী প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিতে বলি। ঘটনাটী প্রত্যক্ষ, এবং আধুনিক, সেইজন্য ইহাতে তর্কের কিছুই নাই।

আমাদের যে পাড়ায় বাস, তাহার অদূরে অর্থাৎ ৮।৯ রশি তফাৎ কয়েক ঘর মুচী বাস করে। ইহাদের মধ্যে যাদব নামে এক জন ছিল। কয়েক বৎসর হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। যাদব বেশ হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ট ছিল, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত। এই যাদবের একটী পুত্র জন্মে। সেই শিশুটীই আমাদের গল্পের বিষয়।

ছয় বৎসর বয়সে শিশুটী ইহলোক ত্যাগ করে। এই অল্প দিনের মধ্যে সে যাহা দেখাইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে, জন্মান্তরের প্রতি সন্দেহ রাহয়া যায়। তাহার চেহারায় কেমন একটু মাধুরী ছিল যে, বিশিষ্ট রূপবান না হইলেও কোন ক্রমেই নিম্ন শ্রেণীর ঘরের ছেলে বলিয়া তাহাকে বিশ্বাস হয় না। জন্মাবধি মাতৃ স্তন্য ও গো দুগ্ধ ভিন্ন সে কিছু খায় নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই, গো দুগ্ধ তাহার জননী ভিন্ন অন্য কাহার হাতে খাইত না, তাহাও আবার জ্বাল দেওয়া হইলে হইবে না। একদিনও তাহাদের অন্ন স্পর্শ করে নাই বা খাইবার আগ্রহ দেখায় নাই। পাড়াগাঁয়ে ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট ভোজ্য, মুচীদের মেয়েছেলে আগ্রহের সাহত লইয়া যায় ও আনন্দের সহিত সেই পরিত্যক্ত অথচ উপাদেয় সন্দেশ, রসগোল্লা, পায়স, ক্ষীর প্রভৃতি ভোজন করে। এই বালকটী কোন দিন তাহাদের সহিত আইসে নাই, বা তাহার মাত

পিতা লইয়া গেলেও সে খাদ্য খায় নাই। সেরূপ দিনে শিশুটী কিছুতেই গৃহের বাহির হইত না। তাহার জনক জননী কত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে কোন উৎসব বাটীতে আনিতে পারে নাই।

কতদিন তাহাকে দেখিবার জন্য আমরা তাহাদের বাটীতে গিয়াছি। সে শিশুটী দৌড়িয়া গৃহের মধ্যে যায়। আমরা চলিয়া না গেলে বাহির হয় নাই। স্বজাতির ছেলেদেরও সহিত তাহার মেশামিশি কম ছিল। দর্শনার্থী কোন ভদ্রলোকের সমক্ষে এতই সঙ্কুচিত হইত, যেন কতই অপরাধ করিয়াছে! কিছু দিতে চাহিলেও আগ্রহ প্রকাশ করিত না। কাহার সহিত বড় বাক্যালাপ করিত না; অতি শান্ত, অতি স্থিরভাবে আপন মনে ঘরে বসিয়া খেলা করিত। দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছু খাইত না বলিয়া তাহার পিতা একটী দুগ্ধবতী গাভী পুষিয়াছিল। তাহারই দুগ্ধ তাহার জীবনোপায় ছিল। শিশুটীর এবম্বিধ আচার দেখিয়া বিশেষতঃ তাহার জন্মের পর তাহাদের সচ্ছলতা বাড়িয়াছিল বলিয়া যাদব তাহার পুত্রটীকে বড়ই যত্ন করিত। শুনিয়াছি কোন কারণে দুগ্ধ না মিলিলে সে দিন উপবাসে শিশুটী কাটাইয়াছে। জন্মাবধি বড় পীড়ার মুখ দেখে নাই। শেষে সহসা এক দিন একটু জ্বর হইল, তাহাতেই তাহার লীলা শেষ হইল। অনেকে বিদ্রূপ করিয়া যাদবকে বলিতেন "তোর ঘরে এক অবতারের আগমন হইয়াছে।"

ছেলেটী মরিবার পর হইতেই যাদবের সংসারে নানারূপ বিপদ দেখা দিল। অর্থ কষ্ট হইল, পৃথগন্ন হইল। নিজেও বহুদিন পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তাহার স্ত্রী ও অন্য পুত্র এখনও এ কাহিনী বলিয়া থাকে।

অনেকে বিদ্রূপ করিলেও আমি বিরত হইতে পারিলাম না। প্রাচীনবর্গের নিকট কথা প্রসঙ্গে বালকটীর জন্মান্তর সংস্কার বলিয়া

বুঝাইতে লাগিলাম। কথায় কথায় শুনিলাম গ্রামের * * গোষ্ঠীর এক মহাপুরুষ ঐ বাটীর এক মুচনীতে আমরণ আসক্ত ছিলেন। অনেকেই তাহা টের পাইয়াও উহাদের প্রভাবে কেহ মুখ ফুটিয়া বলে নাই। তাই মনে হইল "সেই কি এই?"

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটনা।

২০/২১ বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুরে একজন উকিল একটি বড় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। সেই স্থানের প্রতিবাসীরা বলিতেন যে এই বাটীতে বাস করা উচিত নয় বাটীতে ভয় আছে। কিন্তু উকিল বাবুর পরিবারবর্গ কিছুদিন যাবত কোনও কিছু দেখেন নাই বা ভয়ও পান নাই।

ঐ বাটীতে অনেকগুলি গাছ ছিল। আম, জাম, সুপারী প্রভৃতি ও একটী পুষ্করিণীর একদিকে একটি গাবগাছ ও একদিকে একটী সিমুলগাছ ও কৎবেল গাছ ছিল।

কিছুদিন এই বাটীতে বাস করিবার পরে বাবুর দুই বৎসর বয়স্ক একটি মেয়ের জ্বর হয়। তৎক্ষণাৎ মেয়েটীকে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু জ্বর উপশম না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন কলিকাতার বড় বড় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়, কিন্তু কোনও প্রকারে রোগের উপশম হয় না এবং মেয়েটীর চেহারা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে।

কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হওয়ার পরে একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় অতিভয়ানক এক বিকট আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। সেই আওয়াজ

অন্য ৫।৬ বাড়ীর লোকেও শুনিতে পায়। এবং সকলেরই বেশ ধারণা হয় যে, ঐ আওয়াজটী সিমুলগাছ অথবা কৎবেল গাছের উপর হইতে হইয়াছে ও এটী কোনও পার্থিব জানোয়ারের চীৎকার নয়। সেই রাত্রিটা কোনও ভাবে কাটিয়া গেল কিন্তু মেয়ের ব্যারাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে থাকে। তাহার আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার চারিদিকে বসিয়া আছে, এমন সময় শুনিতে পায় যেন তাহাদের সামনের নিকট একটী নারিকেল গাছের উপর হইতে ৫।৬ ঝোড়া ইট্ পাটকেল হুড়, হুড় করিয়া পড়িয়া গেল।

চিকিৎসকেরা মেয়েটিকে সন্ধ্যার পরে ফোমেণ্ট করিতে বলিয়াছিলেন। ফোমেণ্ট করিবার জন্য গরম জলের প্রয়োজন হওয়াতে একজন রান্নাঘর হইতে জল আনিবার জন্য উপর হইতে জানালা খুলিয়াই মুখ বাড়াইয়া কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং আসিয়া অন্য এক জনকে জলের কথা বলিতে বলেন। তিনি তখন কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় জানালা খোলেন ও যাহা দেখেন তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া থাকেন।

তিনি দেখেন যে, ঐ রান্নাঘরের ছাতের আলশের উপরে একটি বৃদ্ধ, গলায় একগোছা পৈতা, পরিধানে শুভ্র কাপড়, পায়ে খড়ম—একদৃষ্টে ঐ জানালার দিকে চেয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তখন সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং জলের আর প্রয়োজন নাই মনে করিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই বৃদ্ধকে দেখার ৩।৪ মিনিটের মধ্যেই বালিকাটীর শেষ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। তখন দেখা গেল বৃদ্ধও সেখানে নাই।

শ্রীজনপ্রিয় রায় চৌধুরী।

অলৌকিক রহস্য।

৯ম সংখ্যা] চতুর্থ বর্ষ। [চৈত্র

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কর্ম্মের গতি অতি বিচিত্র। কোন কর্ম্ম হইতে কি ফল হয় তাহা অনেক সময় বুঝা যায় না!

দার্শনিকেরা কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুমান করেন। কার্য্য ও কারণের এরূপ ঘনিষ্ঠতা আছে যে একটা থাকিলে আর একটা থাকিবেই। এমন কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাহার কোন কারণ নাই। কিন্তু কার্য্যের কারণ সঠিক নির্ণয় করা অনেক সময় শক্ত হইয়া উঠে। সেইজন্য অনুমানে কারণ ঠিক করা হয়। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া যদি বলা যায় ঐ স্থলে অগ্নি আছে তবে ইহা অনুমান সাহায্যে বলিতে হইবে। কারণ জানা আছে যে অগ্নি হইতেই ধূম উঠে। ন্যায় শাস্ত্রে এই অনুমান-তত্ত্ব অতি সুন্দর ভাবে লিখিত আছে।

আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, ভাল মন্দ কর্ম্মের উপর জীবের যে কেবল ইহকালের উন্নতি অবনতি নির্ভর করিতেছে, তাহা নহে, জীবের ভাল মন্দ কর্ম্ম অনুসারে তাহার পরকালেও উন্নতি বা অবনতি হইবে। জীবের ভবিষ্যৎ জীবের বর্ত্তমানের কর্ম্মের উপরই নির্ভর করিতেছে।

সাধক রামপ্রসাদের সরলভাবে খেদ প্রকাশ দেখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, আমাদের ভাল মন্দ অবস্থার জন্য কে দায়ী,—

"দোষ কারো নহে গো মা শঙ্করি।
আমি স্বখাদ-সলিলে ডুবে মরি॥"

বাস্তবিক কথাই তাই। আমরা সকলেই "স্বখাদ সলিলেই" ডুবে মরি, অর্থাৎ, আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করি, পরন্তু অজ্ঞানতা বশতঃ ঈশ্বরকে দোষী করিতে, গালাগালি দিতে, লজ্জিত হই না। আমরা নিজের কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে যখনই যাতনা পাই, তখনই "হায়রে পোড়া বিধি!" "হা ভগবান তোমার কি বিচার!" প্রভৃতি নিন্দা ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়া নূতন পাপ সঞ্চয় করি, এবং ভাবিনা যে এক সময় না এক সময় আবার এই নূতন পাপের ফল পাইতে হইবে।

মন্দ কর্ম্মের ফল কষ্টদায়ক বটে, কিন্তু তাই বলিয়া মন্দ কর্ম্ম করিতে কেহ কষ্ট বোধ করে না ত! পরন্তু মন্দ কর্ম্ম করিতে লোকে বিপুল আনন্দ পায়। তাহার কারণ আনন্দ না পাইলে কি আশায় লোকে মন্দ কর্ম্ম করিবে? লোকে জানে যে মন্দ কর্ম্মের ফল দুঃখপ্রদ ও যন্ত্রণাদায়ক। এখন মন্দকর্ম্মে আনন্দ না থাকিলে তাহার ফলের দুঃখ ও যন্ত্রণা পাইবার জন্য কে অগ্রসর হইবে? যেমন মৎস্যকে বঁড়শীতে টোপ দেখাইয়া কৌশলে গাঁথিতে পারা যায়, সেইরূপ পাপকর্ম্ম আপাততঃ ক্ষণিক আনন্দের লোভ দেখাইয়া জীবকে গাঁথিবার চেষ্টা করে। মৎস্যের যেমন লোভে পাপ ও পাপে মৃত্যু ঘটে, জীবেরও সেইরূপ পাপের ক্ষণিক আনন্দ পাইতে যাইয়া বহুকালব্যাপী যন্ত্রণা ও অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং সেই জীবকেই ধীরে ধীরে তাহার সকল কর্ম্মগুলির ফল ভোগ করিতে হয়।

কিন্তু ভাল কর্ম্মের কথা স্বতন্ত্র। ভাল কর্ম্ম করিলে মনে আনন্দ, হৃদয়ে শান্তি ও দেহে নূতন বল আসে। শুভ কর্ম্মের সবই ভাল, যেহেতু

আনন্দ ছাড়া দুঃখ এদিকেই আসিতে পারে না। সুতরাং যে জীবের জীবনে শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যত হইবে তাহার জীবন সেই অনুসারে নির্ম্মল ও ধন্য হইবে। এইজন্যই শাস্ত্রসম্মত উপদেশের এত ব্যবস্থা।

যাহাতে মানবজীবন পাপ-শূন্য হইয়া একটী বিমল আদর্শে পরিণত হয়, ইহাই ধার্ম্মিক শাস্ত্রকারগণের কামনা। সেইজন্য তাঁহারা বিধি নিষেধ সূচক বিবিধ প্রকার উপদেশের প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে যে, ভাল বা মন্দ কোন কর্ম্ম করিয়া কেহই সেই ভাল বা মন্দ কর্ম্মের ফল-ভোগের হাত এড়াইতে পারিবে না এবং যখন সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য দায়ী থাকিতে হইতেছে, তখন যে মানব আপনার নিজের মঙ্গল চাহিবে, সে ভাল কর্ম্ম ছাড়া মন্দ কর্ম্ম, পুণ্য ছাড়া পাপ, সাধ্যমত করিবে না। তুমি কি এক মিনিটের সুখ পাইবার আশায় নিদারুণ দুঃখ একবৎসর ভোগ করিতে চাও ?

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, অল্প সময় ব্যাপী পাপের জন্য এত গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা যুক্তি সঙ্গত নয়। কাহারও কিছু অর্থ চুরি করিতে কত সময় যায়! কিন্তু তাহার জন্য নরকে কতকাল বাস করিতে হয়! একটী আত্মহত্যা কার্য্য এক মিনিটে সম্পন্ন হয়, কিন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ শাস্তি-ভোগ কত যুগযুগান্ত ধরিয়া করিতে হয়! শাস্ত্রে আছে আত্মঘাতীর শতবর্ষ ধরিয়া উদ্ধার হইবে না।

কিন্তু এই যুক্তির উত্তরে এই বলা যায় যে, এ সংসারেই আমরা বিচারালয়ের দণ্ডবিধি আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই যে, সকল শাস্তিই পাপের গুরুত্ব অনুসারে দীর্ঘকাল ব্যাপী। সময় ধরিয়া পাপ কার্য্যের মাত্রা বুঝিতে পারা যায় না। এমন অনেক গুরুতর পাপ আছে যাহা অনুষ্ঠান করিতে অতি অল্প সময় লাগে এবং এমনও অনেক অপেক্ষাকৃত সামান্য পাপ কার্য্য আছে যাহা অনুষ্ঠান করিতে অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগে।

ক্রোধে কাহাকেও খুন করিতে যে সময় লাগে, সিঁদ কাটিয়া চুরি করিতে তাহার অপেক্ষা বেশী সময় লাগে। কিন্তু খুনের জন্য শাস্তি ফাঁসি বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস, এবং সিঁদ কাটিয়া চুরির জন্য বড়-জোর সাতবৎসর জেল হইতে পারে। অতএব পাপ গুরু হইলে দণ্ডও গুরু হইবে এবং লঘু হইলে দণ্ডও লঘু হইবে। এইজন্যই পাপ শূন্য জীবনে কোন ভাবী দণ্ড ভোগ করিতে হয় না; এবং তখনই মুক্তি লাভের জন্য সেই নিষ্পাপ জীবন ঈশ্বরের নিকট দাবী করিতে পারে।

কর্ম্মের বিচিত্র গতি সম্বন্ধে শ্রীমৎ দেবীভাগবতের ৬৯ স্কন্ধে কর্ম্ম-স্বরূপ বর্ণন নামক দশম অধ্যায়ে অতি সুন্দর জ্ঞানপূর্ণ কথা রহিয়াছে। বিষয়টী বড় জটিল বলিয়া উক্ত অধ্যায়ের সারমর্ম্ম দিলাম।

ইন্দ্রের অদ্ভুত চরিত্র, তাঁহার স্থান-ভ্রংশ ও দুঃখপ্রাপ্তি বর্ণনা শুনিয়া জনমেজয় ব্যাসদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন 'মহাভাগ! কৃপা করিয়া আমার এই সন্দেহ দূর করুন—ইন্দ্র মহাতপা ছিলেন, তিনি দুঃখনাশক দেবাধিপত্য পাইয়াও স্থান ভ্রষ্ট হইয়া দুঃখে পড়িলেন কেন?'

ব্যাস উত্তর করিলেন, 'নৃপবর'! তাহার অদ্ভুত কারণ সকল শ্রবণ করুন, তত্ত্ববিৎ মহাত্মারা বলেন যে, কর্ম্মের গতি সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও প্রারব্ধ ভেদে তিন প্রকার। ইহার প্রত্যেকে আবার তিন তিন প্রকার জানিবেন, যথা,—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক।

অনেক জন্মজনিত প্রাক্তন কর্ম্মকে সঞ্চিত কহে। সঞ্চিত কর্ম্ম শুভই হউক আর অশুভই হউক এবং বহুকালিকই বা হউক, প্রাণিগণকে অবশ্যই সেই সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। জীবগণের জন্ম জন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ-ব্যতিরেকে শত কোটী কল্পেও নিঃশেষরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

যে কর্ম্মের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া এখনও শেষ হয় নাই, তাহাকে বর্ত্তমান

কর্ম্ম কহে। জীবগণ দেহধারণ করিয়া শুভই হউক আর অশুভই হউক এই বর্ত্তমান কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে।

দেহান্তর সময়ে কাল পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্য হইতে কিয়দংশ আহরণ করিয়া ভোগের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া থাকে, তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম কহে; ফল ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রাণিগণকে অবশ্যই এই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। দেবতাই হউক আর মনুষ্যই হউক, অসুরই হউক বা যক্ষই হউক, গন্ধর্ব্বই হউক আর কিন্নরই হউক, পুরাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। পুরাকৃত কর্ম্মই সকলের দেহান্তরের কারণ হইয়া থাকে। কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণের জন্ম নাশ হয় তাহাতে সংশয় নাই।

কালের পরিপাক বশতঃ অনেক জন্ম জনিত সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে কোনও কর্ম্মের বেগ উপস্থিত হয়; যাহার বেগ উপস্থিত হয় তাহাই প্রারব্ধ, সেই প্রারব্ধ বশে মনুষ্য এবং দেবাদি সকলেই যেরূপ পুণ্য করে সেইরূপ পাপ করিয়া থকে। ইন্দ্র পুণ্য বশতঃ যেমন দেবাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাপ প্রারব্ধ দ্বারা ব্রহ্মহত্যা-হেতু স্বীয়পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহের বিষয় আর কি আছে! কেবল ইন্দ্রই কর্ম্মের বশীভূত নহেন, ধর্ম্মপুত্র নর এবং নারায়ণও কর্ম্মের বশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাণিগণের দেহ সম্বন্ধে কর্ম্মের গতি অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। দেবগণও যখন তাহা জানিতে পারেন না, মানবগণের কথা আর কি বলিব। কর্ম্মের প্রকৃতি কিরূপ আমরা এই শ্লোকে দেখিতে পাইব।

"এবং তে কথিতা রাজন্! কর্ম্মণো গহনা গতি!
বাসুদেবোঽপি ব্যাধস্য বাণেন নিধনং গতঃ॥"

অর্থাৎ—রাজন! এই আমি আপনার নিকট কর্ম্মের গহন গতির

বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অধিক আর কি বলিব, এই কর্ম্মবশেই স্বয়ং বাসুদেবও ব্যাধের বানে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সুতরাং ইহা বেশ প্রতিপন্ন হইল যে, যাহা কিছু ঘটনা জীবনে ঘটুক না কেন, তাহার একটা কারণ থাকিবেই। যে ঘটনাকে আমরা Accident বা আকস্মিক বলি, তাহা প্রকৃত কারণ-হীন কার্য্য নয়, আমাদের জ্ঞানে সেই ঘটনার কারণ খুঁজিয়া পাই নাই বলিয়াই তাহাকে আকস্মিক বলি।

শাস্ত্র বলিতেছেন, অজ্ঞান বা অবিদ্যাই এই সংসারের মূল কারণ। তাহা হইতেই কামনা ও ক্রিয়া সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং সেই ক্রিয়া হইতেই সুখ দুঃখ সংঘটিত হয়। অতএব অজ্ঞান বিনাশের জন্য যত্ন করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। এই অজ্ঞান বিনাশ করিতে পারিলেই জীবগণের জন্ম সফল হয়। জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই জীব পুরুষার্থের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে। একমাত্র বিদ্যাই এই অজ্ঞান বিনাশে পটু। যেমন অন্ধকার অন্ধকার দূর করিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞান-জনিত কর্ম্মও অজ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং অজ্ঞান জাত কর্ম্ম কখন অজ্ঞান বিনাশে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান নাশের আশা করাও কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্ম সকল একান্ত অনর্থকর। জীবগণ কর্ম্মবশে পুনঃপুনঃ বিষয় কামনা করে। এই কামনা হইতে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, অনুরাগ হইতে দোষ এবং দোষ হইতে মহান অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইয়া বৈরাগ্য উদয় হয়, ততদিন যত্ন পূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু ভক্তগণের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন সর্ব্বকাজে সর্ব্ব সময়ে তাঁহাতে নির্ভর করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব কর্ম্ম যতই খারাপ থাকুক না কেন, সেই মন্দ কর্ম্মের ফল সব সময় তাঁহাদের ভোগ করিতে হয় না। ভগবান বিশ্বনিয়ন্তা জগৎ ও জীবের জন্ম মৃত্যু ও সুখ দুঃখের জন্য বিবিধ নিয়ম করিয়াছেন। কর্ম্ম ও তাহার ফল ভোগ ঈশ্বরেরই নিয়ম। তিনিই সব নিয়মের কর্ত্তা। তাঁহার নিয়মগুলি এত অভ্রান্ত, এত সুন্দর এবং এত স্থির ও অপরিবর্ত্তনীয় যে অনেক জ্ঞানীরা পর্য্যন্তও তাঁহার নিয়মগুলির মোহে পড়িয়া সকল নিয়মের কর্ত্তা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা এবং এদেশের অনেক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিই ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিয়া Nature বা প্রকৃতি সব করিতেছেন, এই বিশ্বাস প্রচার করিতেছেন। যাঁহাকে এই সব পণ্ডিতেরা Nature বা প্রকৃতি বলিতেছেন তিনি ঈশ্বরের নিয়ম সমষ্টি মাত্র। তাঁহার নিয়মে সূর্য্য পূর্ব্বে উঠিতেছেন, পশ্চিমে অস্ত যাইতেছেন; বর্ষাকালে মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতেছে, ছয়টী ঋতু ঠিক সময়ে আসিতেছে, দিন ও রাত পর পর হইতেছে, জন্ম ও মৃত্যু জগতে চলিতেছে। নাস্তিক পণ্ডিতগণ বলেন এই সব কার্য্য Nature এ করিতেছে। ঈশ্বরের ইহাতে কোন হাত নাই। যদি তাহাই হইত ঈশ্বর মনে করিলে একদিন সক করিয়া সূর্য্যকে পশ্চিমে উঠাইতেন।

কিন্তু কথা হইতেছে যে, ঈশ্বরই সকল নিয়মের আদিকারণ। তিনি মানুষের খেয়ালের মত এমন সখ্ করিবেন কেন, যাহাতে তাঁহার সৃষ্টির বিশৃঙ্খলা হয়! আর তাঁহার এত কি গরজ যে কতকগুলা নাস্তিকের আব্দার রাখিতে তাঁহাকে সত্য স্বরূপ নিয়মেরই বদল করিতে হইবে। নাস্তিকদের প্রধান দোষ যে তাহারা ঈশ্বরকে মানুষের মত একটা জীব মনে করে। এই সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, অন্য সময় বলিব।

এখন কথা হইতেছে যে, ভক্তের নিকট ভগবান যখন বশীভূত, তখন আর কি জিনিস ভক্তের নিকট দুর্লভ হইতে পারে!

বিশ্বজগতের সকল নিয়মের কর্ত্তা যখন বাধ্য হইল, ভক্ত তখন আর কাহাকে ভয় করে? ভক্তের সম্বন্ধে কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের নিয়ম সব সময় খাটেনা। ভক্তেরই ভগবান। যিনি নিয়মের কর্ত্তা, তিনিই মনে করিলে তাঁহার নিয়ম ভাঙ্গিতে পারেন। আর কেহই পারে না।

মার্কণ্ডেয়ের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে গল্প সকল হিন্দুই জানেন। মার্কণ্ডেয়ের মৃত্যু দিবস কি অঘটন ঘটিল ভাবিয়া দেখ দেখি! নিয়তিকে কেহই বাঁধিতে পারেনা, কারণ নিয়তির এত শক্তি ভগবানই দিয়াছেন। সেই নিয়তি যখন মার্কণ্ডেয়ের প্রাণ লইতে আসিল ভক্ত মার্কণ্ডেয় প্রাণ ভয়ে "ত্রাহি মে শিব" "আশুতোষ, বাবা তোমার সন্তানকে, যমের হাত থেকে বাঁচাও" বলিয়া শিবলিঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। তাঁহার বিশ্বাস মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট থাকিলে মৃত্যু আসিবে না। এদিকে যখন যমরাজ কঠোরভাবে শাসন করিয়া মার্কণ্ডেয়কে লইতে অগ্রসর হইল মার্কণ্ডেয় উন্মত্তভাবে "শিব, রক্ষা কর," বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আর কি ঠাকুর থাকিতে পারেন! "মাভৈ, ভয় নাই", বলিয়া জ্যোতিঃ রূপে আবিভূত-হইয়া মার্কণ্ডেয়কে দুই হস্তে রক্ষা করিয়া অপর দুই হস্তে ত্রিশূল লইয়া যমরাজকে তাড়না করিলেন। যমরাজ যোড় করে স্তব করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর, আপনার আদেশে আমি জগতে মৃত্যু-দেবতা হইয়াছি। লোকের অন্তিম সময় হইলে আমরই রাজ্যে তাহাকে যাইবার ব্যবস্থা আপনিই করিয়া দিয়াছেন। বহুকাল হইতে আপনার এই নিয়মেই কাজ চলিয়া আসিতেছে। ঠাকুর, আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

শিব উত্তর করিলেন "আমার একান্ত ভক্তকে তুই ত্রাস দিয়াছিস্ কেন? মার্কণ্ডেয় মৃত্যু চায়না, তুই কেন জোর করিবি! যখন আমার

ভক্তের ইচ্ছা হইবে তখন সে মরিবে। জানিস তুই, আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়!"

যমরাজ কম্পিত কলেবরে জোড় হস্তে বলিলেন "ঠাকুর, আমি অজ্ঞান, আমি জানিতাম না যে আপনি ভক্তের খাতিরে আপনার নিয়ম বদ্‌লাইবেন

শিব বলিলেন" হাঁ, তাই হইবে। কারণ, আমার ভক্ত যাহা স্বেচ্ছায় চায় না তুই তাহাকে তাই দিতে আসিবি কেন? মার্কণ্ডেয় যদি সহাস্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিত তবে তুই আসিলে তোর দোষ হইত না। তুই ভক্তকে কাতর করিতে সাহসী হইয়াছিস!" যমরাজ ফিরিলেন—মার্কণ্ডেয় পুনর্জ্জন্ম পাইলেন।

ভক্তের জন্য ভগবান যখন নিজেকে ভক্তাধীন করিয়াছেন, তখন ঈশ্বরের নিয়মে আর ভক্তের কি করিবে? ভক্তের জন্য ঈশ্বর সব করিতে পারেন। মানুষ অত্যন্ত অজ্ঞান ও অকৃতজ্ঞ তাই বুঝিতে পারে না যে তিনি কত দয়াময়। একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁকে অন্তরের অন্তরে ডাক দেখি তোমার বিপদ কোথা থাকে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এ, বি, এল্‌।



গোপেশ্বরের চাকরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে রাধাগোবিন্দ পুরে অত্যন্ত বাঘের উপদ্রব হইতেছিল। লোকের ছাগল গরু বাছুর প্রভৃতি নিরুদ্দেশ হইতে লাগিল, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে কোন মানুষের প্রাণ হানি হয় নাই, তবে দু'একজন সামনে পড়িয়া পিতৃপুণ্যফলে কোন রকমে বাঁচিয়া গিয়াছিল। ফলে রাত্রে গরু বাছুর বাহিরে রাখা, এবং লাঠি বা মশাল না লইয়া কিম্বা একা বাহির হওয়া দুর্ঘট হইল।

বাঘ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ; কেহ বলিল, একটা, কেহ দুইটা, কেহবা তিনটা বাঘের কথাও বলিল—যাহারা সাহসী বা দেখে নাই তাহারা বলিল নেকড়ে বা চিতা, যাহারা সামনে পড়িয়াছিল তাহারা বলিল সুন্দর বনের আদত বাঘ কেউ অনুমান করিল নদীর ওপারের জঙ্গল থেকে এসেছে অপরন্তু কাহারো মতে তাহা আবাদ অঞ্চল আগত ইত্যাদি।

শ্যামা দুলে কিরূপে দূর হইতে বাঘের জ্বলন্ত চক্ষু দুটি দেখিয়াই পলাইয়াছিল, নবীন বারুই কেমন করিয়া বাঘের মুখে লাঠির গোঁজা মারিয়া বাঁচিতে পারিয়াছিল, তাহারি কল্পনা হাটে বাজারে মুদীর দোকানে অশ্বত্থ তলায়, চক্রবর্ত্তীদের চণ্ডীমণ্ডপে, বাবুদের 'বৈঠক খানায় স্নানের ঘাটে ও মেয়ে মহলে সর্ব্বত্র সমান তেজে চলিতে লাগিল; কিন্তু বাঘের কেহই কিছু করিতে পারিল না, ফলে শার্দ্দুল-রাজ, লাঙ্গুল ফুলাইয়া গ্রামবাসী ও শিশুগণের ভীতি উৎপাদন করিয়া বীরদর্পে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রি; গোপেশ্বর নিজ গৃহে নিদ্রিত। সেই অবস্থায় স্বপ্নে দেখিল যে সে যেন মাঠের ঘোড়ায়বট গাছের কাছে দাঁড়াইয়া। স্বপ্ন স্পষ্ট

ও পরিষ্কার দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। বিস্মিত হইয়া দেখিল যে সে মাঠ তাদেরি গ্রামের মাঠ।

কতকগুলি অদ্ভুত আকারের জন্তু কি একটা জিনিস কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। জন্তু গুলির হাত পা প্রভৃতি সমস্তই মানুষের মত, কেবল মুখগুলা বাঘের মত, আর যাকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে, সে তাহারি আদরের স্ত্রী রাধারাণী।

ভয়ে বিস্ময়ে উদ্বেগে নিদ্রিত গোপেশ্বর চিৎকার করিয়া উঠিল; সে চিৎকারে রাধারাণীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে স্বামীকে চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

জাগরিত হইয়া গোপেশ্বর কিছু পরে বুঝিল যে সেটা স্বপ্ন মাত্র। প্রথমে কিছু না বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তার পীড়া-পীড়িতে বাধ্য হইয়া বলিল "কিছু না, একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলাম।"

স্ত্রীলোক একেই কুতূহল-পরায়ণা তার উপর সে জানিত যে তার স্বামী সহজে ভয় পাবার লোক নয়! কাজেই আমূল বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। এ অবস্থায় অধিকাংশ পুরুষের যা হয়, গোপেশ্বরের তাই হইল; সে ধীরে ধীরে সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া ফেলিল।

শুনিয়াই কি একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় তাহাকে চঞ্চল করিয়া দিল, কিন্তু চতুরা কামিনী স্বামীকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য চকিতে মনোভাব গোপন করিয়া বলিল "বেশত ভালইত, আমি মরে গেলে আবার তুমি এক টুক্‌টুকে বৌ বিয়ে করে নূতন ঘর সংসার করবে; আমি পুরাণো হয়ে গেছি, আমায় আর ভাল লাগছে না, এতে ত তোমারি ভাল হবে।"

গোপেশ্বরের হাসি আসিল, ভাবিল স্ত্রী চরিত্র এইরূপই বটে। ব্যগ্র-

ভাবে বলিল "বালাই তা কেন হবে, আমি থাক্‌তে তোমার বিপদ, তবে কিসের সোয়ামী আমি।"

রা। বেশত, আমারই ত ভাল, হাতের খাড়ু ও লোয়া থাকতে থাকতে তোমার কোলে কালাচাঁদকে দিয়ে সুখে যাব; তুমি পুরুষ মানুষ তোমার ভাবনা কি?

গোপেশ্বর কোন কথা না কহিয়া, আদর পূর্ব্বক রাধার গাল দুটীকে চাপিয়া কথা বন্ধ করিল; সৌরাভ নিটোল গণ্ডদ্বয় লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

আরো কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর রাধারাণী প্রস্তাব করিল, "তুমি কেন কালকে ঠাকুর মশায়ের কাছে যাও না, তিনি পুঁথি দেখে যদি কোন পূজা মানসিক করতে বলেন তা করলেই বিপদ আপদ কাটিয়া যাবে।"

চিন্তিত গোপেশ্বর এরূপ যুক্তি-যুক্ত প্রস্তাব সাদরে লুফিয়া লইল।

পরদিন অপরাহ্নে পুরোহিত ঠাকুরের কাছে উপস্থিত। ঠাকুরটী যদিও পঁয়ত্রিশটী বিবাহ করা নিকোষ ও ভঙ্গ কুলীন সমাজের চক্ষে নীচ বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া হেয়, কিন্তু যতদুর সম্ভবদশকর্ম্মান্বিত, নির্লোভী ও নিষ্ঠাবান।

তিনি সমস্ত ঘটনা শুনিয়া বলিলেন এ সম্বন্ধে স্থির করিয়া বলা বড়ই কঠিন; হয় এর মধ্যে কিছু সত্য আছে এবং কোন ভবিষ্যৎ বিপদের ঈঙ্গিত আছে কিম্বা একেবারে অমূলক, হয়ত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধে ও বাঘের ব্যাপারের ঘটনা দুটো কল্পনায় জুড়ে গিয়ে ওইরূপ একটা স্বপ্ন দাঁড়িয়ে গেছে।

যাই হোক তুমি স্নানের পর প্রত্যহ অশ্বত্থ তলায় জল দিও ও অমাবস্যার দিন কালী বাড়ীতে পূজা মানসিক করো। গোপেশ্বর তাহারই উদ্যোগ করিল, কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না; সন্ধ্যার সময় হইতেই কেমন একটু বিমর্ষ হয়ে পড়ত এবং অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে গোপনে

মাঠের সেই স্বপ্ন দৃষ্ট বটতলায় গিয়ে লুকাইয়া থাকিত ও প্রায় রাত্রি নয়টার পর বাড়ী ফিরিত। মধ্যে মধ্যে এরূপ যাওয়া আসায় বাঘের ভয় হইত বটে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিত না। রাধারাণী তার সন্ধ্যার পর বাড়ী ছেড়ে থাকার সম্বন্ধে কত প্রশ্ন করিত কিন্তু সে এ সম্বন্ধে একেবারে নিরুত্তর থাকিত।

এই সমস্ত কারণে গুপী তাহার স্ত্রীকে রাত্রিকালে পুকুরঘাটে বা খিড়কীতে একা যাইতে বা বেশীক্ষণ থাকিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু রাধা এতটা সাবধানতাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

সে রাত্রি বেশ অন্ধকার এবং আকাশ একটু মেঘলা থাকাতে অন্ধকার আরো জমিয়াছিল। গোপেশ্বর আহারাদি করিয়া শয়ন করিলে, রাধা বাসন মাজিবার জন্য খিড়কার পুকুর ঘাটে গেল।

বাসন মাজিয়া উঠিবে এমন সময় কোথা হইতে দুইজন দস্যু চকিতের মধ্যে তার উপর পড়িল; এবং কোন রূপ শব্দ বা চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই বজ্রমুষ্টিতে তার গলা টিপিয়া মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলিল; দেখিতে দেখিতে আরো ৫।৭ জন আসিয়া পড়িল।

রাধা প্রথমটা স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; ঈষৎ পরেই যখন প্রকৃতিস্থ হইল তখন ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিয়া প্রথমে যখন ঝনকা দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল তখন তাহাকে বজ্রমুষ্টিতে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে একবার ভয়ে আড়ষ্ট হইল আবার মনে হইল কেন তার মানুষের কথা অগ্রাহ্য করিয়া একলা আসিয়াছিল, ভয়ে ও অনুতাপে কাঁদিয়া ফেলিল। একবার মনে করিল ইহাঁরা ডাকাত তখন ভয় হইল ঘরে তার কচি ছেলে ও স্বামী আছে যদি তাদেরি কোন বিপদ হয় বা দরজায় শিকল দিয়া ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়।

দস্যুগণ কিন্তু ভাবিবার আর কোন অবসর না দিয়াই তাকে শূন্যে তুলিয়া অগ্রসর হইল, তখন বুঝিল ইহারা বদমায়েস, আর একবার লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল কিন্তু এমন আড়ষ্ট করিয়া বাঁধিয়াছে যে সে চেষ্টা করিবে কি, তার শ্বাস রোধের উপক্রম হইতেছিল কিছু দূর যাইতে না যাইতে সংজ্ঞা লোপ হইল।

গোপেশ্বর শুইয়াছিল বটে কিন্তু নিশ্চিন্ত হয় নাই; রাত্রিতে যতক্ষণ রাধা তার কাছ ছাড়া থাকিত ততক্ষণ তার উদ্বেগ দূর হইত না। প্রত্যহই এইরূপ কিন্তু আজ তার দুশ্চিন্তার পরিমাণ কিছু বেশী। নিকট আত্মীয়ের বিপদাশঙ্কায় অজ্ঞাতসারে মানবচিত্ত স্বভাববশে কিরূপ দোদুল্যমান হইয়া উঠে নিরক্ষর গোপেশ্বর তা জানিত না, কাজেই এতটা চাঞ্চল্যের কারণ ঠাওরাইতে পারিল না।

হঠাৎ কে যেন বলিল গুপী তুই ঘুমাচ্ছিস। শব্দটা তার বুকের ভিতর থেকে কিম্বা জানালার দিক হতে আসিল ঠিক বুঝিতে পারিল না। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কে?" কোন উত্তর নাই। বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া ডাকিল "রাধা?" উত্তর নাই। তাড়াতাড়ি উঠিয়া উঠানে গিয়া ডাকিল, কোন সাড়া নাই, রান্নাঘর ও খিড়কীর ঘাট দেখিল কেহ নাই; পুনরায় তীব্র কণ্ঠে ডাকিল রাধা? প্রতিধ্বনি কৌতুক করিল। বাগান পুকুর ঘাট বাড়ী পুনরায় তল্লাস করিল কিন্তু সে কোথায় গেল। চকিতে কর্ত্তব্য বুদ্ধি স্থির করিয়া দৌড়িয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল অবোধ শিশু কালাচাঁদ ঘোর নিদ্রায় অচেতন বিপদের কথা কিছুই জানে না।

সামনে তিন গাছা কাপড়া পড়িয়াছিল সেইগুলি ও ঘরের কোন হইতে বড় লাঠি গাছটা লইয়া একবার শিশুর দিকে চাহিল তার বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে মাঠের বটতলার পানে ছুটিল।

মাঠের নিকটস্থ হইয়া দূর হইতে অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে দেখিল যেন জন কতক লোক কি বা কাহাকে বহিয়া লইয়া যাইতেছে। স্বপ্ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিদ্যুৎ বেগে সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। সেইখানে দাঁড়াইয়াই অব্যর্থ লক্ষ্যে পাপড়া ছুঁড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে "গেলুম্রে, মাল্লেরে" বলিয়া একজন ধরাশায়ী হইল এবং তারা সামলাইবার পূর্ব্বেই আর দুইটা পাপড়া ছুড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো দুইজন জমি লইল।

দস্যুদলের পশ্চাৎভাগ হইতে হাঁকিল "তোরা শিকার সামলা" আমরা মহড়া নিচ্ছি। বলিয়াই তাহারা দ্রুত অথচ সাবধানে গোপেশ্বরের দিকে ছুটিল।

তখন আর পাড়পা নাই, শড়কি বা হলকা ও আনে নাই। অনুমানে বুঝিল তাহার আততায়ী সংখ্যায় ৪।৫ জন হইবে এবং সকলেই খেলোয়াড় সুতরাং ইহাদের সঙ্গে লড়াইয়ের পরিণাম স্থির করা দুঃসাধ্য এবং যদিও সে বহুকষ্টে সুবিধা করিতে পারে, ততক্ষণ হয়ত বাকীলোকে শিকার বহু দূর নিয়ে যাবে।

একটা হিসাব করিয়াই সে পাশের ঝোপে লুকাইয়া পড়িল শুষ্ক পত্র মর্ম্মর শব্দ করিয়া বিশ্বাস ঘাতকের ন্যায় তাহার পদশব্দ বিপক্ষ দলকে জানাইয়া দিল।

তাহারা ঝোপের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই, তাহাদের পাশ কাটাইয়া নক্ষত্র বেগে অপর দলের উপর ঝাপাইয়া পড়িল। তাহারা তখনো তার স্ত্রীকে কাঁধে লইয়া দাঁড়াইয়া ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতেছিল সংখ্যায় আন্দাজ ৭।৮ জন; তন্মধ্যে একব্যক্তির আগাগোড়া বাঘছালে ঢাকা। প্রথমেই তার মাথায় লাঠি বসাইয়া দিল।

অন্য সময় হইলে কখনই এরূপ করিত না; লাঠিয়াল বীরের জাত,

সে জন্য মাথায় না মারিয়া প্রায়ই কার্য্যক্ষেত্রে হাতে বা পায়ে মারিয়া যতটুকু জখম করা আবশ্যক তদতিরিক্ত কিছু করিত না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার প্রাণ ও মান লইয়া টানাটানি, াজেই দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া যাহাকে সামনে পাইল তাহাকেই যেখানে ইচ্ছা চোট বসাইল।

বাহকেরা একে গোলা লোক তার উপর শিকার কাঁধে, কাজেই দু'চার জন পড়িবা মাত্রই, শিকার ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল।

অচৈতন্য রাধারাণী তাহারি পাশে সশব্দে মাটীতে গড়াইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে পশ্চাতের দলের একজনের লাঠি বিষম শব্দে তার পিঠের উপর পড়িল; ভাগ্যক্রমে সে তখন একস্থানে স্থির ছিল না তাই আঘাত টা মাথায় পড়িতে পায় নাই।

অত্যন্ত মানসিক উত্তেজনার সময় মানুষ তার শারীরিক আঘাত বা ক্লেশের গুরুত্ব প্রকৃত ভাবে অনুমান করে না তাই সে চোট সামলাইয়াও দাঁড়াইল।

ইতি মধ্যে একজন হাঁকিল "তোরা দুজনে মহড়া নে আমরা দুজনে শিকার সরাই।"

গোপেশ্বর দেখিল বিপদ আবার গুরুতর—আক্রমণকারী দুইজনেই খেলোয়াড় এবং প্রায় তার সমান পাল্লাদার অবিশ্রান্ত লাঠি চালাইতেছে; এখন কাহাকে রাখিয়া কাহাকে সামলায়।

গোপেশ্বর একটু ভাবিয়া ৫।৭ হাত সরিয়া গেল এবং দুইজনে লাস তুলিবার জন্য যে মুহূর্ত্তে হেঁট হইল, সেই মুহূর্ত্তে আক্রমণকারীদের ছাড়িয়া তাহাদের একজনের কাঁধে ও অপরের পিঠে যমদণ্ডের ন্যায় লাঠি বসাইয়া দিল; এই অবসরে নিজেও আক্রমণকারীদের হাতে বিশেষ ভাবে জখম হইল।

তখন অবশিষ্ট দুইজন; কিন্তু আবার ভয় হইল যে যদি উহারা মরিয়া হইয়া তার স্ত্রীকেই জখম করিয়া দেয় বা মারিয়া ফেলে!

এইবার শেষ চেষ্টা; শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া

একবার মরণ কামড় কামড়াইবার চেষ্টা করিল এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই একজনকে ঘাল করিল তখন অপরটী ভাগিয়া পড়িল।

গোপেশ্বর এতক্ষণ পরে একবার স্থির হইয়া নিশ্বাস ফেলিল তারপর কাতর স্বরে ডাকিল "রাধা।"

মূর্চ্ছিতা রমণী নীরব; ভয় হইল বুঝিবা মারিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু নিজের স্বর তখন জড়তাপূর্ণ, কণ্ঠ শুষ্ক, মাথাও ঘুরিতেছিল। আর ডাকিতে পারিল না বা ইচ্ছা করিল না। একবার স্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিল—সে স্পর্শে এত অবসাদেও শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল।

তখনই আবার দাঁড়াইয়া রাধারাণীকে কাঁধে উঠাইয়া লইল ভাবিল দক্ষযজ্ঞের পর সতীদেহ লইয়া বুঝি মহাদেবেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

আশঙ্কা জাগিল যদি উহাদের মধ্যে কেহ উঠিয়া ও লাঠি কুড়াইয়া অকস্মাৎ পিছু দিক হ'তে আক্রমণ করে, তাহা হইলেই ত মহা বিপদ।

আবার স্ত্রীকে নামাইয়া অন্ধকারে লক্ষ্য করিয়া আহতদের আর এক এক ঘা প্রবল বেগে বসাইয়া দিয়া যতগুলি লাঠি নজরে ঠেকিল কুড়াইয়া সে গুলিকে দূরে ফেলিয়া দিল।

তার পর রাধারাণীর বাঁধন ও মুখের কাপড় খুলিয়া দিয়া কাঁধে তুলিয়া সন্তর্পণে বাঁকা চোরা পথ দিয়া ধীরে ধীরে বাটী প্রস্থান করিল। প্রথমে কাজটা যত সোজা ভাবিয়াছিল, দেখিল তত সহজ নয়, প্রতি পদক্ষেপে মাথা ঘুরিতে ও পা টলিতে লাগিল শরীরের বেদনায় ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দুর্জ্ঞেয় ঘটনা।

সে আজ অনেকদিনের কথা, যে ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, যাহা এখনও হৃদয়ে জাগরূক আছে ও স্মরণ করিতে গেলে দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, সেই ঘটনা উল্লেখ করিতে এই প্রবন্ধ লিখিতে হইল।

প্রায় নয় দশ বৎসর পূর্ব্বে ৺পূজার ছুটিতে কোথায় বেড়াইতে যাইব বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে ডাকহরকরা একখানি পত্র দিয়া গেল। পত্র পড়িয়া দেখিলাম যে আমার এক বন্ধু তাহার কর্ম্মস্থানে যাইবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। তাহার অনুরোধ ও এরূপ সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। তাহাকে একখানি টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

সেই দিন বেলা প্রায় দুইটায় একখানি দ্বিতীয় শ্রেণী গাড়ী ভাড়া করিয়া হাওড়া ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া রেলে চড়িলাম। ট্রেণে চড়িবার মিনিট পনের পরে ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিল। গাড়ীর দুই চারিজন আরোহীর সহিত গল্প করিতে করিতে ও রেলওয়ের দুই পার্শ্বের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। যথাসময়ে ট্রেণ আমার গন্তব্যস্থানে উপনীত হইল। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলাম যে আমার বন্ধু কোন অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া পূর্ব্ব হইতে অপেক্ষা করিতেছেন। আমার বন্ধুবর শ্রীরমেশচন্দ্র বসু সে স্থানের সরকারী কর্ম্মচারী। তাহাকে কর্ম্মের খাতিরে নানাস্থানে বদলী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তখন তিনি কোন্ স্থানে ছিলেন তাহা আমার মনে নাই।

সে স্থানে তিন চারিদিন থাকিতে সাত আট জন লোকের সহিত খুব

আলাপ জন্মিয়া গেল। তাহাদের সঙ্গে প্রত্যহ প্রাতে ভ্রমণ করা হইত আর দুপুর বেলায় রীতিমত তাস খেলিবার আড্ডা হইত।

বন্ধুর বাটীর নিকটে একটি খালি বাটী ছিল। আমি বন্ধুকে বলিলাম "তোমার বাড়ীতে আর হাল্লা করিবার দরকার কি, ঐ খালি বাড়ীটা ঠিক করিয়া দাও, আমরা ঐ খানে আমাদের আড্ডাঘর করিব।" বন্ধু বলিলেন, "ও বাড়ীতে যে ভূতের ভয়।" আমি বলিলাম "তা হো'ক গে, ও বাড়ীটে ঠিক করিয়া দাও। আমি আগে গিয়া বাস করিয়া দেখিয়া আসি, আর কাহাকেও বলিও না।" বাড়ীওয়ালার নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি কিছুতেই থাকিতে দিবেন না, অবশেষে অনেক জিদ করাতে সম্মত হইলেন।

রাত্রে আহার সমাপন করিয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তাহার ভৃত্য গৃহে আলোক দিয়া গেল। সে আমার নিকট থাকিতে চাহিল, কিন্তু আমি তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলাম। দোর বন্ধ করিয়া শয়ন ক.রলাম।

হঠাৎ কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম দরজা খোলা। ইহাতে বড়ই আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমি আলো লইয়া কে কাঁদিতেছে সন্ধান করিবার নিমিত্ত ঘরের বাহির হইবামাত্র কান্নার শব্দ থামিয়া গেল। পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবারেও দরজা খোলা, কান্নার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। তখন মনে বড় ভয় হইল। সে সময়ে ভাবিতে লাগিলাম যে চাকরটাকে না তাড়ানই ভাল ছিল। এখন সে কথা বলা বৃথা মনে করিয়া নিঃসাড় হইয়া চোক বুজিয়া শুইয়া রহিলাম। রাত্রি যেন আর কাটে না। এক একটি ঘণ্টা এক এক দিন বলিয়া মনে হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে সেই কান্নার শব্দ আমার মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিল।

পরদিন ভোর হইলে আমার নব বন্ধুদিগের এই ঘটনা কহিলাম। এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে তাহাদের বড় কৌতূহল হইল। তাহাদের আমি বার বার নিষেধ করিলাম তাহারা শুনিল না। এই স্থির হইল যে তাহারা সমস্ত রাত জাগিয়া তাস খেলিবে।

দুই তিন জোড়া তাস লইয়া তিন চারিটি আলো লইয়া তাহারা সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

রাত্রি আন্দাজ দুইটার সময়ে একসঙ্গে কতকগুলি মনুষ্যের কোলাহল উত্থিত হইল। সে বিকট শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বন্ধুকে ডাকিয়া লইয়া তাহার একটি ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আমি যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম সে গৃহে গিয়া দেখিলাম, সকলেই মূর্চ্ছা গিয়াছে, গৃহের চতুর্দ্দিকে তাস ছড়ান রহিয়াছে। কেবল একজন দেওয়ালে ঠেস দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ফারিত নয়নে হাঁ করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া কিংবা ধাক্কা দিয়া তাহার কোন সাড়া পাইলাম না। তাহাতে বুঝিলাম, সে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে। চোখে মুখে জল দিয়া তাহাদের সজ্ঞান করা হইল। সজ্ঞান হইয়াও তাহারা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে রাত্রে তাহাদের মুখ হইতে বাক্য স্ফুরণ হইল না।

উপসংহার।

পরদিন প্রভাতে যে দাঁড়াইয়া মূর্চ্ছা গিয়াছিল সে বলিল, “আমরা সকলে বসিয়া তাস খেলিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম যেন দুই খানি মানুষের পা কড়ি কাঠ হইতে বাহির হইতেছে। দেখিবামাত্র সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছা গেল। আমি তবু সাহস করিয়া দেখিতে লাগিলাম শেষে কি হয়। ক্রমে ক্রমে একটি স্ত্রীলোকের অঙ্গ বাহির হইল। আমি দাঁড়াইয়া কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি কে গা” ?

এই বলিয়া আমার অবস্থা যে কি হইল তাহা আমার মোটেই স্মরণ হইতেছে না।

গ্রামের ভিতর অনুসন্ধান করাতে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ বলিল "যাহার নিকট হইতে বর্ত্তমান সত্বাধিকারী এই বাড়ী কিনিয়াছেন, তিনি তাহার স্ত্রী লইয়া এই বাড়ীতে বাস করিতেন। তাহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি তাহার স্ত্রীকে তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়া যথেষ্ট যন্ত্রণা দিতেন বলিয়া সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করেন। সেই হইতে সকলে দুই এক দিন থাকিয়া চলিয়া যান। আপনারা যে প্রাণরক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট।

সেখানে আর একতিলার্দ্ধ মাত্র থাকিতে আমার ইচ্ছা হইল না। বন্ধুর বহু অনুরোধ সত্বেও আমি সেই দিনই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

যদি কখনও কেহ ভূত প্রেত সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করে, আমি তাহাদের সেই তর্কে যোগদান করি না। তবে তাহাদের কথা অনুমোদন করিয়া থাকি।

শ্রীহীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

দেবী দর্শন।

(সত্য ঘটনা।)

কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন পল্লীতে রামহরি ভট্টাচার্য্য বাস করেন। যজন, যাজন, প্রধান উপজীবিকা। রামহরি অতি সামান্য গৃহস্থ। ব্রাহ্মণ প্রাতস্নান ও দৈনিক পূজাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া দু'এক ঘরে দেবসেবা করেন। তাহাতে যাহা আসে কায় ক্লেশে দুবেলা দুমুঠো সংস্থান হয়। রামহরি দরিদ্র ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলিয়া অনেকেরই নিকট পরিচিত।

সংসারে রামহরির স্ত্রী ও পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র যদু। এই তিন জনে মিলিয়া রামহরির সংসার। ব্রাহ্মণ অপুত্রক ছিলেন, সেইজন্য যদুকেই পুত্রের মত লালন পালন করেন। যদু ইংরাজী পড়ে। যদুর স্বভাব অতি মধুর, শান্ত ও শিষ্ট।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্ব্বিরোধী পুরুষ। পল্লীমধ্যে কখনও কাহারও বিরাগের কারণ ছিলেন না; বরং তাঁহার শান্ত স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই বিশেষ পূজ্য ছিলেন।

যদু যখন ২০ কুড়ি বৎসর উত্তীর্ণ হইল, রামহরি তাহার বিবাহ দিলেন ও বধূ গৃহে আনিলেন। ব্রাহ্মণী হাতের দোসর পাইয়া বিশেষ আনন্দিতা হইলেন।

এ দিকে যদু পড়া ছাড়িয়া কর্ম্মের সন্ধান করিতে লাগিল। জেঠা মহাশয়ের বয়স হইয়া আসিতেছে, শীঘ্র শীঘ্র কিছু আনিতে পারিলে, যদি শেষের ক'টা দিন তিনি সুখে কাটাইতে পারেন,—যদুর ঐকান্তিক বাসনা। শেষে দৈবকৃপায় একটা আপিসে কর্ম্ম হইল। যদু মাসে মাসে

মাহিনার টাকা আনিয়া জেঠা মহাশয়ের হাতে দিতে লাগিল। টাকা কয়টা হাতে করিয়া ব্রাহ্মণের কত আহ্লাদ! যদুরও কত আত্ম-প্রসাদ!

এখন আর রামহরির পূর্ব্বের ন্যায় কষ্ট নাই। এইরূপ সুখে দু'চার বৎসর কাটিল। বধূটী ইতিমধ্যে বড় হইয়া উঠিল ও তাহার সংসার বুঝিতে শিখিল। এখানকার কালের যেমন সকল বধূ বুঝিয়া থাকে, সেও সেইরূপ নিজের সংসার বুঝিল। তাহার স্বামী উপায় করে আর বুড়া বুড়ী কেবল বসিয়া খায়, আবার তাঁহারাই কর্ত্তা ও গৃহিনী—সুবিধা পাইলেই স্বামীকে এই অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য নানা উপায়ে নিজের মতাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যদু হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, ও বলে "বল কি! যাঁহাদের দয়ায় ও যত্নে এত বড় হইয়াছি তাঁহাদের অমান্য! ছি! ছি!"

নদী একদিকে বাধা পাইলে আর একদিকে যেমন প্রবল বেগে বাহিয়া যায়, বধূটি স্বামীকে বাঁধিতে না পারিয়া অপরদিকে শাশুড়ীর সহিত কলহ শ্বশুরের প্রতি অমর্য্যাদা ও অযত্ন দেখাইয়া সংসারে একটা মহা অশান্তির সৃষ্টি করিল।

এইরূপে আরও দুএক বৎসর কাটিল। যদুর দুএকটী পুত্র কন্যা জন্মিল। যদু নেহাৎ ভাল মানুষ, তাই এখনও পূর্ব্বের মত মাহিনার টাকা আনিয়া জেঠা মহাশয়কে দেয় এবং তাঁহারই আদেশমতে সাংসারিক সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। বধূটি এখন আর বধূটি নন, প্রবলা হইয়া উঠিয়াছেন, নিজ ভুজবলে সংসারের অনেক কেন্দ্র জয় করিয়া ফেলিলেও অন্দরমহলটার ভিতর এখন তিনি স্বাধীনা; বহির্ব্বাটীর শ্বশুর কতকটা করদ প্রজা মাত্র। এ দিকে শাশুড়ীর কষ্ট যথেষ্ট বাড়িয়াছে। তিনি বউমার মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন।

রামহরি কিছুদিন যাবৎ সাংসারিক অশান্তির বিষয় বিশেষ পর্য্যালোচনা

করিয়া দেখিলেন ; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। একদিন যদুকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাবা আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর ক'টা দিন বা বাঁচিব ! তুমি পুত্র স্থানীয় পুত্রের কার্য্য কর, বুড়া বুড়ীকে কাশী বাসী কর ; বাকী ক'টা দিন বিশ্বেশ্বরের সেবায় কাটাইয়া দিই। তুমি মাসে মাসে পাঁচটী করিয়া টাকা পাঠাইও, তাহাতেই যথেষ্ট হইবে।"

যদুও অনেকদিন ধরিয়া অনেক ভাবিতেছিল, জেঠা মহাশয়ের যুক্তি বড়ই সুযুক্তি ! যদু সম্পূর্ণ মত দিল। শেষে একটা ভাল দিন দেখিয়া যদু জেঠাও জেঠাইকে সঙ্গে লইয়া কাশী রাখিয়া গেল।

রামহরির বড় সাধের কাশীবাস হইল। যদু ১০৲ দশ টাকা জেঠা মহাশয়ের হাতে দিয়া কলিকাতা ফিরিল দুই মাসের খোরাক রামহরির হাতে রহিল।

পত্রাদি আদান প্রদান চলে, এইভাবে আষাঢ় শ্রাবণ দুইমাস কাটিল। শ্রাবণের শেষ হইতে যদু আর পত্র দেয় না। রামহরিও খরচ ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া পত্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। পত্র আর আসে না। শেষে ভাদ্রমাসের প্রায় মাঝামাঝি যদুর এক পত্র আসিল, তাহাতে সে লিখিয়াছে, "জেঠা মহাশয়, বড় বিপদ, আমার কর্ম্মটি গিয়াছে, ছেলে পুলে লইয়া বড়ই কষ্টে পড়িয়াছি, কাল কি খাইব এমন সংস্থান নাই, সুতরাং উপস্থিত কর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার টাকা পাঠাইতে পারিতেছি না ; ইত্যাদি।"

রামহরি পত্র পড়িয়া মর্ম্মাহত হইলেন, এবং অনেক উপদেশ-পূর্ণ পত্রে উত্তর লিখিলেন, নিজেদের দুরবস্থার কথা আর উল্লেখ করিলেন না।

যাহাহউক, বৃদ্ধ রামহরি বিদেশে সত্য সত্যই বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পরের দ্বারস্থ হওয়া চিরকালই তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ অথচ

অর্থাগমেরও কোন সূচনা নাই। যাহা কিছু যৎসামান্য তৈজস পত্রাদি সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিলেন তাহাই বিক্রয় করিয়া কোনরূপে দিন পাত করিতে লাগিলেন।

আশ্বিন মাস আসিল। ৺দুর্গা পূজার অষ্টমীর দিন প্রাতে রামহরি প্রাতঃ সন্ধ্যাদি সারিয়াছেন। ব্রাহ্মণী একটী পিতলের ঘটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "এইটা শেষ, আমাদের আর কিছুই রহিল না; ঘরেও একমুঠা চাল নাই।" শুনিয়া রামহরি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; কোনও উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "থাক্ ওটা বেচিলেই বা কি দুঃখ ঘুচিবে? উড়নি খানা দাও।" ব্রাহ্মণী উড়নি আনিয়া দিলে ব্রাহ্মণ সেখানা মুড়ি দিয়া শয়ন করিল। ব্রাহ্মণীও সাংসারিক কোন কাজ কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া স্বামার পাশে আসিয়া বসিল, বসিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণকে নিদ্রিত দেখিয়া আপনিও আঁচল বিছাইয়া তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া অতি অল্পক্ষণের ভিতর নিদ্রিতা হইয়া পড়িল।

বেলা যখন প্রায় দুইটা কে একজন অপরিচিত রামহরির দ্বারে আঘাত করিতেছিল ও "বাটীতে কে আছেন, একবার বাহিরে আসিবেন কি?" বলিয়া ডাকিতেছিল। ব্রাহ্মণীর নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি রামহরিকে গা ঠেলিয়া উঠাইলেন। রামহরি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন এক সিদাবাহক মস্ত একটা সিদা লইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। রামহরি জিজ্ঞাসা করিলেন কাহাকে খুঁজিতেছ? সিদাবাহক বলিল "আপনি কি এই বাড়ীতে থাকেন?"

রামহরি। হাঁ কেন?

সিদাবাহক। এই সিদা লউন, আপনার জন্য আনিয়াছি।

রামহরি। আমার জন্য! তোমায়ত বাপু আমি চিনি না। তুমি

নিশ্চয়ই ভুল করিয়া অন্য কোন ব্রাহ্মণের সিদা আমার বাড়ীতে আনিয়াছ। আমায় কেউ এখানে চেনে না, আমায় সিদা দেবে কেন ?

সিদাবাহক। মশায় আমি শিব ভটচাজ্জির লোক। তাঁর বাড়ীতে মা এসেছেন। এইরূপ সিদা কাশীর উপযুক্ত ব্রাহ্মণদের দিবার ভার আমার উপর আছে। আমি আপনাকে দিতেছি, আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। সন্দেহ করিবেন না।

রামহরি। তুমি যে কে আর তোমার ভট্টাচার্য্য মশায়ই বা কে আমি জানি না। আর আমিই যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ তোমার কে বল্লে ?

সিদাবাহক। আপনার কন্যা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন 'ওরে এই বাড়ীতে আমার বাপ মা উপবাসী, সিদাটা আজ এখানে দে যা।

রামহরি। আমার কন্যা! তুমি কি সব বলছো, আমি ভাল বুঝিতে পারছি না। আমারত কন্যা নাই!

সিদাবাহক। কি বলেন মশাই! দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তা আলো করেছিল—কি রূপ!

রামহরি। ওহে বাপু কাশীবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্য বলিতেছি, 'আমরা উপবাসী আছি বটে, তবে আমরা অপুত্রক।'

সিদাবাহক। তবে, উপবাসীত আছেন! এটা সত্যি হ'ল, আর আমি চোখে দেখলাম কানে শুনলাম আমার বাপ মা উপবাসী তবুও আপনার কন্যা নাই বলে গোপন করছেন। দেখুন, এতে আর লজ্জা কি!

রামহরি। না তুমি আমায় অবিশ্বাস করছো! ভাল কিন্তু বাপু এখনও বলছি তুমি ভুল ক'রে অন্য কারুর সিদা আমায় দিচ্চো। অনাহারী হ'লেও অধর্ম্ম উপায়ে উদর পূর্ত্তি করবো না, আমার প্রতিজ্ঞা।

সিদাবাহক। আমার ভুল হয়ে থাকে হয়েছে। আপনার সঙ্গে

আর তর্ক করবো না। এই সিদা র'হিল, যাহা ইচ্ছা করবেন, আমার দেবার কথা আমি দিলাম।

এই কথা বলিয়া সিদাবাহক অতি দ্রুতপদে রামহরির বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। রামহরি বিস্তর পশ্চাত হইতে ডাকিলেও সে ফিরিল না।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। রামহরি কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "কি বল দেখি!"

ব্রাহ্মণী। কিছু বুঝতে পারছি না, আশ্চর্য্য ব্যাপার!

ব্রাহ্মণ। আজ মহা অষ্টমী! কাশীতে অভুক্ত ব্রাহ্মণ! বোধ হয় বেটীর টনক্ নড়েছে। যাহা হউক এখন সিদা লইও না। দুর্গা দুর্গা, কি জানি যদি সত্য সত্যই ভুল হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নিমীলিত নেত্রে দুর্গা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরেই একখানা গাড়ী আসিয়া রামহরির দ্বারে দাঁড়াইল। হৃষ্ট পুষ্ট এক ব্রাহ্মণ পট্টবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই পূর্ব্ব পরিচিত সিদাবাহকের সহিত রামহরির গৃহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। রামহরি প্রমাদ গণিল ও কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মহাশয় আমি অনেক বারণ করিয়াছিলাম, তথাপি এই লোকটী অপরের সিদা আমায় দিয়া গিয়াছে। আমি এখনও সিদার একটী চালেও হাত দিই নাই। ফিরাইয়া লইলেই চলিবে। আর আমার কোন দোষ নাই।"

আগন্তুক পট্টবস্ত্র পরিহিত ব্রাহ্মণটী স্থিরভাবে রামহরিকে দেখিতে লাগিলেন, ও শেষে বলিলেন, "মশায়, সিদার কথা হইতেছে না ও আপনিই লউন। কথা হইতেছে, আপনার কি সৌভাগ্য! আপনার অমন মেয়ে! আপনার মেয়ের রূপের কথা শুনে আমি এই লোকটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। দয়া করে আপনার মেয়েটীকে দেখান। আমাদের এখানে সুলক্ষণা কুমারীর বিশেষ প্রয়োজন।

রামহরি বিস্মিতভাবে বলিলেন, "দোহাই মশাই আমাকে আর লজ্জা দিবেন না, আমি নিঃসন্তান।"

আগন্তুক ব্রাহ্মণ সিদাবাহকের দিকে চাহিল। সিদাবাহক বলিল, "সেকি মশাই, আপনি মিথ্যা বল্‌ছেন কেন? আসুন বাহিরে আসুন, আপনার মেয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আমায় ইঙ্গিত করেছিল, সে জায়গাটী দেখবেন আসুন।"

এই বলিয়া বাহিরের দরজায় সকলে উপস্থিত হইল। তখন সিদা-বাহকটী উন্মত্তভাবে দরজায় গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিল "এই যে এই খানে দাঁড়াইয়া মা আমার লাল চেলী পরিয়া আঙ্গুল নাড়িয়া আমায় ডাকিয়া ছিলেন ও বলিয়া ছিলেন ওরে আমার বুড়া বাপ মা অনাহারী আছে সিদাটা এই বাড়াতে দেযা। সে রূপের দিকে চেয়ে আমি সব ভুলে গেছলুম গো। কে যেন আমায় টেনে এই বাড়ীতে ঢোকালে।" এইকথা বলে আর কাঁদে।

রামহরি ও ব্রাহ্মণী দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আগন্তুক ব্রাহ্মণটি সব ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন; তিনি করযোড়ে রামহরি ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন "আপনারা ভাগ্যবান্ মা অন্নপূর্ণা আপনাদের কন্যা সেজেছিলেন শুধু আপনারা অনাহারী ছিলেন বলিয়া। আজ আমি কৃতার্থ হলাম। জগন্মাতা যাদের কন্যা, তাদের আবার ভাবনা। চলুন, এখনই আমার গৃহে চলুন, আপনাদের আহারের জন্য আর ভাবতে হবে না।

এই কথা বলিয়া আগন্তুক ব্রাহ্মণটী সস্ত্রীক রামহরিকে লইয়া মহানন্দে নিজ প্রাসাদ তুল্য আবাসে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের স্বচ্ছন্দে ও শান্তিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

রামহরিও তাঁহার স্ত্রী জীবনের শেষ কয়টা দিন বেশ সুখে ও শান্তিতে কাশীবাস করিল।

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী।

প্রত্যক্ষ আত্মা দর্শন।

আমার পিতার মাতুল ৺রামদয়াল দাসগুপ্ত মহাশয়ের সংসারে কেহ না থাকায় তিনি আমাদের পরিবার ভুক্ত ছিলেন। আমাকে তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাহার মৃত্যু হইলে কোন্ স্থানে তাঁহার মৃত দেহের সৎকার হইয়াছিল তাহা আমি জ্ঞাত ছিলামনা। সাধারণতঃ যে স্থানে শব-দাহ হইয়া থাকে তাহা একটি খালধার; বাড়ী হইতে সে স্থান বড় বেশী দূরা নহে। তাহার নীচে দিয়া বাজারে যাইবার পথ। সন্ধ্যার পর এইস্থান দিয় নিতান্ত সাহসী ব্যতীত কেহ একা বড় হাঁটেনা। একদা অপরাহ্নে আমি বাজারে রামায়ণ গান শুনিতে গিয়াছিলাম। সেকালে নিষ্কর্ম্মা লোকে প্রায়ই দোকানে দোকানে কাশীরাম দাসী রামায়ণ পাঠ করিত, আর কতকগুলি লোক তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া তাহা শুনিত। অনেক দিন ধরিয়া ৺মহেশ ঠাকুর এই রামায়ণ পাঠ করিত। লোক কোলাহল না থাকিলে আমাদের বাড়ী হইতে তাহার উচ্চরব কতক মধুর সঙ্গীতের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যাইত। আমি আর কখনও সেখানে যাই নাই।

সে দিন কিজানি আমার প্রাণের কেমন টান হইল আমি রামায়ণ শুনিতে গিয়াছিলাম। কে যেন আমাকে আকর্ষণ করিয়াই তথায় লইয়া গেল। আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া রামায়ণ শুনিতে ছিলাম। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিলে হঠাৎ মনে হইল শ্মশানপথে একা বাড়ী ফিরিব কেমন করিয়া। কাহারও সাহায্য চাহিতেও প্রবৃত্তি হইলনা, একাই চলিতে লাগিলাম। একটু অগ্রসর হইলেই শ্মশানপথে আসিলাম। তখন শরীরটা কেমন আপনা আপনি একটু ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। পথটা জনশূন্য, তখনও

সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় নাই, বেশ মানুষ চেনা যায়। সম্মুখে বামদিকে প্রায় আদরশি তফাতে একটী বৃক্ষ। এই বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি করিবামাত্র দেখিলাম আমার পিতৃ মাতুল ৺রামদয়াল দাস মহাশয় আমার দিকেই আসিতেছেন। যে ভুতের ভয়ে আমি দ্রুতগতি শ্মশানভূমি অতিক্রম করিতে ছিলাম তাহাই আমার সম্মুখে! আমি চকিতে আত্ম বিস্মৃত হইলাম। ভূত বলিয়া কিছু আছে, অথবা মানুষ দেহত্যাগের পরে সূক্ষ্ম দেহে যে অবস্থিতি করে তাহা জানিতামনা। ভূত বলিলেই লোকে ভয়াত্মক কোন কিছু বুঝিয়া থাকে, সেই ভূত যে কি তাহাও কখন ইতি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করি নাই। অতএব দাদা মহাশয় ৺রামদয়াল দাসকে সম্পূর্ণ মানবিক আকারেও সুস্থ শরীরে প্রত্যক্ষ করিয়া তন্মুহূর্ত্তে তাহার মৃত্যু সম্বন্ধেই তখন আমার সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। আমার ভয় দূর হইয়া ভয় প্রবাদ স্থানসমূহে বরং একজন সঙ্গী পাইয়া আমার সাহস বৃদ্ধি পাইল। আমি চলিতে থাকিলাম। তিনিও আমার পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি স্পষ্টই বলিলেন, আমি শুনিলাম, "যাও, ভয় নাই আমি এইখানে দাড়াইলাম।" যদিও অনেক দিনের কথা, তবু যেন তাহার কথাগুলি আজিও আমার কাণে স্পষ্ট বাজিতেছে। বাড়ী পৌছিয়া সকলকে এই কথা বলিলে অনেকেই ভীত হইয়াছিল, এবং বহুলোকে আমাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়াছিল। ভূত দেখার শাস্তি স্বরূপ সেই রাত্রে আমার অনাহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, পূর্ব্ব কথিত ছাতিয়ান বৃক্ষের নিম্নেই তাহার দেহ সৎকার হইয়াছিল।

শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত।

নরকোৎসব।

প্রথম উল্লাস।

উপাদান।

সকল কথা গুছাইয়া বলিতে পারিতেছি না, অন্তর্দাহে বড়ই দগ্ধ হইতেছি। আমার যন্ত্রণা তোমরা বুঝিতে পারিবে না। বাতাসটুকু পর্য্যন্ত আমার নিকট যেন অবরুদ্ধ পাহাড়! যখন না শুনিয়া ছাড়িবে না, তখন যত সংক্ষেপে পারি, বলিতেছি, শুনিয়া যাও।

সে অনেক দিনের কথা। কত দিন, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। কিন্তু আমার স্মরণ আছে, তখন শীতকাল। অনুমান দশবৎসরের কথা। বন্ধু বিজয়কুমার আসিয়া অনুরোধ করিলেন, থিয়েটার দেখিতে যাইতে হইবে। আপত্তি করিলাম না। যৌবন-বল দৃপ্তদেহ,—সংসারে কোন পাপ আছে, ব্যসন আছে, আমার কোন বাধা বিঘ্ন বা দায়ীত্ব আছে, এমন মনেও আসিত না। সন্ধ্যার পর পশমী অলষ্টারে দেহ আবৃত করিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বাবুর সহিত রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলাম।

সাড়ে নয়টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবার কথা। আমরা কিন্তু নয়টারও পূর্ব্বে আসনাধিকার করিয়াছিলাম। তবে আমরাই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাতিক-গ্রস্থ তাহাও নহে, আমাদের উপরও ছিল। কারণ নয়টার সময় গিয়াও আমরা পিটের পিটে বসিয়াছিলাম।

তখন অভিনেতা অভিনেত্রীর সাড়া শব্দও ছিল না, কৃষ্ণ যবনিকায় সম্মুখভাগ সমাচ্ছন্ন। ঐকতান বাদকগণও দর্শন দেন নাই। তাহা

হইলেও দর্শকগণের যে কিছুইমাত্র কাজ ছিল না, এমন বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাঁহারা দার্শনিকের ন্যায় স্থিরভাবে নীরব সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রঙ্গমঞ্চের স্থান-অস্থান সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছিলেন। যাঁহারা চঞ্চল, তাঁহারা নাট্যকরের ন্যায় পাঁচরকম-ভাব, পাঁচরকম ভাষা, পাঁচরকম কাজের একত্র অবতারণা করিয়া হট্ট গোল তুলিতেছিলেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শান্ত, তাহারা কবির ন্যায় সর্ব্বত্রই সুন্দর দেখিয়া আপনভাবে আপনি মজিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আর যাহারা প্রেমিক, তাহারা প্রেমের সন্ধানে নয়ন দুইটীকে ছিদ্রপথে পাঠাইয়া প্রেমের নব বারতা আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেছিলেন :— ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি ও আমার বন্ধু বিজয় সেবার বি, এ, পরীক্ষা দিব। আমাদের হৃদয় আশার নবীন কুহেলিকায় তখন সম্যক্ সমাচ্ছন্ন। আমরা সেই গল্পে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের আনন্দ-চিত্রবিষয়ক কথোপকথনে সময় কাটাইতেছিলাম। সহসা আমার দৃষ্টি দক্ষিণদিকের দ্বিতলের উপর গেল, সেখানকার বক্সে একটি পুষ্টাঙ্গী রমণী কয়েকটী বালক বালিকা লইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। পার্শ্বের প্রলম্বিত পর্দ্দা উন্মুক্ত—সম্মুখে এক সুন্দরী ষোড়শী।

ষোড়শীকে ভালরূপে দেখা যাইতেছিলনা, কেবল কৃষ্ণতার দীর্ঘায়ত লোচনযুগল এবং অনিন্দ্য সুন্দর সহাস্য মুখখানিই দেখা যাইতেছিল। আশ্চর্য্য এই যে, সেই চঞ্চলোজ্জল চক্ষু দুইটীর দৃষ্টি আমাদেরই দিকে সন্নিবদ্ধ।

অপরিচিতা ভদ্রকন্যাকে এরূপ ভাবে দর্শন করা অন্যায় মনে করিয়া নয়ন ফিরাইতেছিলাম, ঠিক এই সময় যুবতী ব্যস্তভাবে আগ্রহ সহকারে সেই স্থূলাঙ্গিনীকে নিজের স্বর্ণচাঁপার মত অঙ্গুলী নির্দ্দেশে আমাদিগের

দিকে কাহাকে দেখাইতেছিল। প্রৌঢ়া চাহিয়া দেখিয়া উন্মুক্ত পর্দ্দা টানিয়া দিলেন। কিন্তু এমনভাবে টানিয়া দিলেন, যাহাতে তাঁহারই সর্ব্বাঙ্গ লোক লোচনের অন্তরালে যায়। যুবতীকে তিনি তাদৃশ সাবধান করিলেন না। মনে ভাবিলাম, আমাদেরই নিকট হয়ত উহাঁদের কোন আত্মীয় আছেন, যুবতী সেই আত্মীয়কেই অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইতেছে। ইহার কিছু পরেই ঐক্যতান বাদ্য এবং আরও কিয়ৎক্ষণ পরে অভিনয় আরম্ভ হইল।

সেদিন গিরিশবাবুর "দক্ষযজ্ঞ" অভিনয় হইতেছিল। দুই তিনটা গর্ভাঙ্ক অভিনয় বেশ নিবিষ্ট মনেই দর্শন করিতেছিলাম। সতী ও তপস্বিনীর ভূমিকা লইয়া দুইটী অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হইয়া গান গাহিতেছিল। গানটি বড় মিষ্ট বড় মধুর লাগিতেছিল। কেন জানিনা, কোন্ আকর্ষণে অনিচ্ছা সত্বেও সেই সময় একবার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম যুবতীর উজ্জ্বলতার চক্ষু দুইটী আমারই মুখের উপর সংস্থাপিত। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, যুবতী চক্ষু সরাইল। গায়িকাদ্বয় গান সমাপ্ত করিয়া ফিরিতেছিল, কিন্তু দর্শকেরা "ইন্‌কোর" দেওয়ায় তাহারা সেই গানটি পুনরায় গাহিল।

"ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী।
যুচাও ব্যথা, কও না কথা,
কার প্রেমে হে উদাসী!
রয়েছ মত্ত ধ্যানে,
তত্ত্ব তোমার কে বা জানে!
অনুরাগী সুধাই যোগী,
প্রাণ দিলে কি লও হে আসি?"

বাবু বিজয়কুমার "প্রেম-পীরিতি"র বাহিরে। তিনি বিরক্ত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"ও ছাই গানেরও "ইন্‌কোর"।

যুবতী বুঝি তাহা শুনিতে পাইল। সে মুচ্‌কি হাসিয়া পার্শ্বের পর্দ্দা সরাইয়া দিল। আর তাহাকে দেখা গেল না।

সে হাসির বর্ণনা করিতে পারিবনা, ভাব বুঝাইয়া দিতে পারিবনা, উপমা দেখাইতে সক্ষম হইবনা,—তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি,—

হাসি মদির ধারা
তোলে বিষামৃত জ্বালা

তোমরা কেহ কথনও এ মদিরা পান করিয়াছ কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্ষেত্র।

তারপরে রঙ্গালয়ে অনেকক্ষণ ছিলাম, সত্য কথা বলিতে কি, সেদিন আমি ভাল করিয়া অভিনয় দর্শন করিতে পারি নাই। কিসের পর কি হইল, কাহার পরে কে আসিল, কে কাহাকে কি বলিল, তাহা গুছাইয়া দেখিতে বা শুনিতে পাই নাই। চক্ষু ও মন অধিকাংশ সময়ই দ্বিতলোপরি সেই ষোড়শীর পার্শ্ববর্ত্তী লম্বিত পর্দ্দাপ্রান্তে লুব্ধ ক্ষুব্ধ আর্ত্ত পথিকের মত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।

যথা সময়ে অভিনয় সমাপ্ত হইয়া গেল। রঙ্গমঞ্চের শেষ যবনিকা পড়িল। মনে মনে রাগ হইল এত শীঘ্র কি এমনই করিয়া অভিনয় শেষ করিতে হয়! না হয়, দর্শকদিগের নিকটে আর কিছু দাম ধরিয়া লইয়া সমস্ত রাত্রিটুকু অভিনয় করিলেই হইত! "জলদে লুকাল পূর্ণ-শশধর, পিয়াসা রহিল পূরিয়া।" আর একবার চাহিলাম, দেখিলাম, হেঁস অম্লান পঙ্কজ মুখ খানি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। সে'ও উঠিয়া

দাঁড়াইয়াছে! এইবার শেষ চক্ষুতে চক্ষুতে মিলন! তারপরে সব ফুরাইল, সে চলিয়া গেল, আমিও চলিয়া গেলাম।

সে কোথায় গেল, জানিতে পারিলাম না। একবার ইচ্ছা হইল, অনুসন্ধান করি। আবার মনে হইল, কেন? কিসের জন্য? কে সে? তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমার কি লাভ হইবে? কাজেই বন্ধুর সহিত রাস্তায় বাহির হইলাম।

রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম, রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে। উষার শীতল বাতাসে আরও শীত বৃদ্ধি করিয়াছে, এবং জনকোলাহল মুখরিত মহানগরীর রাস্তায় তখন অল্প লোকের সাড়া শব্দ মিলিতেছে।

আরও কিছুদূর গমন করিয়া বন্ধু বিদায় লইয়া তাঁহার বাড়ীর রাস্তা ধরিলেন, আমিও আমার বাড়ীর দিকে চলিলাম; কিন্তু সেই মুখ খানির অত্যন্ত অভাব জ্ঞান করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, তেমন মুখ বুঝি জীবনে আর দেখা হইবে না। যদি না হয়, তবে এজীবনের উদ্দেশ্য কি? স্বর্গের কথা শুনিয়াছি, বুঝি সে এমনই মুখ সৌন্দর্য্য দিয়া সংগঠিত। পারিজাত পুষ্প, পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল জ্যোৎস্না, মৃদু মারুতের মধুরতা, আর কবিতার কমনীয় ভাব এসকল একত্রে ছানিয়া মাখিয়া বিধাতা বুঝি সেই মুখ খানির সৃষ্টি করিয়াছেন! কি করিলে, তাহা সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে রাখা যায়? কোন্ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সে স্বর্গসুখলাভ করা যায়? অশ্বমেধ, না নরমেধ? পার্শ্বের বাড়ীর ছাদ হইতে ঠিক এই সময় একটা নিশাচর পাখী বড় কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। সেটা কি পাখী বুঝিতে পারিলাম না। সে যেন সেই কর্কশ স্বরে বলিয়াছিল "নরমেধ গো নরমেধ।"

প্রভাতের আলো সম্পূর্ণ বিকাশিত না হইতেই বাড়ী পঁহুছিলাম। তখনও আমি অবিবাহিত। বাহিরের ঘরে বিছানা ছিল, শুইয়া পড়িলাম।

কিন্তু নিদ্রা হইল না, অবশিষ্ট অন্ধকারটুকু সেই মুখের কল্পনা-লোকে কাটাইয়া ছিলাম।

সেই দিন হইতে "সো রূপ লাগ্ রহি, হৃদয়ে হামারি।' আর ভুলিতে পারিলাম না। নাটক নভেল পড়িলে, নায়িকার সৌন্দর্য্য বর্ণনে তাহার কথা মনে পড়িত। উদিত চন্দ্র দর্শনে, পুষ্পগন্ধ আঘ্রাণে, নদীর কল্লোল শ্রবণে, শর্করার মধুর রস আস্বাদনে, মৃদু মারুত স্পর্শনে, তাহারই কথা মনে পড়িত। কিন্তু কি সে? কোথায় সে?

এইরূপে ছয় মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল?

ইহার মধ্যে আমি বি, এ, পাশ করিয়াছিলাম। বাবা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন, বি, এ, পাশ না করিলে আমার বিবাহ দিবেন না। আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বাবার মত এই ছিল যে, নিজে উপার্জ্জন করিতে না পারিলে, অথবা উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিলে বিবাহ দেওয়া উচিত নহে।

আমাদের বাড়ী সিমলা ষ্ট্রীট, জাতিতে আমরা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ আমার নাম মধুসূদন ঘোষ,—পিতার নাম ধনঞ্জয় ঘোষ। বাবার এক খানা কাঠের দোকান ছিল, এবং তাহারই আয়ে আমাদের চারি পাঁচ জন লোকের কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তবে মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থের মতই সংসার চলিত। আমার পড়াশুনাতেও মোটা খরচ হইত। কাষ্ঠ বিক্রেতার পুত্র বলিয়া জমিদার রাসবিহারী বাবুর পুত্রের পোষাক পরিচ্ছদের সহিত আমার পোষাক পরিচ্ছদের কোনরূপ পার্থক্য ছিল না, সে জন্য ব্যয়াধিক্য হইয়া পড়িয়াছিল। যেমন এখনকার সকলেরই দেনা দাঁড়াইয়া যায়, আমার পিতারও তদ্রূপ কিছু দেনা হইয়া পড়িয়াছিল।

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমার অনেক বিবাহ সম্বন্ধ যুটিতেছিল, আমি যেমন যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা পাইতে ছিলাম, তেমনি তেমনি আমার দর বৃদ্ধি হইতেছিল। কিন্তু বাবার সেই "বুকভাঙ্গা পণ।"

এবার কিন্তু বাবাকে নিরুত্তর হইতে হইল। "বি, এ, পাশ করিলে বিবাহ দিব' বাবাকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, পূর্ব্ব পরিচিত অনেক কন্যাভার-ক্লিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তখন দর "উঠানামা" হইতে লাগিল। বহুবাজারের শশিমিত্র মহাশয় নগদ চারি হাজার টাকা, কন্যার আপাদ-মস্তক আভরণ ও জামা চেইনঘড়ী এবং বৃষাভরণ দানে স্বীকৃত হইয়া দিন স্থির করিয়া গেলেন। ক্রমে আমার বিবাহের দিন ঘনাইয়া আসিল।

আমি ভাল করিয়া কিছুই বুঝিয়া জানিতে পারিতে ছিলাম না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিলাভ জন্য যে সকল অজীর্ণ পদার্থ জীর্ণ করিয়াছি, এটা যেন তাহা হইতে আরও কঠিন, আরও দুষ্পাচ্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম। উদরমধ্যে পড়িয়াভাবনাটা অহর্নিশি গড়াগড়ি পড়িতে লাগিল।

আমার মনে হইত, বিবাহ করিব কি না! বিবাহ করা কিসের জন্য? সুখের জন্য, ভালবাসার জন্য। কিন্তু ভাল বাসিব কি প্রকারে? সেই যে, 'অচেনা অজানা মুখ' এক মুহূর্ত্তে প্রাণের সব খানি যায়গায় তাঁহার স্মৃতির ছাপ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেখানে কি আর কিছুর স্থান হইবে? যদি না হয়, তবে বিবাহ কেন? তবে বিবাহ না করাই উচিত। চিরদিন তাহার স্মৃতি লইয়া তাহারই প্রেমের প্রতীক্ষায় কাটাইয়া দিব। কিন্তু কাহার প্রতীক্ষা করিব! কে সে? কোথায় সে? কাহার সে? কলিকাতার সমস্ত রাস্তা, সমস্ত অলি-গলি অনু-সন্ধান করিয়াছি, কোথাও ত তাহার চরণের অলক্তক রাগের একটুকু দানও দেখিতে পাই নাই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিলন।

হঠাৎ একদিন আমাদের প্রাঙ্গণে আমারই প্রাণের মত নীলবর্ণে চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত আবিল রৌদ্র ভাসিতে লাগিল। তাহার তলে যোষিৎগণ আমার সর্ব্বাঙ্গে হরিদ্রা মাখাইয়া দিলেন; দুই তিনটা মঙ্গল-শঙ্খ বাজিল, এবং দরোজায় বসিয়া সানাইওয়ালা তিলক-কামোদ রাগিনীর মিঠা আওয়াজে প্রতিবাসীদিগকে গাত্র হরিদ্রার শুভ বারতা শুনাইয়া দিতে লাগিল।

তাহার তিনদিন পরে বিবাহের শুভলগ্নে সম্প্রদান সভায় বরাসনে বসিয়া অনেক মন্ত্রপাঠ করিলাম, এবং সম্প্রদানকার্য্যের অসম্পূর্ণাবস্থায় স্ত্রী-আচারের জন্য অন্দরমহলে প্রেরিত হইলাম।

অভিমন্যুর ন্যায় সেখানে আমি সপ্তরথী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলাম। ভীমাদির ন্যায় মৎ সম্পর্কীয় দু' একজন সে চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা হইয়া ফিরিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সপ্তরথী বলিয়া ব্যাকরণ ভুল করিয়াছি। তবে আমি নব্য শিক্ষিত নব্য শিক্ষকের মহিমা বলে যখন নলপ্রিয়া মুখোপাধ্যায়, রেণুকা দাস প্রভৃতি সভাপত্নী না হইয়া সভাপতি হইতেছেন, তখন সপ্তরথী বলিয়া এমন কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি?

চতুর্দ্দিকে অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি, হাসি ও বাক্যালাপের বেণু বীণা বংশীনিন্দিত স্বর বিস্তার, চাহনির কুসুম-কমনীয়তা ও কটাক্ষের বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণ-আমি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান! কোন্ জ্যোৎস্না সোপান বহিয়া কোন্ চাঁদের দেশে চলিয়া যাইব। কোন সুখ সরসির কমল-কাননে মধু চক্রের

মধু গন্ধে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িব, স্তব্ধশ্বাসে ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ আমার সমস্ত হৃদয়টা আলোড়ন বিলোড়ন করিয়া সমস্ত হৃদ্‌পিণ্ডটার এক মহা বৈদ্যুতিক প্রবাহ তুলিয়া দিয়া দেহের সমস্ত অণু পরমাণুতে বিষামৃত মাখাইয়া দিয়া 'সেই মুখখানি' সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে মূর্ত্তি রঙ্গালয়ে দর্শন করিয়া এত দিন হৃদয়ের নিভৃত কোণে পোষণ করিয়া আসিতে ছিলাম, আজি তাহা সম্মুখে দেখিতে পাইলাম।

যথাসময়ে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। যাহার সহিত বিবাহ হইল, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম না—কোন কিছু বুঝিলাম না। কেবল এই তত্ত্বে বুঝিলাম যে, রঙ্গালয় দৃষ্টা সেই স্থূলাঙ্গিনী প্রৌঢ়া রমণী আমার শ্বাশুড়ী, এবং চিত্তহারিণী ষোড়শী আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ সহোদরা।

বাসরে তাহার সহিত কথোপকথন হইল। তাহার প্রত্যেক কথায় আমার ধমনীগুলা নাচিয়া উঠিতেছিল, প্রাণের কানে বেহাগের করুণ মধুর ঝঙ্কার ঢালিতেছিল। প্রতি নয়ন-হিল্লোলে স্বর্গ সুখের আস্বাদ আনন্দ উপভোগ করিতে ছিলাম।

আমার স্ত্রীর নাম ঊষা, আর তাহার নাম সন্ধ্যা। আমার বড় শ্যালিকা হইলেও তাহার কথা অভিহিত করিব!

কত কথা, কত হাসি, কত রহস্য, কত গান কবিতার পরে সন্ধ্যা আমাকে বলিল,—"সেই একদিন থিয়েটারে দেখা হইয়াছিল, মনে আছে কি?"

আমি। খুব মনে আছে।

সন্ধ্যা। তুমি কি আমায় চিনিতে পারিয়াছিলে?

আমি। কি করিয়া চিনিব? তবে সেই দিন হইতে চিনিয়া রাখিয়াছি—এমন করিয়া চিনিয়া রাখিয়াছি যে, জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

সন্ধ্যা। সেকি! আমায় ভুলিতে পারিবে না কেন? পূর্ব্বে যদি আমাকে না চিনিতে, তবে তত ঘন ঘন আমার দিকে চাহিতেছিলে কেন?

আমি। সে কেন তার উত্তর দিতে পারিব না। তুমি কি আমারই দিকে চাহিতেছিলে!

সন্ধ্যা। হঁ্যা।

আমি। কেন?

সন্ধ্যা। তোমার সহিত উষার বিবাহের কথা মার সাক্ষাতে আমিই প্রথমে বলি, কিন্তু তোমার পিতা বুঝি বি, এ পাশ না করিলে বিবাহ দিবেন না বলেন। তাই মাকে তোমায় দেখাইয়া ছিলাম। আর তুমি আমাকে জ্ঞান বিবেচনা করিয়া অভিনয়ের ভালমন্দ সমালোচনা স্বরূপে মধ্যে মধ্যে তোমার দিকে চাহিতেছিলাম।

সন্ধ্যার সে কৈফিয়তে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। সেকি তোমার চাহনি? আর তাহার সহিত তত নৈকট্য বা কি ছিল! যাহা হউক, সে কথার আর বাদ প্রতিবাদ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি তোমায় আগে কোথায় দেখিব? তুমি কি আমায় সেদিনের আগেও দেখিয়াছিলে?"

সন্ধ্যা মৃদু হাসিয়া বলিল,—না দেখিলে বিবাহের কথা তুলিলাম কেন? আর মাকেই বা তোমায় দেখাইতাম কি প্রকারে?

আমি। কোথায় দেখিয়াছিলে?

সন্ধ্যা। আমার বিবাহ তোমাদের পাড়াতেই হইয়াছে।

আমি। আমাদের পাড়ায় কার সঙ্গে?

সন্ধ্যা। নাম বলিতে হইবে নাকি? দে-চৌধুরীদের বাড়ী।

আমি। দে-চৌধুরীদের বাড়ী;—ওঃ! কার্ত্তিকঠাকুরদা কি তৃতীয় পক্ষে তোমাকে বিবাহ করিয়াছেন? কি ভাগ্যবান পুরুষ!

সন্ধ্যা। হ্যাঁ, জীবনের সন্ধ্যাকালে তিনি সন্ধ্যারই মাথা খাইয়াছেন।

আমি। টাকা-কড়ি, গাড়ী যুড়ী সবই আছে।

সন্ধ্যা। নাইক কেবল প্রাণ। বৃদ্ধকালে সে জিনিষটা বড় রকমারি ভাব ধারণ করিয়া বসে। যাক্ 'ধান ভানিতে শিবের গীতে' প্রয়োজন নাই। তুমি একটা গান গাও।

আমি ভাল দেখিয়া, খুব মনের মত একটা প্রেমের গান গাহিলাম। সে নিশা বড় সুখেই কাটিয়া ছিল। কিন্তু সে সুখ যে, এত দুঃখে পরিণত হইবে, এমন মর্ম্ম বিদারণ ক্ষণে কঠোর কুলীশাকার ধারণ করিবে, তাহা তখন মনে করি নাই। বুঝি মর্ত্তে সুখ কোথাও নাই। সুখ ডাকিলেই দুঃখ আসে, মিলন যাচিলেই বিরহ উপস্থিত হয়, জীবন থাকিলেই মরণ জাগিয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ভূতের বাড়ী।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী মথুরাবাটী আমাদের গ্রাম। ইহা কলিকাতার পশ্চিম হইতে দশ ক্রোশের অধিক নহে। এই গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলে কি হয়? একদিন এই গ্রাম ৫।৭ শত কায়স্থ ব্রাহ্মণ পরিবারের আবাস-ভূমি ছিল। তখন এখানে কত টোল, কত চতুষ্পাঠী কত বিদ্যালয়, কত চিকিৎসক এই ক্ষুদ্র পল্লীর উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছিল, কিন্তু চিরদিন কিছুই সমান যায় না, এখন সেই গ্রাম জনমানবহীন বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

গ্রামের এই উন্নতির দিনে আমাদের পরিবারবর্গ দেশেই বাস করিত। এখানে আমাদের বাটীতে আমার পিতামহী কোন সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন। গ্রাম্য চিকিৎসকগণের দ্বারা চিকিৎসিত হইলেও তাঁহার পীড়ার উপশম হয় নাই। তাঁহার পুত্রগণ মাতা-ঠাকুরাণীর এই রোগের প্রকোপ দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এবং অনন্য-উপায় হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় বায়ু পরিবর্ত্তন ও সুচিকিৎসার নিমিত্ত আনয়ন স্থির করিলেন। আমার পিতৃদেব ফকীরচাঁদ মিত্রের গলিতে রোগীর ও অন্যান্য পরিবারের বাসোপযোগী একখানি বাটী ভাড়া করিলেন। ঐ বাটীখানি তৎকালে এডমিনষ্ট্রেটার General এর হাতে ছিল। আজ কাল ঐ বাটী ভাঙ্গিয়া একখানি সম্পূর্ণ নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

পিতামহী ঐ বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বে উহার সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ সংস্কার ও পরিষ্কৃত করা হইল। আমার পিতামহী অতি অল্প দিনের মধ্যে সুচিকিৎসক গুণে ও স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে অনেক পরিমাণে নিরাময় হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে আমার পিতাঠাকুর মহাশয় একদিন একটী বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। তৎকালে তিনি কলিকাতা হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষিত লোক হইয়া তিনি হঠাৎ কোন অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন না। যে সময় তিনি মাতাঠাকুরাণীর চিকিৎসা করাইতে আসিয়া ছিলেন তখন শীতকাল। রাত্রে ঘরে থাকিতে হইলে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ না করিয়া থাকা যাইত না। ঐ সময় একদিন রাত্র আন্দাজ ১০ টার সময় তিনি ঘরে বসিয়া পড়িতে ছিলেন। এমন সময় যেন কোথা হইতে হঠাৎ একখানি থান ইট অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে পড়িল। তিনি এই ইটের পতনে একটু আশ্চর্য্যান্বিত ও

বিচলিত হইলেন। কারণ উহা মাথায় পড়িলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তখন ঘরের সমস্ত জানালা ও দ্বার বন্ধ ছিল এবং ছাদেও কোন ভগ্ন অংশ ছিলনা যেখান হইতে এত বড় একটা ইট পড়িতে পারে। এই ইটের পতন দেখিয়া কিছুই স্থির হইল না এবং কেহ উহার মীমাংসা করিতে পারিল না। তবে ঘটনা যে একটা অলৌকিক ও অদ্ভুত তাহা আর কাহারও অবিদিত রহিল না।

কিছুদিন পরে বাড়ীর অন্যান্য স্থানে ঢিল পড়িতে লাগিল। বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ সকলেই ভীত ও চিন্তিত হইতে লাগিলেন এবং মনে সকলেই দেশে ফিরিবার ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। এই দুইটী ঘটনার কিছু দিন পরে আবার একটী অভিনব ঘটনা উপস্থিত হইল। একদিন বাড়ীর কেহ দেখিল সন্ধ্যার পর একটী লোক রাস্তার দিকের পাঁচিলে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। যিনি দেখিলেন তিনি মনে করিলেন বোধ হয় এ চোর— ঐ স্থানে চুরি করিবার মতলবে বসিয়া অবসর খুঁজিতেছে। তিনি বাড়ীর সকলকে সংবাদ দিলেন। এ দিকে সকলে আসিয়া তাড়া দিতে না দিতে চোর হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। এই মূর্ত্তি অদৃশ্য হইলে সকলে কত জল্পনা ও কল্পনা করিতে লাগিল। কিন্তু উহাকে আর দেখা গেল না। সকলেই এই ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়া অবাক।

আমার পিতামহী ক্রমে সুস্থ ও সবলকায় হইতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ নূতন উপদ্রবের কথা শুনিয়া শীঘ্র শীঘ্র দেশে ফিরিতে চাহিলেন, কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়ায় এবারও দেশে যাওয়া হইল না।

আর একদিনের ঘটনায় আমার পিতাঠাকুর মহাশয় ঐ বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য হইলেন। ঘটনাটী অতি ভয়ানক ও লোমহর্ষণ কাণ্ড। একদিন আমার পিতা ঠাকুর মহাশয় রাত্রি আন্দাজ ১১টার সময় পাঠ সমাপন করিয়া বিশ্রাম কালীন তামাক সেবন করিতে ছিলেন। ঐ সময়ে ঘরে

অন্যান্য যাহারা ছিলেন সকলেই নিদ্রিত এবং ক্ষীণ দীপালোক এই প্রকোষ্ঠকে আলোকিত করিতে ছিল।

শীতকালের এই নিস্তব্ধ রাত্রে তিনি দেখিলেন ৭।৮ হাত দূরে ঘরের মশারির চালে একটা স্ত্রীমূর্ত্তি। কি সর্ব্বনাশ! এখানে এ স্ত্রীমূর্ত্তি কোথা হ'তে এলো! তিনি প্রথমে মনে করিলেন আমি ভুল দেখিতেছি না সত্য! ভাল করিয়া দেখিলেন যে ঐ স্ত্রীলোকটী শূন্যে নিজের মাথার চুল আঁচড়াইতেছে। তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু কাহাকেও না ডাকিয়া স্থির ভাবে উহার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই মূর্ত্তি দেখিয়া পিতৃদেব সে রাত্রি আর কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সে রাত্রি অতি কষ্টে ও চিন্তায় কাটিয়া গেল। পর দিবস প্রাতে উঠিয়া তিনি বাড়ীর সকলকে বলিলে সকলই বিশেষ ভীত হইলেন। এবার তিনি অনুসন্ধিৎসু হইয়া ঐ স্থানের বৃদ্ধ লোকের নিকট জ্ঞাপন করিলে কেহ কেহ বলিল যে পূর্ব্বে কোন গোপসন্তান ঐ বাড়ীর মালিক ছিল। তাহার স্ত্রী চরিত্রহীনা হওয়ায় তাহার স্বামী তাহাকে হত্যা করে এবং দোষ সপ্রমাণ হওয়ায় তাহার গ্রেপ্তার হইলে ঐ বাড়ী কোম্পানীর হস্তে যায়। এখন যে স্ত্রীমূর্ত্তি দেখা যায় উহা আর কিছুই নয়, উহা সেই হত স্ত্রীলোকের প্রেতমূর্ত্তি! এই প্রেতিনী এখন ঐ বাড়ী আশ্রয় করিয়াছে।

এই বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব থাকায় কোন ভাড়াটীয়া টিকিতে পারিত না। কিন্তু আমার পিতৃদেব ইহার ওরূপ কাণ্ড জানিতে পারিলে কখনই ভাড়া করিতেন না। যাহা হউক তিনি ঐ ভৌতিক কাণ্ডের দু'চারি দিবসের মধ্যে বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া দেশে অর্থাৎ মধুবাটি গ্রামে সপরিবারে প্রস্থান করিলেন। আজ অর্দ্ধশতাব্দী হইতে ঐ বাটীর কোন চিহ্নমাত্র নাই কারণ তাহাকে ভাঙ্গিয়া এখন নূতন ইমারত করা হইয়াছে। এখন এ পুরাতন বাড়ীর অস্তিত্ব নাই।

শ্রীচুণিলাল মিত্র।

হানা বাড়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশের পর)

সেদিন বিকালে ছেলেরা জল খাবার জন্য পয়সা চাহিতেছে, এমন সময় গোটাকত পয়সা দালানে উঠানে ঠুক্ ঠাক্ করিয়া পড়িল। বেশ বুঝিতে পারা গেল, ছেলেদের জল খাবার জন্য তিনি পয়সা প্রদান করিলেন। তাহারা সেই পয়সায় খাবার কিনিয়া খাইল। তিনি কোথা হইতে যে আমাদিগকে এই প্রকারে টাকা পয়সা, সিকি দুয়ানি প্রদান করিতেছেন, তাহা ভাবিবার আমাদের অবসর হয় নাই।

তারপর, দাদা আফিস হইতে আসিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিনের মত সেদিনও তাঁহার ঘরে আহ্নিক করিতে গিয়াছেন! বলা বাহুল্য, সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে সেই ঘরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই, পাছে তাহাতে সেই অদৃশ্য পুরুষের কোন ক্রিয়ার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় আমাদের এই প্রকার নিষেধ ছিল। পরে দাদা আসিয়া সেই ঘরে প্রদীপ লইয়া প্রবেশ করিবামাত্র চন্দনাদির সুগন্ধ তাঁহার নাসিকায় প্রবেশ করিল এবং পূর্ব্ব দিনের মত সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদনের যাবতীয় চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। এতদ্ব্যাপারে সেই অদৃশ্য পুরুষের উপর আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হওয়ায় গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। তারপর সেই ঘরে বসিয়া দাদার নিকট সেই দিন দুপুর ও বিকাল বেলার ঘটনা সমূহ বিবৃত করা হইতেছে, এমন সময়, দাদার কি মন গেল, তাঁহার বিছানার মাথার বালিশটা তুলিয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলেন। বালিশটা তুলিবামাত্র দেখিতে পাইলেন যে, উহার নীচে বিছানার উপর দুইটা 'দানাদার' রহিয়াছে! বিছানার

চাদর খানি রসে ভিজিয়া গিয়াছে। "তিনি নিশ্চয়ই উহা আমাদিগকে খাইতে দিয়াছেন" এই ভাবিয়া আমরা সকলে মিলিয়া সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলাম। সেদিনকার মত ঐ পর্য্যন্ত।

তৎপরবর্ত্তী দিবস অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইল। বহু দিবস হইতে বড় ঘরের দেওয়ালে একটা ঝুলি ঝুলান ছিল। দুপুরবেলা দেখা গেল যে, উহা সেস্থানে নাই! তারপর খুকিকে স্নান করাইয়া দিবার সময় শূন্য হইতে তাহার নিকট একটা আধলা পয়সা ঠক্ করিয়া পড়িল, বোধ হয় তাহার জলযোগের জন্য উহা প্রদত্ত হইল! সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে দাদার ঘরে "তাঁহার" সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার যাবতীয় দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া রাখা হইল। তাঁহাকে কেবল সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ আয়োজন করিয়াছিলাম। কারণ, উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাকে স্বয়ং সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার যাবতীয় দ্রব্যাদি একস্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতে হয়, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ অসুবিধা বা ক্লেশ হইতে পারে, তাহা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে আমরা সেইদিন সমস্তই আয়োজন করিয়া রাখিলাম এক পয়সার বাতাসা একটি মাটির টবে বসাইয়া অন্যান্য দ্রব্যাদির সহিত সেই ঘরে রাখিয়া আসা হইল আর গোটাকতক ফুলও সেই সঙ্গে রাখা হইল। তারপর- সেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দাদা অফিস হইতে বাটী আসিলে পর, আমরা সকলে একত্রে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, খানকতক বাতাসা তুলসী গাছের চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, তন্মধ্যে এক খানি বাতাসা ভাঙ্গিয়া রহিয়াছে—সেইটি বোধ হয় ঠাকুরকে নিবেদন করা হইয়াছিল; আর গাছের গোড়ায় ফুলগুলি সব সাজান, টবের চারিপার্শ্বে জল ছড়ান এবং খানিকটা চন্দন ঘসা রহিয়াছে দেখা গেল। এতদ্ব্যাপার দর্শনে হর্ষ-বিস্ময়-চিত্তে রোমাঞ্চিত কলেবরে

স্তম্ভিত ও মৃতপ্রায় অবস্থায় গললগ্নীকৃতবাসে আমরা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও মনোমত প্রার্থনা করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

তারপর, দাদার ঘড়ি প্রভৃতি রাখিবার জন্য বাক্স খুলিয়া দেখিলেন যে, উহার মধ্যে চারিটী 'দানাদার' রহিয়াছে—আশ্চর্য্যের বিষয়, বাক্সে একটুও রস লাগে নাই। দানাদার চারিটির মধ্যে দুইটা আমরা সকলে ভাগাভাগি করিয়া খাইলাম, আর বাকি দুইটা আমরা অন্য দুই ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলাম! আমার ঐ দুই ভাই কর্ম্মোপলক্ষে তখন বিদেশে ছিলেন—একজন শিলং, আর একজন বোম্বে থাকিতেন। উক্ত দানাদার দুইটি আমার প্রবাসী ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রেরণ করিবার একটি গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত অদৃশ্য পুরুষ প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী সেবনে যদি আমাদের কোনরূপ ইষ্টলাভ হয়, কিন্তু আমার উক্ত ভ্রাতাদ্বয় সে ইষ্টলাভে বঞ্চিত হইবেন, যাহাতে তাঁহারাও আমাদের সহিত সমফলপ্রাপ্ত হইতে পারেন, তৎপক্ষে আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনায় এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। তৎপরবর্ত্তী দিবস ঐ দুইটি দানাদার ভিন্ন ভিন্ন পার্শেলে তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইল। যথাসময়ে তাঁহাদের নিকট হইতে তৎপ্রাপ্তিস্বীকার পত্রও পৌঁছিল।

উপর্য্যুপরি কয়েকদিবস একপ্রকার অদ্ভুত, অভিনব অথচ অনুকূল ঘটনা প্রবাহে আমাদের সময় অতিবাহিত হইতেছিল, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী দিবস হইতে পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ হইল। সেদিন অফিস হইতে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম যে, মাতাঠাকুরাণী ও বৌদিদিমনির নিকট যাহা কিছু টাকা পয়সা ছিল, সব গিয়াছে! প্রথমবার টাকা পয়সা যাওয়ার পর, যাহা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তন্মধ্যে মাতাঠাকুরাণীর নিকট কতক ছিল, আর কতক বৌদিদিমণি রাখিয়া ছিলেন। মাতা-

ঠাকুরাণী সেইগুলি নিজের পেটকাপড়ে বাঁধিয়া সদাসর্ব্বদা সাবধানে রাখিতেন, আর বৌদিদিমনি সেইগুলি একটি কাগজে মুড়িয়া চাউলের জালার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। সে স্থানে যে মোড়কটি আছে, তাহা চোরেও কল্পনা করিতে পারে না। আর সেই "মহাত্মা" কি না সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন—তবে কি তিনি অন্তর্যামী! এই সব শুনিয়া আমার নিজের বাক্স খুলিয়া দেখিলাম কিছু গিয়াছে কি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার কিছুই যায় নাই। তারপর, দাদাও বাক্স খুলিয়া দেখিতে গেলেন। বাক্সটি খুলিয়াই তিনি সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন—তাঁহারও সব গিয়াছে! সর্ব্বনাশ! বাড়ীর যাহার কাছে যা কিছু ছিল, সব লইয়া গিয়াছেন। হরিনামের ঝুলিটা পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। আর সে দিন সন্ধ্যার সময় আহ্নিকাদি কিছুই করেন নাই। আমরা যথামত সমস্তই আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু যেখানের জিনিস সেইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে।

সেদিনকার ঐ প্রকার অনিষ্টাচরণে আমাদের মনে একটা আশঙ্কা ও সন্দেহ উপস্থিত হইল। বোধ হয় আমাদের কোন রকম ত্রুটি হইয়া থাকিবে, তজ্জন্য তিনি আমাদের সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মনোমধ্যে আরও কত প্রকারের যে শঙ্কা উপস্থিত হইল, তাহা সংখ্যা করা যায় না; মানুষ মন্দটাই আগে ভাবিয়া লয়। কোন উপায়ান্তর নির্দ্ধারণ করিতে পারা গেল না। তাঁহার নিকট করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা ও ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা, এই দুইটি উপায় অবলম্বনে আমরা এক প্রকার স্থিরবিশ্বাসী হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃতলালদাস।

অলৌকিক রহস্য।

১০ম সংখ্যা]　　চতুর্থ বর্ষ।　　[বৈশাখ ১৩২০।

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হিন্দু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়া আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি যে, আমাদের ভালমন্দ অবস্থা আমাদের ভালমন্দ কর্ম্ম অনুযায়ী হয়। জীবের এই জগতে ভাল মন্দ কার্য্য তাহার ইহকালের ও পরকালের সুখজনক বা দুঃখজনক অস্তিত্বের সৃষ্টি করে।

কর্ম্ম কখন বৃথা যায় না। ক্রিয়ার যেমন প্রতিক্রিয়া আছে, প্রত্যেক কর্ম্মেরই সেইরূপ অনুরূপ কর্ম্মফল আছে। একটী প্রবাদ আছে, "যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠায় শোধ"। কাঠা কথার মানে চাউল বা ধান মাপিবার 'কুন্‌কে'। প্রবাদটীর অর্থ এই যে 'যে কাঠা দিয়া মাপিয়া চাউল ধার করিতে হয়, শোধ দিবার সময়, সেই কাঠাতেই মাপ করিয়া চাউল দিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় একমাপের কাঠা ব্যবহারে চাউলের পরিমাণ ঠিক বুঝিতে পারা যায়। এক রকম কাঠা বা কুন্‌কে চাউল লইবার সময় ব্যবহার করিলে এবং আর রকম কাঠা চাউল ফিরাইয়া দিবার সময় ব্যবহার করিলে, সমান ওজনের চাউল পাওয়া যায় না। সেই জন্যই যে কাঠায় মাপ করিয়া লইতে হয়, শোধ দিবার সময় সেই কাঠায় মাপিয়া শোধ দিতে হয়। ন্যায় বিচারের এই নিয়ম।

কিন্তু এই প্রবাদটীর একটী অতি সুন্দর অর্থ আছে তাহা এই যে, যেমন ভাবে ও যে ওজনের কাজ করিবে, তেমনি ভাবে ও সেই ওজনের কাজের ফল ফিরিয়া পাইবে। যেমন করিবে, তেমনি প্রতিদান পাইবে। একটী ভাল কর্ম্ম করিলে তাহার ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ছাত্র জীবনে ছেলেরা যদি আমোদ প্রমোদে মত্ত না হইয়া কষ্ট সহিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, সেই বিদ্যা শিক্ষার ফল তাহারা পাইবেই। কর্ম্মের ফল তোলা থাকে—উড়িয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি মহাত্মার পবিত্র জীবনী স্মরণ করিতে পার, দেখিবে যে, কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া যাঁহারা ছাত্র জীবন কাটাইয়াছেন পরে অর্থাৎ পরিণত বয়সে তাঁহারা সেইরূপ সুখী হইয়াছেন। শরীর খাটাইয়া মন ও প্রাণ একদিকে ঢালিয়া, বিদ্যা ও চরিত্র লক্ষ্য করিয়া সেই সব মহাত্মগণ যে জীবনের প্রথম ভাগ কাটাইয়াছেন সেই সকল সাধনা সেই সকল অনুষ্ঠান বৃথা যায় নাই—তাঁহারা পরে ধনে, মানে ও জ্ঞানে বড় হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান শোভা করিয়া জগতে কর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিয়া চির বিদায় লইয়াছেন।

ভাল কর্ম্মের সম্বন্ধে যে নিয়ম, মন্দ কর্ম্মের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম খাটিবে। কাহাকেও গালাগালি দাও তোমাকেও সেই গালাগালি খাইতে হইবে। কাহাকেও ঘৃণা করিয়া মুখ ফিরাইয়া লও, সেও তোমায় ঘৃণা করিতে শিখিবে। "ঢিলটী মারিলেই পাটকেলটী" খাইতে হইবে।

ইহা আমাদের বেশ মনে রাখিতে হইবে যে, যে কাঠায় মাপ ঠিক সেই কাঠায়ই শোধ হইবে। ঠিক ততটা (সুদ শুদ্ধ বেশী না হইলেও হইতে পারে) দুঃখ নিশ্চয়ই তোমায় পাইতে হইবে। দান, প্রতিদান, সমান হইবে।

কখন কখন উৎকট পাপের ফল অতিশীঘ্র ইহজগতেই লোকদিগকে ভোগ করিতে হয়।

শাস্ত্রে আছে,—অর্থাৎ তিন দিনে, না হয় তিন মাসে, না হয় তিন বৎসরে মানব উৎকট পাপের ফল নিশ্চয়ই পায়।

সেইজন্যই নীতিশাস্ত্রে বলে 'বিনয় সকল গুণের ভূষণ স্বরূপ।' সকলের মান্য রাখিয়া কথা কহিবে ইত্যাদি।

ইংরাজীতেও বলে Do unto others as you would be done by. অর্থাৎ তুমি অপরের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইতে আশা কর, অপরের প্রতিও নিজে সেইরূপ ব্যবহার কর। কারণ, তুমি যে কাঠায় পরকে মাপিবে, পরেও তোমায় ঠিক সেই কাঠায় মাপিয়া শোধ দিবে।

কর্ম্মের এই সূক্ষ্ম অথচ অভ্রান্ত গতি সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক গুলি প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে মনে হয় আমাদের দেশে কর্ম্ম ও তাহার ফল সম্বন্ধে জ্ঞান বহুদিন হইতেই দেশবাসীর প্রকৃতিতে মিশিয়া রহিয়াছে।

কর্ম্ম লইয়াই মনুষ্য জীবন। যে জীবনে যত বেশী কাজ হইয়াছে, সেই জীবন তত বেশী প্রয়োজনীয়। বেশীদিন বাঁচিলেই প্রকৃত দীর্ঘ জীবন হইল না, কারণ বয়স ধরিয়া জীবনের মনুষ্যত্ব মাপা হয় না, কর্ম্ম ধরিয়া জীবনের মূল্য ঠিক করা হয়। কর্ম্মশূন্য জীবন একশত বৎসর অপেক্ষা এক বৎসর ব্যাপী কর্ম্মময় জীবনের দর অধিক। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মাত্র ৩২ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এক মহান্ ব্যাপার করিয়া গিয়াছেন। ৩২ বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মচারীর জীবনে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সকল শাস্ত্রের অভ্রান্ত অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ টীকা বা ব্যাখ্যা প্রচার, বৌদ্ধ ধর্ম্মের আধিপত্য খর্ব্ব করণ, সাধারণের জন্য হিন্দু ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির উপাসনার ব্যবস্থা দান ও জ্ঞানীর জন্য অদ্বৈতবাদের প্রচার এবং সর্ব্বোপরি

ভারতবর্ষের দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে উত্তরে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমগ্র জনপদের জ্ঞানী পণ্ডিতগণকে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করিয়া মনুষ্য জীবনে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

জীবের কার্য্য দেখিয়াই মহত্ব বুঝিতে হইবে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে, 'Life is measured not by years but by deeds'; অর্থাৎ কর্ম্ম ধরিয়া জীবন মাপ করিতে হয়, বয়স ধরিয়া নহে। যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মবীর হন, তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল কর্ম্ম করিয়া এই জগত হইতে বিদায়লন। আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্মজগতে কি এক মহান ব্যাপার করিয়া যাইলেন!

এখন, ভালকর্ম্ম করিলে জীবের ভবিষ্যৎ জীবন যেমন সুখজনক হয়, মন্দকর্ম্ম করিলেও ঠিক সেই রকম দুঃখজনক হইবে। কিন্তু আমরা সব সময় ভাল কর্ম্মের ফল বা মন্দ কর্ম্মের ফল শীঘ্র দেখিতে পাই না। হয়ত বা কর্ম্মের ফল যাহা দেখিতে পাইলাম, তাহা কর্ম্মের মত গুরুতর নহে। যখন দেখিলাম একজন দয়াশীল সাধু-প্রকৃতি প্রাণ পণে পরের উপকার করিতেছে, গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের জন্য পুষ্করিণী খনন করাইতেছে, অনাথ বালক বালিকার প্রতিপালন ভার লইতেছে, বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিতেছে, তখন আমরা প্রায়ই বলি, এই মহাত্মা অক্ষয় স্বর্গের ব্যবস্থা করিতেছেন; কিন্তু আবার যখন সেই মহাত্মারই গৃহে একদিন হঠাৎ নিদারুণ রোদনের ধ্বনি শুনিয়া জানিতে পারি যে সেই ঋষিকল্প সাধকের একমাত্র পুত্র সংসার কাঁদাইয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে, তখন আমরা বিচার বুদ্ধিতে এই অঘটন ঘটনার কারণ কিছুই ভাবিয়া পাইনা। কারণ, আমাদের দৃঢ় ধারণা যে উক্ত মহাত্মা কখনও কাহারও মনকষ্টের কারণ হন নাই। এবং আমরা আরও আশ্চর্য্য হই যখন উক্ত মহাত্মাই অন্তরের অন্তরে, ভাবিয়া চিন্তিয়া এই

পুত্রশোক প্রাপ্তির কোন কারণ খুঁজিয়া পান না। তখন তিনি শাস্ত্র বাক্য বিশ্বাস করিয়া বলেন নিশ্চয়ই এই দুঃখ পূর্ব্বজন্মের কোন গর্হিত কর্ম্মের ফল!

আমাদের মনে স্বাভাবিক এই বিশ্বাস যে, সাধু লোকের ভাল হউক কারণ সাধু প্রকৃতিরই ভাল হওয়া উচিত যেহেতু তাঁহারা ঈশ্বরের ও সমাজের নিয়ম মানিয়া চলেন এবং অসাধুর ধ্বংস হউক, কারণ অসাধুরা সমাজের পীড়া দায়ক।

ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

(গীতা)

অর্থাৎ সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য ও দুষ্কৃতদিগের ধ্বংসের জন্য এবং সনাতন ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।

কিন্তু পাপের ভার অত্যন্ত গুরুতর না হইলে ভগবানের শরীর ধারণ করিয়া অবতার মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে প্রকাশ হইবার আবশ্যক হয় না।

আমরা সংসারে ভাল মন্দ কর্ম্মের ফল অভ্রান্তরূপে দেখিতে পাই। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সমস্যায় পতিত হই যেখানে বিচার বুদ্ধিতে কোন উত্তর পাই না। যখন দেখিতে পাই যে মূর্খ দুর্বৃত্তের অত্যাচারে সমাজে সকলে মানহানির ভয়ে জড় সড়, যখন দেখিতে পাই যে দুর্যোধন অকারণ নিরীহ পাণ্ডবগণের ধ্বংসের জন্য জতুগৃহ দগ্ধ করিল অথচ সেই পাপের ফল তখনই সমাজে পাইল না যখন দেখিতে পাই যে অশ্বত্থামা ভীরুর ন্যায় গভীর রজনীতে পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর কোলে নিদ্রিত পঞ্চ শিশু পুত্রের মস্তক ছেদন করিল অথচ শ্রীকৃষ্ণ-সহায় অর্জ্জুন অশ্বত্থামার বা দুর্যোধনের প্রাণ লইতে পারিল না, যখন দেখিতে পাই লঙ্কেশ্বর

রাবণ অকারণ শান্ত ও সংযমী রামচন্দ্রের নিকট হইতে বীরত্বের তেজে সীতাদেবীকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া কাপুরুষের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়া রামচন্দ্র-প্রমুখ সমস্ত মানব সমাজ ব্যথিত করিয়া যোগীবেশে ভিক্ষাগ্রহণ ছলে সীতাকে সুদূর সিংহল দ্বীপে লইয়া প্রস্থান করিল অথচ নির্ব্বিরোধী ধীর বীরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বৃথা কারণে কতই না কষ্ট ভোগ করিলেন! তখন বাস্তবিকই আমরা বিচলিত হইয়া পড়ি। পাপের ফল পাইতে দেরি দেখিলে, আমরা ক্ষুব্ধ হই। উৎকট পাপের ফল হাতে হাতে পাইতে না দেখিলে আমরা আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা অধিক বিহ্বল হইয়া পড়েন, তাঁহারা বলিয়া উঠেন "ঈশ্বর কি নিদ্রিত! এত বড় অত্যাচারটা তাঁর রাজ্যে সহিল!

কিন্তু বিশ্বরাজ্যের কর্ম্মরহস্য বড়ই অদ্ভুত! দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করেন তখন অর্জ্জুন প্রভৃতি উত্তেজিত হইয়া উঠিলে ধর্ম্মপুত্র উপদেশ করিলেন ভাই সকল, "ধৈর্য্য ধর। কৌরবদিগের এখনও চারিপোয়া পূর্ণ পাপ হয় নাই। এই সকল অত্যাচার হইতে না দিলে কৌরবেরা পাপ করিবার অবসর পাইবে কোথায়? এবং পাপ করিতে না পাইলে কৌরবেরা কখনই বিনষ্ট হইবে না; কারণ পাপেই জীবের আয়ু হরণ করে। আমাদের পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ থাকিতেও যখন আমাদের এই অপমান তখন বুঝিতে হইবে একার্য্য বিধির ইচ্ছা। ভাই সকল, তাঁর ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে একটী তৃণও নাড়িবার আমাদের সামর্থ্য নাই।

কিন্তু কর্ম্মরহস্যের এই গভীরত্ব আমাদের নিকট পূর্ণ শান্তি বা তৃপ্তি আনিয়া দেয় না। কারণ, আমরা বর্ত্তমানের জীব। ভবিষ্যতের ভরসায় বর্ত্তমানে এত কর্ম্ম এত অত্যাচার এত অপমান সহিতে পারি

না। কেবল যে সকল মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের দিব্যদৃষ্টি পান, সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির ফল দেখিতে পান, তাঁহারাই বর্ত্তমানে ভবিষ্যতের ছায়া দেখিয়া স্থিরভাবে কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে পারেন। তাঁহারাই ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারে কখনও সন্দেহ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরের অংশ একটু অধিক পরিমাণে থাকে।

কিন্তু মানুষ অনেক সময়েই বিধির নিয়মে জগতে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। একজন ভাগ্য গুণে আজ বড় লোক হইল; দশজনে তাহাকে মান্য করিল, তাহার দর্প দম্ভ বাড়িয়া গেল, সে মনে করিল এই সংসারে আমি একজন। তাহার সেই ঘোর বিকারের সময় সে অনেক লোকের মনে যদি দুঃখ দিয়া থাকে অনেক লোকের উপর যদি অকারণ অত্যাচার করে, তখন পাঁচটা আত্মা কাতরে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া প্রতীকার ভিক্ষা করে এবং যুধিষ্ঠিরের ন্যায় আত্মারামগণই তখন একটু হাসিয়া বলেন, "ও লোকটা পড়লো বলে।" কালে যখন ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাহার পতনাবস্থা দেখি আমরা বিস্মিত হইয়া বলি, "কি আশ্চর্য্য সেই লোকটার এই গতি!" যদি সেই লোকটা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ও প্রবঞ্চক হয়, আমরা বলি "চোরের উপর বাটপাড়ি হইয়াছে।" লোকটা যেমন ফাঁকি দিয়া পরের লইয়াছিল, তেমনিই ফাঁকি নিজে পড়িয়াছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষের পাপের ফল মানুষই দিয়া থাকে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত কৃপণ ও হৃদয়হীন সুদখোর এবং দয়াধর্ম্ম-ত্যাগী, পরন্তু অতুল সৌভাগ্যশালী, জ্ঞানীরা বলেন, "ঐ ধন রত্নের ভোগ ওর ভাগ্যে নাই। যে যত্নে ও ধন সংগ্রহ করিতেছে, ওর ছেলে হইলে নিশ্চয়ই অকার্য্যে টাকাটা উড়াইবে, তবে ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কিম্বা অপুত্রক থাকিলে পরে সম্পত্তি ভোগ করিবে।"

আবার একজনকে কষ্ট দিলেই যে সে পরে যে কাঠায় মাপ্ সেই কাঠায় শোধ করিবে, তাহা নাও হইতে পারে। অপর একজন তাহার হইয়া তাহার কষ্টের প্রতিদান করিতে পারে। রাম শ্যামকে বিনা কারণে পাদুকা প্রহার করিলে, শ্যামই যে সব সময় রামকে দুদিন পরে কড়ায় গণ্ডায় সুদশুদ্ধ শোধ দিবে, তাহা না হইতেও পারে, কোথা হইতে যদু আসিয়া শ্যামের কার্য্য করিয়া রামকে রামের কর্ম্মের ফল দিয়া যাইতে পারে। দুঃশাসনের রক্তপান দ্রোপদী না করিয়া ভীম করিল।

কিন্তু আর এক প্রকার কর্ম্ম আছে যাহার ফল অলৌকিক শক্তি সাহায্যে আসে, যাহার প্রত্যুত্তর মানুষের নিকট হইতে আসে না। যখন কোন একটা ঘোর অত্যাচার ঘটে, তখন যদি বিপন্ন ব্যক্তি একমনে পূর্ণ আবেগে হৃদয়ের সহিত ভগবানের দিকে চাহিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করে, তখন অনেক সময় দৈব কৃপা তাহার উপর পড়ে ও আশ্চর্য্য উপায়ে সে বিপদ হইতে রক্ষা পায়। এই উপায়ে প্রতিহিংসা লওয়া বড় ভয়ানক। যেহেতু মানুষে নিজ হাতে প্রতীকারের ভার লইলে, সে আঘাত তত গুরুতর হয় না, কিন্তু ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে অসম্ভব প্রকার গুরুতর কার্য্য ঘটিয়া থাকে।

অনেক সাধক এই উপায়ে বিপদে ভগবান শরণ করাকে "ধীরতার পরাকাষ্ঠা মনে করে" কিন্তু সাধুদিগের সহিষ্ণুতা অনেক সময় সংসারিদিগের অমঙ্গলের কারণ হয়। আমাদের মনে হয় এই পদ্ধতিতে অত্যাচার সহ্য করা আর প্রকারান্তরে ভগবান্কে আমমোক্তারী দেওয়া, একই কথা উপর হইতে পাপীর জন্য যে মার বা শাস্তি আসে, তাহা অতি ভয়ানক, ভাবিলেও রোমাঞ্চ হয়, পাপীর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা এখানে পাওয়া যায় না, তাহা উপর হইতেই মাঝে মঝে আমদানী হয়।

এখন এই ভগবান শরণ সম্বন্ধে দুই একটী আশ্চর্য্য গল্প সংক্ষেপে বলিব

বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ বাঁকুড়া কি বর্দ্ধমান জেলায় কোন একটী গাড়োয়ানরূপী ডাকাত নিঃসহায় একটী স্ত্রীলোক ও তাহার শিশু সন্তানকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে গাড়ীতে চড়াইয়া সন্ধ্যার সময় কোন এক দুর্গম অরণ্যের নিকট আসিয়া বলে, এখানে কেহ তোমাদের উদ্ধার কর্ত্তা নাই, যাহা কিছু আছে আমায় দাও। স্ত্রীলোকটী স্তম্ভিতা হইয়া বুঝিলেন ডাকাতের হাতে পড়িয়াছেন—উপায় নাই। তখন তিনি বলিলেন "বাবা আমি নারী এই শিশুর গলায় যাহা আছে আর আমার কিছু নাই।" নিষ্ঠুর দস্যু হাসিয়া বলিল, "তোমাদের কাহাকেও রাখিব না। কারণ পরে তাহা হইলে আমার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। আমি অগ্রে তোমার শিশুটীকে তোমার সাম্‌নে কাটিব, তবে তোমায় কাটিব।"

স্ত্রীলোকটি এই মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ডাকাতটী বলিল, "কাঁদিয়া লোক জড় করা হইতেছে! এখানে কেউ আসিবে না। যত পার চেঁচাও আমি আমার কাজ সারি।" এই কথা বলিয়া শিশুটীকে লইয়া একটু দূরে একটা গাছের গায়ে বসাইয়া কুঠার দ্বারা যেই আঘাত করিল, অমনি কুঠারের অগ্রভাগে লোহার ফলকটী কুঠার হইতে খসিয়া দূরে পড়িল; শিশুটীকে আর কাটা হইল না। শিশুর মাতা এতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া দয়াময়ের চরণে শিশুকে সঁপিয়া বলিতেছিল "ঈশ্বর! তোমার শিশু, উহার এখন আর কেউ নাই তুমি রক্ষা কর দেব; আমার দুঃখিনীর ধন বুঝি দস্যুর হাতে গেল! কোথায় হরি দয়াময় একবার এস একবার দেখ।" ইতিমধ্যে দস্যুটী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত হইয়া কুঠার খানি ঠিক করিয়া পরাইয়া দ্বিতীয় বার শিশুবলির সংকল্প করিতেছিল। মাতা চক্ষু খুলিয়া দেখেন, "শিশুটী পাতা লইয়া চুষিতেছে—মাতা আশ্চর্য্য হইল; কিন্তু পরক্ষণেই যেই

দেখিল দস্যুটী অস্ত্রসংস্কার করিয়া পুনরায় ক্রোধভরে শিশুর দিকে যাইতেছে মাতা "ভগবান" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; আর কি হইল জানিতে পারিলেন না। এদিকে দস্যুটী যেই কুঠার হাতে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে অমনি ভীষণ এক কালসর্প দস্যুটীর উরুদেশে দংশন করিল, দস্যুও তৎক্ষণাৎ 'বাবারে' বলিয়া বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট করিতে করিতে ক্ষণকাল মধ্যে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মাতার মূর্চ্ছাভঙ্গে মাতাও "বাবারে কোথায়" বলিয়া চাহিয়া দেখে তাহার সোনার পুতলী হামা দিতেছে। ছুটে আসিয়া জননী শিশু কোলে করিল। পরে ঘটনাক্রমে সেই পথে এক পথিককে দেখিয়া ঘটনার বিবরণ বলিল। অবশেষে পথিক সেই দস্যুটীর দেহ পরীক্ষা করিতে যাইয়া দেখিল যে দেহ সর্পের বিষে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দস্যুটীর জীবন ফুরাইয়াছে! তখন জননী শিশুটীর মুখচুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদতে বলিতে লাগিল, "বাবা তোকে মার মা এতক্ষণ কোলে করিয়া লইয়াছিল। মানুষ মার কোলে থাকিলে যমে লইবার ভয় আছে, জগদম্বার কোল দেখিলে যম দূরে থেকে পালিয়ে যায়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, বিএ, বি, এল।



প্রসাদ পরীক্ষা।

কৃষ্ণকমল মুখোপাধ্যায় বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছিল। হয় টাকার যোগাড় করিব না হয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। ব্যাপারটা এই কৃষ্ণকমলের ঘরে এক অনূঢ়া কন্যা, বিবাহ যোগ্যা। সুপাত্রে কন্যাদান ব্রাহ্মণের একান্ত অভিলাষ, কিন্তু ব্রাহ্মণ বড় দরিদ্র, কন্যাটিও সুলক্ষণা যেমন তেমন পাত্রে সম্প্রদান করিতে কৃষ্ণকমল বড়ই নারাজ, যদি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান ঘটে।

যত কিছু দায় আছে কন্যাদায় সকলের উপর। আবার তখনকার কালে বরং সেটা বিষম দায় ছিল! কেন না কুলীনের ঘরে যদি পয়সা না থাকে, হাজার সুরূপা কন্যা হইলেও, প্রজাপতির খাতায় হয় ত নামটা পর্য্যন্ত উঠিত না, বন-কুসুম বনে ফুটিয়া আপনি শুখাইত কেহ দেখিত না।

কৃষ্ণকমল কিন্তু কন্যা দান করিতে কৃতসংকল্প, উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিবেই দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া দেখিবে অর্থ মিলে কিনা, যদি একান্তই না পাওয়া যায়, তবে ফিরিবে না, আত্মহত্যা করিবে, ইহাই সংকল্প।

এ গ্রামে সে গ্রামে করিয়া কৃষ্ণকমল তখন কত জেলা পরগনায়ই না ঘুরিল, বাছিয়া বাছিয়া কত বর্দ্ধিষ্ণু জনগণের কাছে কৃপাভিক্ষা করিল, কিন্তু কোথাও এমন একটী হৃদয়বাণ মহাত্মা মিলিল না, যিনি বলিতে পারিলেন—আচ্ছা ঠাকুর তোমার মেয়ের বিবাহের ভার আমি লইলাম। মনোদুঃখে একদিন মধ্যাহ্নে কৃষ্ণকমল প্রান্তরের মধ্যস্থিত এক জলাশয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইল। তখন সূর্য্যদেব প্রচণ্ড কিরণজালে

নির্জ্জন প্রান্তরপ্রদেশ দগ্ধ করিতে ছিলেন। কৃষ্ণকমল ভাবিলেন "আর কেন, চেষ্টার চূড়ান্ত হইয়াছে, টাকা মিলিবে না ঘরে ও ফিরিব না, এই জলাশয়ে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিব। ব্রাহ্মণ অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণ কমল পুষ্করিণীর ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবসন্ন দেহে পুকুর পাড়ে বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মরিতেছি কেন? মেয়ের বিবাহ দিতে পারিলাম না, কিছু অর্থ যুটিলেই সেটা সুসম্পন্ন হইতে পারিত। এমন দুর্লভ মনুষ্য-জীবন হেলায় নষ্ট করিতেছি, যাহা করিতে যাইতেছি, তাহাতেও আবার মহাপাপ; আমার আবার পাপ আর পুণ্য! চতুস্পদ জন্তুর প্রাণের মূল্য আছে, বোধ হয় আমার মূল্য তাহা হইতেও হীন। মা! ব্রহ্মময়ী এই কি আমার পরিণাম! কেন মা, মনুষ্য জন্ম দিয়েছিলে? মনুষ্য জনমের সার্থকতা কোথায়? নিজের ঔরসজাত কন্যার বিবাহ দিতে পারিলাম না। এ জীবনে ধিক্! মরিলেও বোধ হয় শান্তি পাইব না। ভাবিতেছি আমি চলিয়া যাইলে আমার স্ত্রী কন্যা কোথায় দাঁড়াইবে, কে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইবে।" প্রভৃতি নানা চিন্তায় ক্লিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ রোদন করিতে লাগিল। অবিরল অশ্রুধারা তাহার গণ্ড দেশ প্লাবিত করিয়া উত্তরীয় বস্ত্র সিক্ত করিতে লাগিল ব্রাহ্মণ এক এক বার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে আর মুখে বলিতেছে দুর্গে! কি করিলে? দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রাখলে!

কৃষ্ণ কমল বড় কাতর হইয়া কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া ছিল। হঠাৎ মনুষ্য পদশব্দে কৃষ্ণ কমলের চমক হইল। ব্রাহ্মণ চক্ষু মেলিয়া দেখিল, এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! শত সূর্য্যের কিরণ জালে মণ্ডিতা, আলুলায়িত কুন্তলা রক্ত বস্ত্র

পরিহিতা প্রতিমার মত সুন্দরী এক কিশোরী মূর্ত্তি, কক্ষে পিতলের কলসী বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া, কোমল কণ্ঠে তাঁহাকে বলিতে লগিলেন হ্যাঁগা তুমি কাঁদছো কেন ?

কৃষ্ণ কমল চক্ষু মুছিয়া পুনরায় দুইহাতে চক্ষু আবরণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। মনে করিলেন একি দেখিলাম! নিশ্চয় আমার মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হয় অনেকক্ষণ চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলাম হঠাৎ চাহিতেই সূর্য্যকিরণে অত আলো দেখিয়াছি।

কৃষ্ণকমল পুনরায় চাহিলেন, এইবার প্রত্যয় জন্মিল যাহা ভাবিতেছিলেন তাহাই ঠিক, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, দুপুরের রৌদ্রে যতটা আলো থাকিতে পারে তাহাইত রহিয়াছে।

ভাল করিয়া বালিকাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বালিকা প্রশ্ন করিলেন 'হ্যাঁগা তোমার চোখে জল কেন ?'

কৃ। মা তুমি কে ?

বা। দেখিতেছ না পুকুরে জল লইতে আসিয়াছি।

কৃ। ভাল, জল লইয়া চলিয়া যাও।

বা। তুমি কি বিদেশী ?

কৃ। বিদেশী কি এই গ্রামবাসী জানিবার কি আবশ্যক আছে ? জল লইতে আসিয়াছ বল'ত জল তুলিয়া দিই ; ঘরে যাও।

বা। তুমি কাঁদিতেছিলে কেন ? না বলিলে আমি কিছুতেই যাব না।

কৃ। কি বিড়ম্বনা ! জানিয়া তোমার কি লাভ ?

বা। যদি কিছু প্রতীকার করিতে পারি। এত কষ্টের মাঝখানে বালিকার কথা শুনিয়া কৃষ্ণকমল হাসিল। বলিল, পাগল মেয়ে, পরের

দুঃখ শুনিয়া কেন মনে কষ্ট পাইবে, রৌদ্রে তোমার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়েছে, আর এখানে দাঁড়াইও না।

বা। আমায় না বলিলে আমি কিছুতেই যাইব না তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।

ব্রাহ্মণ বিরক্তির সহিত বলিল "শুন্‌বি? তবে শোন্ তোর মত অত বড় এক মেয়ে আমার ঘরে আছে, আজও তার বিবাহ দিতে পারিনাই। আজ তিন মাস এই বাঙ্গলা মুলুক ওলট পালট করিয়াছি কোথাও টাকার যোগাড় করিতে পারি নাই। বল্ দেখি এ কালা মুখ কি আর ঘরে দেখাইতে পারি? সঙ্কল্প করেছি এই জলে আজ ডুবব। যা, শুনিলি ত সব কথা ঘরে যা।"

বা। ওমা! ছি! ছি! আত্মহত্যা করিবে? যার বাড়া আর পাপ নাই ব্রাহ্মণ হ'য়ে তাই করবে। ক'রো না ক'রো না তুচ্ছ টাকার জন্যে কখনও এ কাজ ক'রো না! তুমি কেবল বাজে ঘুরে মরেছ, লোকের মতন লোকের কাছে যেতে হয়। টাকার ভাবনা কি?

ক্র। লোকের মতন লোকটা কে?

বা। কেন, আমার বাবা!

ক্র। তিনি কোথায়?

বা। কেন, তাঁকে তুমি চেন না, তাঁকে যে সবাই জানে এই সামনে হালিসহর গ্রামে তাঁর বাড়ী।

ক্র। তাঁর নাম কি?

বা। রামপ্রসাদ সেন।

ক্র। রামপ্রসাদের কি খুব ঐশ্বর্য্য?

বা। এত ঐশ্বর্য্য আর কার আছে?

ক্র। রামপ্রসাদ কি বড় দাতা?

বা। হ্যাঁগো! একবার গিয়াই দেখনা, বাবা তোমার সকল দুঃখ দূর করিয়া দিবেন।

কৃ। বলিস্ কি, আমি এখনই যাব।

বা। হ্যাঁ তুমি এখান থেকে ওঠ তবে আমি ঘরে যাব।

কৃষ্ণকমল নবীন আশায় নবীন উদ্যমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এখনই হালিসহরে যাইবেন। বলিলেন "দরিদ্র আমি কি আছে যে তোমায় দিব, যে আশার বাতি আমার প্রাণে জ্বালিয়া দিয়াছ, মনে হইতেছে বুঝি বা এইবার সফলকাম হইব। আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরআয়ুষ্মতী হও! কিন্তু যাইবার কালে একটা কথা বলিয়া রাখি। যদি কোনরূপে অকৃত-কার্য্য হই, স্থির জানিও, সংকল্প ত্যাগ করিব না, এখানেই হউক বা যেখানেই হোক প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

কৃষ্ণকমল হালিসহর গ্রামে প্রবেশ করিয়া রামপ্রসাদ সেনের বাড়ী অন্বেষণ করিল। রামপ্রসাদের গৃহদ্বারে আসিয়া ব্রাহ্মণ দেখিল একটা ছোট কুটীর। কৃষ্ণকমল ভাবিল তবে কি বালিকা মিথ্যা বলিল, বাড়ী দেখিয়া বোধ হইতেছে রামপ্রসাদ অতি সামান্য ব্যক্তি, সে ত বর্দ্ধিষ্ণু নয়। প্রতিবেশী দুই এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল এ গ্রামে অন্য কেহ রামপ্রসাদ সেন নাই। অগত্যা অনিচ্ছায় কৃষ্ণকমল রামপ্রসাদের দ্বারে ঘা দিল। ঘরের ভিতর হইতে উত্তর আসিল কে ও।

কৃ। ব্রাহ্মণ অতিথী।

রামপ্রসাদ পূজা সমাপনান্তে আহারে বসিতে যাইতে ছিলেন, ব্রাহ্মণ অতিথী শুনিয়া অতি সত্বর বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণকমল দেখিলেন চন্দনে ভূষিত রুদ্রাক্ষধারী পট্টবস্ত্রাবৃত একব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিল।

কৃষ্ণকমল আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বাপু রামপ্রসাদ সেনের কি এই বাড়ী ?

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

কৃ। একবার রামপ্রসাদ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা আছে।

আপনার দাস আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, বলুন কি করিতে হইবে।

কৃষ্ণকমল কিছু লজ্জিত হইলেন। বলিলেন "তুমি রামপ্রসাদ! আমি বড় বিপদে পড়িয়া তোমার দ্বারস্থ হইয়াছি। তোমার কন্যা আমাকে পাঠাইয়াছেন। ধন্য তুমি! মার আমার যেমন রূপ তেমনই দয়া।

রামপ্রসাদ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "আমার কন্যা! কোথায় দেখিলেন" ?

কৃ। কেন, এই সামনের গ্রামে, আমি নামটা ঠিক জানিনা এবার রামপ্রসাদ একটু হাসিলেন।

রাম। হাঁ, হাঁ, আমারই কন্যা বটে! তা ঠাকুর ব্যাপারটা কি বলুন দেখি।

কৃষ্ণকমল আনুপূর্ব্বিক যথাযথ সকল বিবৃত করিলেন। শুনিয়া রাম প্রসাদ বলিলেন "টাকার জন্য চিন্তা করিবেন না। আজ আমার পরম সৌভাগ্য, যে আপনার ন্যায় একজন পরম ভাগ্যধর ব্রাহ্মনের সেবা করিয়া আমি কৃতার্থ হইব, আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে। আর ওই যে বার বার আমার কন্যার কথা বলিতে ছিলেন, ও বেটীর বাস্তবিক বড় দয়া কৃষ্ণকমলের আহারাদি শেষ হইল রাম প্রসাদ বলিলেন, এইবার আপনি একটু বিশ্রাম করুণ আমি আপনার পদসেবা করি।

কৃষ্ণকমল বলিলেন বাপু রামপ্রসাদ, তোমার অতিথি সৎকারে আমি

পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। এইবার টাকার কথাটা হইলে বড় ভাল হয়।

রাম। সে আর বেশী কথা কি? আজ এখানে অবস্থান করুন!

কৃ। না বাবা, বড় উৎকণ্ঠা! টাকার জন্য কোথায়ও দুদণ্ড স্থির হইয়া বসিতে পারি নাই। তুমি দয়া করিয়া যদি ওটা মিটাইয়া দাও কি পর্য্যন্ত সুখী হই তা মুখে বলিতে পারি না।

রাম। এখনই কি দিতে হইবে?

কৃষ্ণ। কি আর বল্‌ব আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজা হও। রামপ্রসাদ বলিলেন "তবে এস ঠাকুর, আমার সঙ্গে এস।"

কৃষ্ণকমল অতি ব্যগ্র সহকারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রামপ্রসাদ গৃহের বাহির হইয়া পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণকমল জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইতেছ?"

রাম। সঙ্গে আসুন টাকা দিব।

কৃষ্ণকমল রামপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন। যাবার কালে ভাবিতে লাগিলেন "শেষটা কি পাগলের হাতে পড়িলাম। লোকের টাকা কড়ি ত নিজের ঘরে বাক্সবন্ধ হইয়া থাকে; এ ব্যক্তি কোথায় যাইতেছে, এমন ও, হইতে পারে কাহারও কাছে গচ্ছিত আছে, সেই খানে গিয়া টাকা দেওয়া হ'বে। যাহা হউক দেখা যাক এর শেষ কোথায়।"

ক্রমে রামপ্রসাদ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণকমল বলিলেন "বাপু, রামপ্রসাদ! এ যে গঙ্গাতীরে আসিয়া পড়িলে।"

রামপ্রসাদ বলিলেন "হাঁ। এইখানেই আপনাকে টাকা দিব।"

অপরাহ্ন কাল ঘাটে মনুষ্য-সমাগম অতি বিরল রামপ্রসাদ ভাগীরথী

তীরে উপবেশন করিলেন এবং ইঙ্গিত করিয়া কৃষ্ণকমলকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণকমল বসিল, রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ঠাকুর! "মার নাম শুনিতে ইচ্ছা হয়?"

কৃ। অমৃতে অরুচি! মার নাম কার না ভাল লাগে তবে উপস্থিত আমার মেয়ের যেরূপ অবস্থা তাতে বোধ হয় মার নাম বুঝি ভাল লাগে না। তোমার গান আসে নাকি?

রাম। কিছু, কিছু, শুনুন একটা নাম করি। রামপ্রসাদ চক্ষু নিমীলিত করিয়া ভক্তিগদগদকণ্ঠে কালী নাম করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পার্শ্বে বসিয়া দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া সেই নাম-রসামৃত পান করিতে লাগিলেন। গানে রামপ্রসাদ মার নিকট কত আবদারই করিতেছে আবার সর্ব্বশেষে 'মরিব' 'মরিব' বলিয়া ব্রহ্মময়ীকে শাসাইতেছে।

গান থামিলে কৃষ্ণকমলের টাকার ঘোর ভাঙ্গিল বলিলেন "আহা! রামপ্রসাদ তুমি ত বেশ গান কর!"

রাম প্রসাদ পুনরায় গাহিতে আরম্ভ করিল। গান চলিতেছে, কৃষ্ণকমল পার্শ্বে বসিয়া কিয়ৎকাল নিবিষ্ট চিত্তে গান শুনিতেছেন কখনও অন্য মনা হইয়া এদিক ওদিক গঙ্গার চারিধারে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন দূরে কতকগুলি নৌকা আসিতেছে, সম্মুখের নৌকাখানি নানা বর্ণের চিত্রিত একখানি বজরা সাদা পাল তুলিয়া পক্ষিনীর ন্যায় অতি দ্রুত তীরাভিমুখে আসিতেছে। রামপ্রসাদের গান চলিতেছে, কৃষ্ণকমল দেখিলেন ভিতর হইতে একব্যক্তি মুখ বাহির করিয়া হাত নাড়িয়া দাঁড়িদের শীঘ্র শীঘ্র দাঁড় বাহিবার আদেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাম প্রসাদের দ্বিতীয় গানও থামিল ঠিক সেই সময়ে বজরাখানি ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামপ্রসাদ চক্ষু মেলিয়া

দেখিলেন বজরার ভিতর হইতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাসিতে হাসিতে বাহির হইতেছেন।

রাজা বলিলেন "এই যে মেঘ না উঠিতে জল, তোমাকে গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইব, এমন ভরসা করিয়া ত কখন বাহির হই না। রামপ্রসাদ একটু হাসিয়া বলিলেন "আর একটু পরে আসিলে হয় ত আর দেখাই ঘটিত না।" আপনি ত সকলই জানেন, আমার সেই মেয়ে এই বামুনকে ভেজিয়ে দিয়েছেন। ইনি কন্যাদায়ে পীড়িত হয়ে এক মাঠের মাঝখানে পুকুরে ডুবতে যাচ্ছিলেন, সে বেটি কোথা থেকে এসে বললেন রামপ্রসাদের অনেক টাকা এখনই যাও সব দুঃখ দূর হ'বে। যেমন মা তার তেমনি বেটা আমও পেচপাও হই নাই। আমিও বলেছি হ্যাঁ যখন তিনি পাঠিয়েছেন, তখন টাকা নিশ্চয়ই দি'ব। কিন্তু এ দিকে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যথার্থই আজ আমি ভাগীরথী জলে জীবন বিসর্জ্জন দিব দেখি তোমার কালা বেটী কি করে?"

রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন তাঁহার নয়নযুগলে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণকমলের পদপ্রান্তে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া বলিলেন আপনি ধন্য! কোটী জন্ম তপস্যা করিয়া লোকে যা না পায় আপনি সেই দুর্ল্লভ পদার্থ 'মায়ের দেখা' পাইয়াছেন। ক্রমে বুঝিতেছি প্রসাদকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মা আমার এই ফাঁদ পাতিয়াছেন, আমিও সেই সূত্রে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার কন্যার বিবাহের যাবতীয় খরচ আমি নতশিরে বহন করিতে প্রস্তুত হইলাম। এতক্ষণে কৃষ্ণকমলের চৈতন্য হইল। ব্রাহ্মণ অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। পরে বেগ কতক থামিলে বলিলেন "আমি ত প্রথমে ঠিক দেখিয়াছিলাম সে কি জ্যোতি; আমার চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছিল। মানুষ কি করিতে পারে? চেষ্টায় কতটুক কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়। এ যে ভগবানের দান! মা যে আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা রূপে আসিয়া বলে দিয়াছেন। আমি কিন্তু হতভাগ্য! হীরক দেখিয়া কাঁচ লইয়া সন্তুষ্ট হইলাম।"

শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী।

গোপেশ্বরের চাকরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফিরিবার সময় গোপেশ্বর দেখিল যে তার নিজের শরীরেরই ভার বহন করা কষ্টকর তার উপর কাঁধে তার স্ত্রীর দেহ। পথিমধ্যে বহুবার তার নামাইল ও উঠাইল যদি নামায় ত উঠাইতে পারে না, আর যদি কোন ক্রমে উঠাইতে পারে ত সন্তর্পণে নামান দুর্ঘট হইয়া উঠে!

একবার রাধারাণীর নাসিকায় হাত দিয়া বুঝিল যে শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে, জীবিত বুঝিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

আসিতে আসিতে ৪।৫ বার হোঁচোট খাইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া গেল কিন্তু গোপাল দাসের দাওয়ার নিকট আসিয়া আর পারিল না, স্ত্রীকে লইয়া সশব্দে মাটীতে পড়িল!

তবে পড়িবার সময় ও যতদূর সম্ভব নিজের দিকে দৃকপাত না করিয়া যতটা সম্ভব স্ত্রীকে বাঁচাইয়া ছিল।

পতন শব্দে গোপাল দৌড়িয়া বাহির হইল ও দেখিতে দেখিতে পাড়ার মেয়ে ছেলেতে স্থানটা পূর্ণ হইয়া গেল।

মেয়েরা সমস্বরে চীৎকার ও কোলাহল জুড়িয়া দিল পুরুষেরা ও বিশেষ কম গেল না।

কেহ বলিল দেখ বেঁচে আছে কিনা, কেহ বলিল আগে জিজ্ঞাসা কর ব্যাপার খানা কি?

বড় কর্ত্তা বলিল ভিড় ছেড়ে দাও—হাওয়া আসিতে দাও। সকলেই গোলযোগ পূর্ব্বক বলিল হাঁ হাঁ ভিড় ছেড়ে দাও ফলে তাহারা আরো ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

কিরূপে এরূপ অবস্থায় আসিয়া এরূপ ভাবে পড়িল ইহাই তাহাদের প্রথম জিজ্ঞাসা ও প্রধান কর্ত্তব্য, সকলেই সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল কিন্তু সকলেই এক অন্ধকারে, কাজেই কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না দেখিয়া যে যতদূর পারে কল্পনার একটা ইতিবৃত্ত খাড়া করিবার চেষ্টা করিল।

হারুর মা ছোট গিন্নী ধমক দিয়ে বলিল, আগে ত ওদের মুখে চোখে জল দিয়ে বাঁচাও তার পর গল্প শুনলেই হবে।

প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত, সুতরাং ধরাধরি করিয়া তাহাদের বাটীতে আনিয়া ফেলিল ও মেয়েরা রাধারাণীর শুশ্রূষা ও পুরুষেরা গোপেশ্বরের যত্ন লইল।

গোপেশ্বর পড়িয়াছিল বটে কিন্তু সংজ্ঞালোপ হয় নাই তবে কথা কহিবার শক্তি আদৌ ছিল না। শীঘ্র একটু তাড়ি আনিয়া খাওয়াইয়া দিয়া ক্ষত স্থান গুলি পাতার রস দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সুস্থ হইয়া বিস্মিত গোপেশ্বর দেখিল যে তার সমস্ত দেহ রক্তাক্ত।

শুশ্রূষায় রাধারাণী সুস্থ হইয়া প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না, এদিক ওদিক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া যখন পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইল তখন তাড়াতাড়ি বুকের ও মাথার কাপড় টানিয়া দিল কিন্তু উঠিয়া বসিতে পারিল না।

ইহার পরই প্রশ্ন, অজস্র প্রশ্ন;—সমস্তঃলোকের এক কালীন কৌতূহল নিবৃত্তি।

শোনা শেষ হইলে গোপেশ্বর বলিল গোবিন্দ খুড়ো তুমি যাই বল না কেন, বাগ ফাগ ও সব কিছু নয়, ও সব ও বেটাদের বজ্জাতি, ওরাই রাত্রে বাঘছাল মুড়ি দিয়ে লোককে ভয় দেখাত; ভাগ্যি আমি সময়ে সামনে ছিলাম নইলে লোকে বুঝত গুপী সর্দ্দারের বৌকে বাঘেই নিয়ে গেছে।

সকলের অবশ্য একমত হইল না, কেহ বলিল নিশ্চয় বাঘ ও এসেছে নইলে এত গরুবাছুর যায় কোথা ?

অপরে বলিল সব বেটাদের বজ্জাতি নইলে এতদিন বাঘ দেখা দিয়েছে একটাও মানুষ খাল হলো না ?

অবশেষে ভবিষ্যত আশঙ্কায় সাবধান হইবার জন্য স্থির হইল যে এখন হইতে কতক সকলকে রাত্রে সজাগ থাকতে হবে ও কোন হাঙ্গামা বাধলেই ঢোল পিটে বা হাঁক দিয়ে জানান দেওয়া হবে।

প্রত্যুষে কেহ কেহ মাঠে যাইয়া দেখিল যে স্থানে স্থানে প্রচুর রক্তের দাগ ও চাপ রহিয়াছে, কিন্তু সমস্ত লাসই সরাইয়া ফেলিয়াছে।

সে রাত্রে বাবুদের বৈঠক খানার কিরূপ উত্তেজনা বা অবসাদের স্রোত বহিয়াছিল তাহার সঠিক খবর কেহই বলিতে পারে নাই।

চাষার মহলে ঠিক হইল যে একটা বিহিত করা চাই, এজন্য প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল কিন্তু লোক জন ধন ও বুদ্ধি বলে বলীয়ান জমিদারের সহিত নিরক্ষর মুষ্টিমেয় কৃষক কিরূপে যুঝিবে তাহার কোন কিনারাই হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা তখন তিনটা; অকস্মাৎ উর্দ্দিপরা ও লাঠিহাতে চৌকীদার কনেষ্টবল প্রভৃতি পুলিশের ও জমিদারের লোকে চাঁড়াল পাড়া ভরিয়া গেল তাহাদের আস্ফালন ও চীৎকারে ক্ষুদ্র পল্লী চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সঙ্গে থানার বড়দারোগা ও জমিদার হরকান্ত বাবু; চৌকিদারেরা তাড়াতাড়ি বসিবার জন্য দুইটী মোড়া আনিয়া দিল এবং সঙ্গের চাকরেরা প্রকাণ্ড কলিকায় তামাকু সাজিয়া আলবোলার উপর বসাইয়া দিল তখন সরেজমীতে তদন্তের সময়, দারোগার সঙ্গে স্থানীয় জমিদারেরা ও আসিতেন।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল; লাঠি হাতে দেহভারেনত বেদানার মত মুখ পক্ক কেশ বৃদ্ধ হইতে, স্ফূর্ত্তি লাবণ্যমাখা কোমরে ঘুনসী পরা উলঙ্গ বালকের দল পর্য্যন্ত সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; আমবাগানে কলাবাগানে লোকের দাওয়ায় একটু দূরে দূরে বালিকা কিশোরী যুবতী প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধার দল কেহ শুধু হাতে কেহবা ছেলে কিম্বা কলসী কাঁকে দাঁড়াইয়া গেল।

সেকালে দারোগাদের অসীম প্রতাপ ছিল, এখনো পল্লীগ্রামে যে বিশেষ কম তা নয়, তবে তখনকার আমলের সহিত তুলনা হয় না, সে সময়ে জজকে ও দারোগা হও বলিয়া অশিক্ষিত লোকে আশীর্ব্বাদ করিত।

মহা কলরব, জল্পনা কল্পনা, ঔৎসুক্য উদ্বেগ, ভয় ও বিস্ময়; চৌকিদার কনেষ্টবলে লাঠি চালাইয়া ভিড় ও গোলযোগ কমাইতে লাগিল।

দারোগা বাবু মোড়ায় বসিয়া খাতা দেখিয়া হুকুম দিলেন বাঁধো শালা লোককো।

চকিতের মধ্যে গোবিন্দ, গোপেশ্বর, দ্বারিক, নবীন প্রভৃতি ৫।৭ জনকে দড়ি দিয়া পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, তারা প্রথমে একটু বাচনিক ও শারীরিক আপত্তি করিতে গিয়াছিল বটে কিন্তু প্রহারের চোটে সকলেই নিবৃত্ত হইল।

ও পাড়ার যে কয়জন কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দুঃসাহসের পরিচয় দিল তাহারাও অচিরাৎ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল ফলে আর কেহই মুখ ব্যাদান করিতে সাহস পাইল না।

বন্ধন শেষ হইলে, দারোগা হুকুম দিলেন "মাল বাহির কর!"

বন্দীরা অবাক তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া সমস্বরে বলিল দোহাই হুজুর আমাদের খালাস করুন আমরা কিছুই জানি না।

হাত জোড় করিয়া বাঁধা ছিল সুতরাং চেষ্টা করিয়া কাহাকেও হাত জোড় করিতে হইল না।

দা। চোর বেটারা চালাকি করচ্ছিস্; যদি ভাল চাস্ ত মাল বার করে দে বলছি, নহিলে এখুনি ত পিঠের ছাল চামড়া বার করব তাছাড়া সাত বছর করে ঘানি টানিয়ে দিব তখন মজা টের পাবি শালারা।

আসামীরা কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল হুজুর মা বাপ, দোহাই হুজুর, আমরা কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি চুরি ডাকাতির কিছু জানিনা; হুজুর ধর্ম্মাবতার আমাদের কোন কসুর নেই।

দা। (রক্তিম নয়নে) তবেরে বজ্জাত সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরুবে না দেখছি।

জমিদার। লাগাও মার শালাদের?

হেড কনেষ্টবল কাসেম আলি। বদ্‌বখত কাফের?

কনেষ্টবল। আব মাল বাহার করো?

চৌকিদার। দেখিয়ে দে বলছি কোথা আছে মাল বজ্জাত শালারা।

সঙ্গে সঙ্গেই আর একবার উত্তম মধ্যম সঙ্গে সঙ্গেই পল্লীরমণীরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল কোলের অবোধ শিশুরা কিছু না বুঝিতে পারিয়া জননীদের সহিত কান্নার যোগ দিল।

গোবিন্দ। হুজুর কি অপরাধ আমাদের বলে দিন তা শুনে যদি হুজুরের হুকুম না তামিল করি তা হলে যা ইচ্ছে সাজা দিবেন।

দারোগা। রাজার চরে বেণেদের বাড়ী ডাকাতি হয়ে গেছে আর তো বেটারাই সেই ডাকাতি করেছিস্? আমি আর কোন কথাই শুনতে চাই না। ভাল চাস্‌ত সব কবুল কর, নহিলে এখনি থানায় চালান দিব।

তাহারা কি জানে? নিরপরাধ গৃহস্থ তারা কাজেই নিরুত্তর।

জমিদার। ভারি পাজী বেটারা, শাসন না কল্লে কিছুতেই কবুল করবে না? আপনি চালান দিন ঘানি না টানলে সিধে হবে না।

দারোগা। তাই করতে হোল এখনো কবুল করলে রেহাই দিতে পারতুম দেখছি অদৃষ্টে সব দ্বীপান্তরই আছে।

যখন চৌকীদারগণের জুলুম ও রমণীগণের ক্রন্দন সমভাবেই চলিতে লাগিল, তখন হেড কনেষ্টবল কাসেম আলির সহিত গোপাল দাসের নেপথ্যে অনুচ্চস্বরে কি যে কথা বার্ত্তা হইল তাহা যদিও ভালরূপ বুঝা গেল না তবে তাহারি ফলে যে রাধারাণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেওয়ালের ফাটাল চালের ছাঁচ ও বাতা, তক্তাপোষের পেটী, আমকাঠের সিন্ধুক হইতে একটা কাপড়ে বাঁধিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব বাহির করিয়া দিল ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

কাসেম আলি গোপালকে বুঝাইয়া দিল যে এত কমে খালাস পাইবেনা তবে ইহার দ্বারা জুলুম ও কড়া তজির বন্ধ হইবে গোপাল বুঝিল তবু ভাল।

গোপেশ্বর এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল মনে এক সঙ্গে কত কি ভাবনা, কত চিন্তা আসিয়া তাহাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রহার, অপমান, লোকনিন্দা, হয়ত পরিণামে জেল ও আরো কত কি ভবিষ্যৎ বিপদে সে যেন একেবারে মৌন ও নির্ব্বাক।

হঠাৎ লাফাইয়া হরকান্ত বাবুর উপর পড়িয়া গর্জ্জন করিয় বলিল এসব তোর বজ্জাতি, যদি কখন ফিরতে পারি বা দেবতা দিন দেন তা হলে তোর এক দিন কি আমার একদিন, নখ দিয়ে মুণ্ড ছিড়ে যদি না রক্তখেতে পারি ত আমি বাপের বেটা নই।

পুলিশ ও লোকজন এরূপ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সকলে হাঁ হাঁ করিয়া গোপেশ্বরকে ধরিয়া ফেলিল ও আর এক প্রস্তুত শ্যামচাঁদকে বসাইয়া দিল!

অদৃষ্টক্রমে তার হাত পা বাঁধা ছিল, নহিলে তখনই হয়ত হরকান্ত বাবুকে হাতে হাতেই শিক্ষা দিয়া ফেলিত।

দারোগা বাবু আর অবসর না দিয়া চালান দিবার হুকুম দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

দু একটা ধাক্কা তার পর আসামীদের বাহির পূর্ব্বক পুলিশ ফৌজ ও জমিদারের পল্টন নিক্রান্ত হইল।

বাহির হইবার সময় গোপেশ্বর একবার তার ঘরের দিকে চাহিয়া তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশে বলিল "দ্যাখ তুই যদি যথার্থ চাঁড়ালের মেয়ে ও বৌ হস্ তা হলে দেখিস যেন ইজ্জৎ বজায় রাখিস্"—

আর বলিবার অবসর পাইল না পল্লীরমণীগণের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে কনেষ্টবলগণ উপর্য্যুপরি ধাক্কায় তাহাকে তখন বহুদূরে লইয়া গিয়াছে।

নিকর্ম্মা দর্শকের দল যে যাহার মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে অধিকাংশই সরিয়া পড়িল কাহারো মতে চোরের দশ দিন সাধের একদিন তাহারা বরাবরই জানিত যে ও বেটারা ডাকাত।

কেহ বা সহানুভূতি প্রকাশ করিল তাদের মতে বেচারীরা নিরীহ সমস্ত জমীদারের চক্রান্ত।

জন কয়েক আরো কিছুক্ষণ থাকিয়া সহানুভূতি উপদেশ ও সান্ত্বনা দিল এবং মুন্সেফী আদালতের দালাল বগলা ঘোষ কিরূপ ভাবে মামলা তদ্বির করতে হবে এবং প্রাণপণে খরচ করিতে পারিলে যে বেকসুর খালাস হয়ে যাবে ইহাই বুঝাইয়া খরচের ফর্দ্দ ও অগ্রিম রাহা খরচের পরিমাণ হিসাব করিবার জন্য সেই খানেই পাকা রকম আস্তানা গড়িয়া বসিল।

সে রাত্রি পাড়ার কাহারো ঘরে, আগু জ্বলিল না অধিকাংশ গৃহই

অন্ধকার ও নিস্তব্ধ কেবল মধ্যে মধ্যে রমণীগণের উচ্চ বিলাপ ও ক্ষুধার্ত্ত সান্ত্বনাবিহীন শিশুগণের চীৎকার সেই যেন পল্লীর বিষাদময় নির্জ্জনতার মধ্যে সজীবতা ফুটাইয়া তুলিতেছিল।

অবশিষ্ট মাতব্বর গৃহস্থ ও যুবকেরা ভবিষ্য আশঙ্কায় আবার বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত করিল মনে ভয় যে কুচক্রী জমিদার আবার কিছু না অনর্থ ঘটাইয়া বসে বা মেয়ে ছেলেদেরউপর উৎপাত অত্যাচার করে।

সৌভাগ্য ক্রমে দু একদিন কোন উৎপাত ঘটিল না বোধ হয় কতকটা চক্ষুলজ্জা ও কতকটা সন্দেহের হাত এড়াইবার জন্য তা ছাড়া আরো একটু কারণ ছিল।

সে সময়ে তাঁহাকে আদর্শ জমিদার বলিয়া সম্মানিত করিবার নিমিত্ত খোদ মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমরে আসিতেছিলেন তাছাড়া উপর্য্যুপরি কয়েকটী সভাসমিতির জন্য ও বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন।

প্রথমদিন স্থানীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভার ও দ্বিতীয়দিন নমঃশূদ্র জাতি জল আচরণীয় নয় ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী চারিপাঁচ খানি গ্রাম লইয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন ছিল। উক্ত দুই সভাতেই তিনি সভাপতি ছিলেন এজন্য ও সময়াভাব। তখন হইতেই গাড়ী জুড়ী ও ভুঁড়ি ওয়ালাদের সভাপতি করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথচট্টোপাধ্যায়।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বপ্নাবস্থা ও মানবকল্পনা।

আমরা স্বপ্ন-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, * (ক) তৎসমস্ত আলোচনা করিলে একটী মহৎ, একটী নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়; সেটি—স্বপ্নকালে মানব কল্পনা শক্তির বৃদ্ধি, তাহার নাটক রচনা-প্রতিভার উপচয়। কণ্ঠদেশে পিরাণ দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইল, তাহার জন্য স্বপ্ন দেখিল যেন গুরু অপরাধে তাহার শিরচ্ছেদ হইতেছে। সেইরূপ পিন ফোটায় দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিনয়; পালঙ্কের ধাতব বেষ্টনী সংস্পর্শে ফরাসী-রাজবিপ্লবের ভীষণ চিত্ররচনা, অবশেষে "গিলোটিনে" আত্ম শিরশ্ছেদের কল্পনা। এইরূপে প্রত্যেক উদাহরণে কল্পনা শক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়। বাহ্য উপায়ে সৃষ্ট স্বপ্নে ও সেই এক কথা। রিচার্স (Richers) সাহেব বা সাফেনস্ (Suffens) সাহেবোল্লিখিত স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই রহস্যটির একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাউক। * (ক)

বন্দুকের শব্দে বা কাহারও অঙ্গুলি পেশনে নিদ্রাভঙ্গ হইল। ইত্যবসরে স্বপ্নদর্শন। স্বপ্ন বৃত্তান্ত দুইটী, আমরা পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বন্দুকের শব্দ প্রথমে কর্ণ বিবরে প্রবেশ করে এবং তথায় কর্ণপটহে আঘাত করিয়া একরূপ স্পন্দন সৃষ্টিকরে। দ্বিতীয় উদাহরণে অঙ্গুলি সঞ্চালনে নিদ্রিত ব্যক্তির স্পন্দনের উদ্ভব হয়। উভয় আখ্যানেই নিদ্রাভঙ্গের উত্তেজক কারণ হইতেছে বাহ্য ঘটনা,—স্থূল-

---

* (ক) অলৌকিক রহস্য ৪র্থ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, স্বপ্নতত্ত্ব।

দেহের অংশবিশেষে স্পন্দন উৎপাদন এই বাহ্যউত্তেজনা মানবের বর্জ্জিত কল্পনা শক্তির প্রভাবে নানারূপে অতিরঞ্জিত হইয়া, এই মনোহর নানা ঘটনা সমন্বিত বিচিত্র স্বপ্ন কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

এই যে বহিরঙ্গ বিশেষে স্পন্দন, এই যে তরঙ্গ বিশেষ, ইহা স্নায়বিক সূত্র সাহায্যে মস্তিষ্কে আসে এবং উত্তেজনার বোধ জন্মাইয়া দেয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাভঙ্গ হয়। আমরা স্নায়বিক ক্রিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহা দ্রষ্টব্য।* (খ) যেমন শব্দতরঙ্গী একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত হয়, যেমন উত্তাপ তরঙ্গ, যেমন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সেই রূপ এই স্পন্দন দেহের অংশবিশেষ হইতে স্নায়ুসূত্র অবলম্বনে মস্তিস্কে সঞ্চালিত হয়। যেমন শব্দের বৈদ্যুতিক স্পন্দনের বা আলোক তরঙ্গের এক একটী গতি আছে স্নায়ুসূত্র প্রবাহিত তরঙ্গের ও একটা গতি আছে। বৈজ্ঞানিকেরা যেমন আলোকাদি-গতির পরিমান করিয়াছেন, ইহারও সেইরূপ করিয়াছেন। হেলম্ হোলট্জ সাহেব (Helm holtz) এই স্নায়বিক উত্তেজনার গতি পরীক্ষা ও পরিমাণ করিয়াছেন; মায়োগ্রাফ্ নামক যন্ত্র সাহায্যে ইহা সুন্দরভাবে ও অতি সহজে পরিমিত হইতে পারে। বারন্ ষ্টিন্ (Bernstein) সাহেবের বৈদ্যুতিক উপায়ে স্নায়বিক উত্তেজনার গতির বিচারও অতিশয় প্রশংসার্হ। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে দেহের উত্তাপের উপর এইগতি নির্ভর করে। যে সমস্ত জীবের রক্তের উত্তাপ অধিকতর তাহাদের স্নায়বিক উত্তেজনার গতিও দ্রুততর। মণ্ডুকের স্নায়বিক উত্তেজনা সঞ্চারের গতি হইতেছে এক সেকেণ্ডে ৭০০ হাত। সেইরূপ মানবের স্নায়বিক উত্তেজনা সঞ্চারণের গতি এক সেকেণ্ডে প্রায় অর্দ্ধ মাইল। অতএব দেহের

* (খ) অলৌকিক রহস্য ২য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা, স্বপ্ন তত্ত্ব।

কোনও স্থানে কিছু উত্তেজনা হইলে স্নায়বিক সূত্র সাহায্যে তাহার বার্ত্তা মস্তিষ্কে উপস্থিত হইতে যে কাল অতিবাহিত হয় তাহা পরিমেয়। কিন্তু পরিমেয় হইলেও তাহা অতি স্বল্প, একসেকেণ্ডের অতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

এখন নিদ্রাকালে দেহী সূক্ষ্ম দেহ সাহায্যে স্থুল দেহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া যায়। *(ক) আমরা এ বিষয় পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। অতএব স্থুলদেহের অংশবিশেষে কোন উত্তেজনা হইবামাত্র দেহী তাহা দেখিতে পা'ন। তাহাকে স্থুল দেহস্থিত স্নায়ু সূত্র অবলম্বনে অনুভব করিতে হয় না। অতএব এই উত্তেজনাবার্ত্তা মস্তিষ্কে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, ইহার, বিষয় তাঁহার অভিজ্ঞান হয়। এদিকে স্নায়ু সাহায্যে এই স্পন্দনও মস্তিষ্কাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে কিন্তু ইত্যবসরে নানারূপ উপাখ্যান রচনা করেন। মোহিনী মায়ার মোহে আচ্ছন্ন তিনি, এই অল্পক্ষণ মধ্যে নানাদৃশ্যসমন্বিত এক অভিনব নাটকের রচনা করেন। অবশেষে যে বাহ্য ঘটনার ফলে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে এই নাটকখানি তদনুরূপ কোন ঘটনার পরিসমাপ্তি হয়। ইত্যবসরে উত্তেজনার অনভূতি ও মস্তিষ্কে পৌছিয়া যায, এবং নিদ্রিতের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। নিদ্রাভঙ্গে দেহী স্থুল দেহ আশ্রয় করেন; তখন তাঁহার অভিজ্ঞান স্থুল দেহ সাহায্য হইতে থাকে; তিনি স্থুল দেহ কর্ত্তৃক পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন হন। তখন আর কোনটা বাহ্য, কোনটা আন্তরিক ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তখন একটা মহাভ্রম করিয়া বলেন তিনি ভাবেন যেন সেই কল্পনা নাটকের কেন্দ্রে তিনিই বর্ত্তমান থাকিয়া তাহা অভিনীত করিয়া আসিয়াছেন। ইহাই স্বপ্ন দর্শন।

যাহারা এখনও বিশেষ উন্নত হয় নাই, তাহাদিগেরই এইরূপ

---

* (ক) অলৌকিক রহস্য ৪র্থ ভাগ, ১ম সংখ্যা "স্বপ্ন তত্ত্ব" পৃঃ ২৩।

হইয়া থাকে। মানব, যেমন উন্নত হইতে থাকে; প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি তাহার কর্ত্তব্য কি এবং উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সে এই পৃথিবীতে প্রবাসী হইয়াছে এই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া যেমন যেমন সে আত্মজীবন ও চিন্তা সংযত করিতে সক্ষম হয় সে সেই পরিমাণে শৈশবের এই সমস্ত ধূলিখেলা এই সমস্ত অলীক কল্পনা ক্রীড়া দূরে সরাইয়া দিতে থাকে। ছোট ছোট বালক বালিকা যেমন ক্রীড়ায় সংসার রচনা করে এবং শৈশব কল্পনায় তাহার অভিনেতা ও অভিনেত্রী সাজিয়া জীবন নাটকের অভিনয় করিতে থাকে. মানব মহাজীবের বালক বালিকা যাহারা, অনুন্নত বা অর্দ্ধবিকশিত মনুষ্যেরা সেইরূপ প্রথম প্রথম এই প্রকার কল্পনা রাজ্যে থাকিয়া অলীক উপন্যাস রচনা করে। যেমন অশিক্ষিত ও অনুন্নত মানব সম্প্রদায় প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনার উপর একটি একটি অমূল্য আখ্যায়িকা রচনা করে, সেইরূপ জীব যতদিন একেবারে আত্মহারা ও অজ্ঞানান্ধ থাকে ততদিন সূক্ষ্ম দেহাভিমানী এইরূপে অমূলক কল্পনা ক্রীড়ার প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু, যিনি সত্যে সংস্থিত হইতে পারিয়াছেন, বা নিদ্রা জাগরণে যাহার চৈতন্য কিয়ৎ পরিমাণেও অব্যাহত থাকে, তিনি যে অবস্থায় অবস্থিত থাকুন না, নিদ্রার সময়েই হউক জাগ্রৎ অবস্থায়ই হউক, সর্ব্বাবস্থায়েই মানব কর্ত্তব্য পালনে নিযুক্ত থাকেন। তাদৃশ লোকের এইরূপে বৃথা সময় অপচয় করিবার প্রবৃত্তি বা অবসর থাকেনা অতএব তাদৃশ লোক এইরূপ অলীক স্বপ্ন দেখেন না।

কল্পনা শক্তি মনের একটী প্রধান শক্তি। বিরাট মনের কল্পনা হইতে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে, ধাতা ব্রহ্মাণ্ডকে "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"। ভগবানের অংশ "মমৈবাংশঃ জীবভূত" মন অধিষ্ঠাতা মানবজীবাত্মার তাই কল্পনা একটী প্রধান সম্পত্তি। কিন্তু, যিনি এখনও শিশুমানবরূপে

অবস্থিত, তাঁহার এই কল্পনা-শক্তি অমূলক ক্রীড়ায় পর্য্যবসিত থাকে। আর উন্নত মানবে বা যিনি সত্যসংস্থিত, তাঁহার কল্পনা ভগবৎ কল্পনার অনুসরণ করে। ইহাই সৃষ্টিরহস্য বিজ্ঞান; এবং এই অনুসরণেই একটী মহাযজ্ঞ।

ভবিষ্য দর্শন বা প্রবেক্ষণ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়া 'আসিয়াছি যে ব্রহ্ম ত্রিকালের অতীত। সেইরূপ আত্মা বা যাঁহাকে আমরা "অধিযজ্ঞ বা অধ্যাত্ম বলিয়া আসিয়াছি *ক তিনি ও আজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। তাই তিনি সনাতন ও "সদাকাল বর্ত্তমান" (Eternal Now)। আমরা তথায় দেখিয়া আসিয়াছি যে, যিনি সূক্ষ্ম দেহাভিমানী বা যিনি নিদ্রাকালে সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত থাকিয়া কার্য্য করেন তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমানরূপ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন না হইলেও স্থূলদেহে আবদ্ধ থাকিলে চৈতন্য "যেইরূপ কাল বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, তিনি সেইরূপ ন'ন। তাই ভূত, ও কতকটা ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকট বর্ত্তমান এবং তাই কখন কখন তাঁহার ভবিষ্যৎ দর্শন বা প্রদর্শন হইয়া থাকে। যিনি অধিদৈব (*ক) বা যাঁহাকে জীবাত্মা (†খ) বা (Individuality) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার ক্ষর ভাবের বা অধিভূত ভাবের বা (‡গ) (Personalityর) উপকার বা প্রয়োজন হইতে পারে এরূপ কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা যদ্যপি প্রাগ্‌দর্শনার্থ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সেই জ্ঞানক্ষর চৈতন্যে (Personality) অঙ্কিত করিয়া দিতে চেষ্টা করেন ও অল্পাধিক পরিমাণে সফল হন।

---

* (ক) অলৌকিক রহস্য ৩য় ভাগ ম সংখ্যা, স্বপ্ন তত্ত্ব, পৃঃ ৩৮৩।
† (খ) অলৌকিক রহস্য, ৩য় ভাগ, ১০ম সংখ্যা স্বপ্ন তত্ত্ব পৃঃ ৪৭৫।
‡ (গ) অলৌকিক রহস্য, ৩য় ভাগ ৮ম সংখ্যা পৃঃ ৩৮৩।

সাধারণের পক্ষে এই অনাগত প্রদর্শন, তত সহজ নহে। কারণ নিদ্রার সময় অনেকের হয়ত সূক্ষ্ম দেহের অধিষ্ঠাতা চৈতন্য এখনও অর্দ্ধ সুপ্ত অর্দ্ধ জাগরিত থাকে; হয়ত বা এখনও নিজ দেহকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধিকারে আনিতে পারে নাই; নানারূপ বাসনা বা কার্যের তরঙ্গে হয়ত সূক্ষ্মদেহ আকুলিত, উদ্বেলিত; হয়ত লিপ্ত দেহস্থিত মস্তিস্ক (etherie brain) নানারূপ বিশৃঙ্খল বাহ্য চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে বিক্ষোভিত হয়ত তাহার ভাণ্ড দেহস্থ মস্তিষ্ক নানা কারণে অপ্রকৃতিস্থ। তাই সর্ব্বদা এই প্রকার প্রবেক্ষণ হয় না। কখন দৈবক্রমে হয়ত ভবিষ্যৎ জ্ঞানটি জাগ্রৎ স্মৃতিতে সম্পূর্ণ ভাবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কখনও বিকৃতি ভাবে স্মৃতিতে আসে; কখনও বা এই মাত্র মনে হয় যেন কি একটা সুখ সংবাদ তাহার আসিতেছে, কি যেন কি দুর্ঘটনা শীঘ্র ঘটিবে; কিন্তু অধিক সময়েই স্থূল মস্তিষ্ক একেবারে কোনই স্মৃতি রাখেনা।

কেহ কেহ বলেন, "এই যে সকল স্বপ্নের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ দর্শন নহে; তাহা একটা অসম্বদ্ধ দৈব-মিলন মাত্র। প্রবেক্ষিত স্বপ্নের সহিত প্রকৃত ঘটনার দৃষ্টতঃ মিল থাকিলেও সেই স্বপ্নকে ভবিষ্যৎ সূচক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই যে মিল, ইহা দৈবক্রমে হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ প্রাক্ দর্শন সত্য হইলে, পুরুষকার নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদ্যপি যাহা যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বে হইতে নিরাকৃত হইয়া রহিল, যদ্যপি তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারাযায়, তাহা হইলে পুরুষকারের স্থান কোথায়? তবে পুরুষকার আকাশ কুসুম-বৎ অলীক কথা মাত্র?" না পুরুষকার কাল্পনিক কথা নহে, ইহা প্রকৃত. ইহা মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। মানুষ ভগবানের অংশ। তাই সচ্চিদানন্দ ভগবানের

অংশভূত মানবেও সৎভাব, চিৎভাব ও আনন্দভাব আছে। এই আনন্দভাব বা শিবভাব হইতেই মানবের ইচ্ছাশক্তি তাহার পুরুষকার। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি যে এই শিবভাব মানবেই প্রথম প্রবেশ করে, ইতর জীবে তাহা নাই।*(ক) অতএব পুরুষকার মানবেরই বিশেষ সম্পত্তি।

পুরুষকার বা ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা মানবের থাকিলেও, সকলের তাহা সমভাবে দৃষ্ট হয় না। অধিকাংশ লোক ইহা এখনও একপ্রকার সুপ্ত। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সামান্য আমিত্ব জ্ঞানে পরিণত হইয়া থাকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। যে যেমন উন্নত হয়, সুপ্ত শক্তি ও সেইরূপ প্রবুদ্ধ হয়; মানব পূর্ণ হইলে ক্ষুদ্র আমিত্ব ভগবৎরসে ডুবিয়া মিলিয়া যায়, কামও আনন্দভাবে পরিণত হয়, ও ইচ্ছাশক্তি ভগবচ্ছক্তিতে মিশিয়া পূর্ণস্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। মানব যতখানি ঐশ্বরিকভাব প্রাপ্ত হয়, সে যেমন যেমন ঈশ্বরপথ অনুসরণ করিতে থাকে, সে যেমন যেমন তাঁহার ভাবে বিভোর থাকে, মানবের ইচ্ছাশক্তি তদনুপাতে স্বাধীন হইতে থাকে। আমরা কতখানি অদৃষ্টের দাস কতটুকু স্বাধীন তাহা সম্যক বিচার করা এখানে নয়। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে সাধারণ মানবে প্রকৃত পুরুষকার অতি অল্পই থাকে; তাহারা প্রায়ই অবস্থার সম্পূর্ণদাস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী যে অবস্থায় পতিত হয়, যে আত্মীয় স্বজন যে শত্রু মিত্র, যে সম্পদ বিপদ প্রাপ্ত হয়, তাহার মধ্যে সামর্থ্যহীন জ্ঞানহীন পশুরমত কথিত হয়। অতএব এতাদৃশ লোকের ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারা আদৌ অসম্ভব নহে।

---

*(ক) অলৌকিক রহস্য, ৩য় ভাগ ৮ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

যিনি অধিদৈব, বা জীবাত্মা বা যিনি জন্মে জন্মে অমর অহং প্রত্যয়ী বা Individuality তাঁহার যে উপাধি তাহার নাম "কারণ শরীর।" মানবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ জন্মে জন্মে নূতন হয়; কিন্তু কারণ শরীরের নাশ নাই। ইহাতে প্রতিজীবনের শিক্ষা অঙ্কিত থাকে এবং মানব, জন্মে জন্মে যে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা যে শক্তির ক্রিয়ায় গঠিত হয়, তাহা এই কারণ শরীরে নিহিত থাকে। অতএব কারণ শরীর নামের সার্থকতা। সেই শরীরে যে চৈতন্য জাগরিত থাকেন তাঁহার নিকট ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্ব্বহইতেই পরিজ্ঞাত থাকে; যেহেতু যে যে কারণের জন্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহারা সকলেই তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হয়। সমস্ত পার্থিব ঘটনার প্রথম অভিনয় হয় সেই চৈতন্য ক্ষেত্র; তাহার পর সূক্ষ্ম লোকে তাহার পুনরাভিনয় হয়, এবং সর্ব্বশেষে স্থূল জগতে তাহা প্রকাশ পায়।

এখন অনেক ঘটনা আছে, যাহা মানব চেষ্টায় সহজে বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। সাধারণ মানব সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ঘটনাই সেইরূপ। অতএব তাহাদিগের যাহা ঘটিবে অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাহার অভিনয় অধিদৈবের চৈতন্যক্ষেত্রে হইতে থাকে এবং এমন কি সূক্ষ্ম, লোকেও পূর্ব্বহইতেই প্রকাশ পায়। এক বার বা সূক্ষ্ম লোকে ভাবি ঘটনার পূর্ব্ব হইতে চিত্রাঙ্কন হয় এই সত্যের যে বিশ্বাস্য সকল স্বপ্নই একমাত্র প্রমাণ তাহা। *(ক) এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা ভবিষ্যৎ ঘটনা হইতেই জানিতে পারেন। আমি কেবল যোগীও দিব্যদৃষ্টি-সমন্বিত সাধকদিগের কথা বলিতেছি না। স্কটল্যাণ্ডের (Scotland) হাইল্যাণ্ডনিবাসি (High Landers)

অলৌকিক রহস্য, ৩য় ভাগ ৮ম সংখ্যা স্বপ্ন তত্ত্ব।
অলৌকিক রহস্য পাঠক এরূপ অনেক সকল স্বপ্নের বিষয় অবগত আছেন।

অনেকের ইহাকে দ্বিতীয় দর্শন শক্তি (Second Sight) নামে অভিহিত করে ভবিষ্যৎজ্ঞান সম্ভব, ইহা অপর উপায়েও সপ্রমানীত হয়। ইহারই উপর ফলিত জ্যোতিষ নির্ভর করে। যিনি ঐ বিদ্যায় প্রকৃত পারদর্শী, তিনি মানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলেন, যাহাকে "অসম্বন্ধ দৈবমিলন" বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। মানবের ভবিষ্যৎ পূর্ব্বহইতেই অনেকটা নিরাকৃত থাকে, পূর্ব্বোক্তরূপে আলোচনা করিলে ইহাতে আর সন্দেহ আসিতে পারেনা। এবং যন্তপি ইহা পূর্ব্বহইতেই নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে সূক্ষ্মদর্শী বা স্বপ্ন কালে মানব যে তাহা জানিতে পারে সে বিষয়েও সন্দেহ আসা উচিত নয়।

কিন্তু প্রকৃত উন্নত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে ঠিক হয় না। যাঁহারা জ্ঞানী বা তত্ত্বদর্শী এবং যাঁহারা পুরুষকার বিশিষ্ট তাঁহাদের ভাবিঘটনা পূর্ব্বে নিরাকরণ করা যায় না। সাধনার দ্বারা যাঁহারা সুপ্ত ঐশ্বরিক শক্তি বা ভগবানের আনন্দ ভাবকে প্রবোধিত করিয়াছেন. যাঁহার অবস্থার ক্ষুদ্র ও শক্তিহীনদাস নহেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিরূপে বলা যাইতে পারে? তাঁহাদিগের জীবনের ও মুখ্য ঘটনা সমুদয় পূর্ব্বে হইতে নিদ্ধারিত থাকে সত্য; কিন্তু, কোন অবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহারা কিরূপে কার্য্য করিবেন, অতীত কর্ম্মের কতখানি বা তাঁহারা পুরুষকারের দ্বারা শক্তিহীন করিতে পারিবেন, বা হয়ত অত্যুগ্র পুরুষকার প্রারব্ধকে পরাভূত করিয়া বীরের মত শোভমান এসব কথা পূর্ব্ব হইতে জানা যায় না। যে সমস্ত কারণ পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত ছিল তাহাদিগের সমষ্টি শক্তিতে ঘটনার গতি যে অভিমুখে যাইতে ছিল, সূক্ষ্ম লোকে তাহারই পূর্ব্বাভাস পতিত হয়; কিন্তু সাধকের আত্ম-শক্তি, সহসা অতিতীব্র ইচ্ছাশক্তিরূপে অন্তরের কোন নিভৃত মধ্য হইতে আসিল এবং পূর্ব্ব সঞ্চিত ক্রিয়াবান শক্তির গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

শক্তিবিজ্ঞান বা বলবিজ্ঞানের (Mechanics)একটি উদাহরণ সাহায্যে আমরা এই বিশেষ প্রয়োজনীয় তত্ত্বটি বুঝিতে চেষ্টা করিব। মনে করুন একটি গোলকের উপর কাষ্ঠ দণ্ডের দ্বারা আঘাত করিলাম। ইহাতে গোলকের উপর একটি শক্তি প্রয়োগ করা হইল। তাহাতে গোলকটি গড়াইতে গড়াইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া আঘাত করিবে। এই যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আঘাত করা, ইহা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিবার পূর্ব্বে, অন্য দিক দিয়া তাহার উপর আর একটি শক্তির প্রয়োগে সেই গোলকের গতি পরিবর্ত্তিত বা নষ্ট করা হইল। অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা ঘটিলনা। এখন নির্দ্দিষ্টস্থানে উপস্থিতি ঠিক মানবের অদৃষ্টফল সম্বন্ধেও তাহাই হয়। আমাদিগের পূর্ব্বো লিখিত গোলকের সহিত মানব অদৃষ্ট ফল তুলনা করা হইয়াছে। যেমন গোলকের উপর শক্তি প্রয়োগ উহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হইতেছিল, সেইরূপ সূক্ষ্মজগতে যে সমস্ত শক্তির ক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহাতে কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট ঘটনা সূচিত করে। এখন মনে করুন গোলকটী পুরুষকার-সমন্বিত মানব। সে ইহা ইচ্ছা করিয়া কোন একটী নবশক্তি উৎপন্ন করিতেও পারে, নাও পারে। এখন সহসা সেই নবশক্তি উদ্ভূত করিল। ইহাও গোলকের উপর দ্বিতীয় শক্তির ক্রিয়া। আমরা দেখিব ইহার ফলে মানবের যে অদৃষ্টফল পূর্ব্বে অনুমান করা হইয়াছিল কার্য্যতঃ তাহা হইলনা। এই যে নবশক্তির আবির্ভাব যাহার জন্য মানব অদৃষ্ট ফল পরিবর্ত্তিত হইল তাহা সাধারণ সূক্ষ্ম দর্শনে দেখা যায়না তাহা সাধারণ দিব্য-দর্শী অনুমান করিতে পারেনা তাহা ফলিত-জ্যোতিষের গণনার সীমার মধ্যে আসেনা। এই যে নব শক্তির সহসা আবির্ভাব ইহাই পুরুষকার ইহা আত্মার নিজশক্তির প্রকাশ। ইহার

প্রকৃতবাসস্থান মনোময় কোষ নহে, বিজ্ঞানময়কোষ নহে, আনন্দ ময় কোষ নহে; ইহার স্থান হিরন্ময় কোষে।

আমরা আগামী বারে দুই একটি সত্য স্বপ্নবৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিব। আমরা দেখাইব স্বপ্ন কিরূপে সফল হইয়াছিল এবং পুরুষকারে বা তাহা কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভৌতিক চিত্রাবলী।

আমার গোপালদাদা এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার স্ত্রী ৩০ বৎসর হইল মরিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল ও বেশ কথা কহিতে পারিতেন, পুরাতন উদরাময়ের রোগীদের এই রূপই হইয়া থাকে। মৃত্যুর আর সংশয় নাই, নিশ্চয়ই তাঁহার অনতিবিলম্বে মৃত্যু হইবে, অথচ বেশ কথা বলিতে পারিতেছেন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ সকলে মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়া বসিয়াছে। রোগিনী মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছেন ও চক্ষু বুজিতেছেন। গোপালদাদা কাছে ছিলেন তিনি কারণ জিজ্ঞাসিলে বলিলেন কতকগুলি বিকটাকৃতি ভূত তাহার গোচরে আসিতেছে এই জন্য তিনি ভয় পাইতেছেন। গোপালদাদা তৎক্ষণাৎ কতকগুলি বেলপাতা আনিতে বলিলেন, বেলপাতা আনা হইলে তাহার একটাতে রামনাম লিখিয়া তিনি স্ত্রীর হস্তে দিলেন এবং বলিলেন ঐরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে তোমার এই বিল্বপত্র তাহাদের দেখাইবে। রোগিনী তাহাই করিলেন, তদবধি যতক্ষণ তিনি জীবিত ছিলেন আর ওরূপ মূর্ত্তি দেখিতে পান নাই।

হোঁস পোঁস শব্দটা যেন অতি স্থূলকায় ব্যক্তি গুরুপরিশ্রমের পর যেরূপ জোর নিশ্বাস ফেলিয়া থাকে সেইরূপ শব্দ প্রভৃতি বলেন তবে এই শব্দ কিসের ভূতে কি শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে নাকি ? ভূত দূর হইতে দৃষ্টি করিয়াই কি দ্বারবদ্ধ কন্যাটির প্রাণনষ্ট করিবার যোগ্য ব্যাধি দিলেন বা উহাতে আবিষ্ট হইলেন। এ ভূত নিশ্চয়ই স্মৃতিকাদ্বেষী সন্দেহ নাই।

হাবড়া সহরের ভিতরের কাণ্ড, বর্দ্ধিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গৃহের ব্যাপার, আমরা এস্থলে নাম ধাম প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচনা করিলাম না। বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী স্ত্রী, প্রথম গর্ভবতী হইয়াছেন, বাটীতে বাবুর মাতা ব্যতীত আর কেহ নাই, জ্ঞাতি বহু পরিবার থাকিলেও সকলেই পৃথক অবস্থায় পার্শ্বের বাটীতে থাকেন বাবু কলিকাতায় কর্ম্ম করেন। ঘটনার দিন বাবু কর্ম্ম জন্য কলিকাতায় আছেন, অপরাহ্ণে পুরাণ শ্রবণ জন্য বাবুর মাতা তাঁহার বধুমাতাকে একাকী বাটীতে রাখিয়াই পুরাণ শ্রবণে গিয়াছেন। স্ত্রীলোকের বৈকালে গা ধোয়া প্রথা আছে বাবুর বাটীর খিড়কি পুষ্করিণী একটি বাগানের মধ্যে, এবং বাটীর যে অংশ বাবুর ভাগে পড়িয়াছে তাহা হইতে একটু দূরে বাবুর স্ত্রী সে দিন গাত্র ধুইবার জন্য পুকুরে যাইতে একটু বিলম্ব করিয়া ফেলেন; একটু গা ঢাকা মত হওয়ার সময় তিনি ঘাটে গিয়াছিলেন, কোন স্ত্রীলোক তাহাকে সে সময়ে একা যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধ্যার পর বাবু বাটীতে আসিলেন, কিছু পরেই বাবুর মাতা ও পুরাণ শুনিয়া ফিরিলেন, কিন্তু বৌমা বাটীতে নাই শুনিয়া তিনি জ্ঞাতিদের বাটী অনুসন্ধানে না পাইয়া একটি গোল তুলিলেন, বাবুর বহু জ্ঞাতি ভাই আছেন সকলে মিলিয়া খিড়কির পুকুরে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। অনেক অনুসন্ধানে পাঁকের ভিতর পোঁতা অবস্থায় তাহার মৃত দেহ পাওয়া গেল। দেহ আনিয়া পূজার দালানের উঠানে ফেলা হইল। বাবুর স্ত্রীর যেমন রূপ তেমনই গুণ ছিল। প্রতিবাসী সকলেই শোকার্ত্ত হইয়া একবার দেখিবার জন্য দালান বাটীতে পৌছাইল। এমন সময়

পূজার দালান হইতে গম্ভীর স্বরে কথা বাহির হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন দালানের ভিতর হইতে কে যেন কথা বলিতেছে, সে গম্ভীরস্বরে সকলেই ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। পার্শ্বের বাটীতে আমার কোন আত্মীয়া ছিলেন, তিনি ভয়ে সে স্থানে যাইতে পারিলেন না, আপন বাটীতে বসিয়াই সে কথা শুনিতেছিলেন। ঠিক কথাগুলি কেহ লিখিয়া রাখে না, তবে সেই কথার মর্ম্ম যতদূর স্মরণ আছে তাহা এইরূপ, "মারিয়াছি আমরাই মারিয়াছি আমিই মারিয়াছি, গায়ে বড় জোর ছিল, অনেকক্ষণ জুঝিয়াছিল, শেষে পাঁকে পুঁতিয়া তবে শেষ করিয়াছি না মারিয়া আর কি করিতে পারি। ঢের সহ্য করিয়াছি আর সহ্য হয় না, কিছুতেই লজ্জা নাই, আমরা গুরুতর লোক, কতকাল ধরিয়া এই বাগানে রহিয়াছি, এইখানে আমাদের অপমানের একশেষ করিতেছে। কেহই আমাদের গ্রাহ্য করিবে না, বাগানে যত নোংরা ফেলিবে, এই গাছের তলায় সকলে মল ত্যাগ করিবে, থুথু ফেলিবে, অনেক সময় আমাদের গায়ে পর্য্যন্ত নোংরা কালি প্রভৃতি আসিয়া পড়ে, পানের পিচ গায়ে লাগে। এতকাল সহ্য করিয়া আসিয়াছি, সন্ধ্যাকালে গর্ব্ভাবস্থায়, আমাদের কিছু লজ্জা না করিয়া একেবারে নিকটেই মলত্যাগ করিল, আবার কিনা আঁচল ঠেকাইয়া চলিয়া গেল, আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না, প্রতিশোধ দিতে হইল।

এই বলিতে বলিতে ভূত আপন পরিচয় দিতে লাগিল, তাহারা বাগানে কত জন আছে বলিল। যত তাহাদের আত্মীয় কুটুম্ব ও পূর্ব্ব পুরুষ প্রায় ৭০।৮০ জনের নাম করিয়া সকলে এইখানে একত্রে বাস করিতেছে বলিল ও তাহাদের জন্য বাগান পরিষ্কার রাখা ও সেইস্থানে স্ত্রীলোকদের যাইতে না দেওয়া সকলের কর্ত্তব্য ইহাও ভূত জানাইল। উপস্থিত সকলে ভূতেদের প্রণাম করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া আসিল।

বাবুটি পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব পত্নী মধ্যে মধ্যে জ্ঞাতিদের কোন কোন স্ত্রীলোকের উপর আবিষ্টা হন। ও বলেন পিসিমার

রান্না অনেক দিন খাই নাই, বড় খাইতে ইচ্ছা করে বলিয়া আসিলাম। তৃতীয় পক্ষের পত্নীকে লইয়া বাবু সুখী হইতে পারিতেছেন না, নানাপ্রকার রোগ তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছে, এই সকল রোগ ও হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি উক্ত মৃত পত্নীর দ্বারা হইতেছে কিনা তাহা বাবুর বিবেচনা করা উচিত, তাহা তিনি করিতে ইচ্ছা করেন না।

ভুতের এইরূপ কথা কখনও কোথায় হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না, হয় ভুতকে কেহ দেখিতে পাইতেছেননা, অথচ গম্ভীরস্বরে বক্তৃতা করিতেছে, এই রহস্য ঘটনা বস্তুতই লিপিবদ্ধ হওয়া বিশেষ আবশ্যক বোধ করি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে যদি কাহারও সন্দেহ হয় তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন আমরা এই বাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় করাইতে প্রস্তুত র'হলাম ও আমার উক্ত আত্মীয় যিনি পার্শ্বের বাটী হইতে শুনিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে আমার নিকটেই আছেন। ঐ স্থানের বহুলোকও সাক্ষ্য স্বরূপে পাওয়া যাইতে পারে। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার এই ঘটনা হইলেও কাহারও ভুলিবার সম্ভাবনা নাই।

হাবড়া সহরের আমার কোন পরিচিত যুবকের একটি বালক মস্তিষ্ক প্রদাহ জনিত জ্বরে মারা পড়ে। উক্ত সন্তানটীর মৃত্যুর পর হইতে, ইহাদের বাটীতে বিষ্টাদি পড়িতে থাকে। যে ভগ্নীটি খোকাকে কোলে লইয়া বেড়াইত তাহার গাত্রেই বিষ্টা বেশী লাগিত, কোথাও কেহ নাই অকস্মাৎ গাত্রে যেন কেহ আসিয়া বিষ্টা মাখাইয়া দিয়া গেল। এইরূপ কয়েক দিন হইবার পর বালিকাটীর মূর্চ্ছা হইত ও সেই অবস্থায় বালিকাটীর মুখে নানা প্রকার কথা শুনা যাইত। কি প্রতীকার করিলে অনিষ্টকারীর সন্তোষ হয় ও বাড়ীওয়ালা এই বিপদ হইতে মুক্ত হয় তাহা জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর পাওয়া যাইতনা। এই বিষ্টার দায়ে তাহাদের এক প্রকার খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল ও ঘরের বিছানা পত্র কিছুই ছিলনা। এইরূপে কয়েক মাস বিব্রত হইয়া শেষে ইহারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে, প্রায় দুই মাস হইল ইহাদের বাটীতে আর বিষ্টা পড়ে নাই।

পরিশেষে আমরা কয়েকটি পশ্বাকার ভূতের ঘটনা লিখিতে বসিলাম। অনেক স্থলে এরূপ ঘটে যে কোন অপদেবতা পশুর আকার ধরিয়া লোকের ভীতি উৎপাদন করিয়া আনন্দ করিয়া থাকে। আবার কোন চিন্তা-মূর্ত্তিও ঐরূপ আকারে কখনও কখনও কাহারও গোচর হইয়া থাকে। মানব প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া পশুর আকারে প্রকাশ হওয়া সর্ব্বথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়না এরূপ ঘটনা কদাচ কখনও যে ঘটেনা তাহাও বলা যায়না। আবার পশু মৃত হইলে তাহাদেরও এক প্রকার কমে লোকীয় দেহ থাকে। কোন উন্নত জীব কোন স্থানে অন্যের নিকট আসিতে না পারে এই উদ্দেশে সেই স্থানে কোনরূপ বিকট চিন্তামূর্ত্তি করিয়া রাখিয়া দেন সেই স্থানে সাধারণ মানব যাইলে ঐ চিন্তামূর্ত্তি তাহার গোচর হওয়ায় সে ভয়ে পলাইয়া আসে এইরূপ স্থলে বিকটাকার পশ্বাদির মূর্ত্তিও কোন কোন স্থানে দেখা যাইতে পারে।

আমাদের গ্রামের জনৈক মুসলমান গ্রামস্থ শ্রীশ্রী৺ চণ্ডিকা দেবীর ঘরের পার্শ্বেই বাস করে। এক গ্রীষ্মের রাত্রে বাতাস সেবন জন্য দেবীর ঘরের ধাপের উপর বসিয়াছিল রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হওয়ায় কোথাও লোক জন দেখা যাইতেছিলনা। এমন সময় দেখিল একটি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ গাভী নিকটস্থ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর নিকট দিয়া দেবীর বাটীর সম্মুখ হইয়া অপর পার্শ্বের পালেদের বাটীর দিকে চলিয়া যাইতেছে। গাভীটি দেখিতে অতি সুশ্রী ও সেরূপ গাভী সে গ্রামে বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কাহারও বাটীতে দেখে নাই গাভীটিকে তাহার ধরিয়া রাখিবার লোভ হইল সে পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাত যাইবার পর প্রশস্ত পরিষ্কার বাঁধের উপর তাহার চক্ষের সম্মুখে গাভীটী অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পর আরও কয়েকদিন গাভীটী দেখিবার জন্য সে ও অন্য লোক রাত্রে দেবীর ঘরে অপেক্ষা করিয়াছিল কিন্তু আর দেখা যায় নাই। শুনিয়া বোধহয় এই গাভীটী উক্ত দেবীর গাভী হইবে পার্থিব গাভী নহে।

আমাদের কলুর ডাঙ্গাতে ও বাটীর চতুপার্শ্বের বাগানে যেসকল খেজুর গাছ আছে তাহাতে রস জন্য বৎসর দুই পূর্ব্বে শীতকালে কাটা হইয়াছিল রাত্রে রস চুরি হইতে থাকায় জনৈক কর্ত্তারা প্রজাকে রাত্রে চৌকি দিতে

বলা হয় সে রাত্রি ১২টার সময় একবার ও চারি পাঁচটার সময় একবার বাগানে ঘুরিয়া যাইত। একরাত্রে আপন বাটী হইতে সদর রাস্তায় পড়িয়া সদর রাস্তা দিয়া আমাদের পাল বুড়ীর ডাঙ্গার নিকট আসিলে দেখিল সম্মুখে একটি বৃহৎ মহিষ আসিতেছে। আমাদের গ্রামে মহিষ কাহারও তখন ছিল না ও চতুর্দ্দিকে দুই মাইলের মধ্যে কোথাও মহিষ থাকে নাই। লোকটি মহিষ দেখিয়া উহা অপদেবতা বোধে উহার নিকটবর্ত্তী না হইয়া মারিবার জন্য লাঠি উঠাইল, তাহাতে মহিষটি রাস্তা হইতে ফিরিয়া পাল বুড়ীর ডাঙ্গায় উঠিয়া চট্টখণ্ডীর ডাঙ্গায় বাঁশ বনের মধ্যে চলিয়া গেল। লোকটি বলে "আমার মহিষের পশ্চাৎ যাইবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মহিষ আমাকে বাঁশ বনের মধ্যে লইয়া গিয়া প্রাণের হানি করিতে পারে এই বিশ্বাসে আমি আর অগ্রসর হইলাম না। পরে বরাবর কলুর ডাঙ্গায় আসিয়া দেখি সম্মুখে এক সাদা কুকুর বসিয়া আছে ও আমাকে দেখিয়া লেজ নাড়িতেছে।" এরূপ কুকুরও হাকোলা গ্রামে কাহারও নাই।

এই কাওরার নাম হেম চন্দ্র সর্দ্দার, দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ, তদনুরূপ সাহসী ও নিরক্ষর। তাহার ধারণা যে এই মহিষ ও কুকুর দুইই ভূত। আমাদের মনে হয় এরূপ দুইটি জন্তু ঐ গ্রামে বা নিকট গ্রামে কাহারও না থাকায় অবশ্য ইহাদের পার্থিবজীববলা যায় না। তবে বোধ হয় কোন অপদেবতা এই দুই মূর্ত্তি ধারণ উহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে।

হারুদাদার স্ত্রী গর্ভাবস্থায় এক রাত্রে রায়পুকুরের ঘাটে গিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন একটি মহিষ পুকুর পাড়ের বাগান হইতে ছুটিয়া আসিতেছে, তিনি ভয়ে পড়িয়া গেলেন। তদবধি তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন কেহ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে তাঁহার শয়ন ঘরের তক্তাপোষের উপর কেহ আসিয়া বসিল এরূপ মড় মড় শব্দ হইত।

তিনি যে সন্তান প্রসব করিলেন তাহা সূতিকাগারেই পঞ্চত্ব পাইল। এবং পরে যতবার গর্ভবতী হইয়াছিলেন প্রত্যেকবারই তাহার সন্তান ঐরূপ সূতিকাগারে মারা পড়িত।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয় অলৌকিক রহস্যে যে প্রেততত্ত্ব বাহির করিতেছিলেন তাহাতে জনৈক আবিষ্ট প্রেত বলিয়াছিলেন "আমরা কাহারও অনিষ্ট করিতে পারি না, এবং কাহারও শরীরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে প্রথমে ভীত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি, এই ভীত অবস্থায় মানবের উপর আবিষ্ট হইতে আমরা পারি। এখানে ও বোধ হয় কোন প্রেত হারুদাদার স্ত্রীকে ভীত করিবার জন্য মহিষমূর্ত্তি ধরিয়া থাকিবে ও তিনি এই মূর্ত্তিদেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া পড়িয়া যাওয়ার সময় হইতে তাঁহাতে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার জীবিত কাল পর্য্যন্ত আবিষ্ট ভাবে তাঁহার সঙ্গে ছিল। ভূতে কাহারও প্রাণহানি করিতে পারে না একথা সর্ব্বথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। হাবড়ার বাবুর স্ত্রীকে হত্যাকরা উপরের প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ স্থলে ভূতব্যতীত অন্য কোন জীব কর্ত্তৃক তাহার প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা আদৌ ছিলনা ও শেষে ভূত কর্ত্তৃক অদ্ভুত ভাবে আত্ম কার্য্যস্বীকার করাতে অপর কর্ত্তৃক ঐ হত্যাহওয়া, কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন না।

আমরা এইখানে এই প্রবন্ধের শেষ করিলাম তবে পুনরায় বলিতেছি এই চিত্রগুলি ফটোচিত্র অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনার ছায়া বা উল্লেখ মাত্র, ইহাতে কোন রূপে তুলিকাস্পর্শে রঞ্জিত করা হয় না। সারদা দাদার ব্যাপার ব্যতীত সকল কয়েকটির দর্শকগণ এখনও জীবিত আছে ও আমার শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া মাত্র লেখা নহে, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে দায়িত্ব আমি নিজে লইয়া ঘটনা কয়েকটিকে বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষার্থ লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

৪র্থ বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। [১১শ সংখ্যা।

মৃত্যুর পারে।

মৃত্যুতে মানবের স্থূলদেহ-ত্যাগ হয়, এই স্থূলদেহের একটি নাম অন্নময় কোষ। মৃত্যুর পর মানবের যে দেহ প্রকাশ হয়, তাহাকে সূক্ষ্মদেহ কহে, ইহার অপর নাম প্রাণময় কোষ, অনেক স্থলে ইহাকে কামরূপও বলা হইয়াছে। এই দেহ ধারণ করিয়া মানবকে যে স্থানে থাকিতে হয়, তাহাকে ভুবর্লোক, প্রেতলোক, পিতৃলোক, কামলোক প্রভৃতি শব্দে নানা স্থানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অবশ্য মানব স্থূলদেহ ধারণ করিয়া যে স্থানে ছিল, সে স্থান হইতে এই স্থান দূরবর্ত্তী নহে, বিভিন্নও নহে। অর্থাৎ আমাদের এই পৃথিবী, এই ভূলোক ইহার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে ঐ ভুবর্লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, দুইটি লোকই একস্থানেই আছে—যেখানে ভূলোক, সেইখানেই ভুবর্লোক। ভূলোক অপেক্ষা ভুবর্লোকে প্রাণী ও পদার্থ অনেক বেশী, এই ভূলোকের যাবতীয় মানব, জীবজন্তু, কীট, পতঙ্গ, অচেতন উদ্ভিদ প্রভৃতি সকলেরই অনুরূপ (counterpart) ঐ ভুবর্লোকে রহিয়াছে, ইহা ব্যতীত ভুবর্লোকবাসী নানা প্রকার জীব ও নানা প্রকার পদার্থ—যাহা ভূলোকে নাই, তাহাও তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাতাসের ভিতর দিয়া যেমন আমরা যাতায়াত করিতেছি অথচ বাতাস থাকা বশতঃ কোনরূপ বাধা আমরা অনুভব করি না, সেইরূপ

আমরা বাতাস অপেক্ষাও সূক্ষ্ম সেই কামলোকের ও কামলোকস্থ জীব ও পদার্থাদির মধ্যে থাকিয়াও এবং সেই সমস্তের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিলেও আমরা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা সেই লোকের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না ও সেই লোকের সহিত আমাদের সঙ্ঘর্ষ হয় না।

স্থূলতার তারতম্যানুসারে আমাদের পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে সাত ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। প্রথম কঠিন (solid), দ্বিতীয় তরল (liquid), তৃতীয় বাষ্পীয় (gaseous), চতুর্থ ইথিরিক (Etheric), পঞ্চম সূক্ষ্ম ইথিরিক (Super Etheric), ষষ্ঠ আণবিক বা অণুঘটিত (Sub-atomic) এবং সপ্তম পরমাণবিক বা পরমাণুঘটিত (atomic)। এই সাত বিভাগের মধ্যে কঠিন ও তরল পদার্থ সকলেই দেখিতে পাইয়া থাকি। বাষ্পীয় অবস্থার পদার্থ অনেক সময়ে ঘনীভূত হইলে বা কোন ঘোর বর্ণের হইলে দেখা যায় মাত্র, নচেৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। চতুর্থ বিভাগের পদার্থ সকল ইথর ঘটিত, এই ইথরকে অনেকে আকাশ বলিয়া থাকেন, ইহা বাষ্প অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ। পঞ্চমবিভাগের অবস্থা ইথর অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ষষ্ঠ বিভাগে পঞ্চম বিভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কোনপ্রকার অবস্থায় পদার্থ সকল থাকে। কোন পদার্থের সামান্য কণা লইয়া ক্রমশঃ তাহা বিভাগ করিয়া যাইতে থাকিলে শেষে এমন এক অবস্থায় পৌঁছাইতে হয়, যখন ঐ কণা এত সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে যে, উহা আর মানব কর্তৃক বিভক্ত হইতে পারে না, এই সূক্ষ্ম অংশকে পরমাণু বলা হয়, এইরূপ দুই বা ততোধিক পরমাণু লইয়া একটি অণু হয়। ষষ্ঠ বিভাগের পদার্থ এইরূপ অণুঘটিত এবং সপ্তম বিভাগে পদার্থ-সকল কেবল এক একটি পরমাণু লইয়াই হইয়া থাকে। এই পরমাণু আমাদের পৃথিবীর সূক্ষ্ম পদার্থের চূড়ান্ত অর্থাৎ শেষ সীমা। এই সূক্ষ্ম অবস্থা আমাদের দৃষ্টিশক্তির বাহিরে। তাহা হইলেই বুঝিলাম, পৃথিবীর জড় পদার্থের সাতটি বিভাগের মধ্যে

মোট ছুইটি আমরা দেখিতে পাই। পাঁচটি আমরা দেখিতে পাই না। তখন সূক্ষ্ম ভুবর্লোক দেখিবার আশা কি করিয়া করিতে পারি?

যখন তৃতীয় বিভাগের বাতাসমধ্য দিয়া আমাদের গতিবিধির বাধা হয় না, তখন সপ্তম বিভাগের পদার্থ সকল মধ্য দিয়া আমাদের যাতায়াতের যে বাধা হইবে না ও এই বিভাগের পদার্থসকল যে আমরা দৃষ্টিগোচর করিতে পারিব না, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। আমরা নানাপ্রকার গ্রহাদিতে দেখিতে পাই যে, ভুবর্লোকের সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল পদার্থের একটি পরমাণু আমাদের ভূলোকের একটি অণুর ১/৪৯ অংশমাত্র, অর্থাৎ আমাদের ভূলোকের একটি পরমাণু বিভক্ত হইয়া ৪৯টি হইলে ভুবর্লোকের এক একটি অণু হয়। ভুবর্লোকের সর্ব্বনিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরের পরমাণু পর্য্যন্ত আমাদের ভূলোকের পরমাণু অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম হইতেছে। ভুবর্লোকেও সূক্ষ্মতার তারতম্যানুসারে ভূলোকের ন্যায় সাতটি বিভাগ আছে। এক একটি বিভাগের পদার্থসকল লইয়া এক একটি স্তর হইয়াছে এবং গুরুত্বের পরিমাণে ক্রমে ক্রমে একটির নীচে আর একটি করিয়া এই স্তর রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রথম স্তর সর্ব্বনিম্নে ও সপ্তম স্তর সর্ব্বোপরিদেশে রহিয়াছে। পৃথিবীরও উক্ত সাত বিভাগে সাত স্তর হইয়া ক্রমশঃ উপরি উপরি রহিয়াছে। ভুবর্লোকের পদার্থ সকল উক্তরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া ঐ লোকের যে কোন জীব বা পদার্থ আমাদের জগতের জীব বা পদার্থমধ্যেই থাকিতে পারে, আমরা তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিব না ও আমাদের অস্তিত্বে তাহাদের বাধা বোধ হইবে না, ভুবর্লোকবাসী আমাদের দেওয়াল আদির মধ্য দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে পারিবে। আমরা যে স্থানে চেয়ার রাখিয়াছি, সেই স্থানে তাহারা একখানি তাহাদের চেয়ার রাখিলেও পরস্পর বাধা হইতে পারে না। এই কারণে ভুবর্লোক আমাদের ভূলোকের মধ্যে থাকিলেও আমরা ঐ লোক প্রত্যক্ষ করিতে

বা অনুভব করিতে পারি নাই। মানব মৃত্যুর পর এই ভুবর্লোকে থাকিলেও এই কারণে আমাদের দৃষ্টির ও স্পর্শশক্তির বাহিরে যাইয়া পড়ে মাত্র, তাহারা স্থান হিসাবে কোন দূরদেশে চলিয়া যায় না।

মানব ভূলোক হইতে মৃত্যুপথে ভুবর্লোকে যাইলে তাহার কামদেহ দৃষ্টে তাহাকে চিনিবার কোন বাধা হয় না। আমাদের চিন্তা, কামনা প্রভৃতিকে আমরা কোন পদার্থ বলিয়া ধরি না, কিন্তু ইহারা যথার্থই পদার্থমধ্যে গণ্য, কারণ, যে মূল প্রকৃতি হইতে সর্ব্ববিধ পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, চিন্তা, বাসনা ও কামনা প্রভৃতি সেই মূল প্রকৃতিরই বিকার মাত্র। তবে ইহারা সেই মূল প্রকৃতির অতি সূক্ষ্ম অংশ। আমরা উপরে দেখিলাম, ভুবর্লোক কিরূপ সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত হইয়াছে। আমাদের কামনাও ঐরূপ সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত হইয়াছে, দুইই একই প্রকার পদার্থে গঠিত হওয়ায় ভুবর্লোকবাসীদের নিকট কামনা সকল পদার্থমধ্যে গণ্য হইয়াছে, এই জন্যই ভুবর্লোকের অপর একটি নাম কামলোক বা কামনাময় লোক হইয়াছে। এই কামনা সেখানে অন্যান্য পদার্থের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। সেইরূপ চিন্তাও সেই ভুবর্লোকে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভুবর্লোকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ভুবর্লোকবাসী কাহাকেও দেখিতে পাইলে তাহার মনোভাব ও কামনা-সকল পর্য্যন্ত দেখিতে পায়, তাহার নিকট পৃথিবীর লোকের মত ভিতরে এক, বাহিরে অন্যরূপ প্রকাশ করিবার উপায় থাকে না। সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ দেখিয়াছেন যে, আমরা যেরূপ চিন্তা করি, তদনুরূপ এক এক মূর্ত্তি সৃষ্ট হয় এবং সেই মূর্ত্তি যাহার জন্য চিন্তা করা হইয়াছে, তাহার নিকট দ্রুতবেগে চলিয়া যায় ও আবার অধিক বেগে ফিরিয়া আসিয়া চিন্তাকারক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ও চিন্তার বল অনুসারে এই মূর্ত্তির স্থায়িত্বকালের ইতর-বিশেষ হয়, এক চিন্তা-মূর্ত্তি-সৃষ্টির পর

তাহা নাশ হইবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার সেই চিন্তা করিলে ঐ মূর্ত্তি আর ধ্বংস না হইয়া আরও কিছুকাল থাকিবার শক্তি লাভ করে, এইরূপে মানব মাত্রেই আপনার চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার চিন্তামূর্ত্তি করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যেও আমাদের ইষ্ট ও অনিষ্ট করিবার উদ্দেশে বহুকাল চিন্তা করায় অনুরূপ চিন্তামূর্ত্তি গঠিত হইয়া আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। এই সকল চিন্তামূর্ত্তি ভুবর্লোকের পদার্থের ন্যায় সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত হওয়ায় মানব জীবিত থাকাকালে ইহাদের দেখিতে পায় না, মৃত্যুতে ইহারা সঙ্গ ছাড়ে না, সূক্ষ্মদেহ সহ ভুবর্লোকে ইহারা গিয়া থাকে, তখন মানবে ইহাদের দেখিতে পায়। যাহারা পৃথিবীতে এই চিন্তামূর্ত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহারা ভুবর্লোকে যাইয়া এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাদের প্রকৃত জীব বোধ করে। মন্দ-চিন্তা, অনিষ্ট-চিন্তা, হিংসা প্রভৃতি বশতঃ যে সকল মূর্ত্তি হয়, তাহাদের দেখিতে অতি বীভৎস, আবার অনেক সময় নানা প্রকার বীভৎস-মূর্ত্তি একত্রে মিশিয়া গিয়া একটি অধিকতর ভীতিব্যঞ্জক মূর্ত্তি হয়। মানব নূতন লোকে যাইয়া ইহাদের দ্বারা বড়ই বিপন্ন হইতে থাকে। অবশ্য পৃথিবীতে থাকা কালে এই সকল মূর্ত্তি ধ্বংস করিবার ও ইহাদের নিকটে আসিতে না দিবার উপায় শিক্ষা করিলে ভুবর্লোকে অনেক উপকার হইয়া থাকে। ভুবর্লোকবাসী অনেক পরদুঃখকাতর মানবগণ এই সময় এই নবাগত মানবকে শিক্ষা দিয়া ও ঐ সকল চিন্তামূর্ত্তি নষ্ট করিয়া, তাহাকে শান্তি দিয়া থাকেন।

যিনি ভুবর্লোকে যাইতেছেন, তাঁহার জন্য এখানে আত্মীয়স্বজন শোক করিলেও ঐরূপ অশান্তিকর মূর্ত্তি ভুবর্লোকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে শান্তি পাইতে দেয় না। কেহ যদ্যপি তাঁহার ভুবর্লোকে শান্তি ইচ্ছা দৃঢ়ভাবে পৃথিবীতে বসিয়া করেন, তবে মৃত ব্যক্তি সেই লোকে শান্তিপ্রকাশক দিব্য সুন্দর গোলাপের বর্ণবিশিষ্ট মূর্ত্তি

দেখিতে পাইবে ও তাহার মনে আনন্দ হইবে। এই জন্যই শাস্ত্রে মৃতের জন্য শোক করা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং এই কারণে নানা প্রকার দান ও ভোজন ইত্যাদি দ্বারা শ্রাদ্ধকালে বহু লোকের সন্তোষ উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা, ইহাদের কর্ত্তব্য পানভোজনে ও দানগ্রহণে তৃপ্ত হইয়া মৃতের শান্তিজন্য দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করা, আমরা কি তাহাই করিয়া থাকি ?

ভুবর্লোকের মানব ক্রমাগত বাসনা ক্ষয় করিতে থাকে—যতই তাহার বাসনার নাশ হইতে থাকে, ততই সে ক্রমশঃ এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উঠিয়া যাইতে থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তর—যাহাকে আমরা প্রথম স্তর বলিয়াছি, এইখানে বদ্ধ জীবগণকে বেশী সময় থাকিতে হয়, ইহারা পৃথিবীতে থাকাকালে কুবৃত্তি-সকলকে দমন না করিয়া ভোগে তাহাদের বেশ বাড়াইয়া আসিয়াছে, সেই বৃত্তি-সকল এক্ষণে ইহাদের বড়ই কষ্ট দিতে থাকে। ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল ইন্দ্রিয়গুলির মত আমাদের স্থূলদেহে থাকে নাই, ইহারা সূক্ষ্মদেহে থাকে, কাজেই মৃত্যুতে স্থূলদেহের নাশে এই বৃত্তিসকলের নাশ হয় না। যাঁহারা পৃথিবীতে থাকিয়া কুবৃত্তি-সকলকে দমন করিতে অভ্যাস করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের এই প্রথম স্তরে বাস অতি অল্প সময় হয় ও তাঁহাদের এই সময় নিদ্রিতের মত অবস্থায় কাটিয়া যায়। সূক্ষ্মদেহের অপেক্ষাকৃত স্থূল অংশসকল যতই ভোগে ও কালবিলম্বে ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে—ততই মানব প্রথম হইতে দ্বিতীয় স্তর, পরে তৃতীয় স্তর এইরূপে উঠিতে থাকে। শেষে সপ্তম স্তর ভেদ করিয়া—মানবের স্বর্গলোকে গতি হয়। যাহারা স্ত্রীপুত্র আদির মায়া কাটাইতে পারে না বা যাহাদের পানাসক্তি প্রভৃতি বশতঃ পৃথিবীর দিকে বিশেষ ঝোঁক রহিয়াছে—তাহাদের এই প্রথম স্তরে থাকিতে হয়, প্রেত প্রভৃতি অবস্থাপ্রাপ্ত ও ভীষণ পাপকারী মানবগণ এই স্তরেই থাকিয়া কষ্ট ভোগ করে ও পৃথিবীতে আপনাদের অস্তিত্বের বিষয় নানাবিধ

কার্য্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধকালে যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয়, সেই মন্ত্রপাঠহেতু একপ্রকার আলোড়ন বায়ুমণ্ডলে উৎপাদন করিয়া থাকে, এই আলোড়ন দ্বারা সূক্ষ্মজগতে এক প্রকার স্পন্দন হইতে থাকে—অর্থাৎ ইহার অণুসকল সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে নড়িতে থাকে, এই আন্দোলন জীবের প্রেতদেহে আঘাত করিয়া তাহার দেহের সেই প্রথম স্তরসম্বন্ধীয় অপেক্ষাকৃত স্থূল কণাসকলকে উড়াইয়া দেয়, এ মতে জীবের আর কুবৃত্তিসকল প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহারা দমিত হইয়া যায়; কারণ—কুবৃত্তিসকল প্রকাশ পাইবার যোগ্য অপেক্ষাকৃত স্থূল কণাসকল আর সেই জীবের কামদেহে নাই, এখন তাঁহার দেহে কামলোকের দ্বিতীয় স্তরের কণাসকল রহিয়াছে। জীবের ঊর্দ্ধগতি বিধানজন্য এই সুন্দর উপায় আমাদের শাস্ত্রে নিবদ্ধ রহিয়াছে। উদ্দেশ্য বুঝিয়া কার্য্য আমরা করি কি?

ভূলোকে মানবগণ চক্ষু সাহায্যে দেখিয়া থাকে, কোন বস্তুর ছায়া চক্ষে পড়িলে স্নায়ুমণ্ডলী সেই জ্ঞান মস্তিষ্কের গোচর করিলে মানব সেই বস্তু দেখিতে পাইল বলা হইয়া থাকে। ভুবর্লোকে যাইলে মানবকে এইরূপ চক্ষু সাহায্যে দেখিতে হয় না। তাঁহার দেহের প্রত্যেক কণাই দর্শনশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং সে হস্ত, পদ, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, মস্তক প্রভৃতি সকল স্থান দিয়াই সর্ব্বত্র সমকালে দেখিতে পায়। এই দৃষ্টিশক্তি-সাহায্যে সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, এমন কি, কোন বস্তুর অন্তরালস্থ থাকিলেও সেই বস্তু বেশ দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে, সকল পদার্থই তাহার নিকট স্বচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, অগাধ সলিলমধ্যে কি আছে, উন্নত প্রস্তরময় পর্ব্বতের গর্ভের জিনিষ প্রভৃতি তাহার দেখিতে বাধা হয় না। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের অনুরূপ ভুবর্লোকের প্রথম স্তরে থাকায় সে তাহা সমস্তই জীবদ্দশায় থাকাকালের মত দেখিতে পাইতে থাকে; কিন্তু

এক্ষণে তাহার দৃষ্টি প্রখর হওয়ায় সে এই সকল পদার্থের দীর্ঘ, প্রস্থ ও উর্দ্ধদেশ ব্যতীত অপর একটি চতুর্থ দিক্ থাকা বুঝিতে পারে। ইংরাজীতে এই দিক্‌কে fourth dimension বলা হইয়াছে। এই দিক্ জ্ঞান হওয়ায় সে দেখে যে, বাক্স প্রভৃতি আবদ্ধ জিনিষগুলি বস্তুতঃ আবদ্ধ নহে, উহার একদিক্ খোলা এবং সেই দিক্ দিয়া দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমাদের ঘরগুলিও বস্তুতঃ ঘেরা নয়, উহাকে চাবীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াও ভূলোকবাসী আমরা ভুবর্লোকবাসীদের নিকট নিরাপদ্ নহি। খোলা ময়দানে চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া প্রবেশ-পথ তালাবদ্ধ করিয়া রাখিলে যেমন কোন বলবান্ লোক বেড়া লাফাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, আমাদের চাবীবদ্ধ পাকা ঘরগুলিকেও তাহারা তদনুরূপ খোলা দেখে।

কেবল দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে কেন, শ্রবণ, স্বাদগ্রহণ, গন্ধ গ্রহণ ও স্পর্শ-জ্ঞান প্রভৃতিরও শক্তি ভুবর্লোকবাসীদের অনেক অধিক বেশী থাকিলেও উহা অনুভব করিবার জন্য কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট কোন ইন্দ্রিয়ের উহাদের প্রয়োজন নাই, শরীরের সর্ব্ব অংশের সকল কণাই এই সকল জ্ঞানলাভে সমর্থ। বস্তুতঃ উক্ত কামদেহে এই সকল ইন্দ্রিয় নাই। এই দেহরক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করিতেও হয় না, এই দেহে তরবারি আঘাত করিলে জলে আঘাত করার মত হয়, মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তিত স্থান পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই দেহে পীড়া প্রভৃতির ভয় নাই ও বেদনা আদি থাকে না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অন্নচিন্তা, শৌচাদি করা, পোষাক-পরিচ্ছদসংগ্রহ, থাকিবার বাটী কিছুরই ভাবনা ভাবিতে হয় না। সেখানে টাকার প্রয়োজন নাই, কাজেই ধনী নির্ধনের প্রভেদও নাই। ভুবর্লোক-বাসীদের ক্ষুধা হয় না, কাজেই খাবার জোগাড় করিতেও হয় না। স্থূল মস্তিষ্ক নাই—তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমেও ক্লান্তি বোধ হয় না, যে কার্য্য

করিতে হইবে, তাহা আরম্ভ করিয়া দুই শত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া করিয়া যাইতে পারে, আহার বিহার জন্য, শৌচাদি জন্য বা নিদ্রাজন্য বিরামের আবশ্যকতা হয় না। শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ আদৌ ভুবর্লোকে নাই। এই সুযোগ পাইয়া অনেকে প্রেমভক্তি প্রভৃতি সৎবৃত্তির আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া এখানে শীঘ্র শীঘ্র অনেক উন্নতি করিয়া থাকেন। কেহ হয় ত জগতে বৈজ্ঞানিক ছিলেন; তিনি এই লোকে যাইয়া দেখেন, পৃথিবীর যে কোন পুস্তকাগার তাঁহার আয়ত্তের ভিতর; তিনি যে কোন পুস্তক একমাত্র ভুবর্লোকের প্রথম স্তরে নামিয়া গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন এবং সর্ব্ব প্রকার পৃথিবীর যন্ত্রাদিও ঐ স্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তিনি নিজ ইচ্ছামত যাহা ইচ্ছা, ব্যবহার করিতে পারেন এবং এক্ষণে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি এত উন্নত হইয়াছে যে, ইহারও সাহায্যে তিনি পৃথিবী অপেক্ষা অধিক সুযোগ বুঝিয়া আপন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন ও অনেক নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বিমলানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ইহাতে এইরূপ লোক এতই মাতোয়ারা হইয়া থাকেন যে, তাঁহারা শীঘ্র আর এই লোক ছাড়িয়া স্বর্গলোকে যাইতে ইচ্ছা করেন না। এই সকল মানব ভুবর্লোকের সপ্তম স্তরে বাস করেন। এইরূপ ইচ্ছাবশতঃ তাঁহাদের ভুবর্লোকে অধিক দিন থাকিতে হয়।

মনোজগতে যে সকল চিন্তার উদয় হয়, সেই চিন্তা স্থূল মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইতে অনেকটা শক্তি ব্যয় হইয়া যায় এবং যখন তাহারা আমাদের স্থূল মস্তিষ্ক-সাহায্যে আমাদের স্থূল দেহের অনুভবের যোগ্য হয়, তখন তাহাদের পূর্ণ বেগ থাকে না, কিন্তু ভুবর্লোকবাসকালে এই স্থূলদেহে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন না থাকায় এই বেগ আর নষ্ট হয় না, যে পরিমাণ বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ হয়। এই জন্য ভুবর্লোকে

চিন্তা ও কামনার তীব্রতা এত বেশী হইয়া থাকে। কাহারও উপর হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি করিলে তাহার তেজ বড়ই বেশী হয় ও নিজেকে অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়। এখানে এই কারণে সুখ-দুঃখ-বোধের তীব্রতা পৃথিবীর সুখদুঃখ-ভোগের সহিত তুলনাই হয় না। কথিত আছে, একজন বৃদ্ধ লোক জুয়া খেলায় ও নানা প্রকার কুকার্য্যে সমুদয় সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। শেষে যখন দেখিল যে, তাহার বন্ধুবর্গ আর তাহার সংসর্গে আসে না, তখন সে আত্মহত্যা করিল। তৎকালে বলিয়াছিল যে, লোকে আমাকে আত্মহত্যায় বাধ্য করিল, আমিও কিন্তু অনেককে মারিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে ছাড়িব না। পরে ৬০ ষাট বৎসরকাল সে মৃত্যুস্থানে থাকিয়া সেই স্থানে যে আসিত, তাহাকেই আত্মহত্যা করিবার জন্য উত্তেজিত করিত, যে হতভাগা তাহার ভাবে আকৃষ্ট হইত, সেই আত্মহত্যা করিত ও পরে মৃত ব্যক্তিকে নিজ অবস্থায় পাইয়া কেমন জব্দ করিয়াছি বলিয়া বিদ্রূপ করিত। এই প্রতিশোধ-বাসনায় বৃদ্ধকে মাতোয়ারা করিয়া ৬০ বৎসর বদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া কত পাপই না করাইল। ভুবর্লোকে মানবের যাতনা বা শোক অনুভব ভূলোকের মানবের শোক বা মানসিক যাতনা অনুভব অপেক্ষা শত গুণে তীব্র হইয়া থাকে। এই ভুবর্লোকে কামনার রাজ্য বেগ যেমনটি হইবে, তেমনটিই প্রকাশ হইবে, স্থূলদেহ নাই, স্থূল মস্তিষ্কে প্রকাশে আপন বলক্ষয় আশঙ্কাও নাই। সেইরূপ হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কুবৃত্তিসকলও জীবকে এখানে কষ্ট দিয়া থাকে। তবে এই কষ্ট-বোধ ইচ্ছাশক্তির বড়ই বশীভূত, ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগে সহজে ইহাদের শান্তি করা যায়। ভূলোকে অনেকে ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগে শারীরিক যাতনাদির শান্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে, যাতনা শারীরিক অপেক্ষা মানসিক হইলে তাহার শান্তি করিতে তাঁহার তত বেশী চেষ্টা করিতে হয় না। কিন্তু ভূলোকে এই কার্য্য শিক্ষাসাপেক্ষ

এবং অতি অল্প লোকেই এই কার্য্যে পারগ আছেন। কিন্তু ভুবর্লোকে সকলেই ভুবর্লোকবাসীদের কুবৃত্তিজনিত কষ্টাদির উপশম করিতে পারে না। কেবল মাত্র সামান্য শিক্ষা ও কয়েকমাস মাত্র অভ্যাসের প্রয়োজন। তথায় দৈহিক যাতনা-বোধ আদৌ নাই।

বাহ্য আঘাত দ্বারা ভুবর্লোকবাসীদের দেহের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলেও কেবলমাত্র অনিষ্ট ইচ্ছা করিয়া অন্যের অনিষ্ট করিতে পারা যায়। তবে ইহা ধীরে ধীরে করিতে হয় ও ইহা হইতে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়।

যাতায়াত সম্বন্ধে দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক অসুবিধার নাশ হয়। এই দেহের পরমাণুসকল আমাদের ইচ্ছার এতই অধীন হইয়া পড়ে যে, কোথাও যাইবার ইচ্ছা করিলেই শরীরের সেই স্থানে যাইবার গতি আরম্ভ হয় ও অগ্রসর হইতে থাকে এবং এই গতি এত দ্রুত যে, কয়েক মিনিটে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাওয়া যায়। তবে আবার পথিমধ্যে থামিয়াও থাকা যায়। জীব স্বর্গলোকে যাইলে তাহার কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছামাত্রই সেই স্থানে অবস্থিতির জ্ঞান হয়, তাহাকে সময় নষ্ট করিয়া যাইতে হয় না ও তাহার দেহের কোন গতিই হয় না। ভুবর্লোকে কিন্তু যথার্থই মধ্যবর্ত্তী স্থানসকল উত্তীর্ণ হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হয়।

আমরা এইরূপে দেখিলাম যে, ভূলোকের অন্নময় কোষ পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্মবোধ, পীড়া বা ক্লান্তিবোধ সব দূর হইয়া যায়, অর্থাভাব ইত্যাদিরকোন চিন্তা থাকে না, খাইতে, পরিতে ও শুইতে হয় না, তখন যাতনা ও কষ্টবোধ আর কিসের হইতে পারে? আত্মীয়-স্বজনগণকে নিয়ত কাছেই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন চিন্তাই বা কিসের? আত্মীয়গণ জাগ্রত থাকার সময় কথা কহিতে পারে না.

বটে, তবে নিদ্রিতাবস্থায় উহাদের সহিত ভুবর্লোকবাসীদের কথা কহিতে কোন বাধাই থাকে না। তবে ভাবনা ও শোক তাহার কিসের হইতে পারে? বরং বহুকাল পূর্ব্বে পৃথিবী হইতে যে সকল প্রিয়জন চলিয়া গিয়াছিল, তাহাদেরও দেখিতে পায়, এর চেয়ে আর আনন্দ তাহার কি হইতে পারে?

এখানে বাসনার রাজ্য; যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই প্রায় হইয়া থাকে। যিনি সুবিস্তৃত-সুশোভিত হর্ম্ম্যমধ্যে থাকিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেইরূপই থাকেন, পোষাক-পরিচ্ছদের আবশ্যকতা না থাকিলেও যিনি রাজপোষাকে আবৃত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি আপনাকে সেইরূপেই দেখিয়া থাকেন। যিনি যেরূপ প্রবৃত্তির লোক, তাঁহার নিকট সেইরূপ প্রবৃত্তির লোক-সকল মিলিত হইয়া থাকে, সকলে একপ্রবৃত্তির লোক জমিয়া একত্রে থাকিয়া তাঁহারা কতই আনন্দে থাকেন! এইরূপ ভাবে যাঁহারা সঙ্গীতবাদ্যপ্রিয়, তাঁহারা অনেকে একস্থলে মিলিয়াছেন ও ভুবর্লোকের সঙ্গীত-বাদ্য শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহাদের এ মজলিসের বিরাম নাই, ক্ষুধাবশতঃ খাইতে উঠিতেও হয় না, ইহার উপর পৃথিবীর গীত-বাদ্য অপেক্ষা সেই সূক্ষ্মলোকের গীত-বাদ্য যে কত বেশী মনোহর, তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যিনি ভক্ত, তিনি আপন ইষ্টদেবতার অন্য বহু ভক্ত সহ মিলিত হইয়াছেন ও তাঁহার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি তাঁহাদের সম্মুখে কাম-লোকের জ্যোতির্ম্ময় ও পৃথিবীর বর্ণাদি অপেক্ষা বহুগুণে সুন্দর বর্ণে ভক্তদের মন-প্রাণ গলাইয়া দিয়া চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন। ভক্তগণ আর পৃথিবীবাসকালের মত "হারাই হারাই সদা ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে" এইরূপ ভাবে ইষ্টকে হারাইবার ভয়ে ভীত হয়েন না। সকলে মিলিয়া ইষ্টদেবের দর্শন করিতে করিতে আনন্দে এই কামলোকের ষষ্ঠ স্তরে বিরাজ করেন। তাঁহাদের অন্যত্র গমনের আর ইচ্ছা হয় না। এই ভুবর্লোকের বর্ণাদি এতই উজ্জ্বল

যে, আমাদের এখানে বর্ণাদির সহিত তুলনাই হয় না, যেন সকল বর্ণই অগ্নিময় বলিলে অনেকটা ধারণা করা যায় মাত্র, সেইরূপ উহার মন্দির আদি গাছপালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও আমরা কল্পনা করিতে পারি না। এখানে মানবকে বহুকাল বাস করিতে হয়। অনেকে আবার অল্পকাল অর্থাৎ এক বৎসরের কম সময়ও থাকিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যায়। মানব এই স্থান হইতে স্বর্গলোকে যাইবার কালে তাহার কামদেহ পড়িয়া থাকে; সাপের খোলস মত এই দেহ উড়িয়া বেড়ায়, ভূলোকে যেমন মৃতদেহ নষ্ট করিবার প্রথা আছে, এখানে সেরূপ পরিত্যক্ত দেহ নষ্ট করিবার কেহ নাই। ঐ সকল পরিত্যক্ত দেহমধ্যে অনেক অপদেবতা elemental nature spirit প্রভৃতি ভুবর্লোকবাসী নিকৃষ্ট জীবসকল প্রবেশ করিয়া ভুবর্লোকবাসী মানব সাজিয়া নবাগত ভুবর্লোকবাসী মানবকে প্রতারিত করিয়া থাকে। এই দেহে ইহারা অনেক সময়ে ভূলোকের মানবের গোচরে আসিয়াও থাকে। ভুবর্লোকে যাইলে মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির কিছুই ইতরবিশেষ হয় না, তবে ভুবর্লোকের উন্নত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সাহায্যে নূতন অনেক জ্ঞানলাভ করেন মাত্র, অবশ্য এই জ্ঞান ভুবর্লোকের দৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে মাত্র বেশী হয়। ভুবর্লোক হইতে কেহ ভূলোকে জন্ম গ্রহণ করিতে আসে না, এ কারণে অনেক ভুবর্লোকবাসী মানব মাধ্যমিকের শরীরে আবির্ভূত হইয়া পুনর্জন্ম নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের কথা আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ভুবর্লোক হইতে স্বর্গলোকে যাইয়া তবে পুনরায় জীবকে ভূলোকে ফিরিতে হয়, এ সংবাদ ভুবর্লোকে তাহাদের পাইবার সুযোগ আমাদের অপেক্ষা কিছুই অধিক নাই।

জীব ক্রমাগত ভূ, ভুব ও স্বর্গ ও এই তিন লোকে যাতায়াত করিতেছে। ভূলোক ত্যাগের পর ভুবর্লোক ও স্বর্গলোকে স্থিতির কাল ঊর্দ্ধপক্ষে

১৫০০ শত ও নিম্নপক্ষে ৫ বৎসর মাত্র হইতেছে ; এ কথা সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, জীবকে ভূলোকে স্ত্রী ও পুরুষ দুই অবস্থাতেই আসিতে হয়। উপরি উপরি তিন জন্মের কম এবং সাত জন্মের বেশী কাহাকেও কেবল স্ত্রী-আকারে বা কেবল পুরুষ আকারে আসিতে হয় না। অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক আছে, তাহাকে তিন জন্ম স্ত্রী হইয়া জন্মাইতেই হইবে ও পরে পুরুষ হইয়া জন্মাইতে পারে, কিন্তু সাত জন্মে যদ্যপি সে স্ত্রী হইয়া জন্মায়, তবে তাহাকে পরজন্মে পুরুষ হইতেই হইবে।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নরকোৎসব।

চতুর্থ উল্লাস।

বীজ।

এইবার যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া তোমরা শিহরিয়া উঠিবে। তা' উঠ ; কিন্তু সাবধান হইতে পারিবে। যে অপরাধে আমি অপরাধী,—সে অপরাধ যে, তোমাদের মধ্যে কাহারও নাই, তাহা মনে করিও না। সময়ে সাবধান হইতে পারিলে—স্মৃতির দাগ মুছিয়া ফেলিতে পারিলে, আর আগুনের হল্‌কা বুকে লইয়া ছুটাছুটি করিতে হইবে না। বড় ভয়ানক ব্যাপার! তোমাদের ধারণার অতীত—কল্পনার বহির্ভূত কাণ্ড!

হইতে পারে, আমি রমণীর রূপে মজিয়াছিলাম, তুমি না হয় টাকায় ভুলিয়া আছ, তোমার বন্ধু না হয় ভোজন-দ্রব্যে ভুলিয়া আছেন,—আর ঐ নবীন কবি নয় প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া আপন ভুলিয়া অবস্থান করিতেছেন,—কিন্তু সবই মজা;—মজার মজা অবশেষে। তবে কি তারতম্য নাই? তা' আছে বৈ কি। যাক্, আমার কথাগুলা বলিয়া ফেলি।

তারপরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার খুঁটি-নাটি আর নাই বলিলাম। সেই শারদোৎফুল্ল সান্ধ্য-মল্লিকার শোভা-সুগন্ধ, সেই নির্ম্মল চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনী, সেই কোকিল-বধূর ঝঙ্কৃতিময়ী বিরহ-বেদনা-জড়ান বেহাগ-রাগিণীর শেষ রেশ, সেই ফুল-পরিমল-মাখা ধীর চালিত মলয়াশ্বাস, সেই বাঞ্ছিত-অভিসার-গামিনী কলনাদিনী নদীর উচ্ছ্বাস, সেই কুসুমহাসিনী মনোমোহিনী মন্থরগামিনী মদনোন্মাদকারিণী কামিনীর হাবভাব—যাহা যাহা সাহিত্যের হিসাবে প্রেমের সম্পদ্—প্রণয়ীর অত্যাবশ্যকীয় অবলম্বন, তাহা সকলই ছিল। সাবান, এসেন্স, আতর, গোলাপ, নভেল, নাটক, প্রেমের চিঠির গোপন চটক,—প্রণয়িজন-বাঞ্ছিত এ সকলেরও অভাব কিছুরই ছিল না,—গোপন-মিলনের রোমাঞ্চকর কাহিনী, দিবানিশি উদাস-উন্মাদ পথপানে চাহনি—তাহারও ত্রুটি ছিল না। তবে সে সকল আর একে একে গুছাইয়া মনে করিয়া বলিতে পারিতেছি না। এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ যে, সন্ধ্যার সহিত আমার পাপ-মিলন হইয়াছিল;—এখন সেই পাপমিলনের ফলাফল যাহা, তাহাই শুনিয়া যাও।

বিবাহের পরে দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার শ্বশুর-বাড়ীতে—সন্ধ্যার শ্বশুরবাড়ীতে সন্ধ্যার সহিত আমার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। যদিও সন্ধ্যার গুণে আমাদের উভয়ের নিভৃত আলাপে প্রথম প্রথম কেহ বাধা প্রদান করে নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যেন সকলেই সন্দেহ

করিতে লাগিল। পাপ বুঝি এমনি করিয়াই প্রকাশ পায়! তারপরে সন্দেহ গাঢ় হইল। একদিন আমার শ্বশুরবাড়ীতে আমার স্ত্রী আমাকে স্পষ্টই বলিল,—"তুমি দিদির সঙ্গে অমন করিয়া কথা কহ, তাহাতে অনেক জনে অনেক কথা বলে।"

আমি মুখে খুব ধূমধাম করিলাম—কথা না কহিলে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, এমন কি, এ বাড়ীতে নয় আর নাই আসিব—ইত্যাদি নানাবিধ বাক্যের অবতারণায় বীররসের অভিনয় করিলাম, কিন্তু কাজে যা, তাই রহিল।

শ্বশুরবাড়ীর ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না বটে, কিন্তু সন্ধ্যার শ্বশুরবাড়ীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল,—সেখানে আমার যাওয়ার পথ রুদ্ধ হইল, এবং সন্ধ্যাকে তাহার স্বামী লইয়া গেল, অনেক দিন আর পিত্রালয়ে পাঠাইল না। এই প্রকারে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

এত দীর্ঘ বিরহ আমার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাও স্বামীর কারাগৃহে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতে লাগিল। প্রতিদিনই সে তাহার মনোবেদনা ও অসীম যন্ত্রণা জানাইয়া ডাকে পত্র দিয়া আমাকে তাহার অবস্থা জানাইত। আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম। তারপরে সন্ধ্যাকে পাইবার উপায় অনুসন্ধানে মনঃসংযোগ করিলাম,—জীবন পর্য্যন্ত পণ করিলাম।

আরও একমাস কাটিয়া গেল। সব 'তোড়যোড়' ঠিক করিতে এই মাসটা অতিবাহিত হইয়াছিল,—সেই এক মাসই আমার পক্ষে অতি সুদীর্ঘ কাল বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। দুঃখের সময় দীর্ঘ হয়, সুখের সময় কম হয়; এটুকু খুব কঠিন দর্শনের কথা না হইলেও ভাবিবার জিনিষ। যেখানে পূর্ণ সুখ, সেখানে কালব্যাপ্তির অধিকার নাই।

যাহা হউক, হঠাৎ এক দিন অতি প্রত্যুষে পুলিসের রাঙ্গাপাগ্‌ড়ীতে

দে-চৌধুরীদের বাড়ী পূর্ণ হইয়া গেল। পাড়ার ভদ্রলোকেরা প্রায়ই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—আর রাজপথগামী জনসঙ্ঘের বাহিরের ভিড়ে পাশ কাটায় কাহার সাধ্য! বাড়ীর মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। কে বা কাহারা রাত্রিকালে সন্ধ্যার স্বামী কার্ত্তিক বাবুকে অতি নির্দ্দয়ভাবে নিহত করিয়া চলিয়া গিয়াছে!

একটা বিস্তৃত ও সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে দে মহাশয়ের ছিন্নকণ্ঠ রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া ছিল,—পুলিসের ইনস্‌পেক্টর মহাশয় চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন। অনেক দেখিয়া শুনিয়া—অনেক রকম এজেহার আদি লইয়া শবদেহ করোণার আফিসে প্রেরণ করিয়া, তাঁহারাও চলিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল, তাঁহাদের তদন্ত শেষ হইল।

করোণারের পরীক্ষায় প্রকাশ পাইল, কে বা কাহারা তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা শবের কণ্ঠদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, এবং তাহাতে মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই অভিনব আবিষ্কারে পুলিসের তদন্তের কোন আনুকূল্য হইল কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন; কিন্তু কয়েক দিন আর কাহারও কোন উচ্য-বাচ্য শোনা গেল না। এ দিকে কার্ত্তিক বাবুর আদ্যশ্রাদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

ধনী কার্ত্তিকবাবুর শ্রাদ্ধ বেশ সমারোহের সহিতই সম্পন্ন হইবে। আমিই সে কর্ম্মের কর্ত্তা—আমিই সে উদ্যোগপর্ব্বের অধিনায়ক,—যেহেতু কার্ত্তিকবাবুর স্ত্রী সন্ধ্যা আমার শ্যালিকা। তিনিই কার্ত্তিকবাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। যদিও কার্ত্তিকবাবুর ভগিনী-ভাগিনেয় ও নিকট আত্মীয় অনেক ছিল, তথাপি সন্ধ্যাই তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র স্বত্বাধিকারিণী হইয়াছিল। কারণ, তিনি বৃদ্ধ বলিয়া বিবাহের পূর্ব্বে সন্ধ্যার নামে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র লিখিয়া দিয়া তবে পাণিগ্রহণের

অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার যখন সম্পত্তি, তখন আমার কর্ত্তৃত্ব; ইহা বুঝিতে নিশ্চয়ই তোমাদের বাকী রহিল না!

শ্রাদ্ধের পরদিন—তখনও নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের গোলযোগ শেষ হয় নাই,—কেবল উঠিয়া লাগিয়াছে,—সকালে আমি চক্রাকারে ঘুরিয়া সকল কাজের বন্দোবস্ত করিয়া ফিরিতেছি; এমন সময় অকালজলদোদয়বৎ, গৃহ-সুপ্ত-মানব-পার্শ্বে জ্বলন্ত অগ্নিবৎ কয়েক জন পুলিসের লোক আসিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশ-পত্র দেখাইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিল। বলা বাহুল্য, তাহারা আমাকেই কার্ত্তিকবাবুর হত্যাপরাধী বিবেচনা করিয়াছিল। বাড়ীতে হৈ চৈ উঠিয়া পড়িল। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, আমার স্ত্রী, আমার পিতামাতা, আমার আত্মীয়স্বজন সকলেই সে দিন সে বাড়ীতে নিমন্ত্রণোপলক্ষে আগমন করিয়াছিলেন—হঠাৎ আমার এই বিপজ্জে তাঁহারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যাও "সুন্দর প'ড়েছে ধরা, শুনে বিত্মা পড়ে ধরা, ধারা বহে যুগলনয়নে"—হইল। আত্মীয়স্বজন, কুটুম্ব-কুটুম্বিনী সকলেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। পুলিস আমাকে যথারীতি ধৃত করিয়া লইয়া গিয়া হাজতে পুরিল।

প্রায় পক্ষকাল দিবস হাজত-সুখে অতিবাহিত করাইয়া একদিন আমাকে বিচারকের সম্মুখে বিচারার্থ হাজির করিয়া দিল। আমি দেখিলাম, আমার পিতা সাশ্রুনয়নে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আরও চারি পাঁচ জন আত্মীয় আছেন এবং বিখ্যাত একজন ব্যারিষ্টার ও দুই জন উকীল আমার পক্ষসমর্থনার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু আমার শ্বশুর আসেন নাই, কেন আসেন নাই, বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না।

সরকারপক্ষীয় উকীল বিচারক মহোদয়কে মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—"কার্ত্তিকচন্দ্র দে-চৌধুরী ধনশালী ব্যক্তি

ছিলেন। তিনি প্রায় ষাইট বৎসর বয়সে সন্ধ্যা নাম্নী একটি যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন,—ইহা তাঁহার তৃতীয় পক্ষের বিবাহ। পূর্ব্বের দুই স্ত্রী পরস্পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। বৃদ্ধ বলিয়া তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর পিতা বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার সম্পত্তি কন্যার নামে দানপত্র লেখাইয়া লইয়া তবে বিবাহ দেন। মেয়েটি ক্রমে যৌবনের মধ্যভাগে উপনীত হয়। এরূপ অবস্থায় সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে—তাহাই ঘটিয়াছিল,—মেয়েটি চরিত্র বজায় রাখিতে পারে নাই। তাহার ছোট ভগিনীপতি—বর্ত্তমান মোকদ্দমার আসামী মধুসূদন বাবুকে আত্মদান করে। ক্রমে কথা সকলের কানে উঠে. তদবধি কার্ত্তিকবাবু স্ত্রীকে বাপের বাড়ী যাইতে দেন না, মধুসূদনকেও তাঁহার বাড়ীতে আসিতে দেন নাই। ইহার ফলে যুবক-যুবতীর ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, এবং সেই ক্রোধ-বহ্নিতেই বৃদ্ধ কার্ত্তিক-পতঙ্গ বিদগ্ধ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সাক্ষী-সাবুদ প্রদর্শন করিব এবং মধুসূদন বাবুর প্রদত্ত কার্ত্তিক বাবুর স্ত্রীর নামীয় এমন কয়েকখানি পত্র আদালতকে দেখাইব, যদ্দ্বারা আসামীর অপরাধ সপ্রমাণ হইতে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

বিচারক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া, সরকারী উকীলের দিকে চাহিলেন। উকীল মহাশয় পেস্কারবাবুর নিকট হইতে পুলিসরিপোর্টের ফাইল চাহিয়া লইয়া তন্মধ্য হইতে তিনখানা পত্র বাহির করতঃ এক একখানা করিয়া পাঠ করিলেন। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

প্রথম পত্র—

"সন্ধ্যা! তোমার পত্র পাইয়াছি;—তুমি কষ্ট পাইতেছ,—ঠাকুরদার অত্যাচারে—ঠাকুরদার অবরোধ-যন্ত্রণায় ব্যথিত হইতেছ,—কিন্তু কি করিব, হাত নাই। আমার মন ভাল নাই,—এ জগতে তুমিই আমার হৃদয়ের ধ্রুবতারা! তোমার বিরহ আর সহ্য করিতে পারি না। মধু—"

দ্বিতীয় পত্র—

"প্রাণের সন্ধ্যা ;—এমন কাজ করিয়ো না। তুমি আত্মহত্যা করিলে আমাকেও সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। শীঘ্রই যাহাতে সকল জ্বালার অবসান হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিতেছি।

মঃ—"

তৃতীয় পত্র—

"জীবন-সন্ধ্যা ;—বৃথা প্রলোভনে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি না। আমার হৃদয় যদি দেখাইতে পারিতাম, তবে জানিতে পারিতে, বুঝিতে পারিতে, আমি কি অবস্থায় দিন কাটাইতেছি। তোমার বিরহে আমি একরূপ উন্মাদ হইয়াছি। উন্মাদের কাজের পরিচয় শীঘ্রই পাইবে।

তোমার—মধু।"

পত্রগুলি শ্রবণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—"অপরিণামদর্শী যুবক-যুবতী অপবিত্র সম্মিলনে বাধা প্রাপ্ত হইলে যেমন ভাবে পত্র লেখে, ইহাতে তাহার অধিক আর কি লিখিত হইয়াছে? দুই এক স্থলে এই হত্যাকাণ্ডের আভাস বলিয়া ধরিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহার অপরদিক্‌ও ভাবিতে পারা যায়। হয় ত মেয়েটাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার পরামর্শ করিয়াছিল, নয় ত কোন নিরাপদ্ গুপ্ত স্থানে দেখা-সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিবে বলিয়া আশা দিয়া পত্র লিখিয়াছিল। হত্যাই যে করিবে, উহাতে এমন বুঝিবার বিশেষত্ব কি আছে?"

উকীল। না, তাহা নাই বটে, তবে এই পত্রগুলিতে যে আভাস পাওয়া যাইতেছে, সাক্ষিগণের বাচনিক প্রমাণে তাহা পরিস্ফুট হইবে।

আমাদের ব্যারিষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন,—ঐ পত্র

তিনখানি সাক্ষী বা দলিলরূপে নথীর সহিত দাখিল থাকিতে পারে না। কারণ, উহা যে আসামী মধুবাবুর লেখা, অথবা কার্ত্তিকবাবুর স্ত্রীর নিকটে যে উহা পাওয়া গিয়াছে,—পুলিস-রিপোর্টে তাহা কিছুই ব্যক্ত নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মনঃসংযোগসহকারে পুলিস-রিপোর্টখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন, তারপরে সরকারপক্ষীয় উকীলের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পত্র তিনখানা কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল ?"

উকীলবাবু একটু এদিক্ ওদিক্ করিতে মোকদ্দমাচালক একজন পুলিসের লোক তাঁহার হাতে একখানা কাগজ দিল, তিনি তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন,—"কার্ত্তিকবাবুর বাড়ীর একটি দাসীর নিকটে।"

আমাদের ব্যারিষ্টার বলিলেন,—"কাহারও অনুরোধ বা অপর কারণে একটা দাসী যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে না, কে বলিল ? কার্ত্তিকবাবুর অগাধ সম্পত্তি আছে; তাঁহার স্ত্রীই সে সকলের অধিকারিণী—আর এই যুবক তাহার ভগিনীপতি—ইহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে অনেকের লুণ্ঠন-বৃত্তির তুষ্টি সাধন হইবে না, ইত্যাদি ভাবিয়া জ্ঞাতিগণ অথবা যাহারা কর্ত্তিকবাবুর হন্তা, সে বা তাহারা যে পুলিসের চক্ষুতে ধূলিদান করিতে ঐ সকল নবপন্থার সৃষ্টি করিতে পারে না, এমনই বা কে ভাবিতে পারে ?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথমেই দাসীকে সাক্ষ্য দিবার জন্য তলব করিলেন।

আমি অধিক বলিতে পারিতেছি না—বড় কষ্ট হইতেছে। ফলকথা, দাসী সাক্ষ্য দিল, সন্ধ্যা সাক্ষ্য দিল, আরও চারি পাঁচ জন লোক সাক্ষ্য দিল। দাসী বলিল—আমি ঘর পাইট করিবার সময় পত্রগুলি কুড়াইয়া পাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম; মধুসূদন বাবুতে আর আমাদের মনিব ঠাকুরাণীতে অবৈধ সম্বন্ধ কিছু আছে কি না, জানি না—এমন কথা কোন দিন শুনিও নাই। হাঁ, মধ্যে মধ্যে উভয়কে একত্রে কথোপকথন

করিতে দেখিয়াছি। সন্ধ্যা বলিল—আসামী আমার ভগিনীপতি। আমাদের মধ্যে কোন দূষ্য ভাব নাই। ছোট ভগিনীপতি, কাজেই ভালবাসে। আমাদের সমাজে ভগিনীপতির সহিত অন্যের অসাক্ষাতে হাসি-তামাসা চলে,—আমার স্বামী তাহাতেই ঐরূপ মিথ্যা সন্দেহ করিয়া মধ্যে মধ্যে বকিতেন। কে খুন করিয়াছে, জানি না। কাহারও উপর আমার সন্দেহ করিবার কারণ বিদ্যমান নাই। অপর যাহারা সাক্ষ্য দিল, তাহারা পুলিসের সাক্ষাতে যেমন বলিয়াছিল, তেমন বলিল না—অনেক কথা পরিবর্ত্তন করিয়া বলিল। কে জানে, ইহারা কেন সে সকল কথা হজম করিয়া নূতন কথার অবতারণা করিল।

তারপরে উভয় পক্ষের উকীল-কৌন্সুলিতে বাদপ্রতিবাদ ও বক্তৃতা হইল। সকল বিষয়—সকল কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। আমি অব্যাহতি পাইলাম।

পঞ্চম উল্লাস।

অঙ্কুর।

আমার অব্যাহতিলাভে আমার আত্মীয়-স্বজন, আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই আনন্দিত হইলেন। প্রতিবাসিগণ কিন্তু দুই চারি কথা বলিতে ছাড়িল না। রণবিজয়ী বীরের ন্যায় আমি গর্ব্বিতপদক্ষেপে সে সকল অগ্রাহ্য করিয়া চলিলাম।

কয় দিন আমি বাড়ী গেলাম না। সন্ধ্যার আলয়েই অতিবাহিত করিয়া দিলাম। সপ্তাহখানেক পরে যেদিন বাড়ী গেলাম, সে দিন উষার

সহিত সাক্ষাৎ হইল। কচি কলার পাতে আগুনের সেক দিলে তাহা যেমন ম্লান—বিবর্ণ হইয়া উঠে, হেমন্তের সান্ধ্য নলিনী যেমন বিশীর্ণ—হতশ্রী হইয়া যায়, উষাও তেমনি হইয়া গিয়াছে।

আমার দর্শন পাইয়া কি একটা কথা বলিতে গিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। কথা আর বলা হইল না। নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমি ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাঁদ কেন, কি হইয়াছে, বলই না ছাই!"

রোদন-লোহিত নয়ন দুইটী আমার মুখের উপর সংস্থাপন করিয়া কাতর-কম্পিতকণ্ঠে উষা বলিল,—"মা দুর্গা যে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, ইহাই আমার পূর্ব্বজন্মের সৌভাগ্য! তুমি আমার একটি কথা রখিবে?"

তাহার তখনকার অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই আমার বড় মায়া হইল। সেই সদা চল চল—সদা সচঞ্চল নয়ন দুইটী যেন স্থির হইয়া গিয়াছে। রক্ত-রাগ-রঞ্জিত অধরে কালীর দাগ পড়িয়াছে। ফুল্ল-রক্ত-কুসুম-কান্তি গণ্ডে মলিনতা পড়িয়াছে! এই কয় দিনে এত! আমি উষাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার কি কথা উষা?"

জলভরা পদ্ম প্রচাপিত হইলে যেমন তাহার সঞ্চিত জলটুকু ধারাকারে গড়াইয়া পড়ে, উষার পদ্মচক্ষু হইতে তেমনই জলধারা গড়াইয়া পড়িল। সে গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"যা'তে লোকে নিন্দা করে,তা' আর করিও না।"

আমি। উষা, তুমি ক্ষুদ্র বালিকা;—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষিত একজন যুবককে হিতাহিত—সুনীতি-দুনীতি বিষয়ে উপদেশ দিবার অধিকার তোমার নাই।

উষা সে কথার কোন উত্তর করিল না। উদাস স্থির তাম্র নয়নের করুণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হায়! তখন কি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, ক্ষুদ্র বালিকার মধ্যেও অনন্ত জ্ঞান—বিরাট চৈতন্ত অধিষ্ঠিত! বাহিরের আচরণে আত্মা যত বিজড়িত, প্রকৃত জ্ঞান সেখানে তত অল্প। আমি মুগ্ধ—বাহিরের রূপ—কাম-কলুষে আত্ম-বিস্মৃত, ভাবি নাই, সেই ক্ষুদ্র বালিকার যতটুকু জ্ঞানের স্ফূর্তি আছে, আমার ততটুকুও নাই। ছিল;—আমি নিজে বাহিরের বাঁধনে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছি।

উষার করুণ চাহনিতে প্রাণ যেন একটু বিচলিত হইল। মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার কি কথা বল ?"

উষা আমার স্কন্ধোপরি তাহার অনিন্দ্য-সুন্দর কচি মুখখানি গুঁজিয়া আবেগকম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"আমি ছোট বলিয়া, মূর্খ বলিয়া তুমি যদি আমার কথা শুনিবে না, তবে বলিয়া কি করিব ?"

আমি। বলই না।

উষা। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আর দিদির বাড়ী যেও না।

আমি। কেন,—তোমার দিদি কি ?

উষা। কি, তা' আমি জানি না। কিন্তু তুমি সেখানে কেন যাবে ?

আমি। আমি তাহার কুটুম্ব—ভগিনীপতি ; কেনই বা যাইব না ?

উষা। পাঁচ জনে যখন পাঁচ কথা বলিতেছে, তখন না যাওয়াই ভাল।

আমি। লোকে যদি অন্যায় করিয়া বলে।

উষা। লোকে যা'তে নিন্দা করে, তা করিতে নাই।

আমি। মিথ্যা নিন্দার কোন মূল্য নাই। মিথ্যা সন্দেহ করিয়া পুলিস আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দণ্ড দিতে পারিল কি ?

উষা ধাঁ করিয়া আমার স্কন্ধ হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া একটু সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। দর্পণে হাই দিলে তাহা যেমন ঘামিয়া উঠে, উষা তেমনই

ঘামিয়া উঠিল। ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে আর্ত্তস্বরে কহিল,—"সাক্ষীর কথায়, আইনের চক্রে যে বিচার, তাহা সত্যও মিথ্যা হয়, মিথ্যাও সত্য হইয়া যায়; কিন্তু যে নয়ন জগৎ যুড়িয়া রহিয়াছে, যে কর্ণ বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে— সেখানে সত্য মিথ্যা হয় না, মিথ্যাও সত্য হয় না। সেখানেও বিচার আছে।"

ক্ষুদ্রতম বিষাক্ত অস্ত্রে প্রাণের ত্বক্ ভেদ করিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। বসিয়া পড়িলাম। কেন জানি না, আমার এমন অবস্থা হইল। আইনে অব্যাহতিলাভ করিয়া আসিয়াছি,—তবে আর ভাবনা কি? একটি ক্ষুদ্র বালিকার কথায়—কথাটা ত' কিছুই নয়,—তবে এমন হইল কেন? ভগবানের বিচার? সে হয় ত মিথ্যা কথা। ভগবান্ কি আছেন? যদি থাকেন, পৃথিবীশুদ্ধ লোকের এত খুঁটি-নাটির বিচার করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তথাপি কিন্তু প্রাণের কম্পন বিদূরিত হইল না। মনকে বুঝাইতে গিয়াও পারিলাম না। উষার উপরে বড় রাগ হইল,—তখনই সেখান হইতে চলিয়া গেলাম।

ষষ্ঠ উল্লাস।

বায়ু।

সন্ধ্যার সঙ্গে তারপর হইতে আর বড় বিচ্ছেদ হয় নাই। সন্ধ্যার বাড়ীতেই উভয়ে বাস করিতে লাগিলাম। কার্ত্তিক ঠাকুরদার গাড়ী ঘুড়ীতে আমিই আরোহণ করিতাম, কার্ত্তিক ঠাকুরদার দাসদাসী আমারই

আজ্ঞা বহন করিত, কার্ত্তিক ঠাকুরদার বিলাস-ভাণ্ডার আমারই বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত হইতে লাগিল,—এক কথায় কার্ত্তিক ঠাকুরদার যাহা কিছু ছিল, তৎসমস্তই তখন আমার হইয়াছিল, হয় ত তোমরা আমরা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছ না, কিন্তু সত্যই সব তখন আমার। আমি সন্ধ্যাকে দিয়া সে সকল আমার নামে লেখাইয়া লইয়াছিলাম। মোহমুগ্ধা পাপকার্য্যনিরতা একটী যুবতীকে ভুলাইয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তির পক্ষে এত সুকঠিন কার্য্য নহে। সন্ধ্যা তখন আমার সম্পূর্ণ পদানতা,—তাহার রূপ-যৌবন, বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই আমার চরণে উপঢৌকন দিয়া আমারই মুখ চাহিয়া সে দিন কাটাইতে লাগিল। কার্ত্তিক ঠাকুরদার আত্মীয়স্বজন: ও পুরাতন দাস-দাসী প্রভৃতি প্রায়ই সে বাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। তবে যাহারা আমার ও সন্ধ্যার নিত্য তোষামোদ করিতে পারিত, তাহারাই সেখানে স্থান পাইয়াছিল।

এ সকল বাহিরের সংবাদ তোমাদিগকে শুনাইলাম। কিন্তু মানুষ কি কেবল বাহির লইয়াই নিশ্চিত থাকিতে পারে? বাহিরে ত সব মানুষই আপাতদৃষ্টিতে সমান—কিন্তু অন্তররাজ্যে কাহার কি কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়? আমি বিবেচনা করি, বাহিরের সহিত মানুষের সম্বন্ধ যাহা, তাহা অন্তরদেশ লইয়া। আমরা নদীর উপরে তরঙ্গ দেখি, কিন্তু সে তরঙ্গ বাস্তবিক উপরের নহে,—তরঙ্গ আগে নদীর তল-দেশেই উঠিয়া থাকে। মানুষেরও আগে অন্তর হইতে তরঙ্গ উঠে—তবে তাহা বাহিরে আসে। আমার তখনকার অন্তর-তরঙ্গের ব্যাপারটা একটু শুনিয়া রাখ।

তোমরা বোধ হয়, স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছ যে, কার্ত্তিক ঠাকুরদার স্থূল-দেহ হইতে তাঁহার আত্মার বা সূক্ষ্মদেহের বিয়োগসাধন আমার আয়োজনেই

সম্পাদিত হইয়াছিল। আইনে আমাকে বাঁধিতে পারে নাই, সমাজে আমাকে ধরিতে পারে নাই, কিন্তু উষার সেই 'ছোট কথাটি' যেন ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বর্ণে বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। একটি ক্ষুদ্র বীজ বপন কর, দুই এক দিনেই তাহা হইতে একটা প্রকাণ্ড গাছের চারা বাহির হইবে, ক্রমে তাহাই শত কাণ্ড-প্রকাণ্ডবিশিষ্ট মহীরুহ হইয়া দিগন্ত যুড়িয়া বসিবে। বীজমধ্যে গাছটি অব্যক্ত অবস্থাতেই অবস্থান করিতেছিল, —সময়ে প্রকাশ পাইল, এইমাত্র। নরহত্যার মহাপাতক—কার্ত্তিক-ঠাকুরদার ছিন্নকণ্ঠের শোণিত-বহ্নি আমার প্রাণ স্পন্দনের প্রতি কম্পনে অব্যক্ত অবস্থায় জড়াইয়া গিয়াছিল;—আমি বড় অধিক শান্তিতে বাস করিতেছিলাম না। বাহিরের লোকে ভাবিতেছিল, বড় পড়তা পড়িয়াছে —পরের অগাধ ধনে ধনী হইয়া বড় মজায় আছি। কিন্তু তা' নয়। আমার প্রাণের মধ্যে কেমন এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব জ্বালা উপস্থিত হইত—একেলা থাকিলেই হৃদয়মধ্যে অনুতাপের বৃশ্চিক-দংশন আরম্ভ হইত। কেন হইত, বলিতে পারি না। সে জ্বালা—সে বুকদাহ দূর করিবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু কিছুতেই সাফল্য লাভে সক্ষম হইতাম না। তখন এক উপায় অবলম্বন করিলাম,—সুরা সেবন আরম্ভ করিলাম। অর্থের অভাব ছিল না—ক্রমে আমি খুব একজন খ্যাতনামা সুরাপায়ী হইয়া উঠিলাম; তথাপি কিন্তু প্রাণের গোপনপুরে যে জ্বালা জ্বলিয়াছিল, যে দাগা লাগিয়াছিল, তাহা আর গেল না। ক্রমে আর এক উপসর্গ উপস্থিত হইল—আমি প্রায়ই কার্ত্তিক ঠাকুরদার মূর্ত্তি মানস-চক্ষুর সমীপ-বর্ত্তী দেখিতে লাগিলাম, রাত্রিতে আমি তখন আর একা বাহির হইতে পারিতাম না;—আমার বোধ হইত, রাস্তার ধারে কাহাদের ছাদে কার্ত্তিক ঠাকুরদা যেন তাহার ভীষণ প্রেতমূর্ত্তি লইয়া আমারই অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে!

তোমরা ভূত মান কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এ পঞ্চভূতের কথা নয়। মানুষ মরিয়া ভূত হয়—তাহার স্থূলদেহের কার্য্যাকার্য্য মনে করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারে কি না,—তখন অনেক লোককেই এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। কেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কেহ কেহ বলিত,—ভূত আছে। ভূতেরা তাহার পার্থিব দেহের অবশিষ্ট কার্য্যসাধন জন্য পৃথিবীর নিম্নস্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি বি, এ, পাশ বাঙ্গালী যুবক, কাজেই ইংরেজের কথা আমার গুরুবাক্য,—ইংরেজেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহারই অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। সেখানেও সেই এক তত্ত্ব! অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক গ্রন্থকার ভূত মানেন না,—তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। অনেকে আত্মা আছে বলেন, কিন্তু জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন না। অনেকে আবার আত্মা মানেন, জন্মান্তর মানেন, পরলোক মানেন, ভূত মানেন, ভৌতিকজীবনের জীবিতের উপর অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপও মানেন। কাজেই আমি সন্দেহের যে অন্ধকার লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতানুসন্ধানে পরিলিপ্ত হইয়াছিলাম, সেই অন্ধকার লইয়াই ফিরিয়া পড়িলাম।

ভূত সম্বন্ধে সুমীমাংসা কিছুই হইল না বটে, কিন্তু আমার প্রাণের সেই নিদারুণ ভয় গেল না; বরং ক্রমেই তাহা ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমেই যেন আমার বোধ হইত, কার্ত্তিক ঠাকুরদার প্রেত মূর্ত্তি প্রতিহিংসা সাধন করিবার জন্য—আমাকে সংহার করিবার জন্য তাহার প্রেত-বাহু বিস্তার করিয়া বাতাসে বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

আশ্চর্য্য ভূতাবেশ।

৮ম বর্ষীয়া একটী মুসলমান বালিকা একদা দুপুরবেলা নিরুদ্দেশ হয়। তাহার আত্মীয় স্বজন সমস্ত দিবস নানা স্থানে খোঁজ করিয়া কোন সন্ধান পায় নাই। পরে থানায় সংবাদ দেওয়া হইলে পুলিশ তদন্তে প্রবৃত্ত হয়। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, বালিকাটী গ্রামের ময়াবিবির সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল, অনেকে দেখিয়াছে। কিন্তু ময়াবিবি উহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। বালিকার গায় কিছু রূপার গহনা ছিল। সন্দেহবশে ময়াবিবি ধৃত হয়; কিন্তু পূর্ব্বমত তাহার জবাবের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। চৈত্রমাস, দারুণ রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে ময়াবিবিকে সঙ্গে করিয়া গ্রামান্তরে একটী কাছারী বাড়ীতে পৌছিলাম; কারণ, ঘটনার গ্রামে বিশ্রাম উপযোগী স্থান মিলিল না। ময়া বিবিকে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর নজরবন্দীতে রাখিয়া আমি নিদ্রিত হইলাম। রাত্র তখন প্রায় ১০টা। তখনও আহারাদি হয় নাই। ঘণ্টাখানেক পরে "উঠুন, উঠুন শীঘ্র উঠুন" বলিয়া ভূপতি বাবু দারগা আমার পা ধরিয়া জোরে জোরে নাড়া দিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যাহা দেখিলাম—আমার শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

দেখিলাম, ময়াবিবি আর সে ময়াবিবি নাই। তাহার বিকট আকার, আলু থালু কেশ, পরিধেয় বস্ত্র প্রায় খসিয়া গিয়াছে, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, আর এক একবার এক এক হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া অতি ভীষণ রবে "হেউ" "হেউ" করিয়া শৃগালের ন্যায় চীৎকার করিতেছে। ২।৩ জন অতিশয় বলশালী বরকন্দাজও তাহার একখানি হস্তের গতি রোধ করিতে পারে নাই। তাহার চীৎকারে বহু দূরের লোকের ঘুম

ভাজিয়া গিয়াছিল। প্রায় একঘণ্টা ঐরূপ করার পরে সে অতি ছোট শিশুর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিল। ঠিক যেন ছোট বালকের গলা টিপিয়া ধরিলে যেমন হয়, এবারে ঠিক সেইরূপ। তাহার বাহ্যজ্ঞান আদৌই ছিল না। অনেক লোক সমবেত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একজন ওঝাও ছিল। সে হাতচালা দিয়া বলিল, উহাকে ভূতে ধরিয়াছে। আমাদের অনুরোধে নানারূপ প্রক্রিয়া করার পরে যথাবিধি শান্ত হইল। তৎপর সে অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিল, গহনার লোভে সে বালকাটিকে পাণিফল খাইবার লোভ দেখাইয়া ভৈরব নদীর ধারে লইয়া গিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে ও লাশ কাদার মধ্যে পুতিয়া রাখে। তাহার পরে গহনাগুলি রক্তমাখা তাহার ঘরের একটী উনন্যের মধ্য হইতে ও লাশের কতক অংশ ভৈরব হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। এই ভূতাবেশ হওয়ায় পূর্ব্বে সে সর্ব্বদা নিজকে নিরপরাধ বলিয়াই জিদ করিতেছিল, পরে আপনা আপনি অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল, তাহার মানে কি ?

শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত,
নাকাশিপাড়া, নদীয়া।

"রহস্য-বিপ্লব"

বর্দ্ধমানের পশ্চিমে আট ক্রোশ দূরে বিউর নামে একখানি বৃহৎ গ্রামে কোন এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রগৃহে একবার এক অলৌকিক ভৌতিক কাণ্ড সংঘটিত হয়। সেরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহিনী বোধ হয়, কেহ কখন দেখেন নাই বা শুনেন নাই। কারণ, তাহার অসহ্য অত্যাচারে বাটীস্থ সমস্ত লোককেই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। এই ঘটনাটী

প্রায় ১৫ বৎসরের হইবে। উক্ত গ্রামের শেষ ভাগে ব্রজনাথ মিত্র নামে একটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বাস করিতেন। সেই গ্রামই তাঁহার জন্মভূমি। ব্রজ বাবুর সংসার বৃহৎ, গৃহে বহু পোষ্য, আত্মীয়-কুটুম্বাদি দ্বারা তাঁহার বাটী সর্ব্বদাই কোলাহলপূর্ণ। ব্রজনাথ মিত্রের কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতা; তাঁহারা প্রত্যেকেই বিবাহিত ও তাঁহাদের স্ত্রী বর্ত্তমান। একদিবস কোন কারণ বশতঃ ব্রজ বাবুর ভগ্নীর সহিত তাঁহার ভাদ্রবধূর বিবাদ উপস্থিত হয়। যখন তাঁহাদের মধ্যে উভয়ের বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন ব্রজবাবু বাটীতে ছিলেন। তিনি উভয়কে বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হন ও ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া ভগ্নীকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত করেন। বলিতে পারি না, সেই দুঃখেই হউক অথবা অন্য কোনও কারণ বশতই হউক, হতভাগিনী আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে। তাহার মৃত্যুর পাঁচ ছয় দিবস অতীত হইতে না হইতেই বাটীতে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। কারণ, দ্বিপ্রহর সময়ে জানি না, কোথা হইতে বিষ্ঠা, গোহাড়, ইষ্টক ইত্যাদি হুড়্ হুড়্ করিয়া বাটীর উঠানে পতিত হইতে লাগিল। গৃহস্থ সকলে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া অন্য গৃহে গমন করতঃ বিশ্রাম করিতেছেন, পুনরায় রান্নাঘর খুলিয়া দেখেন, অন্ন ব্যঞ্জনাদি কিছুই নাই, তৎপরিবর্ত্তে হাঁড়িগুলি বিষ্ঠা-মূত্রে পরিপূর্ণ। ক্ষুধা পাইয়াছে, ছোট ছোট ছেলেরা আহারাভাবে কাঁদিতে বসিয়াছে। কি করিবে, বাটীস্থ রমণীগণ সেই সকল পরিষ্কৃত করতঃ পুনরায় স্নান করিয়া নূতন হাঁড়ি চড়াইয়া, শীঘ্রই একপাকে রাঁধিয়া ফেলিলেন ও তন্মুহূর্ত্তেই সকলে একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। এইরূপে ভয়াবহ উপদ্রব ক্রমশইঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাটীস্থ সকলে অতীত চিন্তার মোহে আচ্ছন্ন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, সকলেই অত্যাচারে অস্থির হইয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য সচেষ্ট

হইয়াছেন। এইরূপ অত্যাচার যে কেবল দিনের বেলায় সংঘটিত হইত, তাহা নহে। সন্ধ্যা হইলে অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি হইত। এমন কি যে, কেহ গৃহের বাহির হইতে পারিত না। বাহিরে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইত; কখন বিকট হাস্য; কখন করতালি; কখন বা ঘরের মট্‌কায় দুড়্ দাড়্ শব্দ, এরূপ ভয়ানক উপদ্রবে কেহ কি কখন গৃহের বাহির হইতে পারে? এইরূপ ভাবে আরও কিছুদিন অতীত হইলে পর, একদিবস ব্রজনাথ বাবুর ভাদ্রবধূ স্নানান্তে আহারের পর চুল শুখাইতে বসিয়া হঠাৎ ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারিল না। কে বলিবে? তাহার মুখে কথা নাই, চক্ষুঃ রক্তিম বর্ণ, মস্তকের সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ আলুলায়িত। বারাণ্ডা হইতে উঠানে পড়িয়া ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে। আরও একটী সাংঘাতিক দৃশ্য দেখা গিয়াছিল যে, তাহার পৃষ্ঠে কে যেন বলপূর্ব্বক কামড়াইয়া ধরিয়াছিল, সহসা কেন যে এরূপ হইল, তাহা কিছুই নিরাকরণ করা গেলনা; অথবা যাহার এইরূপ হইয়াছে, সেও কিছুই বলিতে পারিতেছে না। উপর্য্যুপরি বিপদ, ব্রজনাথ বাবু মনে মনে কি চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ ডাক্তার লইয়া আসিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ক্রমেই নিদাঘের দীর্ঘ বেলা অবসন্ন হইয়া আসিল। নীরব তপন নীরবে কানন, কান্তার, ব্যোম্, গিরি, সিন্ধুকক্ষ সুবর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া নিতান্ত ক্লান্তভাবে প্রদোষে পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন। সুনীল গগন শ্বেত পীত সুবর্ণ রেখায় সমাচ্ছন্ন হইল, সান্ধ্য স্বভাবের সমীরহিল্লোলে ভাসা বিষাদিনী নলিনী কাঁপিয়া কাঁপিয়া সরসীজলে নিমীলিত হইল, নীলিম অম্বরে তারকারাজি ফুটিল, শ্যাম দূর্ব্বাদল খদ্যোতের দলে জ্বলিল, কামিনীকুঞ্জলে কুসুমেরমালা সাজিল—মধুরে মধুরে মিশিল। সান্ধ্য

সমীরসেবী বিলাসীর বিচিত্র তরী রজতাম্বুবাহিনী সান্ধ্যতটিনীর তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিল। কর্ম্মস্রোতপ্লাবিতা ধরিত্রী শান্তি-সলিলে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে মেদিনী, গগন, গিরি, জীব, উদ্ভিদ্ সকলেই শশাঙ্কশালিনী যামিনীর কোলে নীরবে ঘুমাইয়া পড়িল। এ দিকে সন্ধ্যা অতিক্রম হইল, তখনও সকলে তাহার নিকট বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সহসা কে যেন গৃহের মট্‌কার উপর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কেমন হোয়েছে? বড় অপমান করেছিলি, আমি বউকে পেয়েছি, আমি তোদের সকলকেই একে একে মারিয়া ফেলিব।" কথা বন্ধ হইল, কথা শুনিয়া সকলেই হতভম্ব। কাহারও মুখে কথা নাই, হস্তপদ নিশ্চল; ভয়ে কেহ কোন দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিতেছে না। এইরূপ অবস্থায় বউ পুনরায় লাফাইয়া উঠিল, কেহ তাহাকে ধরিতে পারিল না, গৃহের দ্বার বন্ধ। পাঠক-পাঠিকবৃন্দ! আপনারা যদি সেই সময় একবার ব্রজবাবুর ভাদ্রবধূর অবস্থা দর্শন করিতেন, তাহা হইলে তাহার বিকট চেহারা দেখিয়া যে আপনারা আশ্চর্য্য হইতেন, তাহা নিঃসন্দেহ। বধূ কাহাকেও কিছু বলিতেছে না, কেবল এক একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে ও পরক্ষণেই আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। কখন বা সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া গৃহের কোণে গিয়া বসিতেছে। তাহার অবস্থা এইরূপ ভয়াবহ দেখিয়া ও গৃহের মট্‌কার উপর হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ স্থির করিলেন, ইহা অন্য কিছুই নহে, তরঙ্গিণী উহাকে আশ্রয় করিয়াছে ও সে-ই এইরূপ ভয়ানক উপদ্রব করিতেছে। (তরঙ্গিণী নাম শুনিয়া পাঠকগণ আর কাহাকেও ভাবিবেন না। ব্রজনাথ বাবুর ভগ্নীর নামই তরঙ্গিণীবালা, সকলে তাহাকে তরি বলিয়া ডাকিত।) ব্রজনাথ বাবু এক্ষণে অতীত চিন্তার ভয়ে উৎপীড়িত। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তরি,"

কেন আমাদের জ্বালাতন কচ্ছিস্? আমরা তোর কি করিয়াছি?” তৎক্ষণাৎ সেই গৃহের মট্‌কার উপর হইতে বিকট হাসি উঠিল ও পুনরায় পরুষকণ্ঠে কে যেন বলিল, “জানিস্ না কি ক’রেছিস্? আমি তোদের সর্ব্বনাশ ক’র্ব্বই। হোয়েছি কি?” এই কথা শুনিয়া সকলে বিষণ্ণ হইল। কথা বন্ধ হইয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই বাহিরে যেন হুড়াহুড়ি শব্দ হইতে লাগিল। পরক্ষণেই বোধ হইল যেন, একটি প্রাচীর সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না, সকলেই ভয়ে কম্পবান্। যাহাই হউক, এইরূপ করিয়া কিছুদিন অতিবাহিত হইলে পর, এক দিবস সায়ংকালে কয়েক জন প্রতিবাসী ব্রজবাবুর সহিত একত্রে বারাণ্ডায় বসিয়া ঐ বিষয়ে নানারূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে কে যেন সহসা বলিয়া উঠিল, “ওঝা আনিবার কথা শুনিলে আমি তোদের নির্ব্বংশ করিব। বসিয়া আছিস্—বসিয়া থাক্!” এই কথা শুনিয়া সকলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। পরদিবস পুনরায় সায়ংকালে পাড়ার কোন একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ভাবে বসিয়া থাকার পর বলিলেন, “তরি! তুই যে ভূত হইয়াছিস্, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। যদি তুই এই মুহূর্ত্তে আমায় এক ছিলিম গয়ার তামাক খাওয়াইতে পারিস্, তাহা হইলে বুঝিব যে, তুই যথার্থই ভূত হইয়াছিস্।” হো হো শব্দে গৃহের মট্‌কার উপর হইতে হাসির শব্দ শুনা গেল ও পরক্ষণেই নিস্তব্ধ হইল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ছিলিম তামাক সকলের সম্মুখে পতিত হইল। যথানিয়মে অগ্নিসংযোগে তামাক প্রস্তুত করা হইল। সকলেই বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিলেন যে, ইহা উৎকৃষ্ট তামাক, নিঃসন্দেহে অনেকেই ধূমপান করিলেন। এইরূপে সকলে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কেহ কোন দিন বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, কেহ তামাক প্রভৃতি তরি-

প্রদত্ত দ্রব্য পাইতে লাগিল। তৎপর দিবস সেই ব্যক্তি পূর্ব্ববৎ তামাক চাহিল ; অমনি গৃহের মট্‌কা হইতে শুনা গেল যে, পূর্ব্বের মত গম্ভীরস্বরে কে যেন বলিল, "বড় লোভ হইয়াছে, নয় ? আজ তামাক দিতেছি, খা, এইরূপ তামাক আর কখন খাস্‌নি।" তৎক্ষণাৎ ঝুপ্‌ করিয়া এক ছিলিম তামাক পড়িল। যাহাই হউক, যথানিয়মে তামাকে অগ্নি-সংযোগ করার পর যেমন তিনি এক টান টানিলেন, অমনি হুড় হুড় করিয়া বমি হইতে লাগিল। তামাকের দুর্গন্ধে সকলেই উঠিয়া পড়িলেন, এমন কি, যাহার নাসিকায় সামান্য দুর্গন্ধ প্রবেশ করিয়াছে, তাহারও বমি হইয়াছে। সে যে কিসের গন্ধ, তাহা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না। যাহাই হউক, উক্ত দিবস হইতে তরির নিকট হইতে তাহারা কেহ কিছু প্রার্থনা করে নাই।

তৎক্ষণাৎ ঐ গৃহের মট্‌কা হইতে ভীষণ অট্টহাস্য ও করতালি শুনা গেল। তৎপরেই কথা আরম্ভ হইল। আবার সেইরূপ ভীষণ স্বরে বলিতে লাগিল, "কেমন হইয়াছে ? আর তামাক খাবি ?" আগন্তুক ব্যক্তিগণ ভয়াকুলিতচিত্তে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। যাইবার সময় একজন বলিয়া গেলেন,—"আমি কল্য ওঝা আনিয়া ইহার প্রতীকার করিব।" তৎপরদিবস সায়ংকালে একজন ওঝা আনা হইল। নানাবিধ বাক্যালাপের পর তাহাকে আহার করাইয়া শয়ন করিবার জন্য বলা হইলে ওঝা বলিল,—"গ্রীষ্মাতিশয়প্রযুক্ত আমি বাহিরে শয়ন করিব।" বলা বাহুল্য, তখন গ্রীষ্মকাল। ওঝা গৃহের বাহিরে শয়ন করিয়া আছে ; তন্দ্রাঘোরে চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিতপ্রায়। এমন সময় সহসা চীৎকার-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। গৃহস্থের নিদ্রা নাই, সকলে বাহিরে আসিয়া দেখেন, ওঝা নাই, কেবল চীৎকার-শব্দ শুনা যাইতেছে। সহসা দুড়্‌-দাড়্‌ শব্দ হইল ; এতক্ষণ কেহ দেখিতে পায় নাই, এইবার

সকলেই দেখিল—ওঝাকে কেবলমাত্র ইষ্টক সাজাইয়া কে জীবিতাবস্থায় কবরস্থ করিতেছে ও ওঝা ইষ্টক চাপা পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া চীৎকার করিতেছে। হাত-পা নাড়ায় কতকগুলি বৃহৎ ইষ্টক তাহার গাত্রে পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে টানিয়া বাহির করা হইল। তাহার সর্ব্বশরীর কম্পবান্। বহুক্ষণ বসিয়া থাকার পর ওঝা বলিল,—"আমার সামান্য তন্দ্রা আসিয়াছিল, কিন্তু দুঃস্বপ্নে আমার নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় দেখি, আমাকে কে জীবিতাবস্থায় কবর দিয়াছে। সেই ভয়ে আমি চীৎকার করিয়া উঠি।" ওঝার কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার সেই বিকট অট্টহাস্য ও করতালি হইতে লাগিল। তৎপরে পরুষকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"দূর হ! দূর হ! ভূত তাড়াতে এসেছিস্? কেমন হয়েছে?" ক্রমে বিভাবরী অবসানপ্রায় হইল, প্রকৃতি ক্রমে উষার অঞ্চল ধরিয়া নব-ভানুরাগে রঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বগগনে উদিত হইলেন। সেই সঙ্গে নবজীবন সঞ্চারে জগৎ বিনিদ্র হইল। নির্ঝরিণী-তীরে—নিভৃত কাননে—সরসীজলে—ভূতলে—অম্বরে—রত্নসৌধে—পর্ণ-কুটীরে সুধার নির্ঝর ঝরিল। বনফুলে বনস্থলী সুশোভিত হইল। কল্লোলিনী কল্লোলে হিল্লোলে রাঙ্গা-রবি বক্ষে লইয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিল। মৃদু-মন্দ পবন কুসুমের বাস বিলাইয়া প্রেমিকা যুবতীর অঞ্চল ও কুন্তল লইয়া খেলা করিতে লাগিল। ওঝা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মধুর প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীর-সেবনে সুস্থ হইয়া বলিল,—"মহাশয়! আমার দ্বারা আপনাদের বিশেষ কোনও ফল হইবে না। আপনারা অন্যত্র ওঝা অনুসন্ধান করুন। যদি তাহা না করিতে পারেন, তাহা হইলে আমায় অনুমতি দিন, আমি একজন শিক্ষিত ওঝা পাঠাইয়া দিব।" ব্রজবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই করিও।" এই কথা বলিয়া ওঝা বিদায় হইল। ক্রমে মধ্যাহ্ন-তপনের প্রখর কিরণজালে

জগৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। একে গত রজনীর অনিদ্রা—তাহাতে দারুণ উৎকণ্ঠা—তাহার উপর আবার বিভীষিকাময় ভীষণ অত্যাচারে উৎপীড়িত। পরক্ষণে শুনা গেল, বিকটস্বরে ঘরের মট্‌কার উপর হইতে বলিল,—"তোদের সর্ব্বনাশ করিব, আমায় তাড়াবার জন্য ওঝা আনিয়াছিস্? তোদের এতদূর স্পর্দ্ধা? সাবধান! আর এরূপ কাজ কখন করিস্‌নে।" কথা বন্ধ হইল। সকলে ভয়ে নীরব – নিস্পন্দ; কাহারও মুখে কথাটি নাই। পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ! আমি আর কত লিখিব? এইরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার প্রায় একবৎসরকাল সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার কয়েক দিবস অতীত হইলে পর একদিবস মধ্যাহ্নসময়ে ভিক্ষুক-বেশধারী একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল ও কবরস্থ ওঝা মহাশয়ের পরিচয় দিয়া বলিল,—"সেই আমায় পাঠাইয়াছে।" এক্ষণে সকলেই বুঝিল, ইনি একজন ওঝা। অভ্যর্থনা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বসান হইল ও আহার করিবার জন্য স্বহস্তে পাক করিতে বলা হইলে তিনি বলিলেন,—"না মহাশয়! অগ্রে আমি আপন কার্য্য উদ্ধার করি, তৎপরে যাহা হয় হইবে।" আরও বলিলেন, "মহাশয়, আমায় অগ্রে /৫ সের সরিষা আনিয়া দিন।" ভৃত্য দ্বারা তৎক্ষণাৎ সরিষা আনীত হইল। তিনি একমুষ্টি সরিষা লইয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন ও আপনার ভিক্ষার ঝুলি হইতে একটি চামড়ার বৃহৎ চাবুক এবং তৈলরাখা একটি ক্ষুদ্র কুপার মত জিনিষ বাহির করিয়া বলিলেন,—"কাহাকে ভূতে পাইয়াছে?" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে গৃহমধ্য হইতে এক অনবদ্যাঙ্গী নিরাভরণা রমণী বিকট আকার ধারণ করিয়া বাহিরে আসিল আর বারংবার বলিতে লাগিল,—"দূর হ! দূর হ! তোর ঘাড় মট্‌কাব! তোর সর্ব্বনাশ কর্ব্ব।" ওঝা কোন কথা শুনিল না; প্রথমে বামহস্তে তাহার সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বসাইল; পরে সেই সরিষার

উপর হাত রাখিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বলিতে লাগিল। তৎপরে একটি গোলাকার বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া সেই তৈল-রাখা পাত্রটি বৃত্তমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক চাবুক-হস্তে বলিলেন, "তুই কে?" কোন উত্তর নাই। ব্রাহ্মণ দুই তিন বার প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া এক-মুষ্টি সরিষা লইয়া রোগিনীর গাত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সজোরে এক চাবুক মারিলেন। অমনি রোগিণী বিকটাকার ধারণ করিয়া বলিল,—"আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।" ওঝা বলিল, "যাইতেছি নয়, এই তৈল-রাখা কূপার ভিতর তোকে প্রবেশ করিতে হইবে।" রোগিণী আর কোন উত্তর করিল না, ওঝা পুনরায় একমুষ্টি সরিষা তাহার গাত্রে নিপেক্ষ পূর্ব্বক পুনরায় এক চাবুক মারিল। প্রহারান্তে রোগিণী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যাইতেছি, যাইতেছি!" ওঝা কোন কথা শুনিল না; উর্পর্য্যুপরি চাবুক মারিতে লাগিল। তখন রোগিণী বলিল, "আমি কূপায় প্রবেশ করিয়াছি।" ওঝা বলিল, "যদি কূপার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্, তাহা হইলে এই গোলাকার বৃত্তমধ্যে কূপা ঘূর্ণায়মান হউক।" এইরূপ ভাবে একঘণ্টা কঠিন শাস্তির পর কূপা সকলের সম্মুখে বৃত্তমধ্যে ঘুরিতে লাগিল। ওঝা তৎক্ষণাৎ ছিপি আঁটিয়া কূপার মুখ বন্ধ করিয়া আপন ভিক্ষার ঝুলির ভিতর রাখিয়া দিল ও সকলকে অভিবাদন করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল। রোগিণী এক্ষণে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পতিত। তাহার চখে ও মুখে একঘণ্টা জলের ছিটা দেওয়া হইলে পর সংজ্ঞা-প্রাপ্তে বলিল, "আমার অতিশয় ক্ষুধা পাইয়াছে।" ওঝা বলিল, "উহাকে দধি, চিড়া, কলা ইত্যাদি খাইতে দিন।" রোগিণীর আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ওঝা পুনরায় বিদায় চাহিল। ব্রজবাবু তাহাকে ২৫৲ টাকা দিতে চাহিলেন ও আহারের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ওঝা এক পয়সাও লইল না এবং বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও আহার করিল না।

অগত্যা তখন ওঝার সহিত সকলে বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কূপার ভিতর উহাকে লইয়া কি করিবেন?" "আমি যাহা হয় করিব" বলিয়া ওঝা প্রস্থান করিল এবং সেই অবধি বাটীও নিরাপদ্ হইল।

শ্রীননীভূষণ শেঠ।

গোপেশ্বরের চাকরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরদিন পর্য্যন্ত রাধারাণী মুখে জল দেয় নাই। প্রায় সকল বাড়ীতেই ঐরূপ বিপদ্; সুতরাং সান্ত্বনা বা সাহস দিবার কেহই ছিল না। অনাহারক্লিষ্ট শিশু কালাচাঁদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মুখ-চোখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছে, সে দিকে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। এক একবার রোরুদ্যমান পুত্রের কাতর মুখখানি দেখিলে খাওয়া দাওয়ার কথা মনে পড়ে বটে, কিন্তু অন্য চিন্তা ও দুর্ভাবনায় সব ভুলিয়া যায়।

তার বিপদ্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; অন্য বাড়ীতে তবু দু একজন পুরুষ মানুষ আছে, কিন্তু তাকে রক্ষা বা প্রতিপালন করিবার কেহই নাই। তার পর কে মোকদ্দমা চালাইবে, খরচ যোগাইবে, স্বামীরই বা কি পরিণাম হইবে? হয় ত ৭ বৎসর জেল খাটিতে হবে; পরে জেলের খাটুনি সহ্য করিয়া বাঁচিতে পারিবে কি না, ভাবিতে ভাবিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল।

তা ছাড়া কে বা চাষবাস করিবে, জমি-জরাৎ হয় ত দুদিন পরেই জমিদারের লোকে বা পাঁচ ভূতে কাড়িয়া লইবে। ইহার উপর সেই যত নষ্টের মূল ভাবিয়া লোকের সহানুভূতি দূরে থাকুক, বরঞ্চ অনেকটা বিষনয়নে পড়িয়াছিল।

সান্ধ্য আঁধার ঘনাইয়া আসিল। রাধা তখন গালে হাত দিয়া দাওয়ায় বসিয়া—অকস্মাৎ পদশব্দে চমকাইয়া উঠিল।

চাহিয়া দেখিল, এক অপরূপলাবণ্যবতী রমণী। প্রথমটা একটু ভয় হইয়াছিল। ভাবিল, হয় ত জমিদারের বা পুলিশের চর আবার কোন-রূপে বিপদে ফেলিবার চেষ্টায় আসিয়াছে।

কিন্তু যতই নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ততই তাহার ভয় বিস্ময়ে পরিণত হইয়া তাহাকে নির্ব্বাক্ করিয়া দিল।

বিস্ময়ের বহু কারণ। প্রথম, রমণী তাহাদের গ্রামের নয়, সম্পূর্ণ অপরিচিতা. কখনও তাহাকে দেখে নাই; তাই হঠাৎ এমন সময়ে এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে তাহার কুটীরে এরূপ আগন্তুকের আবির্ভাবে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

দ্বিতীয়তঃ. সে অপরূপলাবণ্যবতী। রাধারাণীর নিজেকে রূপসী ভাবিয়া মনে মনে একটু অহঙ্কারও ছিল, সেটা প্রায়ই স্ত্রীলোক মাত্রেরই থাকে; কিন্তু এ রূপের তুলনা নাই। যৌবন ভরা, কি তার পরপারে পৌঁছিয়াছে, অর্থাৎ যুবতী কি ঈষৎ প্রৌঢ়া, তা দেখিয়া অনুমান হয় না। সুগঠিত নিটোল দেহ, কাঁচা সোনার মত ঢলঢলে রঙ—রঙের ঔজ্জ্বল্য পরিধেয় বস্ত্র ফুড়িয়াও বাহির হইতেছিল। ঘনকুঞ্চিত আলুলায়িত কেশ-রাশি—যেন নিবিড় কৃষ্ণ মেঘরাজি সান্ধ্য গগনের রক্তিমচ্ছটাকে ঢাকিয়া দিয়াছে; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম—যেন পথশ্রান্ত ও বহুদূরাগত।

বিস্ময়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ, সে রমণী ভৈরবী—গৈরিকবসন-পরিধানা ও হস্তে ত্রিশূল।

যখন নিরাভরণা তেজোময়ী রমণী অসীম রূপলাবণ্য লইয়া ত্রিশূলহস্তে তাহার উঠানে দাঁড়াইল, তখন রাধার যেন বাস্তবিকই বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

ভৈরবী তাহাকে এ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে না দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কি গুপী সর্দ্দারের বাড়ী ?"

রাধার উত্তর যোগাইল না।

ভৈরবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই কি তার বউ ?" তখন রাধা মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ভৈরবী। সন্ধ্যা হইয়াছে, ঘরে আলো জ্বাল নাই কেন ?

রাধারাণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাতরস্বরে বলিল, "আমাদের বড় বিপদ্।"

ভৈ। হাঁ, সে কথা আমি জানি, বিপদ্ শুনেই এসেছি।

রাধারাণী আরো আশ্চর্য্য। পরে সাহস করিয়া বলিল, "আপুনি কে গা ?"

ভৈ। আমি ভৈরবী।

রা। কি জাত ?

ভৈ। আমার কোন জাত নেই।

কথাটা শুনিয়া রাধার সন্দেহ হইল। জাত নেই—এ কি কথা ? তবে কি বষ্টম্ ? তা হবেও বা !

রা। আপুনি কোত্থেকে আসছ ?

ভৈ। হরিশপুরের কালীবাড়ী থেকে ;—সেইখানেই আমি থাকি। মা কালী তোমাদের বিপদের জন্য আমাকে এখানে আসবার আদেশ দিয়েছেন।

হরিশপুরের কালী বড়ই জাগ্রত—সে কথা এ অঞ্চলের কে না জানে ? রাধা তাড়াতাড়ি ভৈরবীর পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ;—বলিল,—"মা-ঠাকরুণ ! তুমি দেবতা, তুমি আমাদের রক্ষা কর।"

ভৈ। পা ছেড়ে দাও। তোমাদের কোন ভয় নেই, সেই কথাই বলতে এলাম।

রা। মা, তুমি ভরসা দাও যে, কোন বিপদ্ নেই, নইলে তোমায় ছাড়ব না।

ভৈরবী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"সেই কথাই ত বলছি, তোমার স্বামী ও সবাই খালাস পেয়ে যাবে; কোন ভয় নেই।"

রাধা তার আঁচলটি গলায় বেড়িয়া প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভৈ। কোন ভাবনা নেই, মা নিজে আদেশ দিয়েছেন। তুমি ছেলেকে খাইয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেও খাওয়া দাওয়া কর।

রাধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আপনি ত বলছ মা-ঠাকরুণ, আমি ত কিছু কূলকিনারা পাচ্ছি না; ভেবে ভেবে পেটের ভাত চাল হয়ে গেল; কাল থেকে বাছাকেও কিছু খাওয়াতে পারি নি, বাছা আমার একদিনে কালীমূর্ত্তি হয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, দিন কাটে ত রাত কাটে না।"

আরো কত কি বলিত, কিন্তু ভৈরবী বাধা দিয়া বলিল—"দেখ, তুমি বাছা দিনকতক কোথাও চলে যাও, তা হ'লে শীঘ্র ভাল ফল পাবে।"

রাধা কপালে হাত দিয়া বলিল,—"কোথা যাব মা-ঠাকরুণ? এ সোনার-ঘর সংসার ছেড়ে কোথা দাঁড়াই?"

ভৈ। সে জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না; মা কালী তার সব সুবিধা করে দেবেন। আর একটা কথা—তুমি কখন পুরুষ মানুষের দ্বারস্থ হয়ো না—বরাবর কোন না কোন মেয়েলোককে সুপারিস ধরে থাকবে। মা স্ত্রীলোকের শরীরে বিরাজ করেন কি না! তাই মেয়েলোকের ভিতর দিয়ে তুমি উপকার পাবে—তিনি ত আর দেখা দিয়ে নিজে কিছু করবেন না।

রা। আমি এমন কি পুণ্যি করেছি যে, মা কালীর চরণ দর্শন কোর্‌তে পাব ?

ভৈ। আমায় একটু জল দাও ত বাছা ! অনেক দূর থেকে এসেছি, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।

রাধারাণী এইবার বিপদে পড়িল। সে অস্পৃশ্য জাতি, ভৈরবীকে তার হাতের জল খাওয়ায় কেমন করে ? তাই ভাবিয়া বলিল,—"মা, আমরা যে ছোট জাত।"

ভৈ। (হাসিয়া) আমার কাছে বামন শূদ্র নেই, আমার চোকে সব সমান। তুমি বাছা জল দাও।

রাধারাণী কলসী হইতে ঘটীতে জল গড়াইয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে হাতের ঘটী পড়িয়া গেল— ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া চারিদিক্‌ খুঁজিয়া দেখিল—কেহ নাই। ভাবিল, ভূত না কি ? ভয় আরো বাড়িল। মনে মনে রাম রাম করিয়া স্থির করিল, সত্যি ভূত কি ? না, ভূত নয়, কেন না, তা হইলে মাথায় ঘোমটা ও সাদা ধবধবে কস্তাপেড়ে সাড়ী থাকিত, আওয়াজ খোনা হইত ও আরো নিশুথী রাত্রি হলে দেখা দিত।

আর একটা কল্পনা মাথায় জাগিল। তবে কি সত্য সত্যই মা কালী তাকে ছলনা করতে এসেছিলেন ? না না, তা হতেই পারে না, কেন না, তিনি এমন সামান্য লোকের বাড়ী আবার হেটেই বা আসবেন কেন ? আর মানুষের মত জলই বা চাইবেন কেন ? তবে কি ?—কিন্তু সত্যই যদি মা কালী হন ? আর ভাবিতে পারিল না—মাথা ঘুরিতে লাগিল। আর সত্যই যদি দেবতা হয় ত সে কি পাপিষ্ঠা ! সামনে পেয়েও ধরতে পারলে না, খাবার জল চাইলেন, কিন্তু তা ভোগে লাগিল না ! অনুতাপে অন্তর্দ্দাহ হইল। আবার শঙ্কা হইল যে, যদি জমিদারের লোক বা নষ্ট

মেয়েমানুষ হয়? মনে হইবামাত্র নিজে জিভ কাটিয়া বলিল, না না, মানুষ কখনো নয়, মানুষ হ'লে কি উপে যেতে পারত, নিশ্চয় দেবতা।”

হরিষে বিষাদে সে উদ্দেশে হরিশপুরের দিকে লক্ষ্য করিয়া ও ভূমিতে মাথা খুঁড়িয়া মনে মনে কত কি ক্ষমা প্রার্থনা, কত কি পূজা মানসিক করিল, তার ইয়ত্তা নাই।

মনে একটা আশা, আনন্দ ও উৎসাহ অজ্ঞাতসারে আসিয়া জমিতে লাগিল। দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, ভৈরবী নিশ্চয়ই দেবতা; দেবতার বাক্য মিথ্যা হয় না—তার স্বামী ও পাড়ার লোকেরা নিশ্চয়ই খালাস পাবে। ভাবিতে ভাবিতে বড় বড় চক্ষু দুটি আষাঢ় মাসের জল-ভরা মেঘের মত স্থির হইয়া উঠিল।

সমস্ত অবসাদ ঘুচিয়া কোথা হইতে প্রাণের মধ্যে এত আনন্দ ও আশা-ভরসা আসিয়া জুটিতে লাগিল, তাহা সে নিজেই ভালরূপ ঠাওরাইতে পারিল না।

ভৈরবী মেয়েলোককে ধরিতে বলিয়াছিল। অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, ঠাকুরুণ গিন্নীর কাছে গিয়ে পড়লে হয় ত কিছু কিনারা হতে পারে। ঠাকুরুণ গিন্নী পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

যেমনি সঙ্কল্প, অমনি কার্য্যারম্ভ। প্রাণ ও মান হাতে করিয়া একা বাড়ীতে থাকা অপেক্ষা সে তখনি সেই সপুত্রক অনাহারী অবস্থায়, আর কালবিলম্ব না করিয়া পুত্রকে কোলে লইয়া অন্ধকারেই পুরোহিত-বাড়ী যাত্রা করিল।

রাধারাণী খিড়কীর দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া উঠানের এক পাশে দাঁড়াইল।

পুরোহিত ঠাকুরুণ সন্ধ্যার অন্ধকারে তাকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া বলিলেন, ‘কে গা? কে গা বাছা?”

রাধা নিরুত্তর দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নী। বলি কে গা বাছা তুমি? কথা ক'ও না কেন? এ দিকে এগিয়ে এসো দেখি।

রাধা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

পুরোহিত ঠাকুরুণ তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু ঠাওরাইয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ও মা, কে লো তুই, গুপীনাথের বৌ না? তা বাছা, তোকে গোড়ায় চিনতে পারি নি—বয়স হয়েছে কি না, তা বাছা, আয়—বোস্ বোস্। 'এই যে, কোলের খোকাকেও এনেচিস? তা আনবি বই কি, নইলে কার কাছে রেখে আসবি বাছা? আহা, তোদের বড় বিপদ্—বড় বিপদ্, শুনে অবধি কি কষ্ট হয়েছে যে মা, তা আর বলতে পারি না। আজও ঠাকুরের সঙ্গে তোদের কথা হচ্ছিল; ঠাকুরও কত দুঃখ করছিলেন।"

দুই দিন পরে একটু স্নেহসূচক সহানুভূতি পাইয়া রাধারাণী আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গিন্নী। কাঁদিস না বাছা, কাঁদিস না—কেঁদে আর কি করবি বল; সকলি অদৃষ্ট মা! নইলে আজ তোদের ভাবনা কি বল? সোনার সংসার—সোনার চাঁদ বর তোর। আহা! আমার গুপী ছেলে বড় লক্ষ্মী ছেলে। ঠাকরুণ-মা বলতে অজ্ঞান হত। আহা, এমন ভালমানুষেরও বিপদ্ হয়! তা বাছা, যদি ধর্ম্ম থাকে, এখনো চন্দ্র-সূর্য্যি উঠে ত দেখিস, আমার গুপী ছেলে আবার হাসিমুখে খালাস হয়ে আসবে।

রা। তাই বল মা, তাই বল, তোমরা দেবতা—তোমাদের কথা যেন সত্যিই ফলে যায়।

গি। সবই ত বুঝতে পাচ্ছিস বাছা—ওই জমিদার বেটার কাজ (জিভ কাটিয়া) আস্তে আস্তেই বলি, নইলে কেউ আবার শুনতে পেয়ে

কি অনর্থ ঘটাবে ? (অনুচ্চস্বরে) ওই ত সব অনর্থের জড়। তা তুই খোকাকে খাইয়েছিস ত ?

রা। না মা, কি আর ছাই পাঁশ খাওয়াব, আমার কি আর মাথার ঠিক আছে মা ?

গি। (গালে হাত দিয়া) ও মা, বলিস কি গো! বাছার মুখে জলও দিস নি ? আহা, ছেলের অকল্যেণ করতে নেই। তোরও মুখে কিছু পড়ে নি বোধ হয় ?

পুরোহিত ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি একটু দুধ গরম করিয়া ও কিছু মুড়কি ও বাতাসা একটা পাতায় আনিয়া বলিলেন,—"নে, বাছাকে আগে খাওয়া, তার পর তুইও কিছু মুখে দে। আর রাত্তিরে এখানে পেসাদ পাবি ; এত রাত্রে আর একলা কোথায় যাবি। তা এ রাত্তিরটা এইখানেই থেকে যা।"

রাধারাণী কালাচাঁদকে খাওয়াইয়া ঠাকুরুণের জিদে নিজেও কিছু মুখে দিল।

গি। তার পর রাত্রিকালে কেন এলি, বল দেখি বাছা! ঠাকুরকে আজও বল্লুম যে, নিরীহ নির্দ্দোষী ; ওদের জন্যে একটা কিছু কর। ঠাকুর বল্লেন,—বটে, কিন্তু কি করব বল গিন্নী। গরীব বামুন আমি, আমার না আছে বিষয়-বুদ্ধি, না আছে লোকবল, বুদ্ধিবল,—এ অবস্থায় কি করব বল ?

রা। প্রাণের দায়ে ছুটে এলাম মা! ও হান্না বাড়ীতে একলা থাকতে বুকের ভিতর কেমন করে উঠে, বড় ভয় করে ; ভাবনা হয়, আবার বা কিছু বিপদ্ ঘটে। আমার আপনার বলতে পৃথিবীতে আর কেউ নেই, তোমরা—আপনারা আমাদের দেবতা ; তাই প্রাণের দায়ে তোমাদের পায়ে এসে পড়লুম—এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার কর মা।

বলিয়াই সে হাত জোড় করিয়া ঠাকুরুণের পায়ের কাছে পড়িল।

ঠা। অত ক'রে বলতে হবে না মা, আমাদের যজমান তোরা—আমাদের কাজ ত তোদের দেখা ; তা কর্ত্তা আসুন অন্দরে, তাঁকে বেশ করে বুঝিয়ে বলব।

পুরোহিত ঠাকুর যখন রাত্রে অন্দরে আসিলেন, তখন দূর হইতে রাধাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা ?" ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ও মা, তা জান না ? ও যে আমাদের গুপী সর্দ্দারের বউ। কোলের বাছাকে কোলে করে প্রাণের দায়ে আমাদের দুয়ারে এসে পড়েছে। তা কি করবে বল, সে হানা বাড়ীতে সত্যি ত—আর অমন সমর্থ মেয়ে একলা থাকতে পারে না। আহা! দুদিন ওদের আকা জলেনি—একেবারে অনাহারী। আমি আবার সাত তাড়াতাড়ি কিছু দিই, তবে ওরা মুখে দেয়। তা তুমি খেতে বস এখন—ওদের কথা পরে হবে।"

ঠাকুর আহারে বসিলে ঠাকুরুণ কাছে বসিয়া নথ দোলাইয়া বলিলেন "তা যা হোক্, ওদের ত একটা বিহিত করতে হবে ? ওরা ত যজমান ; তুমি না দেখিলে কে আর এ বিপদে দেখবে বল ?"

পু। গিন্নি, যা বলছ, তা ঠিক বটে, আমার ত কর্ত্তব্য ওদের দেখা। কিন্তু কি যে বিপদ্, তা ত জান না ?

গি। সব জানি, তবু ত একটা ব্যবস্থা করতে হবে ?

পু। তোমায় ত আগেই বলেছি গিন্নি, আমি গরীব ব্রাহ্মণ—আমার সাধ্য কি ? তা ছাড়া প্রবলপ্রতাপ জমিদার পিছনে লেগেছে—নহিলে যা হোক একটা করতুম্। কে আর সখ করে বিপদ্‌কে ডেকে আনবে বল ?

গি। সে কি ঠাকুর! তুমিই ত কত উপদেশ দাও যে, অতিথি শরণাগতকে রক্ষা করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। ও এখন আমাদের দুয়ারে এসে পড়েছে, ওকে ত আর তাড়িয়ে দিতে পারবে না!

পু। গিন্নি, তুমি স্ত্রীলোক ; তুমি বিপদ্ কি বুঝবে। জমিদার যদি

জানতে পারে, তা হ'লে ভিটে মাটী উচ্ছন্ন হবে। তখন কি কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে পথে দাঁড়াবে?

গি। তা যাই বল না ঠাকুর, এখন তুমি না দেখলে কে দেখবে? তুমিই ত রামায়ণ মহাভারত থেকে বল যে, স্ত্রীলোকের ধর্ম্মরক্ষা সকলের আগে করা উচিত—একলা থাকলে ওর কি আর ধর্ম্ম থাকবে? সতীর চোখে জল পড়লে পার্ব্বতী রুষ্ট হন ও ভগবানের টনক নড়ে, তবে ভয় কি?

পু। (চিন্তিতভাবে) কথা ত খুব ঠিক; কিন্তু সে যে অনেক বলের দরকার।

গি। তুমিই ত বলেছ যে, সতীকে রক্ষা করতে জটায়ু প্রাণ দিয়াছিল, দ্রৌপদীর কান্নায় ভগবান্ ছুটে এসেছিলেন। পরে যা হয় হবে, তুমি বেটাছেলে, পণ্ডিত লোক, তোমায় আমি মূর্খ মেয়েমানুষ কি বোঝাব বল?

পুরোহিত নিবিষ্টচিত্তে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি। আজ রাত্রে এইখানে থাকুক ও প্রসাদ পাউক্, পরে ভেবে চিন্তে যদি কিছু সুবিধা করতে পারি, ভগবান্ যদি মুখ তুলে চান ত কাল সকালে একটা যা হোক বিহিত করব।"

রাধারাণী আড়াল হইতে তাহার ভাগ্যের কথা কাটগড়ার আসামীর মত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। মধ্যে মধ্যে হতাশ হইতেছিল। কিন্তু ঠাকুরের শেষ কথাতে আশার একটু ক্ষীণালোক পাইয়া আবার উৎফুল্ল হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

চতুর্থ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২০। [১২শ সংখ্যা

কর্ম্মানুসারে জীবের গতি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাপ গুরুতর হইলে প্রতিফল অনেক সময় অলৌকিক শক্তিদ্বারা অদ্ভুত উপায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উৎকট মন্দ কর্ম্মের ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষে এইরূপ কর্ম্মের প্রতিফল দিতে পারে না। অমানুষিক অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিফলও অমানুষিক শক্তিতে আসিবে। সাধুদিগের জীবনে আমরা এইরূপ দু একটী ঘটনা দেখিতে পাই। যখন নিরীহ সংযমী ত্যাগী সাধুর উপর সংসারের কোন লোক ভয়ানক অত্যাচার করে, তখন যদি সেই সাধুটী নীরবে সহ্য করিয়া যায় এবং গুরুর উপদেশে ক্রোধ জয় করিতে অভ্যাস করিয়া থাকে, তখন অনেক সময় অত্যাচারীর আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কেহ বুঝিতে পারে না, কোথা হইতে কি হইল।

আমরা এই প্রকার নীরবে অত্যাচার সহ্য করা বা প্রকারান্তরে ঈশ্বরে প্রতিফল দিবার ভার দেওয়া সম্বন্ধে আর একটী সুন্দর গল্প বলিব।

কোন একটী তপোবনে একজন মহাতপা সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। সেই স্থানে মহাত্মার কয়েকজন শিষ্য বাস করিত। শিষ্যগণ গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া রীতিমত শাস্ত্রালোচনা করিত।

প্রাচীন কালের আর্য্যঋষিগণের মত এই সকল শিষ্য গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর সেবা করিয়া ব্রহ্মচারীর জীবন কাটাইত।

শিষ্যদের মধ্যে কেহ বা প্রভাতে পূজার জন্য ফুল ফল সংগ্রহ করিতে বাহির হইত, কেহ বা গুরুগৃহের অপর কোন কার্য্য করিয়া দিত; কেহ বা যজ্ঞের জন্য কাঠ আনিতে দূর বনে যাইত। সূর্য্যোদয় হইলে এইরূপে নানাকার্য্যে শিষ্যগণ ব্যস্ত থাকিত। তারপর বেলা হইলে অধ্যয়ন, বিচার প্রভৃতি হইত। তারপর প্রায় মধ্যাহ্নকালে কেহ বা পশ্চিমমুখে, কেহ বা পূর্ব্বমুখে, কেহ বা উত্তরমুখে এবং কেহ বা দক্ষিণমুখে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া নিকটস্থ গ্রামে প্রবেশ করিত ও গৃহস্থদিগের বাড়ী হইতে সেই দিবসের মত চাউল ভিক্ষা করিয়া আশ্রমে ফিরিত। পরে সেই চাউল পাক করিয়া আশ্রমের সকলে ভক্ষণ করিত। এইরূপে সকলে ত্যাগীর মত ব্রহ্মচারীর জীবন কাটাইত। আশ্রমে বড় শান্তি, বড় সুখ, বড় আনন্দ। সংসারী লোকের ধারণায় সেই শান্তির কল্পনা হয় না। বিষয়ের ঘোর চিন্তায় উত্তপ্ত মস্তিষ্ক সংসারে অশান্তি পাইয়া যদি রাজা সুরথের মত একবার এই শান্ত তপোবনে আসিতে পারে, তবেই বুঝিতে পারে শান্তির মূর্ত্তি কিরূপ, আনন্দের প্রকৃতি কেমন, নচেৎ কেবল ধারণায় কিছুই আসিবে না।

এই শিষ্যদিগের প্রতি গুরুর আদেশ ছিল যে, তাহারা প্রাণপণে কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টী রিপুকে অগ্রে দমন করিবার চেষ্টা করিবে। শাস্ত্রে জ্ঞানের কথা আছে বটে, কিন্তু জ্ঞানীর মত হৃদয় ও বুদ্ধি না হইলে, জ্ঞানীর মত সত্য সত্যই জীবন কাটাইতে না পারিলে, মুখে কতকগুলা শ্লোক পাঠ করিলে কি হইবে! গুরুদেব পাকা গুরু ছিলেন বলিয়াই, দীক্ষা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই চরিত্রগঠন করিয়া দিয়া শিষ্যগণকে প্রকৃত মানুষ করিয়াছিলেন।

অভ্যাস-মত একদিন একটী শিষ্য ভিক্ষায় বাহির হইয়া নিকটস্থ একটী গ্রামে একটী গৃহস্থের বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী সে দিন মদ্যপান করিয়া নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছিল। গ্রামে ইতর জাতিও বাস করিত। সেই মত্ত লোকটাকে লইয়া গ্রামে একটা গোলমাল চলিতেছিল। এমন সময়ে সন্ন্যাসীর মত একটা ভিক্ষুককে বাড়ীর দ্বারে দেখিয়া মত্ত লোকটী অভদ্র ভাষায় নানারূপ সম্বোধন করিতে লাগিল। শিষ্যটী গৃহস্থের বাড়ী আসিয়া এইরূপে অপমানিত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে মত্ত লোকটী বেগে আসিয়া তাহার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। শিষ্যটী হতবুদ্ধি হইয়া গেল তখন মত্ত লোকটী বলিতে লাগিল, "বাবা, গেরুয়া কাপড় প'রে দুপুর বেলায় কি মনে ক'রে এসেছ! ভিক্ষে? না, আরও কিছু?"

এইরূপে যখন শিষ্যটীকে লইয়া উৎপীড়ন করিতে লাগিল, সেই নিরীহ ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল; তথাপি তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইল না। মত্ত লোকটী কখন ব্রহ্মচারীর মাথার জটা ধরিয়া টানিতে লাগিল, কখন বা কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল, অবশেষে মত্ত লোকটী ক্রোধান্ধ হইয়া ভিক্ষার ঝুলি ছিঁড়িয়া চাউল রাস্তায় ছড়াইয়া ফেলিল। যখন ব্রহ্মচারী দেখিল, ভিক্ষার সব নষ্ট হইল, তখন অত্যন্ত দুঃখিতভাবে সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, মাতালটী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বিনা কারণে ব্রহ্মচারীকে প্রহার করিতে লাগিল। গ্রামের সকলের মধ্যস্থতায়ও মাতালের অন্যায় ব্যবহার বা অত্যাচার বন্ধ হইল না। নিরীহ ব্রহ্মচারী কোনও কথা কহে নাই, তথাপি কি এক অব্যক্ত কারণে মাতালের রাগ ক্রমশঃ বাড়িয়া এই ভয়ানক অত্যাচারে পরিণত হইল।

রক্তাক্ত, ক্ষত ও ধূলিযুক্তদেহে শূন্যহস্তে খুন্নহৃদয়ে শিষ্যটী আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, "ভিক্ষা আজ মিলিল না।"

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! গায়ের ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছে কেন? ভিক্ষাই বা মিলিল না কেন?"

শিষ্য উত্তর করিলেন, "প্রভু! আজ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।"

গুরুদেব সাগ্রহে বলিলেন, "কি বৎস!"

শিষ্য বলিলেন, "প্রভু, আজ ভিক্ষা করিতে যাইয়া একটী মদমত্ত অজ্ঞান সংসারীর নিকটে লাঞ্ছনা পাইয়াছি। বিনা কারণে সে আমার ভিক্ষার নষ্ট করিয়াছে এবং আমার শরীরে এই সব ক্ষত করিয়াছে। আমি প্রহৃত ও অপমানিত হইয়াছি—তাহাতে তত দুঃখ হয় না, আমাদের আশ্রমবাসিগণের আহারের অন্ন চক্ষের সমক্ষে নষ্ট হইল, ইহাই বড় ক্ষোভের কথা।"

গুরুদেব শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃথা কারণে তোমার এরূপ মর্ম্মান্তিক পীড়া দিল, তা তুমি কিছু উত্তর করিলে না কেন? নীরবে সহ্য করিলে কেন?"

শিষ্য বলিলেন, "গুরুদেব! আপনিই শ্রীমুখে উপদেশ দিয়াছেন ধৈর্য্যের চেয়ে আর বড় গুণ নাই। মানুষ যদি ক্রোধ-রিপুকে দমন করিতে পারে, তবে তাহার একটা অতি মহৎকার্য্য করা হইল, মনে করিবে।' আপনার এই উপদেশ মনে করিয়া আমি ধীরভাবে সব সহ্য করিয়াছি এবং পাছে রাগ আসিয়া পড়ে বলিয়া খুব সাবধানে থাকিয়াছি। তার উপর মনে করিলাম আজ আমার পরীক্ষার দিন। সেইজন্য এইরূপে অপমানিত হইয়াও নীরবে সব সহ্য করিয়াছি।"

গুরুদেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বৎস! সর্ব্বনাশ করিয়াছ। তোমাদের সহিষ্ণুতা সংসারীদের সর্ব্বনাশ করে। যাও—শীঘ্র যাও—সেই

মোহান্ধ—অত্যাচারীটাকে দুটা গালাগালও অন্ততঃ দিয়া আইস। তুমি তার জন্ম যে শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছ, তাহা অতি ভয়ানক। মানুষ যখন উৎকট অত্যাচারের প্রতিফল না দিয়া নীরবে সহ্য করে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহার দুঃখে তাহার হইয়া গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তুমি যখন এত অত্যাচার পাইয়াও নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছ, নিশ্চয় জানিও, সেই মত্ত লোকটার কোন বিপদ্ ঘটিবেই—আজই—ঘটিবে—হয় ত এতক্ষণ কিছু হইয়া থাকিবে। যাও—শীঘ্র যাও, যদি সেই সংসারীটাকে বাঁচাতে চাও, এখনি গিয়া তাহাকে কতকগুলা কটু কথা বলিয়া আইস, তবে যদি ঈশ্বরের মারটা খণ্ডিয়া যায়। তুমি একে ব্রাহ্মণ, তায় পবিত্র ব্রহ্মচারী, তায় মধ্যাহ্নে ভিক্ষায় ফেলিয়া দিয়া বিনা কারণে প্রহার, তায় নীরবে অত্যাচার সহ্য করা—ওঃ! এ সব কি কম! যাও—যাও, সে বোধ হয় জ্বলে গেল!"

শিষ্য অতি সত্বর সেই গৃহস্থের গৃহের দিকে ছুটিল। তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। রবির কিরণে চারিদিক্ তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতি শীঘ্র সেই গৃহস্থের বাড়ীর কাছে গিয়া দেখে, সেখানে মহা গোলমাল। দ্বিবাভাগে তাহার বাড়ীখানি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। একখানি দুইখানি করিয়া গৃহস্থের ঘরগুলি ভস্মীভূত হইতেছে—আর গৃহস্বামী বুক চাপ্ড়াইয়া চীৎকার করিতেছে ও উন্মত্তভাবে বলিতেছে—"আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। হঠাৎ অগ্নি লাগিল।"

গৃহস্থের দুটী ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে ও সকলের চোখের সমক্ষে তাদের বড় সাধের থাকিবার ঘর পুড়িতেছে।

শিষ্য বিস্মিত হইল। কালবিলম্ব না করিয়া সে গৃহস্বামীকে এই বলিয়া গালাগালি করিতে লাগিল, "বড় তেজ যে, মিছামিছি—ব্রহ্মচারীকে প্রহার কেন? মদ খেয়েছ ব'লে সংসার মাথায় করেছ।

...ছি!" ইত্যাদি। কারণ, সে বেশ বুঝিতে পারিল যে, তার প্রতি ...রই ফল দিবাভাগে এই আকস্মিক দুর্ঘটনা।

এইরূপে যত গালাগালি করিতে লাগিল, অগ্নির তেজও তত কমিতে লাগিল। গুরুর উপদেশ মাথায় করিয়া সে কার্য্য করিল এবং হাতে হাতে ফল পাইল, গৃহস্থের গৃহ অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিল ও শিষ্য মনে মনে গুরুকে শত শতবার প্রণাম করিতে লাগিল।

এইরূপ যখনই কোন একটা অত্যাচার হয় এবং মানুষ যখনই অত্যাচারীর সহিত সমান পাল্লা না দিয়া নীরবে অপমান, দুঃখ ও যাতনা সহ্য করে তখনই এক বিচিত্র উপায়ে সে অত্যাচারের প্রতিফল প্রায়ই আসিয়া থাকে। কারণ, ভগবানের রাজ্যে অবিচার হইয়া যাইবার উপায় নাই। সকল মানুষকে তিনি কিছু কিছু শক্তি দিয়াছেন, ভাল মন্দ জানিবার জন্য বিবেক দিয়াছেন, এখন মানুষ আপন স্বভাবে পৃথিবীতে থাকিয়া কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে। যদি কোন একজন অপর একজনের উপর অন্যায় করে, অবিচার করে, অত্যাচার করে, মানুষই তাহার শাসন করিবে, তাহার জন্য কোতোয়ালী বিচারালয় আছে, গ্রামের পঞ্চায়েৎ আছে, পাঁচজনের শক্তি আছে। যেখানে একজন মানুষ অত্যাচারের প্রতিফল দিতে পারে না, সেখানে সে আর পাঁচজন মানুষের কাছে সাহায্য চায়। যখন মানুষ নিরুপায় হয়, যখন তাহার পক্ষে অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকে না, যখন অত্যাচারী প্রবল শক্তিমান্ থাকে, তখনই এইরূপ নিশ্চয় নির্ভরতার ব্যাপার ঘটে এবং সেই জন্যই মাঝে মাঝে অলৌকিক প্রতিহিংসার বিষয় আমরা শুনিতে পাই।

যিনি সব সময় ঈশ্বর স্মরণ করেন! সব কাজে ঈশ্বর চিন্তা করেন, সর্ব্বদাই ভাবেন, "হে ঈশ্বর! তুমি পিতা, আমি সন্তান, তুমি প্রভু, আমি

দাস, তুমি উপাস্য, আমি তোমার ভক্ত," যিনি সর্ব্বদাই ধারণা করেন, আমি তাঁর কোলে রহিয়াছি, আমার বিপদ কোথা ? তাঁর খেলা খেলিতে এসেছি তাঁকে ডাকা ছাড়া আর কি আসল কাজ আছে ?," তিনিই যথার্থ সুখী, প্রকৃত কর্ম্মী তাঁর শক্তি ইহকালে কি পরকালে কথনও মন্দ হইতে পারে না, কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।
বি, এ, বি, এল,

হানাবাড়ী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কতদিন যে আমাদিগকে এ রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে অবস্থিতি করিতে হইবে তাহা অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন কে বলিতে পারে ? এই অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপারের প্রতীকার কল্পে চারিদিকে ওঝা, ভূত-বৈদ্য, আত্মিকতত্ত্ববিশারদ প্রভৃতি ভিন্ন শ্রেণীর লোকের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। অবশেষে, এক-জন ওঝা আসিয়া গৃহ বন্ধন করিয়া দিয়া গেল। গৃহ-বন্ধনের পর প্রায় মাস পাঁচ ছয় কোন উপদ্রব হইতে দেখা যায় নাই। তদনন্তর, পুনরায় পূর্ণমাত্রায় অত্যাচার আরম্ভ হইল। পূর্ব্বপরিচিত ওঝার অনুসন্ধান করিতে শুনা গেল যে, সে আমাদের গৃহ-বন্ধনের এক মাস পরে প্লেগে মারা গিয়াছে।

তারপর একজন ভূত-বৈদ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি বাড়ীর ভিতর বাহির পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, পাঁচ ছয়টী ভূতে এই সব উপদ্রব করিতেছে। আর এরা সব সময়ে এখানে থাকে না; ইহাদিগকে উড়ন্ত ভূত কহে। ইহাদের মধ্যে ভাল মন্দ উভয় শ্রেণীর ভূত আছে। ওঝা মহাশয় আত্মিক ব্যাপার সম্বন্ধে অনেক ক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন যে, উড়ন্ত ভূতকে তাড়ান সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে অনেক সময় লাগিবে ; সুতরাং আমাদিগকে এখন কিছু দিন ধরিয়া অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। ইতিমধ্যে তাহাকে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। যাইবার সময়, এই বলিয়া ভরসা দিয়া গেলেন যে, হাজার অত্যাচার করুক না কেন, শরীরের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারিবে না—সে অধিকার, সে ক্ষমতা ইহাদের নাই।

ওঝামহাশয় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; আর আমরা একজন আত্মিকতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতের পরামর্শানুসারে আধুনিক প্রণালীতে ভূত নামাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রথম দু' এক দিন পরিবারস্থ পাঁচ ছয় জনে মিলিয়া "চক্র" (circle) করিয়া বসিলাম; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। সুতরাং সে পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্লাঞ্চেট (planchette) সাহায্যে ভূত নামাইতে চেষ্টা করিলাম।

প্রথম দিবসেই আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। সেইদিন তিন চারিটী ভূত আসিল। ক্রমে, তাহাদের নাম প্রকাশ করিল, কিন্তু সহজে তাহাদের পরিচয় দিতে চাহিল না। ক্রমাগত মাসাধিক উক্ত প্রণালীতে অধিবেশন চলিল। তাহাতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, মকরন্দ, রামু, কালু, শিবু ও আনন্দ নামে পাঁচ জন ভূতে ঐ সব অত্যাচার করিতেছে; তন্মধ্যে মকরন্দ ভাল ভূত; সে অন্যান্য ভূতের নিকট জিনিষ

পত্র টাকা কাড়িয়া আমাদিগকে দিত ; আরও জানিতে পারা গেল যে, সেই আমাদের বাড়ীতে কয়দিন আহ্নিক করিয়া গিয়াছিল। পরে অন্য ভূতের নিকট জানা গেল যে, সে এখন আর আমাদের এখানে না থাকিয়া বর্দ্ধমান ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ন'পাড়ায় কোন মজুমদারদের বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছে। বলা বাহুল্য, উৎসাহ ও সময়াভাবে আমরা এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। তবে যদি কেহ কৌতূহল নিবারণার্থ এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার নিকট পত্র লিখিলে, উক্ত মজুমদার মহাশয়ের ভূত-প্রদত্ত নাম ও ঠিকানা দিতে পারি, কিন্তু বলিতে পারি না, ইহা কতদূর সত্য। তবে, এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে ভূতের নিকট হইতে এই বিষয়টী জানা গিয়াছে, তাহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছি।

মকরন্দ, রামু, কালু, শিবু ও আনন্দ ব্যতীত শিবু নামে আর একটী ভূত ছিল। নামেই বুঝিতে পারা যাইতেছে, ইহারা উড়িয়া ভূত। তারপর, জানা গেল যে, ইহাদের মধ্যে অনেকেই বাগানের মালী ছিল। কিন্তু কি প্রকারে মারা গিয়াছিল, তাহা বলিতে চাহিল না। ইহাদের মধ্যে শিবু নামে যে ভূত, তাহার দ্বারা অনেক বিষয় আমরা জানিতে পারিলাম এবং সে-ই কেবল আত্ম-পরিচয় দিয়াছিল। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহার সহিত এতদ্‌সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার কি উত্তর দিবেন ?—হাঁ।

আপনি যেখানে আছেন, সে কি ভাল যায়গা ?—না।

আপনার সেখানে কি ভাল লাগে ?—না।

সেখান হ'তে আপনার চলে আস্‌তে ইচ্ছা হয় কি ?—খুব।

কোথায় যেতে ইচ্ছা করেন ?—অমরপুরী।

সেখানে কি করে যাবেন?—আমার পিণ্ডী (অর্থাৎ তাহার নামে ৺গয়াধামে পিণ্ড দিলে, সেখানে যেতে পার্ব্বে)।

তা'হলে আপনার নাম ধাম বলুন।—আমি উড়ে।

আপনার পূর্ণ নাম কি?—শ্রীচন্দ্রকুমার সান্ত।

'সান্ত' কি আপনার পদবি?—হাঁ।

আপনার পিতার নাম?—শ্রী (তারপর প্লাঞ্চেট চলিল না)।

আপনার কি স্মরণ নাই?—আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

আপনার গোত্র কি মনে আছে?—মামাথা।

'মামাথা' কি?—উড়ে গোত্র।

আপনার কোন গুরু ছিল কি?—হাঁ।

গুরুর নাম কি?—শ্রীমামাথা।

আপনার কোন্ জেলায় বাড়ী ছিল অনুগ্রহ ক'রে বলুন।—আমার?

হাঁ আপনার।—চন্দ্রনগর।

উড়িষ্যাদেশে কি আপনার বাড়ী ছিল না?—রাস্তার কুলি!

কি প্রকারে আপনি দেহত্যাগ করিলেন?—গাড়ী চাপা।

কি গাড়ী?—ঘোড়ার গাড়ী।

এ ঘটনা কোথায় হয়েছিল?—রাস্তায়।

চন্দ্রনগরে, না এখানে?—সেখানে (অর্থাৎ চন্দ্রনগরে)।

আপনি এখানে কি প্রকারে আসিলেন?—এক জনের সঙ্গে।

তিনি কি এখনও আপনার সঙ্গে আছেন?—হাঁ।

তিনি কে?—দাদা!

আপনি 'শিবু' বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু 'চন্দ্রকুমার' নাম বলিলেন, কোন্‌টী সত্য?—এখানে আমার শিবু নাম।

* * *

আপনি কতদিন পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন?—ষাট বৎসর।

আপনি বরাবর কি একই স্থানে আছেন?—হাঁ।

আন্দ, কালু, প্রভৃতি আপনার সহিত কতদিন আছেন? পঁচিশ বৎসর।

তারপর শিবু চলিয়া গেল। তাহার নিকট হইতে আমরা পরলোক সম্বন্ধে অনেকতত্ত্ব পাইলাম, তবে সবই যে সত্য, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, তাহারা আবার মধ্যে মধ্যে অনেক অলীক বিষয় বলিয়া থাকে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, প্ল্যাঞ্চেট বৈঠকে আমরা অবগত হইলাম যে, আমরা যদি এ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া না যাই, কিংবা প্রেতাত্মাগুলির নামে ৺গয়াধামে পিণ্ড প্রদান যদি না করি, তাহা হইলে তাহারা আমাদের বিশেষ অনিষ্ট করিবে। অতএব, এই ভৌতিক অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার দুইটী উপায় আছে; একটী, প্রেতাত্মাদিগের নামে পিণ্ড প্রদান, এবং অপরটী, এই বাটী পরিত্যাগ।

পূর্ব্বে যে ওঝা কর্ত্তৃক প্রতীকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কিছুই করিতে পারা যায় নাই। কারণ, ওঝামহাশয় আমাদের গৃহ-পরীক্ষার পর হইতেই রোগ শয্যায় শায়িত হইয়াছেন। আরও শুনা গেল যে, সেই রাত্রেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বপ্ন দেয় যে, যদি তাহার পিতা এই ভৌতিক অত্যাচার নিবারণার্থে কোনরূপ প্রতীকারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার পিতার বাঁচিবার আশা রাখিবে না। অতএব, সে যেন তাহার পিতা উক্ত ওঝামহাশয়কে নিষেধ করে। উক্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত ও তৎসঙ্গে ওঝামহাশয়ের রোগ সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায়, অপর কোন ওঝা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহিল না। সুতরাং উক্ত দুইটীর উপায় ভিন্ন, অর্থাৎ হয় পিণ্ড প্রদান, না হয় গৃহ পরিত্যাগ, অন্য প্রতীকার নাই। সুতরাং এই দুইটীর মধ্যে যেটি সুবিধা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এদিকে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ভূতমহাশয়েরা অধিকতর অত্যাচার আরম্ভ করিল। বৈঠকে উপস্থিত হইয়া আমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়া কেবল অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে, তাহাদিগকে বশে আনিতে না পারায় আমরা বৈঠক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

অবশেষে ভগবানের কৃপায় আর একজন বিখ্যাত ওঝার সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি পনর দিন ধরিয়া নানারূপ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া আমাদিগকে এই অভাবনীয় ভৌতিক অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিলেন। সেই পর্য্যন্ত আর কোন অত্যাচার হয় নাই।

পরিশেষে, আমার বক্তব্য এই যে, পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় এই অদ্ভুত ভৌতিক কাহিনীর পরিসমাপ্তি সংক্ষেপে করিতে বাধ্য হইলাম। সুতরাং অনেক আশ্চর্য্য বিষয়, বিশেষতঃ আত্মিকদের সহিত পরলোক সম্বন্ধে ও তাহাদের গতিবিধি বিষয়ক যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা অপ্রকাশিত রহিয়া গেল।

শ্রীঅমৃতলাল দাস।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথমে আমরা দুইটী সফল ভবিষ্যদ্বোধনের বিষয় উল্লেখ করিব। আমরা দেখিব যে, প্রাগ্‌দর্শন কতদূর সম্ভবপর এবং মানব প্রবল ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে আপনার অদৃষ্টকে কিরূপে নিয়ন্ত্রিত ও তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এ দুইটি ঘটনাই থিওসফিকাল সোসাইটীর সভ্য, তত্ত্বান্বেষী

লেড্‌বিটার (c. w. leadbeater) সাহেবের সুপরিচিত বন্ধু সম্বন্ধীয় এবং তিনি ইহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে স্বয়ং সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

যাঁহারাই প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কখনও কখনও আবিষ্ট (medium) ব্যক্তির হস্ত স্বতশ্চল হইয়া নানা বিষয় লিপিবদ্ধ করে। এইরূপ লিখন ধারাকে তাঁহারা অটোম্যাটিক্ রাইটিং (automatic writing) নামে অভিহিত করেন। তাঁহাদিগের মতে, এইরূপ লিপি সাহায্যে প্রেতেরা ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিষয়ের নানা সংবাদ প্রদান করে। তাঁহারা আরও বলেন যে, সকল সময়েই কেবল প্রেতবাহিত হইয়াই যে এইরূপ লিখন হয়, তাহা নহে; অনেক সময় দূরস্থ জীবিত লোকেরও মনের ইচ্ছা বা বাসনা এইরূপে প্রকাশ পায়।

কোনও এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এইরূপ লিখনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহাকে আবিষ্ট করিলেই তাঁহার হস্ত যন্ত্রের মত চলিতে আরম্ভ করিত এবং বিদেহীর ও দূরস্থ দেহধারীর অনেক কথা এইরূপে লোক-সমক্ষে প্রচার করিত। তিনি আবিষ্ট আছেন এমন সময়ে যেন একজন স্ত্রীলোক তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "তিনি (স্ত্রীলোক) অতিশয় মনঃপীড়ায় আছেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতেছে। এইরূপ আশা ভঙ্গ তাঁহার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। আরও বলিলেন, "এইরূপ অবজ্ঞা আর কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া, সভায় যাইয়া দেখিলাম যে, কোথায় সভাগৃহ দূরস্থ লোক সমাগমে জনচয়পরিপূর্ণ হইবে, তাহা না হইয়া দুই দশ জন বিশিষ্ট সভ্য ব্যতিরেকে তথায় আর কেহ নাই! আসন সমস্ত শূন্য, সভাগৃহ নিস্তব্ধ! আগত সভ্যকয়জন উৎকণ্ঠিত চিত্তে মুক্ত বাতায়ন দিয়া রাজপথ লক্ষ্য করিয়া আছে।" বক্তৃতা করা স্থগিত রহিল। শূন্য সভাগৃহে,

অনধিকৃত আসন সমক্ষে বক্তৃতায় কি ফল?" অবশ্য তিনি বক্তৃতার বিষয় ও সভাগৃহের নামও প্রকাশ করিলেন।

তিনি ঐ স্ত্রীলোককে জানিতেন, কিন্তু বিশেষ তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন না। অতএব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ কিছু করিলেন না। কিন্তু কয়েক দিবস পর, সেই স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার সহসা সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার (স্ত্রীলোকের) বিপ্রলম্ভের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিলে, সেই স্ত্রীলোক একেবারে স্তম্ভিত হইলেন এবং বিস্ময়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন, "কই, আমিত সেই বক্তৃতা এখনও করি নাই; তবে আগামী (অমুক) দিবসে দিব, ইহা স্থির হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, তোমার হস্তলিখন ভবিষ্যদ্বোধনে যেন পরিণত না হয়!"

কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইয়াছিল; যাহা বহুদিন পরে ঘটিবে, তাহারই যথাযথ পূর্ব্বাভাস আবিষ্টের হস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। বক্তৃতা সভায় দুই দশজন ব্যতিরেকে কেহই উপস্থিত হন নাই; বক্তৃতা স্থগিত হইয়াছিল; বক্তৃকামা বিরক্ত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন। কে যে আবিষ্টকে এই সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই দিয়াছিল, তাহা ঠিক বুঝা যায় না; তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে চৈতন্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, ইহা তাহারই খেলা। হয়ত কোনও মহাপুরুষ বা অদৃশ্য দিব্য সহায়ক এই সংবাদ প্রচার করিয়াছিল; না হয় সেই স্ত্রীলোক নিজেই তাহা করিয়াছিল। তাঁহার অধিযজ্ঞ পুরুষ বুঝিয়াছিলেন যে, অধিভূতের আশাভঙ্গ জনিত মনঃপীড়া এত অধিক হইবে যে, তাহাতে স্থূল স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত হইবার সম্ভাবনা; তাই তিনি ভাবি ঘটনার পূর্ব্বাভাস দিয়া এইরূপে মনকে অনেকটা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এখানে আর একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলা যাইতে পারে। অধিদৈব পুরুষ তাঁহার নিজের অধিভূত পুরুষকে সাক্ষাদ্ভাবে ঐই সংবাদ না দিয়া

আবিষ্টের সাহায্যে পরোক্ষভাবে কেন দিলেন ? সামান্য চিন্তা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, আমরা ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, সকল স্থূলদেহে বা স্থূলদেহস্থিত মস্তিকে সূক্ষ্ম লোকের (ভুব, স্বর্গ প্রভৃতি) অনুভূতি সঞ্চারিত করিতে পারা যায় না ; কারণ দেহ হইতে দেহান্তরে ভাব সঞ্চালনের যে যন্ত্র, তাহা সকলের সমভাবে বিকশিত নহে। অথবা, হয়ত, স্থূল-মস্তিষ্ক চিন্তার পর চিন্তাতরঙ্গে এরূপ ভাবে পরিপূর্ণ থাকে যে, তাহাতে সূক্ষ্ম লোকের কোনও ভাব অঙ্কিত করিতে পারা যায় না * তাই সেই সব স্থলে আপনারই সূক্ষ্মানুভূতি আপনার স্থূল মস্তিষ্কে সঞ্চালন করিতে সক্ষম না হইয়া অধিদৈব পুরুষ অপরের সাহাযো পরোক্ষভাবে তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমাদিগের বর্ত্তমান উদাহরণের ভদ্র লোকটি অতি সহজে আবেশনীয় (mediumstic); তাই হয়ত সেই স্ত্রীলোকের অধিদৈব পুরুষ অনন্যোপায় হইয়া আবেশনীয় ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ পরোক্ষ সাহায্য গ্রহণের উদাহরণের অভাব নাই। যাঁহারা প্রেততত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহারা এইরূপ ঘটনা প্রায়ই সাক্ষাৎকার করেন। অপরের ভাবি বিপদের বিষয়, মানব কখনও কখনও যে স্বপ্ন দেখেন, তাহার মূলেও এই সত্য নিহিত আছে।

অপর এক সময়ে আমাদিগের পূর্ব্ব-কথিত ভদ্রলোকটি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে একখানি অতি বিস্ময়কর পত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। পত্রখানিতে তাঁহারই পরচিত এক রমণীর এবং যেন তাঁহাকেই সম্ভাষণ করিয়া পত্রখানি লিখিত। তাহাতে রমণীর বর্ত্তমান জীবনের একটি দুঃখকাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে তাহার সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম।

"কোনদিন সেই স্ত্রীলোক তাঁহার একজন সুপরিচিত লোকের

---

* অলৌকিক রহস্য ৪র্থ ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, "স্বপ্ন তত্ত্ব"।

সহিত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আলাপন করেন। (অবশ্য তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম সেই পত্রে লেখা ছিল।) এই আলাপনই তাঁহার সকল যাতনার মূল, তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতুভূত কারণ। রমণী লিখিতেছেন,—"কেন আমি তাঁহার সহিত এতৎ প্রসঙ্গে আত্মভাব প্রকাশ করিলাম! আমার এই অবিচারিত মানসিক দৌর্ব্বল্যেই ত আমি তাঁহার ক্রীড়ার পুত্তলিবৎ হইলাম! তাঁহার দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইলাম! অবশ্য প্রথম আমি অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলাম —আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়াছিলাম যে, আমার এই কার্য্যে আদৌ সম্মতি নাই। কিন্তু কি করিব, তাঁহাকে অধিকক্ষণ বাধা দিতে আমার শক্তি ছিল না! তাঁহার কি মোহকরী বিচার-প্রতিভা! আমি অবশেষে পরাভূত হইলাম। বৎসরেকের পরেই এই কার্য্যের অতি কটু বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে ইহার চরম পরিণাম কাল আসিল। এখনও স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় কাঁপিতেছে! অনুতাপে, বেদনায় আমি অধীর হইতেছি,—অবশেষে আমি সেই ভয়ঙ্কর মহাপাতক করিলাম। তদবধি আমার জীবন ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন। আমার প্রাণ অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতেছে। এ যন্ত্রণার কি অবসান নাই? এ দাবাগ্নির কি শান্তি বারি মিলে না?"

এই বলিয়া রমণী তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সমাধা করিলেন। সেই ভদ্রলোকটি রমণীকে বিশেষ রূপে জানিতেন। রমণী যে আত্মকাহিনী বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি যে প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাহাতে তাঁহার দ্বারা যে সেই ঘৃণিত কার্য্য সম্ভবপর, ইহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই। তাই যখন তিনি সেই স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার সমীপে সেই পত্রের আমূল শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ঘটনার কথা

সেই স্ত্রীলোকের মনে কখন স্বপ্নেও স্থান পায় নাই। সেই রমণী প্রাতে সদ্য-বিকসিত নলিনীর মত এখনও অমলিনা, এখনও আনন্দময়ী, অনুতাপ বা ভাবনা তাঁহার প্রফুল্ল প্রাণে এখনও কোনও রূপ কালিমা সঞ্চার করিতে পারে নাই। কিন্তু এই বিবরণ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, তাঁহার বর্ণনায় ইরূপ একটী অনুক্রম, এইরূপ সজীবতা ছিল যে, তাহা সেই স্ত্রীলোকের হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল।

বহুদিন অতীত হইয়াছে; সেই চিত্র রমণীর চিত্ত-পট হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে; ইতি মধ্যে একবার তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই। তিনি নির্জ্জনে কোনও ভদ্রলোকের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া আলাপন করিতেছেন, এমন সময়ে বৈদ্যুতিক বিভার মত সেই পুরান স্মৃতি সহসা তাঁহার মানস-গগনে বিভাসিত হইয়া উঠিল। এতদিন যাহার কথা আদৌ মনে ছিল না,—সেই সম্ভাষণ,সেই যুক্তি,সেই তর্ক!—তাঁহকে বশীভূত করিতে সেই প্রবল চেষ্টা! বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-প্রসূত কুন্দনন্দিনী মৃত মাতা পার্শ্বে চেতনোদ্বোধক যে স্বপ্ন-চিত্র দেখিয়াছিলেন, দুর্ব্বল-হৃদয়া বালিকা তাহার সঙ্কেত না লইয়া নগেন্দ্রনাথের করে যেই রূপ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদিগের এই সত্য-ঘটনা-মূলক কাহিনীর নায়িকা সেইরূপ আত্মবিক্রয় করেন নাই। তাঁহার প্রতিযোগীর বাক্যবিন্যাসে, তাঁহার যুক্তি তর্কে, এবং অধিকতর শক্তিশালী তাঁহার করুণ প্রার্থনায় যতই সেই রমণী আত্ম বিস্মৃত হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, ততই সেই পুরান স্মৃতি অধিকতর উজ্জ্বলতার সহিত তাঁহার মানস-পটে দেদীপ্যমান হইতে লাগিল;—সেই প্রলোভনে আত্ম-বিসর্জ্জনের কি বিষময় ফল! তাহার চিত্র তখন: তিনি সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। তাই তাঁহার চিত্তে যে আত্মশক্তি নিহিত ছিল, তাঁহার যে মানসিক বল অবশিষ্ট ছিল, তাঁহার যতখানি পুরুষকার ছিল, তাহা যেন পুঞ্জীকৃত করিয়া, তিনি: সংশয়াস্পদ তাঁহার সেই বন্ধুর বাক্যাবলি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া, সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। তাঁহার

শেষ দৃঢ়তায়, তাঁহার আচম্বিত কঠোর ব্যবহারে তাঁহার আশান্বিত বন্ধু একেবারে স্তম্ভিত হইলেন।

এইরূপে পুরুষকার দ্বারা রমণী তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি ফিরাইয়াছিলেন। তিনি যদ্যপি প্রবল ইচ্ছাশক্তিদ্বারা ঘটনাস্রোত স্তম্ভিত না করিতেন, তাহা হইলে উত্তর কালে, আবিষ্ট-কর-প্রসূত অদৃষ্ট-লিখনানুযায়ী তাঁহার সেই ভীষণ পরিণাম যে না হইত, একথা কে বলিবে? ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথে অজ্ঞাত বনপথে যাইতে যাইতে পথিক যেমন "আর অগ্রসর হইও না কূপে পতিত হইবে"- এই আচম্বিত উক্তিতে স্তম্ভিত হয় এবং গতি পরিবর্ত্তন করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করে এই স্ত্রীলোকেরও তাহাই হইল। হয়ত তাহার অধিযজ্ঞ পুরুষ (Individuality), বা হয়ত কোনও পরহিতব্রতী মহাপুরুষ বা দেবতা সূক্ষ্মলোকে সেই রমণীর আবা কার্য্য-পরম্পরা ও তাহার ভীষণ পরিণামের চিত্র অবলোকন করিয়া সেই রমণীকে, প্রকৃতপক্ষে সেই রমনীর অধিভূত পুরুষকে (Personality) সতর্কিত করিবার জন্ত আবিষ্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রমণী যদ্যপি বিবেচিকা না হইতেন, যদ্যপি এই ভবিষ্যদ্বাক্যে উদাসীন হইয়া কঠোরতার সহিত প্রবল পুরুষকার প্রয়োগ না করিতেন, তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত উদাহরণটীর মত সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইত এবং রমণীর জীবন অনুতাপে ও মর্ম্মপীড়ায় ভারাক্রান্ত হইত।

অতএব আমরা দেখিলাম, প্রাগ্‌দর্শন বহুদূর সম্ভবপর এবং পুরুষকার দ্বারা মানব কিরূপে ভবিতব্যতাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। যেমন এই উদাহরণ দুইটিতে আবিষ্টের সাহায্যে সূক্ষ্মলোক, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র জাগ্রৎ-চৈতন্তের বিষয়ীভূত করা হইয়াছিল, সেইরূপ অনেক স্থলে স্বপ্নেও সেই কার্য্য সংসাধিত হয়। আমরা যথাস্থানে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

সাধু-প্রসাদ।

আমার জনৈক সহপাঠী বাল্যবন্ধুর বিবাহ কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ ধনীর কন্যার সহিত আজ প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে। বন্ধুর শ্বশুর মহাশয়ের পুত্রসন্তান না থাকায়, বন্ধুর স্ত্রী পিতৃত্যক্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবেন, এই ভাবি সম্পদের আশায় আমরা বন্ধুবরকে খুবই ভাগ্যবান্ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু বিবাহের পর শুনিলাম যে, বন্ধুর স্ত্রী দেখিতে সুশ্রী হইলেও মূক ও বধির। সে জন্য বন্ধুবর বিবাহে সুখী হইতে পারেন নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে বন্ধুর শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্ত্রী পিতৃত্যক্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন, কিন্তু বন্ধুবরের মানসিক সুখ ছিল না। তিনি সংসারে উদাসীন ভাবে কালাতিপাত করিতেন।

৫।৬ মাস হইল, তিনি ৺কাশীধামে বেড়াইতে যান। সেখানেও তাঁহার স্ত্রীর বিকলাঙ্গের জন্য মনঃকষ্ট হয়। একদিন সন্ধ্যাকালে জাহ্নবীতীরে ভ্রমণকালে তাঁহার সহিত একটী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন,—"তোমার স্ত্রী মূক ও বধির, সেজন্য তুমি মনঃকষ্টে আছ।" কিরূপে সন্ন্যাসী স্ত্রীর ব্যাধির কথা জানিতে পারিলেন, এই ভাবিয়া বন্ধু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি স্ত্রীর অবস্থা স্বীকার করিলেন ও যাহাতে তিনি নির্ব্ব্যাধি হন, সন্ন্যাসীর নিকট এই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেন। সন্ন্যাসী প্রথমে তাঁহাকে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বন্ধুর পুনঃ পুনঃ আন্তরিক অনুরোধে একটী শিকড় দিলেন ও বলিলেন,—"যখন কলিকাতায় বাড়ী গিয়া স্ত্রীর ঘরে যাইবে, তখন এই শিকড়টী তোমার পকেটে রাখিও। ঘরে যাইবামাত্রই তোমার স্ত্রীর মূক ও বধিরতা লোপ পাইবে।"

আনন্দে বন্ধুবর সে রাত্রিতেই কলিকাতা রওনা হইলেন। পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ী পৌঁছিলেন। সে সময় হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। বন্ধুর শয্যার জিনিষ ও পরিধেয় বস্ত্রাদি বাহিরে রৌদ্রে ছিল। বন্ধুর স্ত্রী ঘরে ছিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া বস্ত্রাদি সিক্ত হইবার আশঙ্কা দেখিয়া বন্ধুর স্ত্রী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। ঠিক সেই সময়ে বন্ধুও শিকড়টী পকেটে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী সেই সময়ে ধাত্রীকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "বৃষ্টি আসিতেছে, শীঘ্র কাপড় চোপড়গুলি তুলিয়া ফেল।" ইহার পর স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। স্বামীও স্ত্রীর মুখচন্দ্রমা-নিঃসৃত মধুর বাণী এই প্রথম শুনিলেন। আজন্মকালের মূক ও বধিরতা অন্তর্হিত হইল। অর্দ্ধাঙ্গিণীর সুমধুর বাক্যালাপে বন্ধুবরের জীবনে নূতন এক প্রেমস্রোত বহিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে তাঁহার সেই শিকড়ের কথা মনে পড়িল। পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, কিন্তু শিকড়টী নাই। জন্মাবধি মূক ও বধির স্ত্রীর এই আশ্চর্য্য আরোগ্যে বন্ধুর এক উৎকট মানসিক চিন্তা দূর হইল, কিন্তু অন্য এক মানসিক কষ্টের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন যে, সামান্য পার্থিব সুখের আশায়, ৺কাশীধামের সেই মহাপুরুষের নিকট তাঁহার পারলৌকিক শান্তি ও উদ্ধারের কোন উপায় করিতে পারিলেন না। পুনরায় কি তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন?

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নরকোৎসব

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আভাসিক তনু।

ইহার কিছু দিন পরে একজন জন্মান্তরবাদী পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়! মানুষ মরিয়া কি ভূত হয়?"

তিনি বলিলেন,—"হয় বৈ কি। কিন্তু সবাই হয় না। নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুসারে কেহ কেহ ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া স্বর্গলোকেরও উপরে চলিয়া যায়? তবে স্বর্গলোক, পিতৃলোক ও মর্ত্তালোক (ভূঃ ভুব স্বঃ) এই তিন লোক লইয়াই সাধারণ জীবের গতাগতি।

আমি। কিপ্রকার কর্ম্মফলে ভূত হয়?

তিনি। তা ঠিক বলা যায় না। তবে প্রবল পার্থিব আকর্ষণেই যে ভূত হয়; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

আমি। যাহারা কাহারও দ্বারায় খুন হয়, তাহারা কি ভূত হয়?

পণ্ডিত মহাশয় আমার মুখের দিকে একবার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। ঝটিতি যেন কি চিন্তা করিয়া লইয়া বলিলেন,—"হাঁ, হয়।"

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়কে আমার সে অবস্থা অবগত হইতে না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি পূর্ব্বে বলিলেন—'প্রবল পার্থিব আকর্ষণেই মানুষ ভূত হয়,' কিন্তু যে কাহারও দ্বারা নিহত হইয়াছে, অথচ হয় ত তাহার তেমন পার্থিব আকর্ষণ কিছুই ছিল না,—সেরূপ স্থলে বোধ হয়, ভূত নাও হইতে পারে?"

পণ্ডিত। এ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমে গোড়ার একটা কথা শুনিতে

হয়। এই যে বিরাট বিশ্বটা দেখা যাইতেছে, ইহা এক অখণ্ড বস্তুর অবভাসকমাত্র। মহাকাশকে যেমন ঘট-পটাদির দ্বারা বিচ্ছিন্ন জ্ঞান করা যায়, তদ্রূপ সেই এক অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ আত্মাকে তোমার আত্মা, আমার আত্মা, তাহার আত্মা বলিয়া পৃথক্ জ্ঞান করা যায় মাত্র। বাস্তবিক আত্মা পৃথক্ও নহেন—জন্ম-মৃত্যুরও অধীন হয়েন না; তিনি নিহতও হন না, হত্যাও করেন না। এ সবই মায়ার খেলা। এখন, মায়িক কোষে আছে সেই চৈতন্যের পৃথক্ বিকাশ আছে। আমাকে তুমি যদি খুন কর, বস্তুতঃ তাহা আমাকে খুন করা হইবে না,—আমার স্থূল দেহটাকে তফাৎ করিয়া দেওয়া হইবে মাত্র। তখন আমার আত্মার সেই যে ভাবটুকু, সেই যে কর্ম্মটুকু,—সেই যে সূক্ষ্ম শোণিতটুকু, তাহা তোমার আত্মাবরণের পাশে গিয়া জড়াইয়া ধরিবে। জিনিষ যে এক। নদীর জলে চিনি ফেলিলে যতটুকু চিনি পড়ে, ততটুকুই মিষ্ট হয় না—যতখানিতে তাহার আবর্ত্ত যায়, ততখানি জল মিষ্ট হইয়া পড়ে। তখন তোমার আত্মাকে আমার আত্মা জড়াইয়া ধরিবার জন্য তাহার প্রেত-বাহু সৃজন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তোমার আত্মা আমার আত্মার আকর্ষণে চিনি-পড়া জলের মত মিষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রমে ক্রমে জল চিনির আস্বাদে পূর্ণ হইবে,—তোমার আত্মাও প্রেত হইয়া প্রেতলোক প্রাপ্ত হইবে।

আমার হৃৎপিণ্ডটা বড় দ্রুতভাবে কাঁপিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, —"ইহা কি সত্য হইতে পারে?"

পণ্ডিত মহাশয় মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সত্য হইবে না কেন? কর্ম্ম-শক্তি কি ব্যর্থ যাইবার? একটা গল্প বলি, শোন। সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শত্রুকর্ত্তৃক হৃতরাজ্য ও হৃতবল হইয়া একাকী গহন কাননে প্রবেশ করেন। তথায় মেধস্ মুনির সহিত সাক্ষাৎ হয়। মুনির নিকট রাজা

মহামায়ার কাহিনী শ্রবণ ও তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শক্তিসাধনা করেন। তিনিই প্রথমে দুর্গোৎসব করেন। দুর্গোৎসবে লক্ষ বলি প্রদান করেন। এক লক্ষ ছাগ—মেষ—মহিষের ছিন্ন কণ্ঠের রুধির-ধারায় শক্তির উদ্বোধন করেন। সেই শক্তি-সাধনার ফলে—সেই পশু-মেধ যজ্ঞের বলে—সেই দুর্গোৎসবের মহামহিমায় সুরথ রাজা মহিমান্বিত হইয়া শত্রুনিধনপূর্ব্বক অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন;—ইহলোকে নানাবিধ সুখভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করিলেন। কিন্তু দুর্গোৎসব তাঁহার পক্ষে নিরাপদ্ হইল না,—লক্ষ পশুর আত্মা লক্ষ খড়্গ তাঁহার কণ্ঠোপরি তুলিয়া ধরিল। তুমি আমি ভাবিয়া থাকি, প্রতারণা করিয়া লোক ঠকাইলাম—কর্কশ অপ্রিয় ভাষায় লোকের মনে ব্যথা দিলাম, পরস্বাপহরণ করিলাম—মনে ভাবিলাম, আমি বেশ; কেহ আমার কিছু করিতে পারিল না। কিন্তু আমার আত্মা সাক্ষিস্বরূপ—তিনি কিছু বিস্মৃত হইবার নহেন। রক্তজবার পার্শ্বস্থ স্ফটিক যেমন রক্তজবার বর্ণ ধারণ করে, তেমনি আত্মার কোষগুলি আশক্তির দাগে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়। তখন আত্মা তদ্ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। তেলাপোকাকে কাচপোকা হইতে দেখিয়াছ? সেও ঐ কারণে হইয়া থাকে। ভাবিতে ভাবিতে জীব ভাব্য পদার্থের স্বারূপ্য লাভ করে।

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা তখন ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

গঙ্গাতীরের রাস্তা ধরিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। আমার গাড়ীখানা হন্‌হন্ করিয়া ছুটিতেছিল। সহসা আমার যেন বোধ হইল, আমার গাড়ীর দরোজার নিকট দিয়া একখানা রক্তাক্ত ছুরি হাতে লইয়া সঁ। করিয়া কার্ত্তিক ঠাকুরদা চলিয়া গেল। চীৎকার করিয়া গাড়ী রাখিতে আজ্ঞা করিলাম। গাড়ী দাঁড়াইল;—সাহসে ভর করিয়া যে দিকে কার্ত্তিকঠাকুরদা গিয়াছিল, সেই দিকে চাহিলাম—কোথাও কেহ নাই!

অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া যখন কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তখন ভাবিলাম, নিশ্চয়ই আমার মন ও চক্ষুর বিকৃতি!! কোচয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে হুকুম করিলাম।

আবার! আবার সেই মূর্ত্তি! এবার নিকটে নহে,—দূরে! গঙ্গা-গর্ভে;—পূর্ণচন্দ্রের রজত-কিরণাপ্লুত ক্ষুব্ধ স্ফীত চঞ্চলিত উত্তাল তরঙ্গমালা-সঙ্কুল গঙ্গার জলরাশির উপরে কার্ত্তিকঠাকুরদা! হস্তে সেই শোণিতাক্ত তীক্ষ্ণ ছুরিকা! আমার দিকে তীব্র চাহনিতে চাহিতেছিল। সে যে, কি ভীষণ চাহনি,—কি করিয়া বলিব, তাহা কত বাজের আগুনে মাখান! আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম,—কিন্তু গাড়ী ছুটিয়া পূর্ব্বদিকের রাস্তা বহিয়া চলিয়া গেল,—সে মূর্ত্তি দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

তোমরা হয় ত বলিবে, সে মূর্ত্তি কার্ত্তিকঠাকুরদার আভাসিক মূর্ত্তি। তাই বটে—কিন্তু তাহার আত্মা এ মূর্ত্তি ধরে নাই। আমারই জীবাত্মা তাহার কর্ম্মফলে প্রেতলোকে যাইবার জন্য ক্রমে তদাকার প্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। পাপে যে অনুতাপ আসে—চিন্তা আসে, সেই অনুতাপ—সেই চিন্তা সেইরূপ ভাবব্যূহ রচনা করিতে থাকে। কু-কর্ম্ম-ফলে নরক গঠন করে।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

৺গুরুদেবের মৃত্যু।

আমার গুরুদেবের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার প্রমুখাৎ যেরূপ অলৌকিক ঘটনার কথা শুনিয়াছি, অলৌকিক রহস্যের পাঠকগণকে তাহাই অদ্য শুনাইব।

সে আজ প্রায় ৪০ বৎসরের কথা, তিনি দর্শন শাস্ত্রাদি শিক্ষার জন্য বারাণসী ধামে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। সেখানে যোগসিদ্ধ মহাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদান্ত শিক্ষা করিতে থাকেন। সে সময় স্বামীজীর ৭২ জন শিষ্য ছিল। তাঁহার আদেশ ছিল, কাহার কোন বিষয়ে সংশয় জন্মিলে, তাঁহাকে প্রশ্ন দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিব্রত না করিয়া, জটীল স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া রাখে; পরে প্রয়োজন হইলে জানিয়া লইবে। তিনি তাঁহার নিত্যক্রিয়া-সম্পাদনান্তে শিষ্যগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া আপন মনে ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন, শিষ্যগণ নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ করিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, পরে ছাত্রগণ দেখিতে পাইত যে, চিহ্নিত স্থানগুলিতে আর সংশয় নাই। কোন্ দিন তাহার সংশয়-চ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ এরূপ না হইলে, এতগুলি ছাত্রকে তাদৃশ কঠিন বিষয়ের অধ্যাপনা করা মহাপুরুষের অসাধ্য হইত। কেবল ইহা লইয়া থাকিলেও সময়ে কুলাইত না।

এই সময় সতীর্থ একটি ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত গুরুদেবের বড়ই সম্প্রীতি হয়। উভয়ে একসঙ্গে একঘরে থাকিতেন। উভয়েই বঙ্গ-দেশীয়। গুরুদেব দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, মধ্যমাকৃতি, নাতিস্থূল। কিছুদিন পরে স্বামী লক্ষ্য করিলেন, গুরুদেবের দেহ-লাবণ্য যেন নষ্ট হইতেছে। তিনি গুরুদেবের সেই সতীর্থের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও ইহার সদুত্তর দিতে পারিলেন না। তখন সেই যুবকটি গুরু-দেবকে ইহার কারণ জানিতে চাহিলে, তিনি কহিলেন, মৃত্যু-চিন্তাই

ইহার কারণ। কোষ্ঠী অনুসারে তাঁহার সংসার-ত্যাগের বড় বিলম্ব নাই।

পরদিন সতীর্থটী এ বিষয় স্বামীজীর গোচর করিলেন। তিনি তাহা শুনিয়া কোষ্ঠী দেখিতে চাহিলেন। গুরুদেব লজ্জায় এতদিন কাহাকে ইহা বলেন নাই, আজ স্বামীর আদেশ পাইয়া তাঁহার হাতে কোষ্ঠী দিয়া ব্যাখ্যা শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী দেখিলেন, গণনায় ভুল নাই, মৃত্যু-যোগই বটে! প্রকাশ্যে কহিলেন,—"কোন ভয় নাই। তোমার এ মৃত্যুযোগে প্রাণান্ত হইবে না। তাহার খণ্ডনও দেখিতেছি। ভাল, তুমি ঐ তারিখের পূর্ব্বদিন আমাকে একটু স্মরণ করাইয়া দিবে। কোষ্ঠীর গণনার ভ্রম দেখাইয়া দিব।" গুরুদেব তাহা শুনিয়া কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন। কারণ, স্বামীজীর বাক্য মিথ্যা হইবার নয়।

ক্রমে সেই ভীষণ দিন আসিল। গুরুদেবও তৎপূর্ব্বদিন স্বামীজীকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন।

সে দিন স্বামীজী তাঁহাকে হবিষ্যাশী থাকিতে বলিলেন এবং তিনি যে ঘরে বসিয়া যোগ-তপাদি করিতেন, তাহার দ্বার খুলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। নিজেও রাত্রিতে একবারও বাহির হন নাই।

প্রাতে স্বামীজী গুরুদেবকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিয়া আবার সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। গুরুদেবকে গঙ্গোদক মাত্র পান করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে বলিলেন।

মৃত্যু-চিন্তা অপেক্ষা ভয়ানক আর কিছু নাই। গুরুদেবের অন্তরে আজ বৈরাগ্যের পূর্ণচ্ছবি। কিছুই ভাল লাগিতেছে না। বিষণ্নমনে আপন ঘরে বসিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। কিন্তু মনোনিবিষ্ট হইতেছে না। সতীর্থটীও আজ স্বামীর আদেশে তাঁহার কাছ-ছাড়া হয় নাই। সে দিন স্বামীজী একবারও গৃহ হইতে বাহির হন নাই।

গুরুদেব শয়ন করিয়া আছেন। রাত্রি হইয়াছে, পার্শ্বে সেই সতীর্থ উপবিষ্ট ; বলা বাহুল্য, তিনিও অনাহারে বন্ধুর চিন্তায় বিভোর! মধ্য-রাত্রে গুরুদেবের গায়ে জ্বালা হইল! জ্বালা যেমন তেমন নয়। তিনি শয্যায় ছটফট্ করিতে লাগিলেন। স্বামীজীর নিষেধ, সুতরাং দৌড়াইয়া তাঁহাকে গিয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিবেন, সতীর্থের তাহারও উপায় নাই। তাঁহার বিপদই অধিক। শেষে ছটফট্ করিতে করিতে গুরুদেব চক্ষু মুদিত করিয়া নির্জীবের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া রহিলেন! তখন সতীর্থ বুঝিলেন, শেষ হইতে বাকি নাই!

ক্রমে দুঃখের নিশার অবসান হইল। স্বামীজীর গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত হইল। সতীর্থের সাহস হইল। স্বামীজী তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া হাজির। গুরুদেবও নিদ্রোত্থিতের ন্যায় শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, যেন উঠিতে গেলে ঘুরিয়া পড়েন। স্বামীজী তাঁহার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতে আদেশ করিলেন। অতি কষ্টে ভাগীরথীনীরে অবগাহন করিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রণাম করিতে গেলেন। রাত্রে তাঁহার যে ভয়ানক গাত্রদাহ হইতেছিল, তাহাই মাত্র তাঁহার স্মরণ ছিল, আর কিছু বলিতে পারিলেন না। স্বামীজী বলিলেন- তাঁহার মৃত্যুযোগ কাটিয়া গেল। আর ভয়ের কারণ নাই।

গুরুদেবের বিশ্বাস, তাঁহার মৃত্যুই ঘটিত, স্বামীজীর তপঃপ্রভাবে ব্যতিক্রম হইল। তাহার পর বহুকাল জীবিত থাকিয়া ৬।৭ বৎসর হইল, ৺পুরীধামে গুরুদেবের দেহান্তর ঘটে।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।
বসুন্দিয়া

গোপেশ্বরের চাকুরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুরোহিত ঠাকুর প্রত্যূষে উঠিয়া মুখপ্রক্ষালনাদির পর গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ গিন্নী, আমি রাত্রে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়াছি যে, তার নিজ বাড়ীতে বা আমার এখানে কিংবা এ অঞ্চলের কোথাও উহাকে রাখিবার বন্দোবস্ত যুক্তিযুক্ত বা নিরাপদ্ নয়। ঠিক ক'রেছি যে, আজই রাত্রে বিশ্বাসী লো* মারফৎ সদরে আমার যজমান যদু মোক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিব। বিশ্বাস আছে যে, সে সযত্নে রক্ষা করবে, তা ছাড়া সদরে থাকলে হয় ত মামলারও কিছু তদ্বির হ'তে পারে। তা তুমি ওকে বলো যে, তৈজস-পত্র বস্ত্রাদি কোন নিরাপদ্ স্থানে সরিয়ে রেখে গহনাগাঁটী ও নগদ যা কিছু আছে, সে সব নিয়ে যেন আজই রাত্রে গোপনে এখানে আসে।"

গৃ। তা ঠাকুর, তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে, তাই কোরবে, আমি মেয়েমানুষ কি বুঝি বল? তবে এতে ওর বা আমাদের কিছু বিপদ্ হবে না ত?

পুরোহিত একটু হাসিয়া ফেলিলেন—বলিলেন, "গিন্নি! তুমিই না কাল রাত্রে বল্‌ছিলে যে, যা হয় হবে—যজমানকে বাঁচাতে যদি বিপদ্ হয় ত হোক।"

ঠাকরুণ একটু অপ্রতিভ হইলেন—অপ্রতিভ হইবার প্রধান কারণ যে, রাধারাণী নিশ্চয়ই আড়াল থেকে তাঁর কথা শুনেছে। পরে বলিলেন, "না না, তা নয় তা নয় কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর কি,না—বাছাদের জন্যেই ভয় হয়!"

রাধারাণী অন্তরাল হইতে সমস্তই শুনিতেছিল। কয়দিন অনাহার

অনিদ্রার পর আহার্য্য ও আশ্রয় পাইয়া গত রাত্রে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সে ঘুম বেশীক্ষণ থাকে নাই—ভবিষ্যৎ দুশ্চিন্তার জন্য; আবার সকাল হইলে কি হইবে, যাঁদের আশ্রয়ে পড়েছে, তাঁরা স্থানে রাখবেন বা কোন ব্যবস্থা করবেন কি না—তা ছাড়া স্বামীর জন্যেও দুর্ভাবনা, সে ত নিজে আরাম করিয়া শুইল, কিন্তু তার স্বামীর আহার জুটছে কিংবা ঘানি টানতে বা বেত খেতে হচ্ছে কি না, সেই ভাবনাতেও আরো অস্থির।

পল্লী-স্ত্রীলোক—তার ধারণা, পুলিশে ধরে নিয়ে গেলেই বুঝি ঘানি টানতে ও বেত খেতে হয়।

কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের পরামর্শ শুনিয়া সে একটু হতভম্ব হইয়া গেল। তার ক্ষুদ্র হিসাব-বুদ্ধিতে কুলাইল না যে, এতে ভাল বা মন্দ হইবে। যাই হোক, মা কালী যখন ভরসা দিয়েছেন, আর ঠাকুর মশায় যখন তাদের উপকারী লোক, তখন তিনি যা কয়ছেন,তা শুনতেই হবে; তা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না।

ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন, "শুনলি ত বৌ, কর্ত্তা কি বলেন? উনি পণ্ডিত লোক; উনি যা ভাল বুঝছেন, আমাদের তাই শুনতে হবে।"

রাধা বাড়ী ফিরিয়া তার বাসন কোসন ইত্যাদি উঠানে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া ফেলিল। পরে অন্ধকার হইলে তার গহনাগাঁটী ও অবশিষ্ট নগদ যা কিছু ছিল, একটা পুঁটুলীতে বাঁধিয়া, কালাচাঁদকে কোলে লইয়া পুরোহিত-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গভীর রাত্রে তাঁর যজমান এবং অন্য জমিদারের প্রজা কীর্ত্তি জেলে ভিন গাঁ অর্থাৎ ভিন্ন গ্রাম হইতে ছতরিওয়ালা ডিঙ্গি লইয়া উপস্থিত হইলে পুরোহিত নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া, তাহাকে অন্যান্য উপদেশ দিয়া এবং বিশেষ সাবধানে ও সযত্নে রাধাকে লইয়া যদু মোক্তারের বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া পত্রোত্তর লইয়া আসিবার জন্যও বলিয়া দিলেন।

পত্র।

আশীর্ব্বাদক শ্রীদীননাথ দেবশর্ম্মণঃ—

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপিতমস্ত পরে বাবাজীউ বহুদিবস যাবৎ তোমার মোকামের কোন সংবাদ না পাইয়া সবিশেষ চিন্তিত আছি, উত্তরে তোমাদের কুশল-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া নিশ্চিন্ত করিবা। তুমি নিশ্চিতই অবগত আছ যে, এ গ্রামের আমার যজমানভুক্ত অনেকগুলি লোককে ডাকাতির অজুহাতে চালান দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আমার জ্ঞানমতে বিশ্বাস যে, অত্রস্থ লোকগুলি বড়ই নিরীহ, কোনরূপ ভ্রম বা চক্রান্তক্রমে ধরা পড়িয়াছে। অতএব এ বিষয়ে যথাসাধ্য মোকদ্দমার তদ্বির করিবা। তা ছাড়া গোপেশ্বর সর্দ্দারের স্ত্রী শ্রীমতী রাধারাণী দাসীকে এ স্থলে রাখা নিরাপদ্ ও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না হওয়ায় এই সঙ্গে তোমার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। ইহাকে যে নিজ কন্যার ন্যায় রক্ষা করিবা, সে কথা বলাই বাহুল্য। সে সঙ্গে তার যথাসাধ্য লইয়া যাইতেছে, অতএব সেই অর্থে মামলা চালান হেতু যদি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, যাহাতে সেইরূপ করিতে পার, সে সম্বন্ধেও উপদেশ দিলাম। তুমি আমার সবিশেষ আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গল জানিবা ও বধুমাতা ও বালকগণকে জানাইবা। পুনশ্চ লোক মারফৎ জবাব পাঠাইয়া চিন্তা দূর করিবা। কিমধিকমিতি।

রাধারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে পুরোহিত ও ঠাকরুণকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিল। তাঁহারাও ছলছল নেত্রে স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

বলা বাহুল্য, যাত্রাটা যাহাতে শুভলগ্নে সম্পাদিত হয়, পুরোহিত ঠাকুর পাঁজি দেখিয়া পূর্ব্বাহ্লেই সেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অবোধ কালাচাঁদ অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন নদীবক্ষে নৌকায় চড়িয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু রাধারাণীর যত্নে ও নৌকার দোল খাইতে খাইতে স্থিরভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাধার উদ্বেগ অত্যন্ত; বাল্যকাল হইতে বহু পূর্ব্বের কত কথা, কত ঘটনা একসঙ্গে সমস্ত স্মৃতি মথিত করিয়া তার মানস-তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল, প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন মল, পাঁজর, নাকছাবি, চাবিশিকলী ও চেলীর কাপড় পরিয়া বালিকা অবস্থায় বধূবেশে এই বাড়ীতে স্বামী, শ্বশুর ও আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বাদ্য-কোলাহলের মধ্যে আসিয়া শ্বশুর পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়াছিল; সেই শুভদিন, সেই পুণ্যক্ষণের স্মৃতি আজও তার মনোমধ্যে স্পষ্টই জাগরূক ছিল। তার পর এই ঘর-বাড়ী সে নিজের করিয়া লইয়াছিল, কত সুখ-দুঃখ গিয়াছে, শ্বশুর শাশুড়ী গত হইয়াছে, দেবতা আবার দয়া করিয়া সোনার চাঁদ ছেলে কোলে আনিয়া দিয়াছেন, আজ আবার সে সেই সংসার ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া গভীর রাত্রে গোপনে নীরবে অজানা স্থানে অজ্ঞাত লক্ষ্যে কোথায় ভাসিয়া চলিতেছে। যে দিন প্রথম আসিয়াছিল, সে দিনও চক্ষে জল ছিল, কিন্তু সে জলের মধ্যেও একটা গোপন আনন্দের উৎস ধীরে ধীরে খুলিয়া গিয়াছিল; আর আজ—আজ সে সধবা অবস্থায় বিধবার মত চোখের জলে ভাসিয়া কোথায় যাইতেছে। কে জানে, চোখের এ জল আর থামিবে কি না? আজ গোপনে যে গৃহ—যে সংসার ছাড়িয়া যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিবে কি না? যদি এই যাত্রা শেষ

যাত্রা হয়- আর ভাবিতে পারিল না—কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আবার পাছে কোলের বাছার অকল্যাণ হয়, এই শঙ্কায় চোখের জল থামাইল বটে কিন্তু বুকের জ্বালা জুড়াইল না।

পরদিন যখন গ্রামময় শত রসনায় রাষ্ট্র হইল যে গোপেশ্বরের বৌ নিরুদ্দেশ, তখন যে উত্তেজনা তর্ক ও কল্পনার স্রোত প্রবাহিত হইল তাহার সঠিক বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের জন্য চক্রবর্ত্তীদের চণ্ডীমণ্ডপে যে জনতা হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তথায় অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে নিশ্চয়ই সে বাবুর কৃপা কটাক্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেল বা স্বেচ্ছায় গিয়াছে ইহাই প্রধান বিবেচ্য, যদিও এ বিষয়ে মতভেদ নিবন্ধন কোনই স্থির সিদ্ধান্ত হইল না তথাপি অনেকেই দৃঢ় স্বরে বলিল যে সে নিশ্চই সেচ্ছায় গিয়াছে এবং যদিও তাহারা স্বপক্ষে প্রমাণ প্রয়োগ দিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু গোলযোগে সে সকল প্রমাণ উত্থাপিত হইবার সুযোগ ঘটিল না। তবে তাহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে ওই মাগীই বজ্জাত ও যত নষ্টের মুল এবং যদিও তারা পূর্ব্বাপর ঐরূপই সন্দেহ করিয়া আসিতেছিল তথাপি পরচর্চ্চা করা অভ্যাস না থাকায় মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই। মাগী আপন দোষে নিজেও গেল আর সেই সঙ্গে সোণার লঙ্কাপুরীও ছারখার করিয়া গেল।

প্রাচীনেরা মত প্রকাশ করিলেন যে যখন আপদ ভাগিল তখন বোধ হয় গ্রামেরও বিপদের অবসান হইল।

এখন কথা উঠিল তাহা হইলে ছেলেটা কোথায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন যে মায়ের মন কিনা, সে যতই নষ্টা দুষ্টা হউক না কেন, মাতৃস্নেহ যাবে কোথায় সুতরাং নিশ্চয়ই সঙ্গে লইয়াছে। দত্তজা মহাশয়ও ইহার পূর্ণ সমর্থন করিলেন।

প্রত্যুষে যখন রাধা যদু মোক্তারের বাসায় অন্দরমহলে ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই ঘোমটা মাথায় অপরিচিতা সুন্দরী যুবতীর অকস্মাৎ আগমনে মোক্তার-গৃহিণীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

অতিমাত্রায় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "কে গা কে গা তুমি ?"

রাধা নীরব।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি কোত্থেকে আস্‌ছ, কথা কচ্ছ না কেন ?"

রাধা জড়িতকণ্ঠে বলিল "রামচন্দ্রপুর থেকে ?"

মো-গৃ। ওমা রামচন্দ্রপুর ? সে যে আমাদেরই বাড়ী তা বেশ, বেশ এসেছ বস ; হ্যাঁগা তুমি কাদের মেয়ে, কাদের বউ।

রাধা কি উত্তর দিবে—পুনরায় পীড়াপীড়িতে বলিলেন "দাসেদের বাড়ী থেকে।"

মো-গৃ। কে দাস ? কোন্ দাসেদের বাড়ী থেকে ? কার সঙ্গে এলে ?

স্বামী শ্বশুরের নাম কি করিয়া বলিবে কাজেই বলিল "পুরুত মশাই দীনুঠাকুর পাঠিয়েছেন বাহিরে মাঝি তাঁর পত্র নিয়ে মোক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছে।"

মো-গৃ। ওমা ! পুরুত ঠাকুর পাঠিয়েছেন, তা বাছা বস বস ; তোমার সঙ্গে কোন পুরুষ লোক আসেনি কি ?

তাঁর যতদূর সম্ভব কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য রাধা তার দুঃখ দুর্দ্দশা কাহিনী বিবৃত করিল। শুনিয়া বলিলেন তা বাছা এসেছ বেশ করেছ, এমন বিপদেও মানুষে পড়ে ; তা যাহোক যখন পুরুত ঠাকুর পাঠিয়েছেন আর আমাদের গাঁয়ের লোক যখন তোমরা, তখন কর্ত্তা আসুন, আমি বোলে কোয়ে তোমার যাতে বিহিত হয় তাই কোরবো।

মোক্তার যদু বাবু গৃহে আসিলে তাঁর পরিবার তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বলিলেন "শুনেছ আমাদের গাঁ থেকে কে দাসেদের বাড়ীর এক বৌ এসেছে, লক্ষ্মী মেয়েটী দিব্বি চেহারা রঙটা সাদা সাদা বটে কিন্তু নিখুঁত গড়ন দিব্বি মুখ চোখ।"

যদু বাবু চিন্তিত ভাবে বলিলেন "তোমার আর বর্ণনায় কায নেই, আমি ওকে নিয়ে বিব্রতে পড়েছি ?

মো-গৃ। কেন কেন তোমার আবার মুস্কিল কিসের ? ওরই ত বিপদ ! আহা কি বিপদে পড়ে ছুটে এসেছে"।

য। ওর বিপদ্ ত বুঝছি কিন্তু আমার যে কি মুস্কিল তা'ত বুঝ্‌ছ না ? গাঁয়ের লোকও বটে কিন্তু কি কর্‌ব বুঝতে পারছি না।

গৃ। এর আর বুঝাবুঝি কি ? পুরুত ঠাকুর যখন অত করে বলে পাঠিয়েছেন তখন আর কথা কিসের ? তোমার বাসায় কত লোক খায় না হয় ও বেচারী দুবেলা দুমুটো খাবে, তাতে ত আর আমরা গরীব হয়ে যাব না।

য। তা নয় সে কথা বলছি না, খেতে দেবার কথাই নয়, দুমাস ছেড়ে ছ মাস থেকে খাউক্ না কেন ! কত লোক যে বাসায় কত দিন ধরে খাচ্ছে।

গৃ। তবে ভাবনা কিসের ? আহা কতদূর হতে বিপদে পড়ে এক-লাই আমাদের আশ্রয়ে এসেছে। তুমি আর অন্য মত ক'রো না।

য। তুমি বুঝছ না, এ মোকদ্দমা লওয়া আমার ক্ষমতা নেই।

গৃ। তবে তোমার এত বড়াই কিসের, এই গল্প কর যে কত লোককে ফাঁসি কাঠ থেকে নামিয়ে আন। আর এই মিথ্যে মোকদ্দমাটা নিতে পারবে না তবে বুঝি সব বড়াই তোমার।

য। তা নয় গো তা নয় ও পক্ষে বড় লোক জমিদার রয়েছে—

গৃ। আর এরা না হয় গরীব লোক, না হয় এ কিছু তোমায় দিতে পারবে না; তা বোল্লে কি হয়, তুমি আর অন্য মত ক'রো না।

য। দূর পাগল, আমি পয়সার কথাই বল্‌ছি না, তুমি কি জান না যে আমি চৌধুরীদের বাঁধা মোক্তার, আমাকে চাকরীর খাতিরে ওদের বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে?

গৃ। তা না হয় এ মোকদ্দমাটা জমিদারের তরফে নাই নিলে?

য। পাগলী, আমার ভাত ভিত্তি যে সব ওই খানে, না নিলে কি আর আমি জমিদারদের মামলা পাব, না তুমি এই রকম গহনা গায়ে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতে পারবে।

মোক্তার স্বামীর নিকট নিজের মোক্তারী টিকে না দেখিয়া, গৃহিণী অন্য উপায়ে কাহিল করিবার মতলবে বলিল "কিন্তু পুরুত ঠাকুর অত আশা করে, এত করে বলে পাঠিয়েছেন তাঁর কথা ঠেলবে কি কোরে?"

য। আরে ভট্‌চার্যি লোক গুলোই ওই রকম কাছা আল্‌গা, কথায় বলে পণ্ডিতের সবগুণ, দোষের মধ্যে তারা বেজায় মূর্খ; 'পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্।' কোন বিষয় বুদ্ধিই নেই, এদিকে এত বুদ্ধি খরচ করে গোপনে বিশ্বাসী লোক দিয়ে পাঠিয়েছেন কিন্তু আমি যে বাবুদের সদর মোক্তার সে আসল কথাটাই ভুলে গেছেন।

গৃ। তবে কি ফিরিয়ে দেবে? তা না হয় মোকদ্দমা না হয় তুমি নাই কোরবে, অন্য কোন মোক্তারকে বলে দিও যেন বেশী খরচ পত্র না করে মোকদ্দমা নেয়। একটা দিন এখানেই থাকুক্।

য। আরে বুঝ্‌ছ না আমি বাসায় আশ্রয় দিয়েছি শুন্‌লে মনিব অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌বে। তা ছাড়া আমাদের সমস্ত জোতজমা সবই তাদের এলাকায়।

গৃ। এখানে রাখ্‌লে কি সমস্ত জমিজমা কেড়ে নেবে, তবে তুমি এত আইনের বই নাড়াচাড়া এত মামলা কি জন্যে কর ?

ঘ। [illegible] এখন ত বাগান থামার পুকুর লুট করে থাস করে নিক্ তার পর তুমি বেটা সামর্থ্য থাকে সাত কোর্ট মামলা লড়ে পারত বিষয় বার করে লও।

গৃ। ক'টা দিন বইত নয়।

ঘ। নেহাত ক'টা দিন নয় ; এই ত কলির সন্ধ্যে। এখন পুলিশ তদারক হচ্ছে, তদারক শেষ হবে, মালের আস্কারা হবে, সব আসামী চালান দেবে, তবে মামলা রুজু হবে—সে এখন ঢের দেরী। তার পর যদি আর দু একটা ডাকাতির সঙ্গে কোন রকমে জুড়ে দিতে পারে তা হলেইত কেল্লা ফতে, একটা বড় রকমের গ্যাং কেস হয়ে ছমাস ধরে মামলাই চলবে।

গৃ। তবে তুমি কি বল ?

ঘ। আমি ভাব্‌ছি যে হরি মোক্তারের বাসায় পাঠিয়ে দিই, তার পর আমি বলে কোয়ে দিলে সে বেশী পয়সার কামড় করবে না।

রাধারাণী সমস্ত শুনিয়া ভাবিল যে তার পোড়া কপাল তারই সঙ্গে এসেছে।

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন শুন্‌লে ত বাছা আমাদের মুস্কিল কি ? তোমাকে রাখতে আমাদের ত অসাধ নেই আর আমিও কিছু বলতে কসুর করিনি ? তা তুমি হরি মোক্তারের কাছে যাও আমাদের কর্ত্তা সব বোলে কোয়ে ঠিকঠাক কোরে দেবেন।

রা। আমি কোন বেটা ছেলের কাছে যেতে পারব না। মা কালীর বারণ আছে এতে আমার অদৃষ্টে যা হয় হবে।

মা কালীর কথা শুনিয়া কৌতূহল-পরায়ণা গৃহিণী একে একে ভৈরবীর

সকল বৃত্তান্তই শুনিল—শুনিয়া হরিশপুরের কালীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বলিল—আচ্ছা তোমায় সেখানে যেতে হবে না, আমি আর একটী বুদ্ধি ঠাওরেছি—দেখি মা জগদম্বা-মুখ তুলে চান কি না ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

"মৃত্যুর পর দর্শন এবং সহচর করা"

প্রায় দশ এগার বৎসর অতীত হইল একদিন বাসায় খাইতে আসিয়া শুনিলাম, একজন বৈদ্যনাথ হইতে আগত সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিতে আসিয়া, আমার আবাসের দ্বারদেশে আমার ছেলেদের পরিচারিকার সহিত আমার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা খেলিতেছে ও তৃতীয় পুত্রটি তখন প্রায় সাড়ে আট মাস বয়স পরিচারিকার ক্রোড়ে আছে দেখিতে পান। সন্ন্যাসী আমার মধ্যমপুত্রকে দেখিয়া বলেন "এই বালক অতি সুলক্ষণা-ক্রান্ত বাঁচিলে খুব বড় লোক হইবে, কিন্তু অচিরে একটি ফাঁড়া আছে।" ফাঁড়ার কথা শুনিয়া পরিচারিকা সন্ন্যাসীকে বসাইয়া আমার স্ত্রীকে সংবাদ দেয় এবং আমার প্রতিবেশী একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী সে সময় আমার বাসায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন উভয়ে সন্ন্যাসীর নিকট আসেন। উক্ত ভদ্র মহিলা তাঁহার সন্তান সন্ততি কয়টি গণনা করান (তিনি তখন পর্য্যন্ত বন্ধ্যা ছিলেন) সন্ন্যাসী বলেন এ পর্য্যন্ত তোমার সন্তান হয় নাই! কোন দৃষ্টি বশতঃ সন্তান হইবার সম্ভাবনা রহিত হইয়াছে! আমি একটি মাদুলী দিতে পারি যদি—পরিমিত ব্যয় করেন, তাহা হইলে অচিরে পুত্রসন্তান

হইবে। সন্তান রক্ষার নিয়ম বলিয়া দেন ও বলেন পুত্রের নাম বৈদ্যনাথ রাখিবেন। আমার স্ত্রীর নিকট তখন যতদূর স্মরণ হয় ধার করিয়া সন্ন্যাসীর প্রার্থিত অর্থ দিয়া মাদুলী গ্রহণ করেন। আমার মধ্যম পুত্রটির ফাঁড়া অপনোদনের জন্যও এক টাকা কি পাঁচ সিকা লইয়া একটি মাদুলী দিতে চাহেন। কিন্তু আমার স্ত্রী আমার অভিপ্রায় না জানিয়া লইতে অসম্মত হন, এবং পরদিনে আসিতে বলেন। এস্থলে বলিয়া রাখি আমি ঐরূপ সন্ন্যাসী ফকীর বিশ্বাস করিতাম না আমার সমক্ষে ঐরূপ সন্ন্যাসী ফকীর আসিলে অপ্রসন্নমনে কখনও ভিক্ষা দিতাম প্রায়ই দিতাম না। যদিও আমি পূর্ব্বে "কাকচরিত্র" জ্ঞানী সন্ন্যাসীর কখনও গণনা অতীত ঘটনাবলী শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছি তথাপি অযাচিত ভাবে ঘরে বসিয়া গণনা শ্রবণে ভক্তি বিশ্বাস অথবা তাঁহাদিগের জ্ঞানের ইয়ত্তা করিতে পারি নাই। অধিকাংশ সময়ে ভক্ত প্রবঞ্চক গাঁজা খোর বদমাস বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি। এখনও যে না করি তাহা নয়। ভেকধারী ঠক বিভূতিধারী নানারূপ সন্ন্যাসীর ভিতর প্রকৃত সাধু সৎ জানা কঠিন। বিশেষ সে সময় আমার আদৌ অনুরাগ ছিল না, এমন কি কিছুই মানিতাম না। বলিতে কি কত সন্ন্যাসীকে যে অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছি বলিতে পারি না। যদিও ফলিতজ্যোতিষ সন্ন্যাসী মুখে শুনিয়া কদাচিৎ বিশ্বাস করিয়াছি, কিন্তু দৈবে যে ভবিতব্য খণ্ডান যায় এবং মাদুলী বা কোন দ্রব্যাদি ধারণে যে ফাঁড়া বা মৃত্যু খণ্ডান যায় এ বিশ্বাস আদৌ ছিল না, এখনও যে আছে তাহা বলিতে পারি না, তবে একটু সন্দিগ্ধ-চিত্ততা বাড়িয়াছে মাত্র। আমার স্ত্রী আমার প্রকৃতি জানিতেন, পাছে সন্ন্যাসী ঠকাইয়া গিয়াছে বলিয়া রোষ প্রকাশ করি সেজন্য সাহস করেন নাই। কর্ম্মস্থানেও বলিয়া পাঠান নাই। পাছে অধিকতর ক্রুদ্ধ হই ও সন্ন্যাসীকে অপমানিত করি। যাহা হউক ছেলের

ভবিষ্যৎ অমঙ্গল চিন্তায় আমার স্ত্রী ও ছেলেদের দাসী আকুল হয়। আমি আহারে বসিলে সাবধানে মেজাজ বুঝিয়া কথাটির অবতারণা করে। আমি শুনিয়াই উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, কে তাকে আসিতে দিল, চাকরদের ধমকাইলাম দূরে থাকিতে দূর করিয়া দেয় নাই কেন। নিজেও বলিলাম আমি থাকিলে তাহাকে বেত লাগাইতাম। পাজী, ভণ্ড, শঠ, জুয়াচোর ছেলেদের অমঙ্গল চিন্তায় ফেলিয়া মাদুলীর নামে পয়সা ঠকানর ফিকির, এরূপভাবে যে গৃহস্থকে অকারণ উৎকণ্ঠিত করে তাহাকে বেত্র প্রহারে জর্জ্জরিত করা উচিত ছিল।

আমার স্ত্রীর নির্ব্বন্ধাতিশয় কোনমতে সন্ন্যাসীকে খোঁজ করাইয়া মাদুলী সংগ্রহ করা। অবশ্য তখন আমার প্রতিপত্তি যেরূপ তাহা অসাধ্য নহে এবং সন্ন্যাসীর অল্প সময়ের ভিতর সহর ত্যাগ করা অসম্ভব। কিন্তু আমার বিশ্বাসই নাই তাতে আবার স্ত্রীলোকের নির্ব্বন্ধে পড়িয়া আমার বিশ্বাস ডুবাইয়া সন্ন্যাসীর সন্ধান করিব? এরূপ অভিমানও বিশেষ অন্তরায় হইল। আমি বলিলাম জ্যোতিষ সত্য এবং পূর্ব্বজন্মের ফলাফল ক্রমে গ্রহাদি বশীভূত হইতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরের সমস্তই নিয়মের উপর স্থাপিত এ নিয়ম তিনি ভঙ্গ করিতে পারেন না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তাঁর নিয়মে নির্দ্ধারিত মৃত্যু, বিপদ প্রভৃতি নিবারণ করিবার মানুষের শক্তি থাকিতে পারে না! কত পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া বুঝাইলাম এক্ষেত্রে যদি কিছু হয় ভগবানেরও অসাধ্য মনুষ্য কোন্ ছার।

যাহাহউক ঐ ছেলেটাকে বড় ভাল বাসিতাম। আমার সন্তান স্নেহের অধিকাংশ স্থান সে জুড়িয়া বসিয়াছিল। আমার নিজের ভোগলিপ্সা ব্যয় অনেক সঙ্কোচ করিয়া ঐ ছেলেটার সুখ সন্তোষ বিধানের জন্য ব্যয় করিতাম। তার অনেক অসম্ভব আব্দারও আমি

সাধ্যমত সম্ভব করিতে চেষ্টা করিতাম। শুধু আমি বলিয়া নয় আমার আত্মীয় কুটুম্ব পরিচিত বন্ধুবান্ধব দাস দাসী লোকজন প্রতিবেশী সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। আমার খাতিরে নয় ছেলেটার চেহারার এমন একটি আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গবিক্ষেপ লোকে চাহিয়া দেখিত, বাক্য শুনিলে শুনিতে ইচ্ছা করিত। অত্যন্ত চাঞ্চল্য দৌরাত্ম্য করিত, ধমক খাইত অথচ তজ্জন্য আমায় ভয়ও করিত আবার আমার বিচ্ছেদ সে বা তার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করিতে পারিতাম না। অদ্যাপি পুত্রকন্যায় ৮ ৯ টি তথাপি তাহার পরিত্যক্ত স্থান কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। অনেক ভগবৎ জ্ঞানী তাহাকে যোগভ্রষ্ট এবং সুলক্ষণাক্রান্ত বলিতেন, এইরূপ দুইটি সন্তান আমাদের বংশে প্রায় সমসাময়িক জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুগ্রস্ত হয়।

আমার একটি ভোট দেশীয় কুকুরশাবক শৈশব অবস্থা হইতে প্রতিপালিত হয়। আমার উক্ত পুত্রের সহিত এরূপ সৌখ্য আনুগত্য হয় যে, সে বালসুলভ অত্যাচার করিলেও সহ্য করিত। আবার ছেলেয়া তার খাদ্যাংশের অধিকাংশ কুকুরকে দিত বলিয়া সময়ে সময়ে আমার স্ত্রী তাড়না করিলে সে ভোজনান্তে খাদ্যাদি উৎকৃষ্ট অংশ প্রচুর পরিমাণে মুখে লইয়া উঠিয়া আসিয়া কুকুরকে খাওয়াইত। আমরা পিতামাতা ব্যতীত তাহার বিশেষ বন্ধু এবং প্রেমের পাত্র ও সমবেদনা উক্ত ঝি ও কুকুরটির সহিত ছিল। কত কথা যে উভয়ের সহিত হইত তা কি বলিব।

সন্ন্যাসী আর আসেন নাই। এই ঘটনার কতদিন বা মাস স্মরণ নাই তবে বহুকালের পরে হঠাৎ ছেলেটার খুব সর্দ্দিজ্বর হয়, ডাক্তার ঔষধ দেন। আমার হাঁপানীর ব্যারাম আছে উহার লক্ষণ দেখিয়া হাঁপানীভ্রমে চিকিৎসা করেন। দুইচারি দিন পরে হঠাৎ স্বর বিকৃতি এবং শ্বাসকষ্ট

দেখা দেয়। তখন অন্য ডাক্তার ডাকি। তিনি একদিন দেখিয়া বলেন, ডিপ্থিরিয়ার লক্ষণ দেখিতেছি। যাহা হউক আমি বয়স ও বিজ্ঞতায় প্রবীণ হইলেও পার্শের হিসাবে পূর্ব্ব ডাক্তারকে ডাকিয়া পরামর্শ করুন। অগত্যা আমি উভয়কে ডাকাইলাম কিন্তু যিনি পাশে জ্ঞানী তিনি কিছুতেই ডিপ্থিরিয়া স্বীকার করিলেন না Tonsilites বলিয়া অস্ত্র-চিকিৎসা করিলেন। করিবামাত্র অল্প উপশম হওয়ায় কার্য্যান্তরে গেলাম। অল্পক্ষণ বাদে (দুই একঘণ্টা মনে হয়) পুনরায় পূর্ব্ববৎ শ্বাসরোধ উপশম হওয়ায় বড় পাশকরা ডাক্তার ডাকিলাম, তিনি এবার দেখিয়া ভীত হইয়া সিভিলসার্জ্জন ডাকিলেন, তিনি আসিয়া ডিপ্থিরিয়া বলিলেন ও হাঁসপাতালে লইয়া গেলেন, কিছুইতেই গৃহে চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাহাই হইল এসময় আমাদের মনের ভাব ছাড়িয়া দিন। কুকুরটাও আকুলী বিকুলী করিতে লাগিল। রাত্র প্রায় দুই কি চারি ঘটিকা স্মরণ নাই স্নেহের পুতলী হাঁসপাতালে বিসর্জ্জন দিয়া পাগল হইয়া আবাসে কয়দিন কাল কাটাইলাম। অপরাপর আত্মীয় বন্ধুতে যথা শাস্ত্রোক্ত নিয়মে সৎকারাদি করিলেন। ছেলেটা এসময় মাত্র পঞ্চম-বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা সংজ্ঞাহারা অবস্থায় কয়দিবস বাদে আবার উপশম লাভ করিতে লাগিলাম। পুত্রশোক যাবজ্জীবন সহচর তবে শোকের উন্মাদনা হ্রাস হইল মাত্র। কিন্তু কুকুরটা ছেলেটার মরার পর থেকে এমনি বিমর্ষ হইল আর একটিদিনও তার আনন্দ, আশক্তি, ভোজনলোলুপতা দেখিলাম না। দিবারাত্র পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত, ক্ষুধায় আহার দিলে যৎকিঞ্চিৎ প্রাণধারণার্থ খাইয়া লোকসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে রোদন করিত। তবে কখনও আমার স্ত্রী চীৎকার করিয়া রোদন করিলে কাছে আসিয়া বসিত ও কাঁদিত। কখন কদাচিৎ উক্ত পরিচারিকার কাছে বসিয়া মনুষ্যসঙ্গ লাভ করিয়া কাঁদিত। এইরূপে

বিমর্ষ ও শুষ্ক ক্ষুণ্ণভাবে চারিমাস কাটাইয়া শরীর শীর্ণ ও লাবণ্য নষ্ট হয়। শেষে একদিন অন্যত্র হইতে ইন্দুরমারা বিষ খাইয়া আসিয়া যেখানে ছেলেটার সঙ্গে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিত সেইস্থানে দেহত্যাগ করে।

এই কুকুরটির জীবনে কয়েকটি অলৌকিকতা লক্ষ্য করি। কখনও অন্য কুকুরের সঙ্গতা হয় নাই। গর্ভধারণের বয়স অতীত হইলেও সঙ্গতা হয় নাই। কুকুর-স্বভাব-সুলভ লোলুপতা ছিল না। দেখিয়াছি ভোজন-পাত্রের নিকট বসিয়া ভোজনকর্ত্তার অবর্ত্তমানে প্রহরা দিতেছে কিন্তু লোভযুক্ত হয় নাই। খাদ্য দিলেও ইঙ্গিত না করিলে খাইত না। বিষ্ঠাদি অপবিত্র ভোজনে আশক্তি দেখিনাই। তাহার এই সকল ব্যবহার দেখিয়া পরিচয় দিবার সময় বলিতাম বোধ হয় জন্মান্তরে পবিত্র লামা ছিল। শান্ত অথচ কর্ত্তব্যশীল ছিল।

ছেলেটার মৃত্যুর অল্পকয়েক দিবস পরে শোকমগ্ন অবস্থায় আমার স্ত্রী একদিবস দেখেন যেন খাদ্য প্রার্থনা করিতেছে, আর একদিন দেখেন যেন আমার শিওরে খাটের রেলীং ধারে দাঁড়াইয়া মাথায় হস্ত দিয়া অঞ্চল ধরিয়া ঠানিতেছে। আমি একদিন স্বপ্নে দেখি যেন উলঙ্গবেশে রাস্তায় দৌড়িয়া দৌড়িয়া যাইতেছে। আর আমরা উভয়ে স্বপ্নে দেখি নাই।

তাহার পরিচারিকা তাহাকে সদা সর্ব্বদা দেখিত ও যে দিন যেরূপ দেখিত আমাদের বলিত। স্মরণ হয় সে একদিন বলে "আমি শীতে কষ্ট পাচ্ছি জামা পরিয়ে দে" আর একদিন বলে "আমার বড় ক্ষিদে কিছু খেতে দে" আর একদিন বলে "আমি কমলালেবু খাব" তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কমলা খাইতে চাহিয়াছিল পাছে অসুখ বাড়ে বলিয়া দিই নাই। ঝির মুখে কমলা খাওয়ার কথা শুনে একদিন তার সমবয়স্কদের ডাকিয়া লেবু খাওয়াই এবং আর একদিন ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে আমার কতিপয় বন্ধু ও পরিচিতকে লেবু, সন্দেশ খাওয়াই। শববাহী কয়জনকেও স্মরণ

য় লেবু সন্দেশ ও খাদ্যাদি খাওয়াই, এর পর আর লেবু খাবার কথা শুনি নাই। যাই হউক ঝির মুখে তার কথা মধ্যে মধ্যে শুনিলে আমাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইত বিশেষতঃ আমার স্ত্রী অত্যন্ত শোকাতুরা হইতেন সেজন্য একদিন রূঢ়ভাবে ঝিকে বলি থাম্ বেটী—তোর সঙ্গে রোজ রোজ দেখা দেয় আমরা বাপ্ মা আমাদের দেখা দেয় না তুই বড় না" এই অবধি ঝি সাবধান হয়, তার প্রসঙ্গ আমাদের কাছে আর বলিত না। তবে অন্য প্রতিবেশী ও অপরাপর লোকের কাছে বলিত ও কাঁদিত। চাকরীর খাতিরে অন্যান্য ছেলেদের যত্ন করিত বটে কিন্তু এই ছেলেটার মৃত্যুর পর হইতে ঝির মনে ভাবান্তর হয়, আর বড় আশক্তি স্পৃহা ছিল না। যদিও সে অতি প্রাচীনা হইয়াছিল তথাপি কেহ তার মরণ কামনা করিলে এমন কি মৃত্যুর কথা বলিলে গালাগালি করিত, কিন্তু এই ঘটনা হইতে সে অনবরত মৃত্যুকামনা করিত।

আমি বাহ্য ভাবান্তর দেখাইলেও হৃদয়ে গুমরিয়া কাঁদিতাম, একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যেন আমি এক জ্যোতির্ম্ময় লোকে উপস্থিত, তথায় কেবল জ্যোতি, কি উজ্জ্বল জ্যোতি, কি শান্তি কি উল্লাস, বর্ণনা করিতে আমি অসমর্থ। সেই অপরিচিত জ্যোতির্ম্ময় দেশে দেখিলাম অধিকাংশ আমার অপরিচিত তাঁহাদিগের মধ্যে শিশু আনন্দে বসিয়া আছে। আমি তথায় দেখিয়া নয়ন তৃপ্তি করিলাম বটে কিন্তু মায়া হইল না আশক্তি হইল না, কাঁদিলাম না মিলন বাঞ্ছা করিলাম না কেবল দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শিশু যেন বলিল "বাবা তুমিও কিছুকাল পরে এখানে আসিবে এইখানে সকলের সঙ্গে দেখা হবে, আমি বেশ আছি আমিত তোমাদের জন্য কাঁদি না, তোমরা কাঁদিতে থাক কেন। আমি আশ্বস্ত হইলাম মনে নানারূপ প্রবোধ আসিল, মায়ার সংসার সকল মায়াবিশেষে জ্ঞানগম্য হইল এই প্রপঞ্চ বুঝিলাম। মনে সে সময় কি যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ

হইল বলিতে পারি না। স্বপ্নলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন জ্ঞান হইল তখন বেশ শান্তভাব; স্ত্রীকেও বলিলাম, তদবধি আমার সেই শোক পীড়া উপশমিত হইল। ঐ পুত্র বিয়োগের প্রথম শোকোচ্ছ্বাসে উন্মাদ হইয়া বিষপান করিয়াছিলাম। মনুষ্যলোকের অজ্ঞাতসারে আশ্চর্য্যভাবে সে বিষ উদ্গীরণ হইয়া যায় এবং শুধু উদ্গীরণ নয় সঙ্গে সঙ্গে দেহটা শান্ত স্তব্ধ হইল। তদবধি শোকের উন্মত্তভাব হ্রাস হইল। এই স্বপ্নলোকে পুত্রকে দর্শনের পর সম্পূর্ণভাবে শোকাপনোদন হইল, স্ত্রীও আমার পূর্ব্বেই শান্ত হন। এই পুত্রশোকে জীবনে যত মৃত্যুজনিত বিয়োগ যাতনা পাইয়াছি এক পিতৃশোক ব্যতীত আর কিছুতেই এমন অধীর হই নাই। সে অবধি ছেলেটাকে আর স্বপ্নেও দেখি নাই। তবে বরাবর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল মায়ার দৃঢ় বন্ধনে তাহাকে টানিয়া আনিব কিন্তু আর পারি নাই। দেখিলাম আমাদের মায়ায় কিছু হয় না। পরলোকগত আত্মার মায়াবন্ধন দৃঢ় রাখিয়া মরা চাই।"

চাকরাণীটার কথা বলছিলাম, ছেলেটার মৃত্যুর প্রায় ৭।৮ মাস বাদে একদিন বৈকালে চাকরাণীটা বাচাল হয় ও আমার চাকর বাকর ও তজ্জাতীয় বহু লোকের মধ্যে বসিয়া তার সংসারের গল্প করিতেছে। বরাবর আমায় খুব সম্ভ্রমযুক্ত ভয় করিত কিন্তু সেদিন আমার কর্ণগোচরে বসিয়া খুব বাচালতা, বাহাদুরী করিতেছে। তার কথার মর্ম্ম এই—সে কাল থেকে আমার আর চাকরী করিবে না, আমার তোয়াক্কা রাখে না, তার অভাব নাই তার উপযুক্ত পুত্র পুত্রবধূ ইত্যাদিতে জাজ্জ্বল্যমান সংসার আছে, তাহাদের কৃষি আছে, প্রচুর গোলাজাত শস্য আছে, মহিষ গাভী আছে, আমার চেয়েও তার খাইবার পরিবার উত্তম সংস্থান আছে, সে আর এ গু, মূত ঘাঁটা চাকরী করিবে না, তারই সংসারে যার কত লোক চাকরী কচ্ছে। সে এখনি বিদায় দিলে বিদায় চায়, বিদায় না দিলেও

সে থাকিবে না। আমার ছেলেদেরও মায়া করেনা, কেন পরের ছেলের মায়া করিবে। পরের ছেলের জন্য কাঁদিবে কেন, তার নিজের কি অভাব? আমার কর্ণের গোচরে আমায় উপেক্ষা অমর্য্যাদা করিয়াও প্রায় দুইঘণ্টা লোক জমাইয়া আত্মকাহিনী বলিতেছিল। আমি আমার জীবনে প্রায় ১০।১২ বৎসর দেখিলাম সে আমায় যত ভয় করে ও সোজা দুটা কথা কহিতে সঙ্কুচিত হয় সে কিরূপে এরূপ বাচাল হইল। আমি রাগ করিলাম না। বরং তামাসা করিয়া মধ্যে মধ্যে যখন সেখানে নামিতে দিইনা যেহেতু আমার বোধ হইল তার একটা কিরূপ হঠাৎ ভাবান্তর হইয়াছে কি যেন একটা দিব্য দূর দৃষ্টিতে যে কত কি দেখিতেছে। তখন যদি আমার ভৌতিক বিদ্যায় কিছুমাত্র প্রত্যয় থাকিত আমি তাহার সকল কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তার পূর্ব্ব বাসভূমির সন্ধান নিয়া অনুসন্ধান করাইতাম। যাহোক তখন এইরূপ তার ভাবান্তর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, ভাবিলাম বোধহয় গৃহিনী কিছু বলিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিল কিছুই বলে নাই বরং খুব যত্ন করে। সে যদি যত্ন না করিত তা'হলে কবে সে চলিয়া যাইত। আমি বা বাড়ীর অথবা পাড়ার অথবা কোন চেনা অচেনা কেউ তাকে কিছু বলে নাই। কারও বাবারও সাধ্য নাই কেন বলিবে সেত কারও কিছু করে নাই। যার যা ধারিত আজ তা দিয়াছে। কেউ ধারের তাগাদাও করে নাই।

এক্ষণে উহার পূর্ব্ব-কাহিনী কিছু বলি, বিশেষ কিছু জানি না সেও বড় জানিত না এবং বলিত না। তবে এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছি বীরভূম জেলার কোন স্থানে তার পূর্ব্ব নিবাস সে সজ্জাতি, অনেক কাল আগে দেশ ছাড়া, তার দেশে স্বামী পুত্রাদি ভূসম্পত্তি সব ছিল। তার যৌবনে যৌবন ও সত্যযুগের কথা, যেহেতু আমার কৈশোর বয়স হইতে তাহাকে প্রাচীনা

কদাকায়া দেখিতেছি এই বয়সে এ অবস্থায় আমাদের সংসারে দাদার ছেলে মানুষ করিতে থাকে, পরে দাদার ছেলেরা বড় হ'লে, আমার ছেলেদের মানুষ করিতে থাকে, সেই সূত্রে আমারও সঙ্গে বিদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে মারা যায়। উপপতির সহিতই হউক অথবা আড়কাঠির প্রবঞ্চনায় হউক আসামে চা বাগানে আসে, তথায় কার্য্যান্তে মুক্তিলাভ করিয়া বহু উপপতির হাত ফিরিয়া শেষে জনৈক ময়রা উপপতির সহিত ঘুরিতে ঘুরিতে কোন স্থানে ময়রার দোকান পাতিয়া অবস্থিতি করে ও সুখে দিন যায়। পরে ময়রা নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া গেলে তখন বয়সও নাই জীবিকার সংস্থানও নাই অগত্যা আমার দাদার কর্ম্মস্থলে তাঁর ছেলে মানুষ করিবার জন্য চাকরী স্বীকার করে, তদবধি আমাদের সংসারেই থাকিয়া দেহান্ত হয়। গৃহত্যাগ অবধি ঘরের কোন সংবাদ জানে না, দেশে গেলে কেউ লইবে না সেও কাহাকেও চিনিবে না, এবং ছেলেপুলেদের কলঙ্কিত মুখ দেখাতে চায় না। ক্ষীণস্মৃতি ব্যতীত ঘরের কোন কথা জানে না। কোন দিক্ দিয়া কি করিয়া দেশে যাইতে হয় তাও জানে না। ছেলেদের বা স্বামীর নাম কি কোন প্রসঙ্গ কেহ কখনও শোনে নাই। তারও স্মরণ ছিল কি না সন্দেহ। যাহা হউক এই দিন কিন্তু যেন দিব্যদৃষ্টিতে সব কথা বলিতে লাগিল। শেষে জনতা ভঙ্গের জন্য আমি নামাইয়াদিলাম। এ ঘটনা সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে হয়।

সন্ধ্যার পর ভূত একবার কখন ভেদ হয় কেউ জানি না। অন্যদিন ছেলেদের কাছে নিয়া ঘুম পাড়াইত এদিন তাহা করে নাই। রাত্রি প্রায় নয়টা আমি বেড়াইয়া আসিয়াছি, দেখি সে অসামাল হইয়া পড়িয়াছে। বমী করিবে আমি সাহায্য করিলাম নিকটে একস্থানে বসিতে বলিলাম, বলিল ছেলেপুলের ঘর একটু দূরে যাই বলিয়া বেড়ার নিকট যাইল সঙ্গে আমি আছি। বমী করিয়া মুখ ধুইবার সময় "—বাবাগো

(আমার মৃত পুত্রের নাম করিয়া) যাইরে, তোকে ছেড়ে আর থাক্‌তে পাচ্ছিনিরে” আমি বলিলাম ছি! ও কথা বলিস নে, ভয় কি আমি আছি, এখনি ওষুদ দেব। সে বলিল ঐ যে কাকা ঐ যে—(অমুক) দাঁড়িয়ে ঐ যে আমায় ডাকৃচে। আমি ওষুদ দিলেও বাঁচবো না বুড়ো হয়েচি মরবো তার আর কি, যাই—সে ডাকছে তার কষ্ট হচ্চে। আমি ভাবিলাম হতে পারে আসন্ন কালে এরূপ আত্মার দর্শন হয় শুনেচি ভাগ যদি এ সুযোগে ও একবার ছেলেটাকে দেখ্‌তে পাই। হোক্ সে ভূত তবু দেখ্‌বো।

আমি বল্লাম কোথায় সে বল্ আমায় দেখিয়ে দে। আমায় বলে তোমার দেখে কায নেই তুমি দেখ্‌তে পাবে না। তুমি ছেলের বাপ তোমার অপর ছেলে আছে তুমি আমার কাছে এস না। আমি পুনঃপুন জেদ করিলাম হোক তুই বল এখন সে আছে কি না কোথা আছে—তখন ঝি আমায় অঙ্গুলী দ্বারা একটা দিকে দেখালে আমি দেখ্‌তে না পেয়ে এগিয়ে গিয়ে সে দিক ও আরও অনেক অন্ধকারাবৃত্ত অগম্য-স্থানেও মনের বেগে ঘুরে কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না। দ্বিতীয়বার রামকণ্ঠে, বসে বল্লে “কাকা (আমার কাকা ও আমার দাদাকে বাবা বল্‌তো) এবার আমি বাঁচবো না আমি যাবো—(অমুক) আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তার বড় কষ্ট হচ্চে সে একলা এ ক’মাস আমার কাছ ছাড়া কেউ যত্ন করে না সে আমায় চায় তোমরা আছ পয়সা আছে লোক যুটবে ছেলেদের মানুষ করিও। তাকে একলা রাখ্‌তে পাচ্ছিনি সে বল্‌চে তার কষ্ট হচ্চে আমি যাবো “তার পরও কয়েকবার ভেদবমী হ’ল ঔষধ ধর্‌লো না, যতক্ষণ জ্ঞান ছিল আমার মৃত পুত্রকে দেখিতেছিল ও যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও প্রাতে মৃত্যু হয়।

এ ঘটনার পর—ভাবিয়াছিলাম ঝি আশক্তিবশতঃ ভূত হবে দেখা

দিবে বা উপদ্রব করিবে। আরও বৃদ্ধাবস্থায় তার আকৃতি বিকট ছিল, মৃত্যু অবস্থায় বিকটতর হয়। আমরা তার মৃত্যুকালীন আকৃতি স্মরণ করিয়া রাত্রে ভীত থাকিতাম কিন্তু একদিনও কোন ভয় বা ভয়ের লক্ষণ দেখি নাই। আমরা কয়েক দিবস সন্ধ্যার অল্প পরে বাড়ী আসিতাম পরে আবার যথা সময়ে ১০।১১টা কমে কখনও বাড়ী আসি নাই। আলো লইয়া ভ্রমণ বা পাইখানা যাওয়া অভ্যাস ছিল না নিই ও নাই। ঝির মৃত্যুর পর আমার পুত্র বা ঝীকে কদাপি স্বপ্নেও দেখি নাই। আমার পুত্রের সহিত ঝির মৃত্যুকালীন এ রহস্যমর্ম দেখা ডাকা যাওয়া এবং কুকুরটার ভাব বৈলক্ষণ্য আর একটু বলিতে ছি কুকুরের মৃত্যুতে সকলের অপেক্ষা ঝি অধিকতর দুঃখিত হয় এবং বলিত কুকুরটাকেও সঙ্গে নিলে আমি কবে যাবো। সন্ন্যাসীর বিষাদ্বানী সত্য হইল বন্ধ্যারও পুত্র হইয়াছিল সে পুত্র অদ্যাপি জীবিত নাম বৈদ্যনাথ। উহার মাতা পিতার অবস্থা ভাল আরও ছেলেপুলে হইয়াছে। সন্ন্যাসীর প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ জানি না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
